সাহিত্যে
রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় পর্ব

জীবেন্দ্র সিংহ রায়

ক্যালকাটা পাবলিশার্স

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ভূমিকা

বাঙলার রেনেসাঁসের আলোকে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সাহিত্যরথীদের সৃষ্টিকর্মের বিচার-বিশ্লেষণ এইখানে শেষ হলো। প্রথম পর্ব প্রকাশের পর দেড় বছর পার হয়ে গেছে—এর মধ্যে কোন কোন পাঠকের তিরস্কার পর্যন্ত শুনতে হয়েছে—তবু কর্মস্থল পরিবর্তন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণের জন্য দ্বিতীয় পর্ব লেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিলম্বে হলেও পাঠকের কাছে আমার ঋণ যে শেষ পর্যন্ত শোধ করতে পেরেছি, এই আমার একমাত্র পরিতৃপ্তি।

গ্রন্থ-পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রথম পর্বের ভূমিকায় যা বলেছি, তার অতিরিক্ত আর কিছু বলার নেই। তবে দেখে ভালো লাগলো, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙলার রেনেসাঁসকে আমি যেভাবে দেখেছি, (প্রথম পর্বের ভূমিকা দ্রঃ) শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার তাঁর একটি সাম্প্রতিক রচনায় অনেকটা সেইভাবেই বিষয়টাকে দেখেছেন—'অসম্পূর্ণ সেই বাঙলার রেনেসাঁস এ কথা বলেছেন বিজ্ঞজনেরা, মেনেছি আমিও অপরিতৃপ্ত বিচারে। কিন্তু আমরা তার কী বুঝেছি যদি না মানি বুদ্ধি দিয়ে আর অন্তর দিয়ে—তবু অসামান্য সেই রেনেসাঁস? যদি না অনুভব করি রেনেসাঁসের সেই বুদ্ধির-মুক্তি কেরানি জীবনের ভাব-ভূমি ছাড়িয়ে জাতীয় মুক্তির বুদ্ধিকে ধূম্রান্তরালবর্তী কোন্ যজ্ঞাগ্নিশিখায় জ্বালিয়ে তুলবার আয়োজন? যন্ত্রতাড়িত আর মন্ত্রশাসিত সেই পরাধীন জীবনের খণ্ডিত আয়োজনের মধ্যেও যে নব-জাগরণের চাঞ্চল্য রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শতবর্ষের বাঙলাকে শিহরিত উচ্চকিত উদ্‌বোধিত করেছিল আমাদের ইতিহাসে তার তুলনা কোথায়?...রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, হিন্দু কলেজের (ইং ১৮১৮) থেকে স্বদেশীযুগের প্রকাশ (ইং ১৯০৫-৮)—এই কালের মধ্যে, কলোনির এই অপরিসর মধ্যবিত্ত-জীবনের মধ্যে, যেমন শক্তিমান বহুসংখ্যক মনীষার স্ফুরণ ঘটেছে এমন স্ফুরণ যে কোনো জাতির ইতিহাসে গৌরবের (পরিচয়, বৈশাখ ১৩৬৮)।' এ কথা উল্লেখের কারণ এই যে, প্রথম পর্বের সমালোচনায় দু' একজন আমাদের উনিশ শতকী রেনেসাঁসকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন, কেউ বা

রেনেসাঁসের ভূতকে পরিহাস করতে দ্বিধা করেন নি। গোপাল হালদারের লেখাটিকে সে-দিক থেকে আমি একটা জোরালো প্রতিবাদ বলে মনে করি। বস্তুতঃ এই খণ্ডের প্রথম অধ্যায়টি কোন কোন পাঠকের সংশয় নিরসন কল্পে এবং গ্রন্থ-পরিকল্পনার মূল সূত্রটি স্পষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা। পরবর্তী সংস্করণে এই অধ্যায়টিকে প্রথম পর্বের প্রথম অধ্যায় রূপে যোজনা করার ইচ্ছা রইলো।

মধুসূদনের কাব্যের আলোচনায় আমি আমার আরেকটি গ্রন্থ—'মধুসূদনের কাব্যবৃত্ত'—থেকে অনেক অংশ উদ্ধৃত করেছি। পুনরায় লিখতে গিয়ে যাতে বক্তব্যের পরিবর্তন না ঘটে, সেজন্য পূর্বকথারই পুনরাবৃত্তি করতে হলো। মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনার তুলনায় বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা ছোট বলে মনে হতে পারে। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে পাঠকের অধিকতর পরিচিতি, গ্রন্থের কলেবর-স্ফীতি ও প্রকাশিতব্য 'বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থটির দিকে লক্ষ্য রেখেই অধ্যায় দুটিকে ছোট করতে বাধ্য হয়েছি। আশা করি, পাঠকরা পৃষ্ঠাসংখ্যাকে সাহিত্যরথীদের গুণাগুণের সূচক হিসেবে দেখবেন না।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্বিতীয় পর্বে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেলো। তারিখে দুটি অশুদ্ধি প্রথমেই চোখে পড়বে—এক জায়গায় 'হিন্দুমেলার' তারিখ ১৩৬৭ হয়েছে, ১৮৬৭ হবে। আরেক জায়গায় ১২-এর স্থলে ২২ হয়েছে, উনিশ শতক যে বাঙলা বারো শ সাল হবে, এটা অবশ্য সকলের জানা। চন্দ্রবিন্দু, 'উ-ঊ' ইত্যাদির ক্ষেত্রেও কয়েকটি অশুদ্ধি রয়ে গেছে। মধুসূদন-প্রসঙ্গে 'strand'-এর আগে 'distant' হবে। এ ছাড়াও ত্রুটি হয়তো আছে, তার জন্য অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি। রেনেসাঁসের প্রতিশব্দ হিসেবে 'নবজন্ম' শব্দটি ব্যবহার করেছি, পাঠকরা ইচ্ছে করলে 'পুনর্জন্ম' করে নিতে পারেন।

গ্রন্থ রচনায় যাঁদের রচনা থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য গ্রহণ করেছি, তাঁদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জীবেন্দ্র সিংহ রায়

অধ্যাপক সুনীলকুমার ঘোষ

বন্ধুবরেষু

সূচী

সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ

১

বাঙলার রেনেসাঁসের সাধনা ও সাহিত্যের নবজন্ম

এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের, এক কালের সঙ্গে আরেক কালের বিলক্ষণতা শুধু কতকগুলি সংখ্যার হিসেবে কখনই ধরা পড়ে না। আয়তনভেদে ভূখণ্ডের ভৌগোলিক পরিমাপ বদলে যায় সত্য, কালের ব্যবধানেও শতাব্দীর হিসেবে নতুন অঙ্ক জড়ো হয়, সন্দেহ নেই—তবু সেই সংখ্যাতত্ত্বেই দেশকালবিধৃত জীবনের পরিবর্তনের পুরো তাৎপর্য ফুটে ওঠে না। ইংল্যাণ্ড সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের দেশ হলেও তার সঙ্গে ভারতবর্ষের দেহমনের যোগ গত দুশো বছরে যতটা গভীর হয়ে উঠেছে, ভৌগোলিক সান্নিধ্য সত্ত্বেও কাবুল কান্দাহারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ততটা গভীর হয়নি। চৈতন্যযুগের পরে উনিশ শতক পর্যন্ত কয়েক শতাব্দীতে ভারতবাসীর জীবন একটুও এগোয়নি, অথচ রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কয়েক যুগের মধ্যে কি অভাবনীয় রূপান্তরই না ঘটে গেলো। তাই ভৌগোলিক বা কালগত বিচারে সামাজিক সত্যের সঙ্গে সর্বত্র ও সর্বথা সাক্ষাৎকার হয় না। তার জন্যে চাই বাস্তব অবস্থা ও পরিপ্রেক্ষিতের বিচার, যে সমস্ত সামাজিক, রাষ্ট্র-নৈতিক ও আর্থিক কার্যকারণ পরম্পরায় জীবনের আদল ভাঙে ও গড়ে তারই আত্যন্তিক মূল্যায়ন। সেই বিচার ও মূল্যায়নের শেষে দেশে দেশে কালে কালে জীবনের বিচিত্র ভেদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বোঝা যায়।

এ কথাগুলি অপ্রাসঙ্গিক নয়। একদা পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে য়ুরোপের রেনেসাঁস বা পুনর্জন্ম ঘটেছিলো। সময়ের ব্যবধানে হলেও অন্ততঃ পশ্চিম য়ুরোপের দেশগুলিতে রেনেসাঁসের আশীর্বাদ

সোনার ফসল ফলিয়েছে। ফ্লোরেন্সের উৎসভূমি থেকে রেনেসাঁসের জোয়ার যখন ছড়িয়ে পড়েছে অন্যান্য দেশে তখন ইতিহাসের একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা। সেই অধ্যায়ে দেখতে পাই : মানুষকে কেন্দ্র করেই মানবিক চিন্তার বয়ন ; মানুষই মানুষের ধ্যান, জ্ঞান ও কর্মের বিষয়। এ শুধু ঐহিকতা নয়, এ হচ্ছে মানবমহত্ত্বে আস্থা ও শ্রদ্ধেয়তা। ইহলোকের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের স্বরাট-সাধনা ঐহিকতাবোধ নিয়েই সম্পূর্ণ, তবু শুধু মাত্র ঐহিকতায় হিউম্যানি-জমের আসল তত্ত্বটি নেই। তাই রেনেসাঁসের যুগে য়ুরোপের মনুষ্যচিন্তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে।

মধ্যযুগের অন্ধকারত্ব সম্বন্ধে যতই বিতর্ক থাক এবং রেনেসাঁসের কিছু কিছু ভাব-লক্ষণ মধ্যযুগে ছিলো কিনা এই নিয়ে যতই মত-বিরোধ দেখা দিক, তবু সামগ্রিক বিচারে মধ্যযুগের সঙ্গে রেনেসাঁস যুগের পার্থক্য ঐতিহাসিক সত্য, যদিও সন তারিখ নির্দিষ্ট করে দেওয়া অসম্ভব। সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রচর্চা ও অর্থসাধনার অবসান এবং জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্র ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অভ্যুদয় এই দুই যুগের পার্থক্য চিনিয়ে দিতে আমাদের সাহায্য করে। তখনকার য়ুরোপের বাস্তব অবস্থার ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে জাতিগুলির মানুষী ভাবনার বিশ্লেষণও সম্ভব। সমুদ্রপথ আবিষ্কারের ফলে অন্যান্য দেশ, বিশেষ করে আরব জগতের সঙ্গে ইতালীর যে বাণিজ্যিক লেনদেন ঘটতে শুরু করে, তা শুধু কৃষিনির্ভর য়ুরোপের অর্থ-নৈতিক রূপান্তর আনেনি, ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সূত্রে একটা মানবতন্ত্রী প্রত্যয় ও অনন্যনির্ভর জীবন-জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়তঃ রেনেসাঁসের সময়ে প্রাচীন বিদ্যার পুনরুজ্জীবন ঘটে, ধ্রুপদী অতীতের পুনরাবিষ্কার চলতে থাকে। হেলেনিক উত্তরাধি-কারের পুনরুদ্ধার বা অতীত ঐতিহ্যের কালানুগ স্বীকৃতির প্রত্যক্ষ কারণ ইতালীর সঙ্গে প্রাচীন রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন যোগ এবং কন্‌ষ্টান্‌টিনোপলের পতনের পর প্রাচীন বিদ্যাজীবী পণ্ডিতদের ইতালীতে আগমন। তবে সামগ্রিক বিচারে মনে হয়,

প্রাচীন বিদ্যার অনুশীলনের মধ্যে চিত্তমুক্তির সুযোগ ছিলো বলেই রেনেসাঁসের দিক থেকে তার এমন মূল্য। এইচ্. জি. ওয়েল্‌স্ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—'The fundamental fact of the Renaissance was not classicism, but release ('The outline of History')।'

আসলে রেনেসাঁসের আলোচনায় এই চিত্তমুক্তির বিষয়টাই সবচেয়ে বড়ো কথা। এযাবৎ মানুষের মন ছিলো নানা শেকলে বাঁধা, কল্পিত আদিপাপের অভিশাপ তাকে আত্মপ্রত্যয়শীল বিচার-প্রবণ মানুষে পরিণত হতে দেয়নি। চার্চের নিরঙ্কুশ আধিপত্য মেনে নিয়ে, পুরোহিততন্ত্রের অসহায় শিকার হয়ে, ভগবানের তথাকথিত প্রতিভূ রাজা আর জমিদারের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করে জীবন-যাপনের মধ্যে যে আত্মনিগ্রহ ও মূঢ়তা, মধ্যযুগের মানুষের ইতিহাসে তারই চরম পরিচয়। রেনেসাঁস মানুষকে এই সর্বব্যাপী মূঢ়তা ও মানসিক জড়তা থেকে উদ্ধার করে। ফলে সে পায় শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের জটাজাল থেকে মুক্তি আর মানবিক অধিকার, অন্ধ আনুগত্যের বদলে যুক্তিশীলতা। সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজবিন্যাস ও অর্থসাধনার পরিবর্তে সমাজ ও রাষ্ট্রের গঠনে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ ও অর্থনৈতিক বৃত্তে ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বীকৃতি বিশেষ তাৎপর্যবহ, সন্দেহ নেই। মানুষের ভাবধারায়, জীবন-সম্পর্কে ('in all his ideas and relations of life'—Thatcher & Schwill), পারিবারিক ও সামাজিক ইউনিটে ব্যক্তির ভূমিকায়, রাষ্ট্রতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যে মৌল পরিবর্তন এলো, তাতে নতুন জীবনায়নের সম্ভাবনা ছিলো প্রচুর। এবং তার বিচিত্র প্রকাশও দেখা গেলো।

এখানে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে। রেনেসাঁস কথাটি একটি সামান্য (general) সংজ্ঞা এবং সাধারণভাবে একাধিক বৈশিষ্ট্যের স্মৃতিবহ। বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রেনেসাঁসের ভাবধারার মধ্যে মানবতাবাদ ছাড়াও কতকগুলি

শাখা প্রশাখা আছে—যেমন দুঃখবাদ, সংশয়বাদ, প্লেটোবাদ ইত্যাদি।

কিন্তু এত বিচিত্র ভাবের অনুষঙ্গ স্বীকার করে নিলেও য়ুরোপের রেনেসাঁসের কতকগুলি ক্রটি অনস্বীকার্য। মধ্যযুগের নানা মানদণ্ড ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এই নতুন যুগে বর্জন করার চেষ্টা হয়েছে, তবু স্বয়ং ইতালীয়রাই অর্বাচীন বিজ্ঞানবুদ্ধিকে সম্পূর্ণ মেনে নিয়েছিলো বলে মনে হয় না। আর তারই ফলে অন্ধ সংস্কার, বিশেষ করে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রভাব থেকে তাদের মুক্তি ছিলো খণ্ডিত। দ্বিতীয়তঃ দর্শনচিন্তায় ইতালীয় রেনেসাঁসের বিশেষ কিছু দান নেই। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, রেনেসাঁসের সাধনায় জনসাধারণের ভূমিকা ছিলো নগণ্য, যদিও এই আন্দোলনে জনসাধারণের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি কম-বেশি বদলে যায়।*

সে যাই হোক, এই যে য়ুরোপীয় রেনেসাঁস, তার স্ফূর্তির ফল সেখানকার সাহিত্যেও পরিস্ফুট। স্থাবর সমাজে গতির বিদ্যুৎ-স্ফুরণ শুধু ব্যবহারিক জীবনকেই আলোকিত করে না, শিল্প-সাহিত্যেও তার দ্যুতি বিভাবিত হয়। জাতির মর্মমূলে সঞ্জীবনী শক্তির রস-সঞ্চার হলে তার সৃজনবৃত্তি সক্রিয় হয়ে সাহিত্যের ফুল ফোটায়। তার প্রমাণ য়ুরোপের সাহিত্যে পাই। আর্মাডার পরাজয়ে ইংরেজের উল্লাসের উতরোল শুনতে পাওয়া যায় মার্লোর নাটকীয় চরিত্রগুলির বুকভরা নিঃশ্বাসে, শক্তির মদমত্ততায়, জাতীয় গৌরব-চেতনায়। নাবিকদের সমুদ্রপথ আবিষ্কারে, বৈজ্ঞানিকদের প্রকৃতি-বিজয় ও পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে জ্যোতির্মণ্ডলে মানস-অভিসারের মধ্যে সীমায়িত জীবনের পরিধি বিস্তারের যে সীমাহীন তৃষ্ণা তাতেই

* "The Renaissance was not a popular movement; it was a movement of a small number of scholars and artists encouraged by liberal patrons, especially the Medici and the humanist Popes'—'History of Western philosophy'—Bertrand Russel। 'তাঁরা (হিউমানিষ্টরা) ডিভাইনপন্থীদের মতো জনপ্রিয় ছিলেন না, জনতা তাঁদের বুঝতে পারত না, তাঁরাও জনতাকে বোঝাবার জন্য বর্ণপরিচয় ও শিশুবোধক লিখতে নারাজ ছিলেন।...ও মাপকাঠি (অপামর জনসাধারণ ইত্যাদির মাপকাঠি) হিউমানিষ্টদের জন্য নয়।'—কণ্ঠস্বর, অন্নদাশঙ্কর রায়।

হয়তো তৈমুরলঙের নাট্যকাহিনীর প্রাণ-প্রেরণা নিহিত ও মার্লোর কল্পনা উদ্দীপিত। ইতালী, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, হল্যাণ্ড, জার্মানী ইত্যাদি দেশের সাহিত্যেও রেনেসাঁসের উজ্জ্বল স্বাক্ষর আছে। আসল কথা, রেনেসাঁসের যাদুস্পর্শে শিল্প-সাহিত্যের সাধকদের মধ্যে একটা নবচেতনার উদ্বোধন হয়, ইহনিষ্ঠ মানবতায় যে সত্যদর্শনের ইঙ্গিত, তা লেখকদের মধ্যে আনে একটা বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস, নতুন প্রত্যয়। শুধু তাই নয়, তাঁদের চোখের সামনে খুলে যায় একটা অদৃষ্টপূর্ব দিগন্ত। মধ্যযুগে যে নারী ছিলো সহজ সামাজিক ও ব্যক্তিগত অধিকার থেকে বঞ্চিত, রেনেসাঁসের যুগে সেই নারী আদিপাপের পুরুষানুক্রমিক অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে শুধুই সামাজিক পরিবর্তন আনেনি, সাহিত্যেও পেয়েছে নিজের অভিনব জীবনায়ন ও যথাযোগ্য স্বীকৃতি। ভোগ্যা ও পণ্যা হয়েছে সহধর্মিনী ও সহমর্মিনী, বন্ধু ও নর্মসহচরী। সমাজভুক্ত ইউনিট হিসেবে নারী-ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কেও আসে একটা নতুন দৃষ্টি—নিরঙ্কুশ ভোগবাদের নয়, একনিষ্ঠ প্রেমবাদের। ফলে রেনেসাঁসের সময় থেকে স্বাধীন নারী-সত্তা ও প্রেমবৃত্তে নারীর সুন্দর রূপমূর্তি সাহিত্যের অমূল্য আবিষ্কার। পেত্রার্কার লরা ও সেক্সপীয়ারের জুলিয়েটরা অবিস্মরণীয়া।

॥ ২ ॥

ইংরেজ-লক্ষ্মীর দূতীয়ালিতে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের প্রথম শুভদৃষ্টি। হ্যাঁ, শুভদৃষ্টিই ; অন্ততঃ উগ্র জাতীয়তাবাদের আবিলতা থেকে মুক্ত হয়ে বিচার করলে তা-ই মনে হয়। য়ুরোপের সঙ্গে পরিচয়ে আমরা আঘাত পেয়েছি, দরিদ্র হয়েছি, ভয়-শঙ্কা মনে মেনেছি, আবার হয়েছি চমৎকৃত। প্রথম যুগ পেরিয়ে দ্বিতীয় যুগে পৌঁছনোর পরেই প্রশ্ন উঠেছে ঃ য়ুরোপের কতটুকু গ্রহণ করবো,

আর কতটুকুই বা বর্জন করবো। রামমোহনে প্রথম এই জিজ্ঞাসা প্রতিধ্বনিত। আবার কেউ কেউ ভেবেছেন, শুধুই বর্জন বা গ্রহণের কথা। ভবানীচরণ ও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই-সব গুরুতর প্রশ্নে শেষ সিদ্ধান্তে তাঁরা পৌঁছোতে পারেন নি সত্য, তবে গ্রহণ-বর্জন প্রশ্নের টানাপোড়েনেই আমরা সক্রিয় হয়ে য়ুরোপের অন্তরাত্মাকে ধরবার চেষ্টা করেছি, আমাদের যুগযুগান্তরের স্থৈর্য্য ও জাড্যে জাগরণের শিহরণ অনুভব করেছি। আর সেই জাগরণের ফলেই আমাদের উনিশ শতকী জীবনের নানা দিগন্তে বিচিত্র কলরব, ব্যক্তিগত ও সামাজিক অস্তিত্বের নব নব মুক্তি ও বিকাশ। সদ্যোক্ত জাগৃতির প্রাণাবেগই রেনেসাঁসের ভাবধারা কিনা, সে প্রশ্ন অবশ্য উঠতে পারে।

বাঙলা তথা ভারতে প্রাক্-ব্রিটিশ আমলের শ্রেণী-বিন্যাস ও সমাজ-মানসে বিপ্লব ঘটানো ইংরেজদের কাম্য ছিলো না। তবু ইংরেজ রাজত্বের আর্থিক ও সামাজিক তাৎপর্য আঠারো শতকের শেষ দিকেই আভাসিত হতে থাকে। যে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় অপরিবর্তনীয় শ্রম-বিভাগের নীতির সূত্রে কৃষি ও কুটিরশিল্পের উৎপাদন মাত্র গ্রামীণগোষ্ঠীর সরাসরি প্রয়োজন মেটায় এবং শুধু আভ্যন্তরীণ বিনিময়যোগ্য পণ্য হিসেবে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থিক গ্রাম-ইউনিট গড়ে তোলে, ইংরেজ রাজত্ব তারই মূলে আঘাত হানে। সরল উৎপাদন-পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল স্বয়ংসম্পূর্ণ অথচ আত্মকেন্দ্রিক, পরিবর্তনবিমুখ ও পরস্পরবিচ্ছিন্ন এই গ্রামগুলি ছিলো, মার্ক্সের ভাষায়, প্রাচ্যদেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার ক্ষেত্র: মানুষগুলি ছিলো অর্ধবর্বর ও অর্ধসভ্য এবং মানুষের মন ছিলো সংস্কারের প্রতিরোধ-অক্ষম যন্ত্র মাত্র। আর শিল্প-বিপ্লবে গর্বিত ইংল্যাণ্ডের, বিশেষ করে ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রতিযোগিতায় তার নিজস্ব কুটিরশিল্প, বিশেষ করে তার তাঁতশিল্প নষ্ট হয়ে গেলো। ভারতবর্ষ হয়ে উঠলো ইংল্যাণ্ডে কাঁচামাল সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র। প্রাক্-ব্রিটিশ আমলের এদেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক বিন্যাসে কৃষকগোষ্ঠীই

ছিলো জমির আসল মালিক। রাষ্ট্রগত সার্বভৌম মালিকানা এবং ফলভোগী কৃষকসমাজের মধ্যে কোন মধ্যস্বত্ব ছিলো না এমন নয়। মার্ক্স বললেন, 'side by side with the masses,···we find the chief inhabitant, who is judge, police and tax-gatherer in one.' এই গ্রাম্যপ্রধানরা জমিদার না হলেও সমগ্র গ্রামের কতকগুলি গুরুতর দায়িত্ব বহন করায় এবং রাজা বা সম্রাটের প্রতিনিধি হওয়ায় এদের জমিদার-সুলভ মধ্যস্বত্বভোগীর মর্যাদা ছিলো (সমগ্র গ্রামীণগোষ্ঠীকেই এদের জীবিকা যোগাতে হতো, একথাও স্মরণ রাখতে হবে)। অবশ্য কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে এই তথাকথিত জমিদারদের জমির ওপর বংশানুক্রমিক স্বত্ব স্বীকৃত হয়। সে যাই হোক, এই একই প্যাটার্ণে বংশপরম্পরায় কাজ চলতে থাকায় রাষ্ট্রশক্তির মুহুর্মুহু পরিবর্তন সত্ত্বেও গ্রাম-ইউনিটের সামাজিক ও আর্থিক বিন্যাস ছিলো অপরিবর্তনীয়। ইংরেজরা এদেশের ছোট গতানুগতিক সামাজিক সংগঠনে একটা বিরাট পরিবর্তন আনে এবং সেই পরিবর্তনকেই মার্ক্স বলেছেন এশিয়ার একমাত্র সামাজিক বিপ্লব। ইংরেজ-প্রবর্তিত পরিবর্তনের মূল কথা হচ্ছে: স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধ্বংস, আমদানী ও রপ্তানীর সূত্রে বিশ্বের ধনতন্ত্রের সঙ্গে সামন্ত-তান্ত্রিক বাঙলার যোগাযোগ স্থাপন, পণ্যবিনিময়ের আর্থিক চেতনার বদলে নগদমূল্যে পণ্য কেনা-বেচার অর্বাচীন চেতনার প্রকাশ।

এই নতুন আর্থিক বিলিব্যবস্থায় ইংরেজ আমলে তিনটি নতুন শ্রেণীর আবির্ভাব। তার একটি হচ্ছে জমিদারশ্রেণী। ওয়ারেণ হেস্টিংসের সময়ে এদেশের প্রচলিত ভূমিব্যবস্থায় পরিবর্তনের সূচনা। জমির আসল মূল্য নির্ধারণকল্পে অন্ততঃ পাঁচ বছরের জন্য যিনি সর্বোচ্চ ডাক দেবেন (highest bidder), তাকেই জমি দেওয়া ঠিক হয়। কিন্তু তার ফল ভালো না হওয়ায় পরে একটি বোর্ডের

ওপর দেওয়া হয় রাজস্ব আদায়ের ভার। যদিও হেস্টিংস ক্রমে ক্রমে জমির যাবজ্জীবন বন্দোবস্তের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিলেন, তবু পরস্পরবিরোধী তথ্যের অজুহাতে বাৎসরিক বন্দোবস্তের নীতিই গৃহীত হয়। এর পর কর্ণওয়ালিশের আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিয়ম প্রচলিত হওয়ায় ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এতে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দূর হয় বটে, কিন্তু প্রজাদের জমি ঠিকে নেওয়ার অতি ত্বরান্বিত প্রতিযোগিতায় নতুন জমিদাররা ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। হেস্টিংসের আমল থেকে কর্ণওয়ালিশের আমল পর্যন্ত ইংরেজদের প্রসাদপুষ্ট এই নতুন জমিদারশ্রেণীর সঙ্গে সামাজিক ধারাবাহিকতার যোগ না থাকায় এবং বিদেশীর স্বার্থে তাদের উদ্ভব হয়েছিলো বলে সামন্তশ্রেণীর উপযুক্ত সামাজিক ভূমিকা তাদের ছিলো না। তারপর জমির সঙ্গে যোগাযোগহীন অনুপস্থিত জমিদার মাত্রে (absentee landlord) পরিণত হওয়ায় তারা কলকাতার বাবু হয়েই রইলো, সমাজের অপরিহার্য ইউনিট হয়ে উঠতে পারেনি।

এদের সঙ্গেই আবির্ভাব ঘটে আরেক আর্থিক সম্প্রদায়ের। ইংরেজের সমর্থন ও সাহায্য না পেয়ে দিশি বেনিয়ারা লোপ পেতে শুরু করে। রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব আর নেই, বিপুল শুল্কের বেড়া ডিঙিয়ে বহির্বাণিজ্যের সুযোগও কম—এমনি অবস্থায় তাদের আত্মরক্ষার উপায় আর রইলো না। কিন্তু কোম্পানীর অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য প্রসারে সাহায্য করার সূত্রে গড়ে উঠলো বেনিয়ান-মুৎসুদ্দির দল, বিশেষ করে কোম্পানীর কর্মকেন্দ্র কলকাতায় উঠে আসার পর এই নতুন আর্থিক সম্প্রদায় কলকাতার আরেকটা শ্রেণী হয়ে ওঠে। সামাজিক ও বংশগত ঐতিহ্যবিহীন অথচ প্রচুর কাঁচা পয়সার মালিক বেনিয়ান-মুৎসুদ্দির দল কলকাতায় প্রাধান্যও অর্জন করে। নতুন জমিদারদের মতো এরাও বৃহত্তর বাঙালী সমাজের অন্তরঙ্গ ছিলো না।

কিন্তু নতুন জমিদার শ্রেণী ও বেনিয়াসম্প্রদায় ছাড়া আর এক

বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণীও ইংরেজ রাজত্বে গড়ে ওঠে। রাজকর্মচারী, টোলো পণ্ডিত, সভাকবি, বৈদ্য ইত্যাদি নিয়ে পরগাছা-মধ্যবিত্তশ্রেণী প্রাক্-ব্রিটিশ আমলেও ছিলো, কিন্তু সামাজিক গুরুত্বের দিক থেকে তাদের ভূমিকা ছিলো নগণ্য। অন্ততঃ সংখ্যায় ও ক্ষমতায় এরা তখন বিশেষ একটা প্রভাবশালী গোষ্ঠী ছিলো বলে মনে হয় না। কিন্তু ইংরেজ আমলে জমিদারদের ছত্রচ্ছায়ায় জমির উপস্বত্বভোগী যে মধ্যবিত্তের আবির্ভাব, তাদের সামাজিক প্রভাব ও গুরুত্ব অনু-পক্ষেণীয় হয়ে উঠেছিলো। এই মধ্যবিত্তশ্রেণী বাঙলাদেশে অনেক দিন পর্যন্ত জমিনির্ভর ছিলো, এমন কি বৃত্তিধারী বা ব্যবসায়ী মধ্যবিত্তরাও আপন আপন জীবিকা ছেড়ে জমির দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকে। দ্বিতীয়তঃ কর্ণওয়ালিশের সময়ে নিম্ন বেতনে যে দিশি সরকারী কর্মচারীর দল গড়ে উঠেছিলো, বেন্টিঙ্কের এক শ টাকারও বেশি বেতনে দিশি কর্মচারী নিয়োগের নীতি ঘোষণার পর থেকে তারাও দলে ভারী হয়ে ওঠে। এই মধ্যবিত্তশ্রেণী ছিলো শাসনযন্ত্রের নন-প্রডাক্টিভ্ ইউনিট এবং সেই জন্যই তারা কৃষক ও মজুরের মতো শ্রমজীবী না হলেও পরজীবী ছিলো। এদের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে এসে যোগ হলো শিক্ষিত সম্প্রদায়—হিন্দু কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষাসংস্থা প্রতিষ্ঠার পর এদের প্রভাব ক্রমশঃই অনুভূত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাঙলার মধ্যবিত্তের গড়নে তিনটি উপাদান ছিলো—জমি-নির্ভর উপস্বত্বভোগীর দল, ইংরেজ রাজত্বের সরকারী কর্মচারীবৃন্দ ও শিক্ষিত ভদ্রলোকের দল। এদের বিচিত্র ও জটিল ত্রিবেণীসঙ্গমেই বাঙলার মধ্যবিত্তশ্রেণী উৎসারিত। তাই এদের সঙ্গে য়ুরোপের ধনতন্ত্রের স্নেহচ্ছায়ায় গড়ে-ওঠা মধ্যবিত্তের পার্থক্য আছে। মনে রাখতে হবে, যে শিল্পকেন্দ্রিক ধনতন্ত্রের (industrial capitalism) যুগে পাশ্চাত্ত্যদেশে আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, তার চেয়ে বাণিজ্যকেন্দ্রিক ধনতন্ত্রই (merchant-capitalism) বাঙলা তথা ভারতবর্ষে প্রধান। ফলে মধ্যবিত্তের ভূমিকায় অসঙ্গতি, স্ব-বিরোধ ও সীমা (limitation) আছে, তা খণ্ডিত ও দ্বিধাগ্রস্ত।

বিশেষভাবে এই কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, সদ্যোক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীই উনিশ শতকের বাঙলার রেনেসাঁস ও সাহিত্যের উজ্জীবনের নায়ক।

দেশের জনসাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে ইংরেজের প্রাথমিক অনাগ্রহের প্রমাণ এমন কি ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়া অ্যাক্টেও আছে। কিন্তু কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১) প্রতিষ্ঠা থেকে হিন্দু কলেজ (১৮১৭) স্থাপনের অন্তবর্তীকালীন সময়ে সেই অনাগ্রহ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। মাঝখানে ১৮০০ সালে সিভিলিয়ানদের দিশি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা। তবু তার মধ্য দিয়ে 'exaltation of the British character among the nations of Europe.' প্রচারের চেষ্টাও দেখা যায়। হিন্দু কলেজও ছিলো ইংরেজী শিক্ষা, চিন্তা, আদর্শ ও জীবনচর্যার নীতি অনুশীলনের পীঠস্থান। জনসাধারণের শিক্ষার যেটুকু ব্যবস্থা ছিলো, তার কৃতিত্ব অবশ্য মিশনারীদের প্রাপ্য। কিন্তু সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থারই মূলে নিঃস্বার্থ কল্যাণ কামনা ছিলো না, ছিলো ইংরেজের স্বার্থসিদ্ধি ও আদর্শ রূপায়ণের লক্ষ্য বস্তুতঃ প্রাচ্যশিক্ষা নয়, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষারই আকর্ষণ ও দাবি ক্রমশঃ প্রবল হয়ে ওঠে (দ্রষ্টব্য: Charles E. Trevelyan's 'on the Education of the people of India')। আর তারই ফলে মেকলে ঘোষণা করতে দ্বিধা করেননি: We must do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern ; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect.' সুতরাং বাঙলাদেশের যে শিক্ষিত শ্রেণী নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান অঙ্গ, তাদের শিক্ষা যতটা য়ুরোপীয়, তার শতাংশ ভারতীয় ছিলো না। রামমোহন রায়ের মতো অনেকের এই য়ুরোপীয় শিক্ষার প্রতি সমর্থন ছিলো, যদিও মেকলের 'দালাল' সৃষ্টির দৃষ্টিকোণে সেই

শিক্ষাকে তাঁরা দেখেননি। তারই মধ্যে রামমোহনেরা দেখতে পেয়েছিলেন জাতির মুক্তির পথ।

এইভাবে ইংরেজী শিখে, ইংরেজের চাকুরী করে মোটামুটি আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করলো যারা, তারা ইংরেজের প্রয়োজন মিটিয়েও নিজেদের সঞ্জীবিত মানসকে নানা সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিয়োজিত করে। কারণ ইংরেজের সংস্পর্শে, কেরাণী বা দালাল গড়বার পরিকল্পনার ফাঁক দিয়েই প্রতীচ্যের আলোকোজ্জ্বল দিগন্ত তাদের চোখে উদ্ভাসিত হয়। যেমন বিজ্ঞান ও সাহিত্য তেমনি গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শ দেখে তাদের মধ্যে নতুন বোধ ও বুদ্ধি জাগে। শুধু তাই নয়, ইংরেজরা নিজেদের শাসনযন্ত্র কায়েমী করার প্রয়োজনে যে সমস্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত পরিবর্তন সাধন করে, তা-ই আমাদের সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত জীবনে স্বাতন্ত্র্য, সক্রিয়তা ও গতি স্ফুরণের উৎস। এই সব নতুন আদর্শ ও তাদের বাস্তব রূপায়ণ নিয়েই বাঙলাদেশের রেনেসাঁসের ইতিহাস।

তবু য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের ইতিহাসবেত্তার কাছে বাঙলার রেনেসাঁসের তাৎপর্য যে খণ্ডিত বলে মনে হয়, তার কারণ আছে। কালের পরিবর্তনে রেনেসাঁসের ভাবধারার অদল-বদল সম্পূর্ণ সমাজবিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, ভারতবর্ষের বহুকালাগত ঐতিহ্যের পিছু-টান, অনগ্রসর অর্থনীতি, স্থানীয় বিচিত্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি, পরাধীন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি নানা বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতের জন্য এদেশের রেনেসাঁসের রূপ ও সাধনা য়ুরোপীয় আদলের সঙ্গে ঠিক মেলে না। স্বাধীন রাষ্ট্রে সমাজ-বিকাশের বিশেষ স্তরে বিবর্তনের নিয়মানুযায়ী বা আকস্মিক কোন বিপ্লবের ফলে জাতির জীবনে যে নবজাগরণ আসে, তার সঙ্গে 'কলোনিয়াল রেনেসাঁসের' পার্থক্য থাকবেই। যেখানে বৈষয়িক স্বাধীনতা নেই, নিজের হাতে ভাগ্য গড়বার সুযোগ নেই, এমন কি শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল সূত্র বিদেশী শাসকের

হাতে সেখানে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত উজ্জীবন দ্বিধাগ্রস্ত ও পঙ্গু হওয়া স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ উনিশ শতকী রেনেসাঁসের নায়ক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গড়নটা ছিলো বিচিত্র ও জটিল, সামন্ততন্ত্রের অভিশাপের বোঝা থেকে তারা মুক্ত ছিলো না। তাদের শিক্ষায় ত্রুটি, কর্মে সীমাবন্ধন, চিন্তার সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের অসঙ্গতি (যেমন রামমোহনের অর্থোপার্জনের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর সামাজিক কর্ম ও চিন্তাধারার ইতিবৃত্ত মেলে না ঃ একক্ষেত্রে শাসক-নির্ভরতা, অন্যক্ষেত্রে স্বাধীন-চিত্ততা।) ছিলো বলেই রেনেসাঁসের সাধনায় তাদের ভূমিকাও ছিলো আংশিক, কুণ্ঠাপূর্ণ ও স্ব-বিরোধী। তৃতীয়তঃ এই রেনেসাঁসের সঙ্গে হিন্দু ভাগ্যবন্তরাই জড়িত ছিলো, মুসলমানেরা ছিলো দূরে। অবশ্য তার কারণও সুস্পষ্ট। ইংরেজরা মুসলমানদের হাত থেকে শাসনভার গ্রহণ করেছিলো বলেই শাসনের প্রাথমিক আশীর্বাদ ও সুফল থেকে তাদের বঞ্চিত করতে দ্বিধা করেনি। এ-প্রসঙ্গে কেউ কেউ জনসাধারণের ভূমিকার প্রশ্ন তুলেছেন, যদিও এমন কি য়ুরোপেও রেনেসাঁস জন-আন্দোলনে পরিণত হয়নি। চতুর্থতঃ ইংরেজী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সংস্পর্শে আমাদের প্রচুর মানসিক সমুন্নতি ঘটেছিলো সত্য, কিন্তু সেই সুদূরপ্রসারী মানস-প্রয়াসের সঙ্গে তাল রেখে আমাদের ব্যবহারিক জীবন অগ্রসর হতে পারেনি। ভাবলোক ও বাস্তবক্ষেত্রের এই বিরোধের মধ্যে একটা গুরুতর শূন্যতা ছিলো। পঞ্চমতঃ রেনেসাঁসের কালে আমরা যে য়ুরোপের সাক্ষাৎ পেয়েছি, তা একান্তভাবেই ইংলণ্ডীয় ও উনিশ শতকী, ইংরেজের দেশের বাইরের আর কোন দেশের সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক ঋদ্ধির তেমন পরিচয় আমরা পাইনি।

এই সমস্ত বিচিত্র ত্রুটি ও অসঙ্গতির জন্যই আমাদের উনিশ শতকী রেনেসাঁসের সাধনা সকলকে খুশি করতে পারে না। বাঙলার মাটিতে নবজাগরণের ইতিহাস যে রূপ নিয়েছে, তাতে বাঙালীর উজ্জীবন ও চিত্তমুক্তি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি বলে ক্ষোভ

প্রকাশ করতে অনেকে দ্বিধা করেননি। কিন্তু সমস্ত কিছু সীমা-স্ব-বিরোধ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও উনিশ শতকে আমাদের পূর্বাগত জীবন ও মনের কোন রূপান্তরই ঘটেনি এমন সিদ্ধান্ত করার কারণ সত্যই কি আছে? স্বীকার করতেই হবে—'য়ুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা, আর এক দিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশে কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না (কালান্তর, রবীন্দ্রনাথ)।' য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তির রসধারাই 'আমাদের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে যে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে।' আর তাই নতুন সংবিৎ ও মূল্যবোধ নিয়ে অনেক মনীষী ব্যক্তির জন্মও এই সময়েই ঘটে।

এক কথায়, রেনেসাঁসের অর্থ যদি হয় নবজন্ম (re-birth), তবে উনিশ শতকের বাঙালীর নবজন্ম অনস্বীকার্য।

॥ ৩ ॥

বাঙলার রেনেসাঁসের সাধনায় ধীরে ধীরে যে ভাবলোক গড়ে উঠেছিলো, তারই মধ্যে সে যুগের সাহিত্যের জন্মের ইতিহাস লুকিয়ে আছে। ইংরেজের শাসন ও শোষণের ফাঁকে ফাঁকে, সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত ইংরেজী শিক্ষার সঙ্কোচনমুখিতা সত্ত্বেও উনিশ শতকের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেদেরর সঞ্জীবিত মানসকে নানা সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত করে। কিন্তু যে মন নিয়ে তাঁরা সৃষ্টির আসরে নেমেছিলেন, যে ভাবলোক থেকে বিশেষ করে তখনকার সাহিত্য উৎসারিত—তার রূপ ও স্বরূপ প্রথম দিকে বড়ো রকমের সৃষ্টির পক্ষে ঠিক উপযুক্ত ছিলো বলে মনে হয় না। কারণ জীবনের

দৃষ্টিভঙ্গির মৌল পরিবর্তন এবং নতুন সংবিৎ ও মূল্যবোধের আত্যন্তিক প্রকাশ না হলে সাহিত্যের নবজন্মের প্রাণ-প্রেরণা জাগতে পারে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শিক্ষিত বাঙালীর মানস-জগতে নতুন হাওয়ার দোলা লেগেছিলো সন্দেহ নেই, কিন্তু জাতি-গত বা ব্যক্তিগত চিত্তমুক্তি পুরোপুরি না ঘটায় তাদের সৃষ্টিমানসকে কিছুদিন খুঁড়িয়ে চলতে হয়েছে। অবশ্য বাঙলা সাহিত্যের পূর্বাগত ঐতিহ্য এবং বাঙলা গদ্যভাষার সমসাময়িক রূপও নবযুগের বাঙালীর সৃজনশীল মুক্তচৈতন্যের পরিপোষক ছিলো না।

প্রথম পর্বে নানা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, বাঙলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্ততলে একটা ভাঙাগড়ার পালা চলেছে। পূর্ববাহিনী ও পশ্চিমবাহিনী বিচিত্র চিন্তা ও ভাবধারার ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের মানসলোক আলোড়িত। কিন্তু সেই ভাবাবর্তের মধ্য থেকে জাতীয় চরিত্রের সুনির্দিষ্ট রূপ জেগে উঠতে সময় লেগেছিলো, সমন্বায়িত আদর্শের সাগরসঙ্গমে বাঙালীর তীর্থযাত্রা দু'দশ বছরে সম্পন্ন হয়নি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধটাই সেই জটিল মানসিক ও ব্যবহারিক প্রয়াসে ব্যয়িত। রেভেলিউসান, কাউন্টার-রেভেলিউসান ও রিফর্‌মেসানের যে ইতিহাস পূর্বখণ্ডে আলোচিত হয়েছে, তা থেকে রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতা, সমাজ-সংস্কার-স্পৃহা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতাবাদের দ্বন্দ্বজনিত চিত্তসঙ্কটের চেহারাটা অনুমান করা কঠিন নয়। আর এই চিত্তসঙ্কট ছিলো বলেই রেনেসাঁসের সবচেয়ে বড়ো লক্ষণ—চিত্তমুক্তির জন্য সমসাময়িক মনীষীদের বিপুল অন্তরঙ্গীয় ও বহিরঙ্গীয় প্রয়াসের প্রয়োজন অপরিহার্য ছিলো। ফলে সাহিত্যেও রেনেসাঁসের ফসল ফলেছে শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে —তার প্রথমার্ধ গেছে ক্ষেত প্রস্তুত করার কাজে।* রেনেসাঁসের উদ্যোগ-পর্ব (preparation for the renaissance) সম্পূর্ণ

'The Indian renaissance, although it began in 1800, didnot fully come to its own until the second half of the century.—J. C. Ghosh, Bengali Literature.

হবার পরেই তার বিকাশের পর্ব (flowering of the renaissance) শুরু। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই ধরণের পর্ব-বিভাগ যুক্তিসম্মত। কারণ ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছর ছিলো প্রস্তুতি ও পরীক্ষার যুগ। তখনকার লেখা বইগুলি ঠিক সাহিত্যপদবাচ্য ছিলো না, তাদের মধ্যে বিষয়গত কোন মৌলিকতাও নেই। তাদের অধিকাংশই ছাত্রদের জন্য লিখিত পাঠ্যপুস্তক বা জ্ঞানভারতী (Book of knowledge) জাতীয় গ্রন্থ এবং তাও মৌলিক রচনা নয়, সংস্কৃত বা ইংরেজীর ভাবানুবাদ মাত্র। সাময়িক প্রয়োজনের দিক থেকে তাদের যে মূল্যই থাক না কেন, স্থায়ী সাহিত্যিক মূল্য তাদের দেওয়া যেতে পারে না। মৃত্যুঞ্জয়ের লেখায় মাঝে মাঝে সাহিত্যের রস দেখা দিয়েছে বটে, তবু তাঁর কোন নির্দিষ্ট ভাষারীতি ছিলো না, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ তাঁর রচনার মধ্যে নেই। তবে এই প্রথমার্ধেই রামমোহন, ভবানীচরণ, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, ভূদেব ও রাজেন্দ্রলালের রচনায় সাহিত্যধর্ম সুপরিস্ফুট না হলেও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর সমুজ্জ্বল। তাঁরা সাহিত্যিক প্রেরণা নিয়ে বাণীর অঙ্গনে সমবেত হননি, (একমাত্র বিদ্যাসাগর কিছুটা ব্যতিক্রম), রসের তাগিদও তাঁদের লেখায় প্রবল নয়—তবু তাঁদের দার্শনিক চিন্তায়, পরিশীলিত মননধর্মে, জ্ঞানভূয়িষ্ঠ চিত্তবৃত্তিতে, পরিশুদ্ধ সত্যানুভূতিতে বা ব্যবহারিক বোধ ও বুদ্ধিতে এমন একটা বলিষ্ঠতা ছিলো যা বাঙলা গদ্যের মধ্যে শক্তি এবং কিছুটা সৌন্দর্য সঞ্চারিত করেছে। তাঁদের কর্মী-জীবন ও শিল্পী-জীবন অবিচ্ছেদ্য হওয়ার জন্য রসের কারবারে তাঁরা পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে না পারলেও তাঁদের রচিত কেজো গদ্যের গ্রানিট স্তরের ওপরেই ভবিষ্যৎ সাহিত্যের পুষ্পিত কানন রচিত হয়েছিলো। রেনেসাঁসের ফসল ফলানোর একটা উপযুক্ত সাহিত্যিক ও ভাষাগত ভিত্তি নির্মাণের কৃতিত্ব এঁদের দিতে হবে।

অন্যদিকে কাব্যের ক্ষেত্রেও শতাব্দীর প্রথম ভাগটা পুরোপুরি

আধুনিক হয়ে উঠতে পারেনি। নতুন সংবিৎ ও অনুভূতির জাগরণ তখন পর্যন্ত অর্ধস্ফুট ও স্তিমিত। ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল—আমরা প্রথম পর্বেই দেখেছি—অনেকটাই দোটানার কবি, যুগসন্ধির মানুষ। তাঁদের এক চোখ গত দিনের দিকে, আর একটি চোখ অনাগত দিনের দিকে। তবে তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, ঈশ্বর গুপ্তের ঝোঁকটা ছিলো দেশজ ঐতিহ্যের দিকে—যদিও তাঁর প্রথম দিকের ঐতিহ্যবাদে দূরের প্রতি আকর্ষণ প্রধান হলেও শেষ দিকে নিকট-সভ্যের উপকরণও তাতে স্থান লাভ করে। অন্যদিকে রঙ্গলাল যুগসন্ধির কবি হলেও নতুন সাহিত্যরুচির কোল ঘেঁষে জন্মেছেন বলেই তিনি আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক. পূর্বায়ত কাব্যকলার শেষ উত্তরাধিকারী। এ থেকে বোঝা যায়, উনিশ শতকের প্রথমাংশে বাঙলা কাব্যের নতুন জীবনায়ন ঘটেনি. রেনেসাঁসের আশীর্বাদ তার অঙ্গে অঙ্গে একান্তভাবে ঝলমল করে ওঠেনি। আর মধুসূদনেব আগে বাঙলা নাটকও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাথমিক স্তরেই সীমাবদ্ধ। তবে সব কিছু দেখে শুনে মনে হয়, সাহিত্যের নানাবৃত্তে একটা বিপুল সংগঠন চলছে, একটা বিরাট কিছু গড়বার জন্য শিক্ষিত মানুষের মানসিক প্রয়াসের অন্ত নেই। এবং সেই প্রাণাবেগেই বাঙলা সাহিত্য উত্তীর্ণ হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধের উজ্জ্বল আলোয়। চিত্তসঙ্কট থেকে চিত্তমুক্তির খোলা হাওয়ায়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে রেনেসাঁসী সাহিত্যের এই স্বর্ণযুগ আলোচিত হবে। এই সময়ে সংস্কৃতির উজ্জীবন ও চিত্তমুক্তির স্ফূর্তি সাহিত্যের নানা দিগন্তে যে আলো ছড়িয়েছে, তাকে ছোট করে দেখার কোন কারণ নেই। নতুন সাহিত্যের প্রেরণামূলে একটা অভিনব জীবনদৃষ্টি থাকে, নতুন চৈতন্য ও অনুভূতি অঙ্গীকার করেই সাহিত্যের গোত্রান্তর বা রূপান্তর হয়—এ-তত্ত্ব দ্বিতীয়ার্ধের আলোচনায় গ্রহণ করার অসুবিধা নেই। একজন বিদগ্ধ পণ্ডিতের উক্তি উদ্ধৃত করে বলা যায়—'The writers after 1850 were equally well versed in Bengali and English, and they

enriched their native literature with the ideas they had acquired from English and other European literatures. It is now common knowledge that British rule in India, besides bringing about a political and economic revolution, brought about a greater revolution in thought and ideas. Old ways of life were challenged, and new lines of development were pursued. The most significant things in the literature of the nineteenth century were born of the impact of the West upon the East. This impact was spread over every sphere of life, religious, cultural, social, political, and economic. The advent of western learning in Bengal was of importance comparable with the advent of the Renaissance in the fifteenth century Europe, and its immediate effect was to stimulate literary production on an unprecedented scale...The literature of the nineteenth century, particularly of the second half, was the work of writers in whom the East and the West have met, and who represented in different ways and degrees the harmonies and discords that had resulted from that meeting.' ডক্টর জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের এই দীর্ঘ উক্তিতে যে বক্তব্য পরিস্ফুট, বর্তমান আলোচনায় আমাদের মূল সূত্রের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য নেই।

কিন্তু সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা অনেকের মধ্যে দেখা যায়। যেহেতু উনিশ শতকের প্রথমার্ধ সাহিত্যের দিক থেকে তেমন ফলপ্রসূ নয়, সেই হেতু আমাদের সাহিত্যে সত্যিই রেনেসাঁসের যুগ বলে কিছু আছে কিনা এই প্রশ্ন উঠেছে। আর শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছর ধরে শুধু রেনেসাঁসের প্রস্তুতি চলেছে, এই সিদ্ধান্তেও অনেকের মন সায় দেয় না; কারণ সময়টা অতিমাত্রায় দীর্ঘ। কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস স্মরণে রাখলে

ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকে না। ইংল্যাণ্ডেও গদ্য-পদ্যের ওপর রেনেসাঁস ও হিউম্যানিজমের তেমন কোন সুস্পষ্ট প্রভাব দীর্ঘ দিন দেখা যায় নি। কারণ তখনও সেখানকার জাতীয় ভাষা অপরিপুষ্ট (দ্রষ্টব্যঃ History of English Literature, Legouis & Cazamian)। গদ্যের কোন লক্ষণীয় উন্নতি হয় নি, পদ্যও চসারের পর থেকে ভারসাম্যবর্জিত ও অনিয়মিত হয়ে পড়েছিলো। ফলে ইংরেজী সাহিত্যেও রেনেসাঁসের আশীর্বাদ দু'দশ দিনে ঝলমল করে ওঠেনি। তুলনা করলে দেখা যাবে, উনিশ শতকের প্রারম্ভে বাঙলা গদ্য-পদ্যের অবস্থা আরও খারাপ ছিলো। গদ্যের বাল্য-লীলা তখনও অতিক্রান্ত হয়নি, পদ্য লোকসাহিত্যের সীমাবদ্ধ কুণ্ডে আবর্তিত হচ্ছিল, নতুন ভাব ও অনুভূতিতে তার নতুন কায়া গড়ে ওঠেনি। এমনি অবস্থায় রেনেসাঁসের ভাবধারা অঙ্গীকার করে নিতে আমাদের সমাজের যেমন সময় লেগেছে, তেমনি সাহিত্যেরও। তাছাড়া নবযুগের ভাবধর্মে দ্বিধা ও অপূর্ণতা ছিলো বলে এবং দেশজ সাহিত্যের সঙ্গে তার কোন যোগসূত্র না থাকায় বাঙলা সাহিত্য বেশ সময় নিয়েই তার আবেদনে সাড়া দিয়েছে।

২ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাস্তব পরিবেশ

আঠারো শ ছাপ্পান্ন সালে বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ হয়, আর এই সালেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বার জন্য হুগলী থেকে কলকাতায় আসেন। এই দুই ঘটনার মধ্যে প্রত্যক্ষতঃ কোন যোগ নেই, কিন্তু ঘটনা দুটিকে মিলিয়ে দেখলে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা চোখে পড়ে। বিধবা-বিবাহ বৈধকরণের আত্যন্তিক তাৎপর্য আজও আমাদের সমাজ-মানসে স্বীকৃত হয়নি সত্য, তবু পুরনো কালকে পেরিয়ে আসার এই বিধিগত প্রচেষ্টা অন্ততঃ চিন্তা ও বুদ্ধির বিবর্তনের দিক থেকে মূল্যবান। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট বঙ্কিমের কলকাতায় আগমন ও প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হওয়া শুধু ব্যক্তিগত ঘটনা হিসেবেই স্মরণীয় নয়, বাঙলা দেশের নব্যশিক্ষার অগ্রগতি ও যুগধর্মী নতুন মানুষের আবির্ভাবের দৃষ্টিকোণে তার একটা বৃহত্তর তাৎপর্যও আছে। বস্তুতঃ ভাটভাড়া-নৈহাটীর ছেলে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশের মুখোজ্জ্বল করলো, এ তো শুধু একটা শ্রোতব্য তথ্য মাত্র নয়, এ হচ্ছে যুগান্তরণের সুস্পষ্ট সংবাদ।

শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই নতুন মানুষের পরিচয় নিতে গেলে প্রথমেই আমাদের রাজনৈতিক দিগন্তে দৃষ্টিপাত করতে হবে। কারণ প্রথমার্ধের তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধে রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ অধিকতর এবং সেই জন্যই নতুন মানুষের পরিচয়ে রাজনৈতিক ছাপ কতখানি তার খতিয়ান নেওয়া দরকার। প্রথমার্ধে রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, জর্জ টমসন ইত্যাদির রাষ্ট্রীয় স্বাধিকারবোধ ও জাতীয় রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টির

চেষ্টা আমরা দেখেছি। **কিন্তু সমস্ত কিছু ক্ষোভ ও অসন্তোষ** রাজনৈতিক আন্দোলনের আকারে প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫-৫৬) মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে। হাণ্টারের বিবরণ থেকে বোঝা যায়, শাসকসম্প্রদায় এই হাঙ্গামাকে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ রূপেই দেখেছেন এবং তা দমন করতে কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু এই আন্দোলনের প্রতি তখনকার শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মনোভাব ছিলো সহানুভূতিবর্জিত। মনে হয়, রামমোহন থেকে শুরু করে তখনকার শিক্ষিত ব্যক্তিরা ভারতে ইংরেজ রাজত্বকে ভবিষ্যৎ সুখ-সমৃদ্ধির উপায় রূপে গ্রহণ করার যে মনোভাব দেখিয়েছেন, পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন সালেও সেই মনোভাব অপরিবর্তিত। আসল কথা, সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত এদের যেমন সামন্ত-স্বার্থের, তেমনি জনস্বার্থের প্রতি রাজনৈতিক সচেতনতা ছিলো না। কোম্পানীর সনদের বার বার পরিবর্তনের ইতিহাস থেকে শুধু এইটুকু জানা যায় যে, শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা আন্দোলন (agitation) করতে শিখেছে, প্রশাসনিক ভালো-মন্দ বিচারের দিকে দৃষ্টি দিতে শুরু করেছে এবং সরকারী কাজে অধিকতর ভারতীয় নিয়োগের প্রাথমিক দাবিকে সংখ্যাধিক্যের নীতির ভিত্তিতে আইনসভা গঠনের দাবিতে পরিণত করতে পেরেছে (১৮৫৩)।

সাঁওতাল হাঙ্গামার পরে আসে সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭)। এই বিদ্রোহের নায়ক অবাঙালী সিপাহীরা, প্ররোচক ক্ষমতাচ্যুত রাজা ও জমিদারশ্রেণী। সিপাহী বিদ্রোহ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত হিন্দু বাঙালীদের মধ্যে কোন সাড়া জাগাতে না পারলেও মুসলমান বাঙালীকে কিছুটা আলোড়িত করেছিলো বলে মনে হয়। কোন কোন গ্রামাঞ্চলে তা কৃষক আন্দোলনেও পরিণত হয়। তবে সমগ্রভাবে বিচার করলে তখনকার দিনের চিন্তা-নায়কেরা যে এ বিষয়ে উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় ছিলেন, তাতে সন্দেহ থাকে না। বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন ইত্যাদি স্বাধীনচিত্ত শিক্ষিত নেতাদের প্রতিক্রিয়ার কথা আমরা জানতে

পারিনি ; তবে ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু, হরিশ্চন্দ্র, দক্ষিণারঞ্জন ইত্যাদির প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার কথা আমরা জানি। একমাত্র কালীপ্রসন্নের ব্যঙ্গোক্তি ('হুতোম প্যাঁচার নক্সা') ও আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের কবিতা (তাঁতিয়া টোপীর ওপর লিখিত) সিপাহী বিদ্রোহের সমর্থনসূচক। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী যেখানে অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বাধীনচিন্তা ও সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, সেখানে সিপাহীদের সম্বন্ধে তাদের ঔদাসীন্যের কারণ ইংরেজের প্রতি নির্বিচার আনুগত্যের মধ্যে খোঁজা উচিত নয়, তা খুঁজতে হবে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাদের শ্রদ্ধাবোধের মধ্যে। দ্বিতীয়তঃ নানা বাস্তব অবস্থার জন্য দেশের উন্নত শ্রেণীর প্রকাশ্য অনুকূল প্রতিক্রিয়ার অভাব ঘটলেও সমাজে বিদ্রোহের প্রভাব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করার কারণ নেই, অন্ততঃ একটা নতুন জাতীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে তা সমর্থ হয়েছিলো।*

সাঁওতাল বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহ শিক্ষিত বাঙালী সমাজে প্রত্যাশিত আলোড়ন তুলতে না পারলেও নীলবিদ্রোহে (১৮৫৮-৬০) তাদের ভূমিকার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে। তিরিশ সালে যে নীলচাষ রামমোহনের চোখে শুভসূচক বলে মনে হয়েছিলো, পঞ্চাশ সালে সেই নীলচাষই অক্ষয়কুমার দত্তের দৃষ্টিতে প্রজাপীড়নের নামান্তর মাত্র (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ, ১৮৫০ দ্রষ্টব্য)। নীলচাষীদের দুঃখ চরম হওয়ার কারণ তাদের দাদন দিয়ে ভালো জমিতে নীলচাষ করতে বাধ্য করানো, চুক্তিভঙ্গকারীদের নীলকুঠিতে কয়েদ রাখা, তাদের দিয়ে বেগার খাটানো ইত্যাদি। সিপাহী বিদ্রোহের পর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পেয়ে নীলকরেরা আরও বেশি অত্যাচারী হয়ে ওঠে এবং চাষীদের অবস্থা আমেরিকার নিগ্রোদের সামিল হয়ে পড়ে। কুড়ি বছরেই

---

* 'It is absurd to imagine that they didnot affect profoundly the millions who remained passive.'—The Rise and Fulfilment of British Rule in India.

'সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গদেশের ও সমাজের এক মহোপকার সাধিত হইল ; এক নবশক্তির সূচনা হইল ; এক নব আকাঙ্ক্ষা জাতীয় জীবনে জাগিল।' —শিবনাথ শাস্ত্রী।

পরিস্থিতির এতটা অবনতির ফলে গ্রামাঞ্চলের প্রজারা হয় বিদ্রোহী—বিশেষ করে যশোহর, নদীয়া, পাবনা, ফরিদপুর ইত্যাদি অঞ্চলে। এই ব্যাপক প্রজান্দোলন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ছিলো বলে এর রাজনৈতিক তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, চাষীনেতা বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস সেকালের স্মরণীয় গণনায়ক। নীল হাঙ্গামার এই গণভিত্তিকতার সাহিত্যিক ফলশ্রুতি নীলদর্পণের সেই আগুনে-পোড়া শক্ত-সমর্থ মানুষের শ্রেণী—তোরাপের দল। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, নীলবিদ্রোহে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জাগরণ। রামগোপাল ঘোষ, শিশিরকুমার ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমেছিলেন, কলকাতা ও মফঃস্বলের পত্র-পত্রিকাগুলিতে আরও বহুকণ্ঠ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলো। দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ' লিখলেন, মধুসূদন ইংরেজীতে অনুবাদ করলেন, লঙ্ সাহেব হলেন তার প্রকাশক। কোর্টে লঙের কারাদণ্ড ও জরিমানা হলো, কোর্টেই সেই জরিমানার টাকা দিয়ে ফেলে দেশঋণ শোধ করলেন কালী-প্রসন্ন সিংহ। আরও অনেকে এ টাকা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এ থেকেই প্রমাণ করা যায়, সেদিনের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ দাঁড়িয়েছিলো সংগ্রামরত চাষীদের পেছনে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সাঁওতাল ও সিপাহী বিদ্রোহে অনেকটা নিষ্ক্রিয় থাকলেও নীল-বিদ্রোহে তাদের সচেতনতা ও জাগরণ তখনকার মানুষের মানসিক সংগঠনে একটা বড়ো রকমের উপাদান হয়ে ওঠে। তাই কাজী আব্দুল ওদুদ মন্তব্য করেছেন—'ইংরেজ ও ইয়োরোপীয়দের প্রতি অকপটভাবে শ্রদ্ধান্বিত হয়েও সেদিনের শিক্ষিত বাঙালী যে ইংরেজ ও ইয়োরোপীয়দের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল এতেই প্রমাণ রয়েছে, সেদিনের শিক্ষিত বাঙালীর ইংরেজ ও ইউরোপ-প্রীতি প্রকৃত প্রস্তাবে ছিল, যা তাদের সামনে সুন্দর ও মহৎ রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার প্রতি প্রীতি—হীন স্তাবক-বৃত্তি আদৌ নয়।'

কিন্তু সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ ও নীলবিদ্রোহের কোন অনুকূল প্রতিক্রিয়া ইংরেজ শাসকদের মধ্যে দেখা যায়নি, তাদের শাসন ও শোষণবিধিও মূলতঃ অপরিবর্তিত থেকে যায়। নীল কমিশন (১৮৬০) ও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণের (১৮৫৮) কথা মনে রাখলেও এ-মন্তব্য অপরিহার্য। তাই এই সময়ের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক মনোভাব ছিলো ক্ষোভ, হতাশা ও বেদনামথিত। রাজনারায়ণ বসুর সাক্ষ্য ('সেকাল আর একাল') তার প্রমাণ। শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরেজী সভ্যতা ও সংস্কৃতির মোহ থেকে ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে যে সপ্রশংস দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিলো, ষাট সালের আগে-পরে সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাঙন দেখা দেয়। এই রাজনৈতিক নেতিবাচক মনোভাবের অপর পিঠে একটা ইতিবাচক জাতীয় মনোভাব ও নবশক্তি ধীরে ধীরে রূপ নিতে থাকে। তবে তাকে ঠিক আত্মনির্ভরতা ও রাজনৈতিক প্রতিরোধচেতনা বলা অসঙ্গত। যথার্থ পথ সন্ধানের নৈতিক তাগিদ এসেছে, কিন্তু তার সন্ধান এখনও অস্পষ্ট। জাতিগত বা ব্যক্তিগত-ভাবে জাতীয় রাজনৈতিক পন্থায় পদচারণের চেষ্টা তখন পর্যন্ত অনুপস্থিত, যদিও মানসলোকে তার বার্তা পৌঁছে গেছে।

১৮৬১ সালে লঙের বিচার ও কারাদণ্ড হয়। এই সালেই রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে সুরাপান নিবারণী সভা ও জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ষাট সালের শেষ দিকে যে বড়ো রকমের দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তার প্রভাবে সমকালীন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-মানসে একটা সর্বব্যাপী জাতীয় চেতনার উদ্বোধন ঘটে। এই ঘটনাগুলিরই ক্রম-পরিণতি নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলার (১৩৬৭) প্রতিষ্ঠায়। মাঝখানে পাই উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে বিদ্যাসাগরদের সচেতন সেবাকার্য। এইভাবে গড়ে ওঠে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানস ও চিন্তাধারা, চলতে থাকে আত্ম-নির্ভরতা ও স্বাধিকারবোধের দিকে আমাদের অগ্রগতি। সম-সাময়িক শাসনযন্ত্রেও কিছু কিছু রদবদল সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে।

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট (১৮৬১) অনুযায়ী ভারতে হাইকোর্ট ও বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদের প্রতিষ্ঠা (১৮৬২) একটি গুরুতর প্রশাসনিক ঘটনা, সন্দেহ নেই। ভোটাধিকার না থাকলেও ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যদের অর্ধেক ভারতীয় হওয়ার রাজনৈতিক গুরুত্ব অনুপেক্ষণীয়।

ঠাকুরবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায়, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থসাহায্যে, রাজনারায়ণ বসুর উৎসাহে ও নবগোপাল মিত্রের নায়কত্বে যে হিন্দুমেলার উদ্ভব, তাতেই প্রথম স্বদেশী দ্রব্য ও শিল্প স্বীকৃতি পায়। এর পরেই উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান (১৮৭৬)। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের বয়স বাড়িয়ে দেওয়ার সঙ্কীর্ণ দাবি নিয়ে সংস্থাটির জন্ম বটে, তবু এসোসিয়েশনটিকে ইংরেজ শাসকদের অপ্রসন্নতা ও প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে বাঙালী তথা ভারতবাসীর জাতীয় চেতনা ও রাজনৈতিক চিন্তাক্ষেত্র হিসেবেই বিচার করা উচিত। উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ এযাবৎ ছিলো হিন্দু-জাগরণের নামান্তর, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথই প্রথম তাকে দিলেন জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সর্বভারতীয় রূপ। অন্যদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও একটা নবচেতনার সঞ্চার দেখি: ইংরেজের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী মনোমালিন্যের পটভূমিকায়, ওহাবী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, সিপাহী বিদ্রোহের ধাক্কা খেয়ে তারা নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলো, ইংরেজী না শেখার মূর্খামির কথা ভেবে তাদের ক্ষোভেরও অন্ত রইলো না। কিন্তু ওহাবী মতবাদ মুসলমানদের কতটা আদি ইসলামে ফিরিয়ে নিয়ে ধর্মাচারে শুদ্ধ করতে পেরেছিলো বলা কঠিন, কিন্তু একটা সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি যে জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই ওহাবী নেতা সৈয়দ আহ্মদ সুরেন্দ্রনাথের আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেন নি এবং সর্বভারতীয় রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধনে অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু অপ্রতিহত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান ও হিন্দুমেলাই ক্রমে পরিণত হয় ভারতীয় কংগ্রেসে—

সবচেয়ে বড়ো অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে। ইলবার্ট বিলের প্রতিক্রিয়ায় শ্বেতাঙ্গরা বিদ্রোহী হয় আর তারই বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় স্বাদেশিক মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয় ভারতীয় সমাজ। তারও প্রমাণ আছে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায়। আবেদন-নিবেদনের প্রাথমিক পালা শেষ করে কংগ্রেস অচিরেই হয়ে উঠলো দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী সংস্থা। কারণ এর প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলো জাতির আত্মপ্রকাশের তাগিদ, 'নবীন ভারতে যে জীবন দিন দিনই সত্য হচ্ছিল সেই ধর্ম-বর্ণ-প্রদেশ-অতিক্রান্ত ওজস্বল অধিকার-সচেতন সর্বভারতীয় জীবন থেকে তা রস আহরণ করছিল।'

কিন্তু শতাব্দীর শেষ দিকে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক মনোভাবের পাশেই দেখা যায় হিন্দু জাতীয়তাবাদ। এর মর্মমূলে নানা ব্যক্তি, পথ ও মত রসসঞ্চার করেছে। 'যেমন মন্তরগতি ব্রাহ্মদল, বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনুবর্তী কবি-সাহিত্যিকরা, শশধর তর্কচূড়ামণি ও তাঁর সম্প্রদায়, আর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও তাঁদের ভক্ত-সমাজ।...তবে হিন্দু-জাতীয়তাবাদের উপরে শেষ দিকে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব, তাতে তাঁর সমর্থিত যোগ ও সন্ন্যাসের দিকে একটি উল্লেখযোগ্য দলের প্রবণতা জাগে। কিন্তু তার চাইতেও আরও ব্যাপকভাবে দেখা দেয় হিন্দুধর্ম ও ঐতিহ্যের গৌরব-বোধই। এই ঐতিহ্য-গৌরব-বোধ.. আসলে দুর্বল,...স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ বীর্যবত্তাও এই ঐতিহ্য-গৌরব-বোধকে প্রকৃত সবলতা দান করতে পারেনি, কেননা, তাঁর সেই অপূর্ব বীর্যবত্তার সঙ্গে যোগ ঘটেছিল প্রবল সন্ন্যাসী-প্রীতির মতো জীবন-বিমুখ ব্যাপারের আর সাধারণভাবে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে চিন্তার অপরিচ্ছন্নতারও।'

বাঙলার চিত্তে এই হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রভাব এমন কি বিশ শতকের সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যেও দেখা যায়, স্বদেশী আন্দোলনও তা থেকে একেবারে মুক্ত ছিলো না। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, হিন্দু জাতীয়তাবাদ যে বিশ্বমুখী মানবতাবাদ, বিজ্ঞানবুদ্ধি ও গণতান্ত্রিক

চেতনার সাক্ষাৎ পেয়েছিলো তা কখনই বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য ও স্বার্থের প্রতিকূল হয়নি। এবং সে কারণেই তা ভারতীয় জাতীয়তা-বাদের নামান্তর। কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনা উনিশ শতকের শেষপাদে যতটা হিন্দু-গৌরব-চেতনা ও অধ্যাত্মচিন্তার অভিমুখিন, ঠিক ততটা পরশাসনের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে সচেতন নয়। অবশ্য বোয়ার যুদ্ধে য়ুরোপের স্বার্থপর রূপ উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পর হিন্দু জাতীয়তাবাদ স্বাদেশিকতার বীজমন্ত্রে আরও বীর্যবান ও পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে (এ প্রসঙ্গে অরবিন্দ ঘোষ স্মরণীয় ; কিন্তু যেদিন তিনি শ্রীঅরবিন্দ হলেন, সেদিন তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা আর রইলো না। তবে তখন জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস হিন্দু জাতীয়তা-বাদের পথ অনুসরণ করেনি, এটা সুখের কথা)।

কিন্তু বাঙলা দেশের স্বদেশ-সাধনা আবার ক্রমান্বয়ে পরিণত হয় উগ্র জাতীয়তাবাদে। রবীন্দ্রনাথ সেই সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদে শেষ পর্যন্ত আস্থা রাখতে পারেন নি, তাকে তিনি বৃহত্তর মানবতাবাদের পরিপন্থী বলেই মনে করেন। সত্য কথা, আদি ব্রাহ্মসমাজের (যে সমাজে রাজনারায়ণের হিন্দুজাতীয়তাবাদের ছোঁয়া লেগেছিলো) আবহাওয়ায়, হিন্দুমেলার প্রাণমন্ত্র উচ্চারণ করে, স্বদেশী আন্দোলন ও শিবাজী উৎসবের আবেগের পথ বেয়ে তাঁর চিত্ত ও চিন্তার বিবর্তন ঘটেছে, তবু পরিণত পর্যায়ে তাঁর মনের মুক্তি ঘটলো বিশ্বমানবিকতার উদার ক্ষেত্রে। তিনি দরখাস্ত জারি করে স্বদেশের প্রতি কর্তব্য শেষ না করার আবেদন ('স্বদেশী সমাজ') জানিয়েছেন. গভর্ণমেন্টের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি করার বিরুদ্ধে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করতেও দ্বিধা করেন নি ('সফলতার সদুপায়'), তবু শেষ পর্যন্ত মানবতাবোধবর্জিত অপরিসর জাতীয়তার কুণ্ডেই তাঁর মানসধারা আবর্তিত হলো না, তা গাঙ্গেয় ঔদার্যে প্রবাহিত হলো বিশ্বমানবের ঘাটে ঘাটে—'অতএব বর্তমান অবস্থায় যদি উত্তেজিত দেশের লোককে কোনো কথা বলিতে হয় তবে তাহা প্রয়োজনের দিক হইতেই বলিতে হইবে। তাহাদিগকে এই কথা ভালো করিয়া

বুঝাইতে হইবে যে—প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর হইলেও প্রশস্ত পথ দিয়া তাহা মিটাইতে হয়, কোনো সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া কাজ সংক্ষেপ করিতে গেলে একদিন পথ হারাইয়া শেষে পথও পাইব না, কাজও নষ্ট হইবে।' বিশ্বমানবিকতার প্রশস্ত পথের আহ্বান আমাদের রাজনৈতিক ভাবধারার বিবর্তনে একটা নতুন পথের ইঙ্গিত এবং সেই ইঙ্গিতকে চিন্তা ও কর্মে রূপায়ণের কাহিনীই বিশ শতকের রাজনৈতিক ইতিহাস। কিন্তু নেতিবাচক রাজনৈতিক সাধনায় যে দেশব্যাপী শূন্যতার সৃষ্টি হতে পারে, তারই দূরদৃষ্টিবশে রবীন্দ্রনাথের গঠনমূলক স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা (১৩১১)। সুতরাং কি বিশ্বমুখী রাজনৈতিক চিন্তায়, কি 'বৃহৎ স্বদেশী কর্মক্ষেত্রের' অনুধ্যানে বিশ্বকবির মানসিক অগ্রগতি যে আমাদের রাজনৈতিক চেতনার সুষ্ঠু ও সত্য পরিণতি, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সাহিত্যের ক্রমবিকাশের আলোচনায় সে কথা মনে রাখতে হবে।

॥ ২ ॥

প্রথম পর্বে রেভেলিউসান, রিফর্মেসান ও কাউন্টার-রিফর্মেসানের বিচিত্র দ্বন্দ্বে একটা সামাজিক আবর্তের উদ্ভব দেখেছি। কিন্তু ছাপ্পান্ন-ষাট সালে সেই বহুমুখী আদর্শের সংঘাত একটা সমন্বয়-আদর্শের মধ্যে বিধৃত হতে শুরু করে। কারণ ততদিনে আদর্শগত লড়াইয়ের সমস্ত দিক বুদ্ধিজীবীদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এর আগে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাস্তব সুবিধাবাদ, ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধি এবং মুক্ত জীবনাদর্শ লাভের (এই মুক্ত জীবনাদর্শ য়ুরোপবাসীদের মধ্যে দেখা দেয় শিল্প-বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে) আকৃতির জন্য পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি যে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা দেখা গিয়েছিলো, তার সঙ্গে

সংস্কারবাদীদের (Reformationist) সংশোধনস্পৃহা আর রক্ষণশীল দলের ঐতিহ্য-প্রীতি মিলিয়ে মিশিয়ে একটা সমন্বায়িত সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রয়াস তখনকার যুগমানসেরই বাহ্যিক অভিব্যক্তি। বস্তুতঃ গত অর্ধশতাব্দীব্যাপী বিচিত্র আলোড়নের (trouble & turmoil) স্থিতিধর্মী পরিণতির কামনা সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ধর্ম সকলক্ষেত্রেই আত্মপ্রকাশ করে। তাই সমকালীন ইতিহাসের অধ্যায়টিকে যথার্থই সংগঠনের যুগ বলা যেতে পারে।

এই সদ্যোক্ত সংগঠনের ইতিবৃত্তে বঙ্কিমের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তিনি একদিকে ছিলেন এক বিরাট অতীত ঐতিহ্যের (নৈহাটী ভাটপাড়ার) উত্তরাধিকারী ও ব্রাহ্মণবংশের সন্তান, অন্যদিকে নব্যশিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। যুগটাও ছিলো মানসিক সংগঠনের অনুকূল। তাই বিশেষ বিচার বিবেচনার পর পুনর্গঠনের পথ নির্বাচনের তিনিই ছিলেন উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি এই জাতীয় দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করেছেন, স্বীকার করতেই হবে। তাঁর জীবন ও সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় স্পেন্সার, বেন্থাম, মিল, চানিং পার্কার, নিউম্যান প্রভৃতির চিন্তাসূত্র। অথচ তাঁর গভীরতর সত্তায় শুধু নানা অর্বাচীন সৃষ্টিধর্মী চিন্তানুভূতিই ছিলো না, একটা গভীরতর জাতীয় ঐতিহ্যপ্রীতিও ছিলো। আমরা জানি, বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য ও গোটা মানুষের সমুন্নতিই বঙ্কিমের সাধনার মূল কথা। এই সামঞ্জস্য-মন্ত্রের উপলব্ধি শুধু 'মহামানবের সাগরতীর' ভারতবর্ষ থেকেই তিনি লাভ করেন নি, খৃষ্টান একত্ববাদী ও দার্শনিকদের কাছ থেকেও লাভ করেছেন— একথা মনে রাখলেই তখনকার সমাজের সমন্বয়বাদের ধাঁচটি ধরা যাবে।

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে স্মরণীয় বিরোধে কেশবচন্দ্র সেন অধিকতর প্রগতিশীল চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন, সন্দেহ নেই। দেবেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, ব্রাহ্মসমাজ সংস্কারের দিকে ধীরে চলুক, কেউ গলায় পৈতে রাখতে চাইলে তাকে রাখতে দেওয়া হোক। দেবেন্দ্রনাথের

এই মন্থর-গতি সামাজিক চিন্তা কেশবচন্দ্রকে খুশি করতে পারেনি, তিনি চেয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজকে একটি প্রগতিশীল সর্বসংস্কারমুক্ত হিতধর্মী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে। তাই তাঁর কণ্ঠে শুনতে পাই এক বলিষ্ঠ ঘোষণা—'যতদিন আপনার (দেবেন্দ্রনাথের) সংস্কার অন্যায় ও অনিষ্টকর বোধ হইবে, ততদিন তাহাকে নির্যাতন করা, তাহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করা আমার কর্তব্য। হিন্দু-ধর্মকে নির্যাতন করা যেমন কর্তব্য, কল্পিত ব্রাহ্মধর্মের শিথিল ভাবকে নির্যাতন করা তেমনি কর্তব্য, উন্নতিশীল ব্রাহ্মধর্মকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবার চেষ্টাকে নির্যাতন করা তেমনি কর্তব্য।'

কেশবচন্দ্রের এই চিন্তাধারা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত প্রগতিশীল মনোভাবের সূচক নয়, ডিরোজিওপন্থীদের আদর্শগত প্রভাবেরও পরোক্ষ প্রমাণ। সমকালীন ডিরোজিওপন্থীদের যা কাম্য ছিলো, কেশবচন্দ্রের সাধনায় তার কম-বেশি স্বীকৃতি আছে। শুধু তাই নয়, তাঁর ধর্মমতে ও সামাজিক আদর্শে খৃষ্টানসাধনার ছায়াপাতও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। তাই অতি দ্রুত পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথের চোখে ব্রাহ্মসমাজের কোন বৃহত্তর সর্বজনিক কল্যাণকর ভূমিকা ছিলো না, ধর্মসাধনায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য স্বীকার করে নিয়েই তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা ও উজ্জীবন কামনা করেছিলেন। ফলে কেশব চন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের বিরোধ অনিবার্য ও অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলো, তার প্রমাণ আছে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' (১৮৬৫) প্রতিষ্ঠায়। কিন্তু ক্রমে কেশবচন্দ্রের দলেও ভাঙন দেখা দেয়। খৃষ্টান ও বৈষ্ণব ভক্তিমার্গের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মে যে উন্মাদনা প্রশ্রয় পায়, তাতে অক্ষয়কুমার দত্তের যুক্তিবাদের ভিত্তি একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। কেশবচন্দ্র নিজের অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের হিন্দু রাজবংশে বিয়ে দিয়ে নিজের প্রচারিত আদর্শ ও প্রগতি-শীলতারই মূলোচ্ছেদ করেন, কোন টেকসই যুক্তি দিতে না পেরে ঈশ্বরের তথাকথিত প্রত্যাদেশের আড়ালে আত্মরক্ষার প্রয়াস পান।

এতে তাঁর অনুচরদের মধ্যে একটা সন্দেহ ও দ্বিধার উদ্রেক হয়— তবে কি শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্মে ভক্তিপ্রাবল্যবশতঃ বৈষ্ণবীয় সঙ্কীর্তন ও খৃষ্টানী ঢঙের পাপের ক্ষমার জন্য নরপূজা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চলেছে? তাই অবশেষে স্থাপিত হলো, 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' (১৮৭৮), যার নেতা হলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। কেশবচন্দ্র 'ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের' অবশিষ্ট অনুচরদের নিয়ে গড়লেন 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ'। আর দেবেন্দ্রপন্থী রাজনারায়ণেরা নিজেদের 'আদি ব্রাহ্মসমাজের' অনুভুর্ক্ত বলেই পরিচয় দিতেন।

উনিশ শতকের ব্রাহ্মসমাজের এই ইতিহাস বিচিত্র ভাবসংঘর্ষে মুখর, সন্দেহ নেই। প্রথম সংঘর্ষ বাধে ভক্তিবাদ ও যুক্তিবাদের মধ্যে: দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার সেই পর্যায়ে দুই প্রতিপক্ষ। তারপর দ্বন্দ্ব শুরু হয় দ্রুত সমাজ-সংস্কার ও প্রগতিশীল কর্মসূচী নিয়ে: দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সেই দ্বন্দ্বের নায়ক। তৃতীয় পর্যায়ে দেখতে পাই ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ নিয়ে বিবাদ: কেশবচন্দ্র যেখানে ব্রাহ্মধর্মকে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম বলে মনে করতেন, সেখানে রাজনারায়ণের মতে ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই উন্নততর সংস্করণ মাত্র (দ্রষ্টব্য: 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতাবিষয়ক প্রস্তাব,' ১৮৭৩)। চতুর্থ স্তরে কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিগত ঈশ্বরোপলব্ধির তত্ত্ব ও ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে উদ্বুদ্ধ নিজস্ব আচরণবিধির সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের অনুসৃত ব্রাহ্মদের সামাজিক আচরণবিধি ও ঈশ্বর-সাধনার বিভেদ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরমহংসদেবের সংস্পর্শে কেশবচন্দ্রের মরমীয়া প্রীতিও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মনঃপূত হয়নি। কিন্তু এই বহুস্তর দ্বন্দ্বাবর্তের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক ও নৈতিক তাৎপর্য সীমিত করে দেখার কোন কারণ নেই, তার তাৎপর্য দেখতে হবে বৃহত্তর জাতীয় জীবনের বিকাশের দিক থেকে। তখন বুঝতে পারা যাবে, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের কাহিনী আসলে আমাদের জাতীয় প্রাণমুক্তির ইতিহাসের একটা বিশিষ্ট অধ্যায়।

আগে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের কথা বলেছি, তার রাজনৈতিক

তাৎপর্য শুধু বিচার্য নয়, সামাজিক গুরুত্বও অনস্বীকার্য। খৃষ্টান মিশনারীরা যেদিন আমাদের ধর্মের ক্ষেত্রে ও সামাজিক বৃত্তে আক্রমণ চালাতে শুরু করে, সেদিন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ও প্রগতিবাদী ব্রাহ্মসমাজ সেই সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে মিলিত হয়। সেদিনের ব্রাহ্মদের ভারতীয় ঐতিহ্যবাদ এবং সনাতনীদের হিন্দুজাতীয়তাবাদ মিলেমিশে যে ঐক্যের সৃষ্টি করেছিলো, তা কখনও সাময়িক প্রয়োজন ছাড়িয়ে ওঠে স্থায়ী রূপ লাভ করতে পারেনি। শতাব্দীর পঞ্চম দশক পেরিয়েই ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের চিন্তা ও লেখায় হিন্দুমনের পরিচয় দেখতে পাই। বঙ্কিমের পুনর্গঠন প্রয়াস ও সমন্বয়ধর্ম প্রচার শ্লাঘার বিষয়, সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর মানসিক পরিমণ্ডলে হিন্দু পুনরুজ্জীবনের চিন্তাও ছিলো। সত্তার যে অংশে তিনি শিল্পী ও সংস্কৃতিবান, সে অংশে তাঁর মন মহৎ ও সর্বাশ্রয়ী ; কিন্তু যেখানে তাঁর সত্তার প্রচারকের ভূমিকা, সেখানে তাঁর চিন্তা অনেকটা হিন্দু-ঐতিহ্যবাদের অনুগামী এবং সে কারণেই খণ্ডিত ও একদেশদর্শী। তিনি যখন পাশ্চাত্ত্য মনীষা আত্মসাৎ করে স্বদেশে অনুশীলন করেন, তখন তাঁর শিক্ষা ও বুদ্ধির ঔদার্য সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করে ; কিন্তু দেশের প্রতীক রূপে দশভুজা দুর্গার পরিকল্পনা তাঁর হিন্দুসংস্কারের পরিচায়ক বলে গণ্য হতে পারে না কি? তারপর ব্রাহ্ম হয়েও রাজনারায়ণ বসুর হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা সেই একই সঙ্কীর্ণ পথে আমাদের দৃষ্টিকে পরিচালিত করে। এর আগে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও হিন্দুজাতীয়তাবাদের প্রাধান্য দেখতে পেয়েছি। এই ভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, উনিশ শতকের শেষার্ধে আমাদের সাহিত্য, রাজনীতি ও সংস্কৃতির জগতে কোন না কোন ভাবে একটা হিন্দুমনোভাব প্রশ্রয় পেয়েছে। আর পূর্বাপর এই হিন্দুমনোভাব প্রচ্ছন্ন ছিলো বলেই মাঝে মাঝে শশধর তর্ক-চূড়ামণির দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছেন। এবং সাময়িক প্রতিষ্ঠাও অর্জন করেছেন। ভূদেব বা বঙ্কিমের হিন্দু-ঐতিহ্যবাদের সঙ্গে নানা বিচারসহ নতুন চিন্তা ও আদর্শের অনুশীলন ছিলো বলেই, তাঁদের

তথাকথিত সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বিজ্ঞানবুদ্ধি, গণতান্ত্রিক চেতনা ও সর্বব্যাপী মানবতাবাদের প্রতিকূল হয়নি বলেই আমাদের সামাজিক ইতিহাসে তাঁদের স্থান অবিস্মরণীয়। কিন্তু শশধর তর্কচূড়ামণির ধর্মব্যাখ্যায় সেই বিচারমুখী চিন্তা, যুক্তিধর্মী বুদ্ধি ও অনুভূতিবেদ্য মানবতাবাদের কোন ছাপ নেই; তাঁর চোখে হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠান-আকীর্ণ লৌকিক ও পৌত্তলিক রূপটার মূল্য অনেক। এসব কথা নতুন নয়, এর আগে উনিশ শতকেই এ-জাতীয় কথা আমরা আরও শুনেছি। তবু যে শতাব্দীর শেষ দিকে আবার সেই পুরাতন বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি শোনা গেলো, তার কারণ, যতই শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান হই না কেন, আমাদের রক্তে মাংসে, মনে মননে হিন্দুসংস্কার কোন সময়েই একেবারে লোপ পেয়ে যায়নি (আজও নেই কি ?)। এবং সে কারণেই আমরা দীর্ঘ দিন পুরো-পুরি নতুন যুগের মানুষ হয়ে উঠতে পারিনি।

শশধর তর্কচূড়ামণির প্রসঙ্গে আরেকজন উত্তর-ভারতীয় ধর্মনেতার কথা স্বভাবতই এসে পড়ে। তিনি হচ্ছেন আর্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪—১৮৮৩)। ব্রাহ্মরা যেখানে প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণে জাতির পুনর্গঠনের স্বপ্ন দেখতেন, সেখানে দয়ানন্দ বিশুদ্ধ ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে নতুন সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন। রামমোহন ও রাণাডের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি দয়ানন্দের ছিলো না; তিনি চেয়েছিলেন শ্রদ্ধার সূত্রে বৈদিক ধর্ম ও আচারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, যদিও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর মনের জাগরণ ও সমাজসংস্কারমূলক নানা কর্তব্যসাধনও তাঁর কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। 'হিন্দুভিন্ন অন্যান্য ভারতবাসীর কাছে দয়ানন্দের আবেদন যে অনুপস্থিত ছিল, তা বলা বাহুল্য; বরঞ্চ মনে হতে পারে যে সাম্রাজ্যবাদী শাসন যখন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদাভেদ পাকিয়ে তুলে নিজের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চেষ্টায় ব্যাপৃত, তখন আর্যসমাজ আন্দোলন সাম্প্রদায়িকতা দোষদুষ্ট হয়ে সমগ্র ভারতের জাতীয় সত্তা প্রতিষ্ঠার

কাজে সফল হওয়ার সম্ভাবনা রাখেনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় ভাবকে প্রখর ও কঠোরভাবে জাগিয়ে তুলতে মাঝে মাঝে ধর্মের সহায়তা নিতে হয়েছে।'

যেমন দয়ানন্দের সমাজসংস্কারমূলক কর্মপ্রচেষ্টা ও পরশাসন-বিরোধী রাজনৈতিক মনোভাব সৃষ্টির একটা বৃহত্তর জাতীয় তাৎপর্য আছে, তেমনি অ্যানি বেশান্তের থিওসফিক্যাল সোসাইটি এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য-অতিক্রান্ত একটা মহত্তর ভূমিকাও আছে। একথা সত্য যে, আদি ব্রাহ্মসমাজ, বঙ্কিম-ভূদেবের দল ও শশধর-দয়ানন্দের ধর্মদৃষ্টির প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে থিয়োসফির ও পরমহংসদেবের (যুক্তির নিরিখে তাঁর জীবন ও চিন্তার সবটুকুই ব্যাখ্যা করা যায় না) জীবনের অলৌকিক দিকটির সাম্প্রদায়িক নিহিতার্থ উপেক্ষণীয় নয়। অবশ্য আপন অলৌকিক জীবনের গভীরতম উপলব্ধিকে তিনি এমন সহজ সরল ভাষা ও ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন যার সঙ্গে সকল ধর্ম ও সভ্যের কোন মৌলিক ভেদ নেই। তাঁর ধর্মসাধনায় সর্বজনগ্রাহ্য মানবতার রূপ স্বীকার্য। তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ (১৮৬৩—১৯০২) সেই মানবতার বাণীর আরও বলিষ্ঠ ও বীর্যবান রূপ দেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে শুনিয়েছেন এক মহামানবতার বাণী—'হে ভারত ভুলিও না, তোমার সমাজ বিরাট মহামানবের ছায়া মাত্র; ভুলিওনা—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার ভাই।' তিনি দেবতার কাছে মনুষ্যত্ব ভিক্ষা করেছেন, সর্বমানবের কল্যাণ চেয়েছেন, চেয়েছেন ক্লৈব্যের অভিশাপ থেকে দেশবাসীর মুক্তি। প্রাণের উজ্জীবন-মন্ত্রে নিশ্চল নির্বীর্যবাহু কর্ম-কীর্তিহীন মানুষকে জাগিয়ে তোলার এই সাধনা সামাজিক দিক থেকে ফলপ্রসূ, সন্দেহ নেই। নাস্তিকতা বা আস্তিকতা নিয়ে তিনি মাথা ঘামান নি, স্বর্গ-নরকের ভাবনাকে তিনি বর্জন করেছেন, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের প্রশ্নটা তাঁর কাছে ছিলো

গৌণ। তাঁর মনে সব চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছিলো মানুষের দুঃখ দুর্দশা এবং সেই দুঃখ দুর্দশা বিমোচন করতে গিয়ে 'ছোট আমির' ধ্বংসের সঙ্কল্প। তবু তিনি উদ্দীপিত হিন্দুমনোভাবেরই প্রতীক। আচরিত সন্ন্যাসধর্ম, য়ুরোপের জড়বাদ সম্পর্কে বিতৃষ্ণা, ঐতিহ্যবাদের সূত্রে হিন্দুসুলভ অহঙ্কারবোধ, বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস, রামকৃষ্ণের অবতারত্ব সম্পর্কে নিশ্চয়তাবোধ, হিন্দুদৃষ্টিতে ভারতীয় ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা ইত্যাদি নানা বৃত্তে তাঁর যে পরিচয় পাই, তা এ-সিদ্ধান্তের পরিপোষক।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনার মানবিকতা ও কল্যাণধর্মিতা সত্ত্বেও হিন্দুর পুনরুজ্জীবনবাদেই তার অন্যতম সার্থকতা। এখানে শ্রীঅরবিন্দের কথাও একটু বলা দরকার। তাঁর দিব্যজীবনবাদ এক মহৎ চিন্তায় অনুপ্রাণিত, কিন্তু ব্যক্তি ও সমষ্টির ক্ষেত্রে সেই দিব্য জীবনের অনুশীলন আজও বৃহত্তর সমাজের কাছে বোধের অগম্য হয়েই আছে। সে যা-ই হোক, তাঁর সমগ্র জীবন-সাধনা, ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে অধ্যাত্মরঞ্জিত দৃষ্টি, গীতানুরাগ ইত্যাদি মিলিয়ে যেন একটা হিন্দুধর্মের নতুন পরিমণ্ডলই গড়ে উঠেছে এবং অন্য সম্প্রদায়ের ওপর তাঁর প্রভাবও দুর্নিরীক্ষ্য।

তবে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েও, আদি ব্রাহ্ম-সমাজের এককালের নেতা হলেও, হিন্দুমেলা শিবাজী উৎসবের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েও শেষ পর্যন্ত অন্তরে উপলব্ধ চরম ও পরম সত্যকেই 'আমার ধর্ম' রূপে অঙ্গীকার করেছিলেন। হিন্দুধর্মের অচলায়তন তাঁর মনোহরণ করেনি, আচার-অনুষ্ঠানের মরুবালুকায় তাঁর হৃদয়ের ধর্মবোধ কখনও ঢাকা পড়ে যায়নি। এক প্রত্যয়সিদ্ধ অনুভূতিবেদ্য সত্যধর্মকেই তিনি মানুষের ধর্ম রূপে নিরূপণ করেছেন। তাঁর ধর্মের লৌকিক রূপটা নগণ্য, ব্যক্তিগত বিশ্বাস আর সহজ বুদ্ধির বেদীতেই তার প্রতিষ্ঠা। একটা গভীর অধ্যাত্ম-বিবেক নিয়ে তিনি দেখা দিলেও তাঁর ধর্মসাধনার প্রকাশ সম্পূর্ণ সেকিউলার। এবং সে কারণেও তিনি পুরোপুরি এযুগের মানুষ।

॥ ৩ ॥

পরাধীন দেশে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ভাঙা-গড়ায় বৈজ্ঞানিক বিবর্তনের সূত্র ও পদ্ধতি বিপর্যস্ত ও বিকৃত হয়ে দেখা দেয়। মানুষের বাস্তব পরিবেশে ও মানসিক জগতে যদি কিছু উন্নতি ঘটেও, তবু তা খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন। আমাদের উনিশ শতকী রেনেসাঁসের প্রতিটি প্রস্থচ্ছেদ (cross-section) পরীক্ষার সময়ে উপনিবেশবাদের এই মূলগত ত্রুটি ও পঙ্গুতার কথা মনে রাখতে হবে।

ইংরেজরা ভারতবর্ষের মাটিতে পা দেওয়ার পর নানা কারণে আমাদের মধ্যে একটা নতুন সমাজ-দর্শন ও জীবন-জিজ্ঞাসা জাগে, এ-সত্য অস্বীকার করে লাভ নেই। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সেই নবাগত দর্শন ও জিজ্ঞাসা প্রধানতঃ তিনটি বৃত্তে সীমাবদ্ধ থাকে—ধর্ম-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষা-প্রসার। আর এই তিন ক্ষেত্রেই দেশী ও বিদেশী আদর্শ ও ভাবধারার মধ্যে একটা সংঘাত দেখতে পাই। কিন্তু তখনকার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম ও চিন্তার ইতিহাস অপেক্ষাকৃত অনুদ্‌বেজিত বলেই মনে হয়। ইংরেজ শাসনের অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও তার উনিশ শতকের প্রথমার্ধের চেহারা আমরা আগে বিশ্লেষণ করেছি।* তখনকার বুদ্ধিজীবী ও সচেতন সামাজিকেরা নানা বিক্ষিপ্ত অর্থনৈতিক প্রশ্নে মনোযোগ দিয়েছেন, সন্দেহ নেই (যেমন নীল চাষ সম্পর্কে রামমোহনের অনুকূল মনোভাব, অক্ষয়কুমারের নীলচাষীদের দুঃখদুর্দশা বর্ণনা, নানা সময়ে শিক্ষিত সমাজের শাসনকার্যে অধিকতর ভারতীয় নিয়োগের দাবি ইত্যাদি), তবু সমকালীন বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন সুসম্বদ্ধ ও প্রবল অর্থনৈতিক চিন্তা তখনও রূপ পায়নি বলেই মনে হয়। দ্বারকানাথের কার, ঠাকুর এণ্ড কোং

* প্রথম পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায় ও দ্বিতীয় পর্বের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কিংবা রামগোপাল ঘোষের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান কিংবা মতিলাল শীল রামদুলাল দে-র বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ হয়তো তাঁদের অর্থনৈতিক চিন্তার কিছুটা প্রমাণ, তবু নয়া ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা, বিনিময়গত আর্থিক ক্রিয়াকর্মের বিকাশ, য়ুরোপের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন ও ছোটবড়ো যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পারস্পরিক ও জটিল পরিবর্তন ও সম্প্রসারণ ঘটে, তার সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক ভাবনা সমগ্র সমাজ-মানসে, এমন কি বুদ্ধিজীবীদের মানসেও অস্পষ্ট।

কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে অসম্বদ্ধতা ও অস্পষ্টতা থাকলেও ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক পরিবর্তনটা অস্পষ্ট ছিলো না। সেটা হচ্ছে, য়ুরোপীয় অর্থনীতির যে বিলিব্যবস্থার সঙ্গে ভারতবর্ষ জড়িয়ে পড়েছে, তা থেকে আর আমাদের বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব নয়। আর তাই ধীরে ধীরে দেশের অর্থনৈতিক ঝোঁকও সেই দিকে দেখা গেলো। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে শেঠ-চেট্টি শ্রফ-নাথজী বণিকগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা দেখা গিয়েছিলো, ১৮৩৩ সালের সনদ প্রবর্তনের সময়ে তাদের সেই প্রবল ভূমিকা দেখা যায়নি। তার কারণ, ইংরেজরা বাণিজ্য করতে এদেশে এলেও ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে এই নিছক বণিকবৃত্তির পরিবর্তনও হয়ে ওঠে অবশ্যম্ভাবী। তখনকার ইংল্যাণ্ডের প্রয়োজন ছিলো শিল্পের পক্ষে অপরিহার্য কাঁচা মাল ও যন্ত্রের দ্বারা প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যের উপযুক্ত বাজার। তাই শাসকসম্প্রদায় নিজেদের অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাতে গিয়ে দিশি শিল্পের ধ্বংস সাধন না করে পারেনি। আর ইংরেজদের ভারতবর্ষে অবাধ প্রবেশ ও বাণিজ্যাধিকার প্রতিষ্ঠার সূত্রেই বঙ্গীয় বণিকসভা (১৮৩৪), মাদ্রাজ বণিকসভা (১৮৩৬) ও বোম্বাই বণিকসভা (১৮৩৬) গড়ে ওঠে। এইসব বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মারফৎ ও ইংরেজ শাসকদের ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে ভারতবর্ষের অর্জিত মূলধন স্থানান্তরিত হয়ে যায় এবং

যে বাণিজ্যকেন্দ্রিক মূলধন সঞ্চয় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও উৎপাদনের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তার অপচয় ঘটে।

একদা পশ্চিম য়ুরোপেও বাণিজ্যকেন্দ্রিক মূলধন প্রচুর সঞ্চিত হয়েছিলো, তার ভৌগলিক অবস্থান ও নৌ-যানের দ্রুত প্রসার সেই মূলধন সঞ্চয়ের পক্ষে সহায়ক ছিলো। সামুদ্রিক ও নদীতীরবর্তী বাণিজ্যের সূত্রে যে ধনসম্পত্তি সেখানকার বণিকদের হাতে এসে জমেছিলো, তা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে ও রাষ্ট্রের সক্রিয় সমর্থনে একটা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি সেখানে মাথা তুলে দাঁড়ায়। নৌ-যানের প্রয়োজনে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি নির্মাণ, নৌ-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে পণ্য উৎপাদনের সম্প্রসারিত ব্যবস্থা, বিনিময় বা বিক্রয়যোগ্য বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনেব চেষ্টা, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণের ফলে অর্জিত বাণিজ্যকেন্দ্রিক মূলধন শিল্পায়নে নিয়োজিত হয়। শিল্পকেন্দ্রিক মূলধনের উৎপত্তি ও ধনতন্ত্রের বিকাশের এই ইতিহাসে রাষ্ট্রের যে সক্রিয় ভূমিকা দেখতে পাই, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসকদের সেই ভূমিকা ছিলো না। ফলে বাণিজ্যকেন্দ্রিক মূলধন কেন্দ্রীভূত হয়ে শিল্পায়নে সার্থকভাবে নিয়োজিত হওয়া দূরে থাকুক, তা ইংল্যাণ্ডে স্থানান্তরিত হয়ে শিল্পায়নের সম্ভাবনা ও ধনতন্ত্রের বিকাশের সুযোগ একেবারে নষ্ট করে দেয়। তাই অধ্যাপক প্রিয়তোষ মৈত্রেয় বলেছেন ঃ—'সঞ্চিত বিপুল সম্পদ ও তৎকালীন উৎপাদিত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত পশ্চিমীরা নিজেদের দেশে চালান করে দিয়ে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অন্যতম সর্ত প্রাথমিক মূলধন-সঞ্চয় ব্যাহত করে। যদিও পণ্যের ব্যাপক সঞ্চালন (circulation), বিপুল সংখ্যক নিঃস্ব কৃষক কারিগরের উদ্ভব এবং পশ্চিমের উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির সঙ্গে যোগাযোগের মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পক্ষে খুবই অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল! কিন্তু বিদেশীরা নিজেদের স্বার্থে এই অগ্রগতিকে স্বাভাবিক পথে পরিচালিত না ক'রে আধা সামন্ততান্ত্রিক কৃষি-

অর্থনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাণিজ্যকেন্দ্রিক মূলধনের অপচয়ের জন্য ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক কৃষিগত অর্থনীতি ঠিকভাবে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হতে পারেনি। এবং তার ফলেই বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে জন্মগত পঙ্গুতার প্রকাশ।

অন্যদিকে যতই শাসন ও শোষণের সূত্রে সাম্রাজ্যবাদীর ভূমিকা নিক না কেন, ইংরেজরা দ্রুততালে শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে এক সময় বুঝতে পারলো স্বদেশের ধনতান্ত্রিক বিকাশকে ইংল্যাণ্ডের চৌহদ্দির মধ্যে ঠেকিয়ে রাখায় বিপদ আছে। তাতে বাণিজ্যযোগ্য পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ও মূল্য হ্রাস অপরিহার্য। তাই ইংল্যাণ্ডের শিল্পপতিদের মনে দেখা দিলো শুধু শিল্পদ্রব্য নয়, উদ্বৃত্ত শিল্পকেন্দ্রিক মূলধন রপ্তানীর চিন্তা। উনিশ শতকের মধ্য-কালটা হচ্ছে বৃটিশ ধনতন্ত্রবাদের চরম সন্ধিক্ষণ। তাই সেখানকার মূলধন শতাব্দীর তৃতীয় ভাগ থেকে ভারতাভিমুখী হয়ে ভারতবর্ষের শিল্পযুগের পত্তন করে।

বৈদেশিক মূলধন এদেশের যন্ত্রশিল্পে নিয়োজিত হওয়ার ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্র প্রস্তুতের প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলো পাশ্চাত্ত্য এজেন্সী হাউসগুলি। কিছু কিছু দেশীয় উদ্যোগ ও মূলধন থাকলেও বৈদেশিক প্রচেষ্টার কথাই এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তবে ভারতবর্ষে রেলপথই হচ্ছে, মার্ক্স বলেছেন, আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত, কারণ যে দেশে লোহা ও কয়লা আছে, সে দেশে দ্রুতগামী যানবাহন ব্যবস্থায় দ্রুত শিল্পায়ন অবধারিত। সে যাই হোক, আঠারো শ তেপ্পান্নে যে রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিলো মাত্র বিশ মাইল, তার পরিমাণ তেয়াত্তর সালে ছয় হাজার মাইল, উনিশ শ সালে পঁচিশ হাজার মাইলের কাছাকাছি দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণ শুরু হলো কাঁচা-পাকা সড়কের, শতাব্দীর শেষভাগে যার মোট দৈর্ঘ্য ছিলো পৌনে দু'লক্ষ হাজার মাইল। যানবাহনের এই দ্রুত উন্নতির ফলে কাপড়ের কলের সংখ্যা ও কলে নিযুক্ত কর্মী

সংখ্যা বাড়তে থাকে (১৮৯৪-৯৫ সাল—কল ১১৪, কর্মী ১৩৯৫৭৮)। এই কাপড়ের কল থেকে যে পুঁজি ও মুনাফার সঞ্চয় তার আশ্রয়ে অন্যান্য শিল্পেরও প্রসার ঘটতে থাকে, যার চরম পরিণতি হচ্ছে বিশ শতকের প্রথম পাদে দিশি মূলধনে প্রতিষ্ঠিত টাটা ইস্পাত শিল্প।

এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের আশ্রয়ে যে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি নিজেকে বিকশিত করার অধিকতর সুযোগ পেলো, তারই যুগানুগ স্বাক্ষর সমাজ ও সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার দ্রুত প্রসার, ডিগ্রিধারী ও বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, স্কুল ও কলেজ—বিশেষভাবে নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রম-প্রাচুর্য, সত্তর সালের পর থেকে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের অধিকতর প্রচলন, জাতীয়তাবাদী মনোভাবের কালানুক্রমিক ব্যাপ্তি ও তীব্রতা, ধর্মের ক্ষেত্রে নানা মতের সংঘাত ও পরিবর্তন ইত্যাদি বিচিত্র বাস্তব পরিস্থিতি এমন সব ব্যক্তিসত্তার উদ্ভব ঘটালো এবং সামাজিক আদল ও মানসলোক রচনা করলো যার সঙ্গে সমকালীন সাহিত্য কার্যকারণ সম্বন্ধে স্বভাবতঃই জড়িত।

কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালী তথা ভারতবাসীর বাস্তব পরিবেশের চেয়ে তার মানসলোকের সঙ্গে তখনকার সাহিত্যের সম্বন্ধ অধিকতর অব্যবহিত বলেই তার কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। একটা মানুষের মনের গঠনে থাকে প্রধানতঃ দুটি উপাদান—স্থানীয় সামাজিক চেতনা ও সার্বভৌম বিশ্বচেতনা (cosmic consciousness)। উনিশ শতকের ভারতবাসীর মধ্যেও দেখতে পাই এই দুটি চেতনারই নানামুখী প্রকাশ। তখনকার শিক্ষিত মানুষ ভাবতে শুরু করলো দেশ ও দশের কথা, দুঃখ ও অনটনের কথা, সমাজ ও ধর্মের কথা, গোষ্ঠীগত ও বৃহত্তর স্বার্থের কথা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কথা, সাম্য ও অসাম্যের কথা, দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস-অর্থনীতির কথা ইত্যাদি ইত্যাদি।

জাগ্রত মানুষের দৃষ্টি যেমন ভেতরের দিকে, তেমনি বাইরের দিকে। দাদাভাই নৌরজী, রাণাডে, গোখেল, রমেশচন্দ্র দত্ত ইত্যাদির অর্থনৈতিক চিন্তায় যেমন স্থানীয় নানা তথ্যের উপযুক্ত মূল্যায়ন আছে, তেমনি আছে ইঙ্গক্ল্যাসিক্যাল ও প্রগতিশীল অর্থনীতিবিদদের মতামতের ছাপ। মিক্সড্ ইকোনমি, ডেমোক্রেটিক্ সোস্যালিজম্, সাবসিস্টেন্স লেভেল্ ইকোনমি ইত্যাদি কিছুই তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। জাতীয়তাবাদের চর্চায় দেখি থমাস পেইন্, স্পেন্সার্, বার্ক, মিল্, মার্জিনি, গ্যারিবল্ডির কর্ম ও চিন্তার স্বাক্ষর, অথচ এদেশের রাজপুত জাতি ও মারাঠাদের ইতিহাসেও তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো। দর্শন, বিজ্ঞান. ইতিহাস চর্চায় এই ধরনের ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গির দৃষ্টান্তও দেওয়া যেতে পারে। আসল কথা, ক্রমবিকশিত অথচ পঙ্গু ধনতান্ত্রিক পরিবেশে দিশি ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্ত্য মনীষা আত্মসাতের চেষ্টায়, তাদের পারস্পরিক সংঘাত-সংযোগে প্রাণবান ও পরিবর্তমান বুর্জোয়া সমাজে ও ব্যক্তিসত্তায় যে সচল ও প্রগতিশীল মানসিকতার প্রকাশ, তাতেই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সাহিত্যের উজ্জীবন। সীমা ও স্ব-বিরোধ সত্ত্বেও।

৩ | মধুসূদন

মধুসূদনের জীবনটাই নাটক। জাতীয় জীবনের এক সঙ্কট-কালে তিনি দেখা দিয়েছিলেন—তাই তাঁর জীবনেতিহাসেও দেখতে পাই একটা সঙ্কট—মানসিক সঙ্কট। বাইরে দেশকালের মধ্যে ভাবধারার যে জটিলতা ও বিক্ষুব্ধি ছিলো, কবির মনোভূমিতে তার প্রভাব সুস্পষ্ট। কপোতাক্ষ তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে যে ছোট কপোতটি জন্ম নিয়েছিলো—তার মধ্যে আর কিছু না থাক, দুরন্তপনা ছিলো—আত্মবিশ্বাসীর দুরন্তপনা। জীবনে সে শান্তি চায়নি, স্বস্তি চায়নি, স্বাচ্ছন্দ্য চায়নি—চেয়েছে আত্মপ্রত্যয়ের জোরে শুধু অবারণ ভেসে চলা। তাইতো তাঁর অস্থির জীবনের কল্লোল শোনা গেছে থেকে থেকে। অশান্ত মনোধর্মের তাড়না নিয়ে সে কলকাতায় চলে এলো নয় বছর বয়সে, কিন্তু সেখানে এসেও তার মন স্থির হয়নি। হিন্দু কলেজ ও বিশপস্ কলেজ তাঁর মনের ওপর ছায়া ফেলতে লাগলো, এক অস্থির আবেগ তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হলো। সাগর পারের শ্বেতদ্বীপ তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগলো বারে বারে। পিতামাতার স্নেহের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ভেঙে দিয়ে, অজানা পথের শঙ্কা বরণ করে নিয়ে—সে খৃষ্টান হলো—যিশুর প্রতি ভক্তিবশতঃ নয়—এক নতুন জীবনের সুধা আকণ্ঠ পান করবে বলে, একজন 'মানুষের মত মানুষ' হবে বলে, বিলেত গিয়ে একজন বড়ো কবি হওয়ার সুযোগ পাবে বলে। বিজাতীয় ধর্মাবলম্বী হয়ে তার স্বপ্নের দেশ হয়ে দাঁড়ালো ইংল্যাণ্ড।

And oh ! I sigh for Albion's strand
As if she were my native land !

অতএব মধুসূদন মাতৃভূমি থেকে ছিন্নমূল হলেন, নতুন জন্মের—জন্মভূমির অঙ্গীকার নিলেন। জীবনে একটা কিছু চান বোঝা গেলো। তার জন্য সর্বস্ব পণ করতেও তাঁর দ্বিধা নেই। ব্যবহারিক জীবনে ইয়ং বেঙ্গলের একজন হয়ে তিনি স্পষ্টতঃই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছিলেন, বিজাতীয় সমস্ত কিছুর প্রতি ভক্তির প্রাবল্যে স্ববের পরিচয় দিতে ইতস্ততঃ করেন নি। কিন্তু বাইরের জীবনের এই সর্বগ্রাসী উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে, বিমূঢ়তার মধ্যে ছিলো একটা অন্তর্জীবন। সে জীবনে বিদ্যাদায়িনী ও কাব্যলক্ষ্মীর আসন ছিলো সুপ্রতিষ্ঠিত—বাইরের ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও অন্তরের দেবীর পূজায় কোন ব্যাঘাত ঘটেনি, বড়ো কবি হওয়ার স্বপ্নটানে তিনি পাশ্চাত্ত্য ভাষা ও সাহিত্যের সমুদ্র মন্থন করে চলেছেন। ইংরেজী ও পারসী শিখলেন হিন্দু কলেজে, বিশপস্ কলেজ গ্রীক ও ল্যাটিন।

মধুসূদনের মাদ্রাজ-প্রবাস নিয়ে আলোচনা তেমন হয়নি—অথচ গুরুত্ব তার অনেক। যে বিপুল আশা নিয়ে তিনি খৃষ্টান হয়েছিলেন তার মধ্যে ধীরে, অতি ধীরে ভাঙন ধরেছে ; খৃষ্টান হলেই জীবনের যা কিছু কাম্য তা পাওয়া যায় না, এই উপলব্ধি তার মধ্যে জাগতে শুরু করেছে। মাদ্রাজে মধুসূদনের জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের ছিলো না, বহু আয়াস ও পরিশ্রমে তাঁকে সেখানে অন্নসংস্থান করতে হয়েছে। এক কথায়, স্নব মধুসূদনের স্বপ্নের জগৎ একটু একটু করে ভাঙতে আরম্ভ করেছে। যৌবনের স্বপ্ন-রঙীন দিনে কবির চোখে যে প্রিয়া—'oh ! beautiful as Inspiration when she fills the poet's breast'—মধুসূদনের জীবনে তিনি প্রথমে এলেন কিনা সঙ্কীর্ণমনা রেবেকা-বেশে! পুরুষ, কবিপুরুষ নারীর কাছে প্রাণ-পিপাসায় যে সুধা চায়, রেবেকার কাছে সাফোর-ভক্ত মধুসূদন তা পাননি। এতেও কি তাঁর স্বপ্ন না ভেঙে পারে ?

দ্বিতীয়তঃ এই সময়ে তিনি ইংরেজী কাব্য লিখলেন, ভালোই লিখলেন—অথচ রসজ্ঞ ইংরেজ মনীষী বেথুন সাহেব তাঁকে উপদেশ দিলেন—বিদেশী ভাষায় কাব্য লিখলে ভালো করবে না, মাতৃ-

ভাষায় লেখো, তোমার প্রতিষ্ঠা অনিবার্য। অর্থাৎ খৃষ্টান হওয়ার সময় মধুসূদনের যে ছুটি স্বপ্ন ছিলো—একজন অভিজাত, সম্ভ্রান্ত ও উচ্চস্তরের ব্যক্তি হবেন আর হবেন ইংরেজী ভাষায় একজন কবি—সেই দুই স্বপ্নেই মাদ্রাজ-প্রবাস কালে আঘাত এলো; আঘাতে আঘাতে বাস্তবের সাক্ষাতে তাঁর চোখ খুলতে শুরু করলো। আবার এই সময়েই বিধাতার আশীর্বাদের মতো তিনি লাভ করেছিলেন—সতী-সাধ্বী দ্বিতীয়া স্ত্রী আঁরিয়েৎ বা হেনরিয়েটাকে। তাঁর অশান্ত বিক্ষুব্ধ জীবনে এই নারী স্নিগ্ধ প্রলেপ হয়ে দেখা দিলেন, হয়তো জীবনের অন্তর্নিহিত মাধুর্যের আস্বাদ ও তাৎপর্যের সন্ধান এই সময়েই তিনি পেয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, মধুসূদনের মাদ্রাজ-প্রবাস-কাল তাঁর স্বপ্নভাঙার কাল, অন্ততঃ কিছু পরিমাণে আত্মস্থ ও স্থিতধী হওয়ার কাল।

কোন কোন সমালোচক অন্য কথাও বলে থাকেন। কলকাতা থাকতেই মধুসূদন দিশি ভাষা ও সাহিত্যকে নিঃশেষে ত্যাগ করেছিলেন, আশ্রয় নিয়েছিলেন ইংরেজী ও পাশ্চাত্ত্য বিভিন্ন ক্লাসিক্যাল ভাষা ও সাহিত্যের রাজ্যে। এই সময়ে তিনি নাকি প্রকাশ্যে মাতৃভাষার নিন্দা করে বেড়াতেন। মাদ্রাজে প্রথমাবস্থায় তারই অনুবৃত্তি চলেছিলো—তাঁর এক চিঠিতে জানা যায়—হিব্রু, গ্রীক্, তেলেগু, সংস্কৃত, ল্যাটিন এবং ইংরেজী পাঠে তাঁর নিত্যকার অধ্যবসায়ের কথা। সীতাকে একটি রচনায় 'অসতী' (faithless) বলতে ইতস্ততঃ করেন নি; 'ক্যাপটিভ লেডির' পাদটীকায় রামায়ণ পুরাণ সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতার প্রমাণ রয়েছে; বাঙলা দ্রুত ভুলে যাচ্ছেন বলে এক চিঠিতে গৌরদাস বসাককে জানিয়েছেন। অর্থাৎ মাদ্রাজ প্রবাস মধুসূদনের পক্ষে দেশ, দেশের সাহিত্য ও দেশের সংস্কৃতিকে অস্বীকারের কাল। কিন্তু আমরা এই মতের পরিপোষক নই। মাদ্রাজে দেশীয় খৃষ্টান সমাজ ছাড়া আর কিছু তিনি পাননি এবং মধুসূদনের জীবন যারা অধ্যয়ন করেছেন তারা নিশ্চয় বিশ্বাস করবেন—এই দূরাভিলাষী ব্যক্তিটির স্বপ্ন তাতে অটুট থাকতে

পারে না। দ্বিতীয়তঃ তখন পাশ্চাত্ত্য বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ও তেলেগু তিনি পড়ছিলেন—দেশের ভাষা ও সাহিত্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি থাকার উদাহরণ এটি। তৃতীয়তঃ, গৌরদাস বসাকের কাছে মধুসূদন কাশীদাসী মহাভারত চেয়ে পাঠিয়েছেন—তা পড়বার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তিনি। চতুর্থতঃ, ভাষা শিক্ষার তালিকা উল্লেখের শেষে তিনি চিঠিতে মন্তব্য করেছেন : Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers? সকলের চেয়ে বড়ো কথা, মাদ্রাজ প্রবাস-কাল মধুসূদনের স্বপ্নভাঙার কাল না হলে তিনি কলকাতায় ফিরে এসে সার্থক সাহিত্যের সোনার ফসল ফলাতে পারতেন না। সীতা সম্পর্কে মন্তব্য ও ক্যাপটিভ লেডির পাদটীকা (notes) স্নব ও উচ্চাভিলাষী মধুসূদন কর্তৃক বিদেশী পাঠককে খুশি করার একটা চেষ্টা মাত্র। এই ধরনের ধাপ্পা বা স্নবারির উদাহরণ মধুসূদনের জীবনেতিহাসে আরো অনেক মেলে।

তারপর তিনি ফিরে এলেন মাদ্রাজ থেকে—পিতার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে—সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে। কিন্তু এই প্রাচুর্যের কুফল ফলার আগেই মাদ্রাজ জীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে, মাথায় বিত্তের বোঝা নিয়ে—ভেতরের কবি-পুরুষের তাগিদে তিনি কয়েকটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করে ফেললেন। বস্তুতঃ, এটাই ছিল মধুসূদনের জীবন-নাট্যের প্রকৃষ্ট সময়। কারণ ব্যবহারিক জীবনে যে দুঃখবেদনা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, এক কথায় যে ট্র্যাজেডি মাদ্রাজে তাঁকে সুখী হতে দেয়নি—পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার, পুলিশ কোর্টের চাকুরী, আর্থিক সচ্ছলতা ও মানসিক শান্তি তার অবসান ঘটাতে পেরেছিলো। তাঁর কবিজীবনের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের সামঞ্জস্য আসায় তাঁর অস্থির জীবনের পুনর্বাসন ঘটেছিলো। যে কোন সৃষ্টির জন্যই যে স্থিতি ও শান্তি অত্যাবশ্যক মধুসূদনের মন তখন তাঁর নাগাল পেয়েছিলো। কবি তখন আত্মস্থ। বাঙলার সমাজের মাহেন্দ্রক্ষণও এই সময়ই এসেছিলো (১৮৬০ খৃষ্টাব্দের আগে

পিছে)। বিধবা-বিবাহের আন্দোলনে, নীলকর-বিরোধী আলোড়নে, দেশীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনায় নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুত্থানে একটা সামাজিক পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। এমনি শুভদিনে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের দিনে মধুসূদনের বাঙলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভাব, বিস্ময়কর আবির্ভাব।

কিন্তু কবির সৃষ্টিশীলতা দীর্ঘস্থায়ী হলো না, পৈতৃক সম্পত্তির সংস্পর্শে ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার আস্বাদনে তাঁর ভেতরকার স্বপ্ন মানুষটি আবার জেগে উঠলো—অপব্যয়ে ও অমিতব্যয়ে তাঁর জীবন কাটতে লাগলো—বিদেশে যাবার স্বপ্নে তিনি আবার হয়ে পড়লেন অস্থির অশান্ত। অর্থ-চিন্তা নাশ করলো তাঁর ভেতরকার কবি মানুষটিকে, সাহিত্যের পবিত্র পূজায়, মানসিক তপশ্চর্যায় ঘটলো তাঁর অবহেলা। ব্যারিষ্টার হওয়ার জন্য তিনি বিলেত যাত্রা করলেন। এর ফল হলো ভীষণ। অনিদ্রায় অনাহারে বিদেশে তাঁর দিন কাটতে লাগলো, শক্ত করে ধরবার কোন খুঁটিই তিনি খুঁজে পেলেন না। এর আগেও তাঁর জীবনে দুঃখ এসেছে, এসেছে অভাব—কিন্তু তখন তিনি এমন ভাবে ভেঙে পড়েন নি, সংসারের টানা-পোড়েনের হাত থেকে আপন শক্তিবলেই আপনাকে তিনি মুক্ত করেছেন। কিন্তু বিদেশে যখন দুঃখের আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছেন—তখন বিদ্যাসাগরের দিকে আকুল দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন, কিন্তু সমস্ত সম্ভাব্য সাহায্য সত্ত্বেও তিনি শান্তির আশ্রয় পাননি, পাননি স্বস্তির অবলম্বন। ততদিনে তিনি প্রায় সব খুইয়ে বসে আছেন, মনের দিক থেকে দ্রুত দেউলে হয়ে যাচ্ছেন, কাব্যলক্ষ্মীর ঝাঁপি ভরিয়ে তোলবার শক্তি-সামর্থ্য হারিয়ে ফেলছেন। মধুসূদন তখন নিঃস্ব রিক্ত সর্বহারা হওয়ার পথে—বাইরের দিক থেকে যেমন, ভেতরের দিক থেকেও তেমনি। মাঝে মাঝে তিনি জানাচ্ছেন বটে—আমি অবিশ্রান্ত পড়ে যাচ্ছি, শিখে যাচ্ছি—কিন্তু তখনকার সমস্ত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্তিগুলিকে

আত্ম-ছলনার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু বলে মনে হয় না। এ যেন নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্য নিজের এক অসামান্য প্রয়াস।

এমনি দিনে মধুসূদনের বারে বারে মনে পড়লো মাতৃভূমির কথা—যে মাতৃভূমি শুধু মৃন্ময় নয়, চিন্ময়ও বটে। সেই কপোতাক্ষ-নদ, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, নদীতীরের দ্বাদশ শিবের মন্দির, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, জয়দেব, ইত্যাদি স্বপ্নে জাগরণে তাঁকে হনন করতে লাগলো। কিন্তু, হায়, বিমূঢ়তায় তিনি যে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন ; ফেরবার পথ কোথায় ? তাই চতুর্দশপদীতে শেষবারের মতো মধুসূদনের কবিকণ্ঠ আর্তনাদ করে গেলো—মাতৃভূমিকে জানিয়ে গেলো তাঁর রক্তাক্ত হৃদয়ের সর্বশেষ নমস্কার, সর্বশ্রেষ্ঠ নমস্কার।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মধুসূদনের মধ্যে এক অশান্ত হৃদয়াবেগ ছিলো, ছিলো অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা। সাগরদাঁড়ি থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে বিলেত, বিলেত থেকে ভারতবর্ষকে তিনি পেতে চেয়েছিলেন,—একটিকে যখনই পেয়েছেন, তখনই আরেকটির জন্য মনে তাঁর আকুলতা জেগেছে। এই যে মন তাঁর কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াতে চায়নি, দাঁড়াতে পারেনি—তার কারণ যুগ-পরিবেশ। সমাজে তখন এসেছে নতুন জোয়ার-জল—সেই জোয়ারে মধুসূদন আত্মরক্ষা করতে পারেন নি, আত্মরক্ষা করতে তিনি চানও নি—কারণ তাঁর ব্যক্তিপুরুষেরও ছিলো অস্থির ধর্ম। কালের বুকে আবর্ত জেগেছিলো নিশ্চয়ই, আর সেই আবর্ত ভেঙে পড়েছিলো মধুসূদনের জীবনের তটে। সম্বাদ-প্রভাকরের পৃষ্ঠায় সেকালের পিতার আর্ত-নাদ শুনি 'ওরে আমি কি ঝক্‌মারি কর্য়ে তোরে হিন্দু কলেজে দিয়েছিলাম যে তোর জন্য আমার জাতিকুলমান সমুদয় গেল।' কিন্তু হিন্দু কলেজে পড়লেই ছেলে উচ্ছৃঙ্খল হয় একথাই বা বলি কি করে? মধুসূদনের হিন্দু কলেজের সহপাঠী ছিলেন রাজনারায়ণ বসু ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়—তাঁদের একজন গেলেন রিফর্‌মেসনের পথে, অন্যজন ঝুকলেন রক্ষণশীলতার দিকে। আসল কথা, সমাজে

তখন যে নতুন বন্যা এসেছিলো মধুসূদন তা থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাননি—কারণ তাঁর মন কখনো নোঙর করতে শেখেনি। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর আত্মমহিমা বা ব্যক্তিত্ববোধ ছিলো খুব প্রখর, তাই ইয়ং বেঙ্গলের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে তাঁর মধ্যে কুণ্ঠা দেখিনে। কারণ ইয়ং বেঙ্গল, গভীরতর দৃষ্টিতে, ব্যক্তিতন্ত্রের উপাসক ছিলো না কি? এবং তাতে উচ্ছ্বাস ও স্বেচ্ছাচারিতা, অতিসাহস ও স্পর্ধা থাকা স্বাভাবিক। মধুসূদন আপন ব্যক্তিত্ববোধের তাগিদে রাজনারায়ণ-জাহ্নবীর স্নেহের ফাটল দিয়ে যুগের ঝড়ো হাওয়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাছাড়া অতি অল্প বয়সে, গ্যেটের চেয়েও কম বয়সে, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন -- কবিত্ব-প্রতিভা নিয়ে তিনি জন্মেছেন, অসাধারণ একটা কিছু করবার জন্য রাজনারায়ণের ছেলের আবির্ভাব। এই উপলব্ধিটাও তাঁকে ঘর ছেড়ে বাইরে ছুটে যেতে প্রেরণা দিয়েছিলো। ফলে মনে তাঁর শান্তি ছিলো না, স্থৈর্য ছিলো না, দৃঢ়তা ছিলো না—মানসিক ভারসাম্য তাঁর কখনো অটুট থাকে নি। একটা গভীর প্রত্যয় ছাড়া জীবন দাঁড়াতে পারে না, একটি বিশ্বাসের শক্ত জমির ওপর অন্তর্জীবন দাঁড় করাতে না পারলে মানুষের চলে না। মধুসূদন সমস্ত জীবন সেই অপরিহার্য শক্ত জমি হারিয়ে ফেলে শুধুই অবিশ্রান্ত উড়ে বেড়িয়েছেন। বহু সংগ্রামের শেষে সেই জীবন-পাখি—যখন মাটি খুঁজে পেল তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। তাই মধুসূদনের বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরের দিনগুলি শুধু অপচয়ের দিন, মৃত্যুর দিকে ক্ষয় হয়ে যাওয়ার দিন। অতি বেদনাদায়ক সে ইতিহাস।

॥ ২ ॥

মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯)। তবু তাঁর দুটি প্রহসন—'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০। দুটিই লেখা হয় ১৮৫৯ সালের শেষ দিকে)।

নিয়েই তাঁর রচিত নাটকের বিচার শুরু করতে চাই কারণে এই প্রহসন দুটিতে 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের সমাজচিন্তার অনুবৃত্তি আছে এবং সেই দিক থেকে তুলনামূলক বিচারের পক্ষে সুবিধাজনক। কিন্তু তার আগে বাঙলা নাটকের প্রাথমিক ইতিহাসটা জেনে নেওয়া দরকার।

বাঙলা নাটকের পঙ্গুতা জন্মগত। বাঙালীর সামগ্রিক জীবনবোধ থেকে তার জন্ম হয়নি, জাতীয় অস্তিত্বের উত্তপ্ত পরিবেশ থেকে সে নিঃশ্বাস গ্রহণের সুযোগ পায়নি। বাইরের জীবনের মধ্যে যে ঝড় ও আলোড়ন তার উত্তেজনা কিংবা চিত্তের গভীরে যে দ্বন্দ্ব ও ক্ষোভ তার তীব্রতা থেকে বাঙলা নাটক বঞ্চিত। আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনের কোন নাটকীয় দিগন্ত নেই বলেই এটা অনিবার্য ছিলো। যে জাতি ঐতিহ্যের দায়ভাগ হিসেবেই আজও সকল রসের পরিণামে শান্তরস সন্ধান করে, তার সত্তায় কোন অনবচ্ছিন্ন নাটকীয় অংশ না থাকাই স্বাভাবিক। আর তারই অভিশাপ বাঙলা নাটক আজও বহন করে চলেছে।

কোন জাতিই তার মানসিক সংস্কারকে একেবারে বর্জন করতে পারে না, আপন শরীরের রক্তের গুণ বদলানো কঠিন। সর্বদিদৃক্ষু বুদ্ধির চর্চায়, বিচারপ্রবণ ন্যায়ের তর্কে বিতর্কে কিংবা গভীরতম আত্মদর্শনের ফলে মাঝে মাঝে ইহনিষ্ঠ চিন্তার প্রকাশ ঘটলেও আমরা অনেককাল থেকে জগৎ ও জীবনকে বিকার বা মায়াপ্রপঞ্চ বলেই জেনে রেখেছি। বস্তুবিশ্বের প্রাতিভাসিকতায় বিশ্বাস আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ক্ষতি করেছে, ক্ষতি করেছে ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের। তাছাড়া জীবনের শান্তরসাশ্রিত পরিণামমুখিতা সমগ্র সত্তার নাটকীয় সম্ভাবনাকে, তার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-মথিত উদ্বেলতাকে শেষ পর্যন্ত একটা স্থিরভার বন্ধনে আবদ্ধ করে, আচ্ছন্ন করে তার উত্তপ্ত স্বাদকে। বস্তুজগৎ সম্পর্কে এই উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনের লীলারস সম্পর্কে প্রশান্ত অনুভব নাটকের দেহ ও প্রাণের অনুকূল নয়। তাই আমাদের নাট্যপ্রয়াসের প্রত্যাশিত পরিণতি

নেই, সাহিত্যের এই বিশেষ শাখায় বাঙলার সৃজনী প্রতিভা অচরিতার্থ।

অথচ উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর সঞ্জীবিত মানস নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রই খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কাব্যে মধুসূদন সেই সৃজনের পথ দেখালেন, গদ্যে বঙ্কিম। সেকালের শিক্ষিতদের কাছে পাশ্চাত্ত্য দেশের নাট্যসাহিত্য অপরিচিত ছিলো না, হিন্দুকলেজে সেক্সপীয়ার-চর্চা অনেকদিন আগেই শুরু হয়েছিলো। সার্থক ইংরেজী সাহিত্যের অনুবাদ করতে দিয়ে শিক্ষিতদের প্রথম দৃষ্টি পড়ে সেক্সপীয়ারের নাটকগুলির ওপর। তার প্রমাণ আছে গুরুদাস হাজরার 'রোমিও এবং জুলিএটের মনোহর উপখ্যানে' (১২৫৫), ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটির প্রকাশিত 'মহাকবি শেক্ষপীর প্রণীত নাটকের মর্মানুরূপ কতিপয় আখ্যায়িকায়' (১৮৫৩)। বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাসও' সেক্সপীয়ারের 'কমেডি অব এররস্' অবলম্বনে লেখা। এমন কি বাঙলায় প্রথম মৌলিক নাটক 'কীর্তিবিলাসের' স্থানবিশেষে 'হ্যামলেটের' ছায়া পড়েছে, হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' লেখা হয়েছে 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' অবলম্বনে। সুতরাং ভালো নাটক বলতে কী বোঝায়, তার রূপই বা কী, তার রসাত্মাই বা কী জাতীয়—তা শিক্ষিত সমাজের জানা ছিলো। তবু কেন আমরা নাট্যরচনায় ব্যর্থ হলাম? যে সমাজ জন্ম দিয়েছে মধুসূদনের কাব্য-নির্মাণ ক্ষমতার, ফুটিয়ে তুলেছে বঙ্কিমের ঔপন্যাসিকতার প্রতিভা—তা নিশ্চয় নাটক রচনার শক্তি যোগাতে পারতো। সমাজজীবনের গতানুগতিকতার মধ্যে, প্রাণ-প্রেরণাহীন ছবির অস্তিত্বের উৎসে ও অসাড় চেতনার গর্ভে সত্যিকারের নাটকের সম্ভাবনা জাগে না, একথা জানি। আরও জানি, 'যখন সমাজ-মনে একটা সুগভীর জীবন-প্রত্যয় জাগে এবং এই জীবন-প্রত্যয় একটা গৌরবময় জাতীয়তাবোধ ও শক্তিদৃপ্ত কর্মময় অভিযানের মধ্যে রূপায়িত হয়, তখনই শ্রেষ্ঠ নাটকের যোগ্য পটভূমিকা প্রস্তুত থাকে।' গ্রীক নাটকের স্বর্ণযুগে ও ইংলণ্ডে এলিজাবেথের যুগে

দেশের আকাশে বাতাসে এমন একটা উন্মাদনা ছড়ান ছিল, কাব্য-জগৎ ও কর্মজগতের মধ্যে এমন একটা বিপুল ভাবপ্রেরণার সামঞ্জস্য ছিল, যে ঐ তুটি যুগে কবিকল্পনা অনিবার্যভাবে প্রাণাবেগ চঞ্চল, মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতে তরঙ্গিত নাট্যরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছিলো। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইংরেজী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে, বিদেশী শাসনের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় বাঙলা দেশে একটা নবজীবনের তাগিদ যে দেখা দিয়েছিলো, তা আমরা নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। হয়তো সেই নবজাগ্রত চেতনা তখন পর্যন্ত সুদৃঢ় জীবন-প্রত্যয়ে পরিণত ও শক্তিদৃপ্ত কর্মময় অভিযানের মধ্যে রূপায়িত হয়নি, তবু ভাব ও ভাবনায় যে নতুন বেগ, আচার ও আচরণে যে পরিবর্তন, কর্মে যে অপেক্ষাকৃত আসক্তি এসেছে, তাতে সন্দেহ নেই। জাতীয় জীবনের সেই উন্নতি ও উন্মাদনার প্রকৃতি ও পরিমাণ নিয়ে যত আফশোষই পোষণ করি না কেন, তবু তার বৃন্তেই মোটামুটি ভালো নাটক ফলতে দেখলে আমরা আশ্চর্য হতাম না। যেমন আমরা আশ্চর্য হইনি নাটকের ক্ষেত্রে মধুসূদনের কম-বেশি সফলতা দেখে।

তার কারণও আছে। গন্থ-পন্থে উনিশ শতকের প্রতিভা প্রকাশের পেছনে ছিলো যে সামাজিক বেগ, উজ্জীবিত চেতনা এবং জাগ্রত ব্যক্তিত্ব—নাটকের পেছনেও তা সক্রিয় ছিলো। পলাশীর যুদ্ধের মাত্র আটত্রিশ বছর পরে (১৭৯৬) একজন রুশদেশীয় রসিক—হেরাসিম লেবেডেফ - তু'খানি ইংরাজী প্রহসনের বাঙলা অনুবাদের ('The Disguise' ও 'Love is the best doctor') অভিনয় করিয়েছিলেন। তিনটি কারণে এই উদ্যোগের ঐতিহাসিক মূল্য আছে—এক, পাশ্চাত্ত্য ধরনের অভিনয় কলা ও রঙ্গমঞ্চের উপযোগিতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ; তুই, নাটকে অভিনেত্রীদের অংশগ্রহণে উৎসাহদান; তিন, নাটকে 'বিন্তাসুন্দর পালার' গান জুড়ে দিয়ে বাঙলা অভিনয় ধারার সঙ্গেও যোগাযোগ সংরক্ষণ

নাটক ও অভিনয়কলা যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, একথা স্মরণে রেখেই তিনি ইংরেজী নাটকের বাঙলা অনুবাদ করিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তার প্রয়োগকৌশলের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছিলেন। অভিনয়কলার উন্নতি ছাড়া নাটকের কোন উন্নতি হয় না, নাটক-মাত্রই অভিনেয় শিল্প—একথা ভুলে যাই বলেই আমাদের নাটক-বিচার অনেক সময়েই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বিলিতি নাট্যাভিনয়ের এই সূত্রপাতের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব অনেককাল দেখা যায়নি, তবু ১৮৩৫ সালের শ্যামবাজারের নবীন-চন্দ্র বসু উদ্যোগে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের যে অভিনয় হয়, তাতেও স্ত্রী ভূমিকায় অভিনেত্রীদের অংশগ্রহণ করতে দেখি। এবং তাদের অভিনয়নৈপুণ্যও উল্লেখ করার মতো। নবীনচন্দ্রের নির্মিত রঙ্গ-মঞ্চের জন্য প্রচুর অর্থ খরচ হয়েছিলো, লেবেডেফের নাট্যশালায়ও অর্থব্যয় কম হয়নি। এর সঙ্গে যদি যাত্রাভিনয়ের আসরটিকে মিলিয়ে দেখা যায়, তবে প্রয়োগশিল্পের দিক থেকে বাঙলা নাটকের দৃষ্টি-পরিবর্তন স্বীকার করে নিতে হয়। এই দুই ঘটনার মধ্যবর্তী সময়ে দেখিতে পাই প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার (১৮৩১)। বিশেষ লক্ষণীয় হচ্ছে, এই থিয়েটারে ইংরেজীতে অভিনীত হয় সেক্সপীয়ারের জুলিয়াস সীজারের নির্বাচিত দৃশ্য ও উত্তররামচরিত। অন্তর জনসমাজে যাত্রাপালা আগের মতোই চলেছে, তবু বিলিতি ঢঙের বিলিতি ধরনের অভিনয়ের এই ঘটনা বিস্মৃত হবার মতো নয়। ১৮৫৭ সালে সাতুবাবুর বাড়ির নবনির্মিত নাট্যশালায় অনুষ্ঠিত হয় 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' ও 'মহাশ্বেতা' নাটকের অভিনয়। এর পরে উল্লেখযোগ্য রামজয় বসাকের গৃহে অনুষ্ঠিত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) নাটকের অভিনয় (১৮৫৭)। নাটুকে রামনারায়ণই হচ্ছেন প্রাক্-মধুসূদন কালের নাট্যবৃত্তে উল্লেখ করার মতো একমাত্র ব্যক্তিত্ব। সেই ব্যক্তিত্বের ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে, যদিও তাকে বৃহৎ ব্যক্তিত্ব বলবো না। তারপর আসে কালীপ্রসন্নের 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' (এখানে অভিনীত নাটকের মধ্যে রাম-

নারায়ণের 'বেণীসংহার' ও কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী' উল্লেযো...
ও পাইকপাড়ার রাজাদের 'বেলগাছিয়া নাট্যশালার' (১৮৫...
কথা। দ্বিতীয়টির উদ্বোধন হয় রামনারায়ণের রত্নাবলী নি...
খ্যাতি অর্জন করে 'শর্মিষ্ঠার' নাট্যকার মধুসূদনের জন্ম দি...
এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা; কারণ 'শর্মিষ্ঠাই' প্রথম খা...
পাশ্চাত্ত্য রীতির নাটক, যার মধ্যে বাঙলার নব নাট্যপ্রয়াস পূর্ণ...
সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাঙলা নাটকের প্রাথমিক ইতিহা...
ইংরেজী থিয়েটার প্রবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে একান্তভাবে জড়ি...
এবং সেই ইংরেজী থিয়েটার নির্মাণের চেষ্টাও হচ্ছে ইংরেজ রাজ...
শিক্ষিত বাঙালীর মানসিক প্রবর্তনার প্রমাণ। যাত্রাভিনয়ে রঙ্গম...
ছিলো না, দৃশ্যপট ছিলো না, পটক্ষেপের প্রয়োজন ছিলো ন...
নাটকাভিনয়ের নামে নাচ ও অঙ্গভঙ্গি সহকারে সঙ্গীতানুষ্ঠা...
চলতো। পাশ্চাত্ত্য নাটকের ফর্মের সঙ্গে তার অনেক পার্থক...
সংলাপ থাকলেও যাত্রাভিনয় নাচগানের দিকেই দৃষ্টি ছিল বেশি...
কথকতায় কথকঠাকুর যেমন একাই বিভিন্ন নরনারীর ভূমিকা...
অভিনয় করেন, কীর্তনপালায় যেমন একই ব্যক্তির কণ্ঠে অনেকে...
সংলাপ এবং একাধিক রসের সংলাপ শোনা যেত, তেমনি বাঙল...
দেশের যাত্রায় ভূমিকালিপিও ছিলো একান্তই সীমাবদ্ধ। এমনি...
অবস্থায় ইংরেজী থিয়েটারের আবির্ভাবটা বাঙলা রঙ্গমঞ্চ ও নাটকে...
ইতিহাসটাকেই যে বদলে দেবে, তাতে সন্দেহ কি? আর এই স...
নাটকাভিনয়ে উৎসাহের বেশি প্রমাণ পাওয়া যায় উনিশ শতকের
পঞ্চম দশকে। এখন রেনেসাঁসের সাধনা তার প্রস্তুতি-পর্ব পা...
হয়ে সৃষ্টির পর্বে উত্তীর্ণ হতে চলেছে, জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতি...
নানা উজ্জ্বল দিগন্ত রচনায় শিক্ষিত বাঙালীর মানসিক প্রয়াস
চলেছে। সেই উজ্জীবিত চেতনা ও নতুন রসপ্রেরণায় বাঙলা
রঙ্গমঞ্চ ও নবনাটকের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং বাঙলা গদ্য-পদ্য সাহিত্যে...
খাতবদল ও জীবনায়নের পশ্চাদ্‌পট ও প্রাণ-প্রেরণা নাটকের

ক্ষেত্রেও বর্তমান ছিলো এবং তার পদযাত্রাও শুরু হয়েছিলো গদ্য-পদ্য সাহিত্যের মতোই। মধুসূদন নাটকের পালা শুরু করে দিয়েছিলেন ঠিক পথেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি সিদ্ধি ঘটলো না। লেবেডেফ নাটকাভিনয়ে যে বিদ্যাসুন্দর পালার গান ও দিশি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন, তা যেন বাঙলা নাটকের ভাবী অদৃষ্ট নির্ধারণের সামিল। এই গানের মধ্য দিয়ে যাত্রার একটা বিশেষ ঐতিহ্য বহন করে চলার দায় থেকে বাঙলা নাটকের মুক্তি আজও ঘটেনি। আরম্ভে যে শান্তরসপ্রিয়তা ও উদাসীন বিশ্ববীক্ষার কথা বলেছি, তার সঙ্গে এই সঙ্গীতপ্রিয়তা যুক্ত হওয়ার ফলেই সেক্সপীয়ারের মতো নাটক আমরা লিখতে পারিনি। এমন কি রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য, গীতিনাট্য, রূপকনাট্য ও সাঙ্কেতিক নাট্য ... বেশি মিউজিক্যাল বলেই যতটা সফলতা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, সেক্সপীরীয় রীতির নাটক ততটা সিদ্ধিলাভ করেনি।

বাঙলা দেশে ইংরেজী থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে, আমরা আগেই দেখেছি, নবনাট্যধারার উৎপত্তি। তার সাহিত্যিক আদর্শ ছিলো পাশ্চাত্ত্য নাটক, যাত্রা নয়। তবে যাত্রাভিনয়ের মধ্যে যে জাতিগত মানস-বৈশিষ্ট্যের পরিচয়, বাঙলা দেশের উনিশ শতকী নবনাট্য তার কিছু কিছু স্মৃতিধারক, সন্দেহ নেই। আসল কথা, কাব্য ও গদ্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন বৃহৎ ব্যক্তিত্ব জড়িত ছিলো, নাটক তা থেকে ছিলো বঞ্চিত। যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, তারাচরণ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ ও নন্দকুমার রায় ইংরেজী শিক্ষিত ছিলেন, কিন্তু সাহিত্যের বিশেষ কোন শাখায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনার মতো মনীষা ও প্রতিভা তাঁদের ছিলো না। শতাব্দীর বহু বৃহৎ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বের ভিড়ের মধ্যে তাঁরা নামমাত্র বেঁচে ছিলেন, তাঁদের কর্ম, চিন্তা ও শক্তি ঠিক বড়ো রকমের কিছু সৃষ্টি করার পক্ষে ছিলো অনুপযুক্ত। তাই বিশ শতকের সন্ধানী দৃষ্টি প্রসারের পূর্ব পর্যন্ত, তাঁরা পাদপ্রদীপের অন্তরালে গুপ্ত হয়েই ছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস নাটক' (১২৫৮) বিষাদান্ত হলেও

ট্র্যাজেডি নয়। পঞ্চ অঙ্কে ও বিভিন্ন দৃশ্যে বিভক্ত হলেও সংস্কৃত রীতির প্রস্তাবনাও আছে। নাট্যকাহিনীর মূল কথা বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা গ্রহণ ও চঞ্চলচিত্ত তরুণীভার্যার সপত্নী পুত্রদের সম্পর্কে বিমুখতা। কাহিনীতে নূতনত্ব কিছু নেই, বহুবিবাহজর্জরিত বাংলা দেশের একটি পরিচিত কাহিনী নাটকটিতে আছে। গান, স্বগতোক্তি ও গদ্যপদ্যমিশ্রিত পুরনো ধাঁচের ভাষা এবং একাধিক মৃত্যুর অবতারণায় কাঁচা হাতের লক্ষণ সুস্পষ্ট। শুধু তাই নয়, নাটকের সামগ্রিক কলাকৌশল, ঐক্যনীতি, চরিত্র ও কাহিনীর ক্রমাভিব্যক্তির কোন পরিচয় এতে নেই। এক কথায়, সেন্স অব ড্রামার একান্তই অভাব। অথচ লেখক নাটকের ভূমিকায় বিষাদান্ত নাটকের সমর্থনে সেক্সপীয়ারের বিখ্যাত উক্তি উদ্ধার করেছেন— 'আমার অন্তঃকরণ শোকানলে দহন হইতেছে, তত্রাপি আমার মন অবিরত ঐ শোক প্রয়াসী।' শুধু তাই নয়, দেশবিদেশের নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের প্রমাণও ভূমিকায় আছে। এতেই মনে হয়, সত্যিকারের প্রতিভাশালী স্রষ্টা হলে তাঁর সিদ্ধি ঘটতো আশাতীত।

তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) আরেকখানি উল্লেখযোগ্য নাটক। প্রস্তাবনা অংশ ও বিদূষক চরিত্র বর্জনে তাঁর প্রগতিশীল মনোভাব ও নব্যরীতির প্রতি অনুরাগের পরিচয় পাওয়া গেলেও তাঁর সামগ্রিক নাট্যদৃষ্টি সংস্কৃতানুসারী। 'এই নাটকে ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্দেশ বিষয়ে ইওরোপীয় নাটকের প্রায় হইয়াছে'—তারাচরণের এই মন্তব্যও মেনে নেওয়া যায় না। সত্য কথা বলতে কি পাশ্চাত্ত্য নাটকের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ঠিক স্পষ্ট ছিলো না, তাতে ত্রুটি ছিলো। প্রস্তাবনা ও বিদূষক চরিত্র বদলে দিলেই সংস্কৃত নাটক আর পাশ্চাত্ত্য নাটক অভিন্ন হয়ে যায়, তাঁর এই উক্তি ভুল বোঝার ফল মাত্র। চরিত্রে ব্যক্তিত্ব সঞ্চারে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ, একমাত্র অর্জুন ছাড়া। তবে কোন কোন ছোটখাটো চরিত্র মন্দ ফোটেনি। 'ভদ্রার্জুনের' সবচেয়ে

বড়ো ত্রুটি তাঁর পয়ারপ্রধান সংলাপ, কাহিনীর গতিপ্রকৃতির মন্থরতা।

হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' (১৮৫২), 'কৌরব বিয়োগ নাটক' (১৮৫৮), 'চারুমুখচিত্তহরা নাটক' (১৮৬৭), ও 'রজতগিরি নন্দিনী নাটক' (১৮৭৪) অঙ্কে বিভক্ত কাহিনী-বিন্যাস মাত্র। গদ্য-পদ্যের পরিমাণভেদ থাকলেও ভাষার দিক দিয়ে তাঁর নাট্যকাহিনী উপাদেয় নয়। পদ্যাংশ মাধুর্য-বর্জিত, গদ্যাংশ জটিল ও অপাঠ্য। নব্যরীতির কথা নাট্যকারের মনে থাকলেও রচনায় তার বিশেষ প্রকাশ নেই। প্রস্তাবনা অংশের যোজনা তার অন্যতম প্রমাণ। হরচন্দ্রের নাটক যে পাঠ্য বা অভিনীত হয়নি তার সঙ্গত কারণ আছে। নাট্যপ্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহের কথাও আছে। সেকালের বাঙলা দেশে তিনি ছিলেন বৃহৎ ব্যক্তিত্ব এবং বয়সের তুলনায় সে-ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠাও হয়েছিলো স্মরণ রাখবার মতো। নাট্যজগৎও তাঁর দান থেকে বঞ্চিত হয়নি, তার উদাহরণ আছে 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' স্থাপনায়, 'বিক্রমোর্বশীর' অনুবাদ, মৌলিক 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক' রচনায়। তিনি স্বয়ং ছিলেন অভিনেতা। তবু মনে হয়, বাঙলা নাটকে যুগান্তর আনার উপযুক্ত অনন্য সাহিত্যিক নিষ্ঠা ও শিল্প-প্রতিভা তাঁর ছিলো না। নাটকের ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত তাঁর সর্ববিষয়-ব্যাপিনী উদ্দীপনা ও অতি-তৎপর কর্মযোগের পরিচায়ক মাত্র।

যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, তারাচরণ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ ইত্যাদির নাট্যপ্রয়াসের স্থায়ী সাহিত্যিক মূল্য নিতান্তই গৌণ, তাদের নাট্যপ্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন রূপে নাটকগুলিকে গ্রহণ করা কঠিন। চরিত্র ও ঘটনাঘত ঘাত-প্রতিঘাতের সূচনা থেকে পরাকাষ্ঠা (climax) পর্যন্ত কাহিনীর ক্রমারোহণ ও সঙ্কটের চরম পর্যায়ে উত্তরণ এবং গ্রন্থিমোচনের মধ্য দিয়া উপসংহারে অবতরণ উৎকৃষ্ট নাটকের লক্ষণ। কিন্তু মধুসূদন-পূর্ববর্তী নাটকগুলিতে নাটকীয় পঞ্চসন্ধির সুষ্ঠু সন্নিবেশ চোখে পড়ে না এবং সেই পঞ্চসন্ধির

দৃষ্টিকোণে অঙ্ক-বিভাগের চেষ্টাও অনেকটাই অনুপস্থিত। দ্বিতীয়তঃ চরিত্রের মুখে কোন রকমে কথা গুঁজে দিয়ে সংলাপ রচনার ব্যর্থ প্রয়াস আমাদের রসবোধকে পীড়িত করে। সেই মুখের কথায় প্রাণের ধ্বনি নেই, আবেগের প্রতিফলন নেই, নেই কোন ব্যক্তিত্বের দ্যোতনা। সেই ভাষার অঙ্গে অঙ্গে আড়ষ্টতা ও নির্জীবতা। তবে এই সব ত্রুটি সত্ত্বেও তখনকার নাটকগুলিকে দু'দিক থেকে কিছুটা কৃতিত্ব দেওয়া যায়—এক, একটা কাহিনীকে নানা অঙ্কে বা অঙ্গে বিভক্ত বা সংযোগস্থলে বিন্যস্ত করে মোটামুটি ফুটিয়ে তোলার কৌশল তাঁরা আয়ত্ত করেছেন; দুই—নানা ত্রুটি সত্ত্বেও এখানে সেখানে নবনাট্যরীতি অনুসরণের প্রয়াস করেছেন তাঁরা। কিন্তু এই পর্যন্তই, তার বেশি কিছু নয়।

রামনারায়ণ তর্করত্ন নাট্যকার হিসেবে মধুসূদনের অগ্রজ ও আর কিছুটা প্রতিষ্ঠালব্ধ। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের রক্ষণশীলতা তাঁর ছিলো না আর বল্লালসেনীয় কৌলীন্যপ্রথার সঙ্গে তাঁর বংশগত কোন সম্পর্ক ছিলো না বলেই তিনি ছিলেন মুক্তদৃষ্টি। তাই স্বকপোলকল্পিত কুলমর্যাদার নামে যে অনাচার ও কুসংস্কারের রাজত্ব তাঁর চোখে পড়েছিলো, নাটকে তার মূলে আঘাত করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। তিনখানি পৌরাণিক নাটক, চারটি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ, কয়েকখানি সামাজিক নক্সা, তিন-চারখানা প্রহসন রচনা করলেও 'কুলীন কুল-সর্বস্বের' জন্যই তিনি সেকালে ছিলেন জনপ্রিয় নাট্যকার। নাটক রচনা ও নাটকাভিনয়ে তাঁর উৎসাহের জন্যই তিনি নাটুকে রাম-নারায়ণ নামে সমধিক পরিচিত। তাঁর অনূদিত 'রত্নাবলী' নাটকের প্রতিক্রিয়ায়ই মধুসূদনের নাট্যরচনাপ্রয়াস, একথাও স্মরণ রাখলে রামনারায়ণের ভূমিকা বিচারে সুবিধা হবে।

'কুলীন কুলসর্বস্ব ছয়ভাগে বিভক্ত। প্রথমে কুলপালক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান। দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট ব্যবহারসূচক রহস্যজনক প্রস্তাব। তৃতীয়ে, কুলকামিনীগণের আচার ব্যবহার। চতুর্থে, শুক্রবিক্রয়ীর দোষোদ্ঘোষণ। পঞ্চমে,

নানা রহস্য বিরহি পঞ্চানন্দের বিয়োগ পরিবেদন। ষষ্ঠে, বিবাহ নির্বাহ। এই রীতিক্রমে এই নাটক রচিত হইয়াছে, ইহা কোন রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তৎপর্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কৌলীন্যপ্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া যাইতে পারে।' এই নাটকে সংস্কৃতের নান্দী ও প্রস্তাবনা আছে, আছে ঘটনার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন প্রকৃতিবর্ণনা, অহেতুক ভাঁড়ামি ও অহেতুক হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা। সমকালীন নিম্নগতি রুচি ও আঙ্গিক-শৈথিল্য থেকেও তাঁর নাটক মুক্তি পায় নি। কিন্তু একটা গুরুতর বিষয়ের অনুধ্যানে ও তার নির্মম সমালোচনায়, জীবন্ত মানুষ সৃষ্টির প্রয়াসে, আবেগের বন্ধন থেকে মুক্ত একটা বাস্তব কাহিনীর সবল রূপায়ণে তাঁর কৃতিত্ব স্মরণযোগ্য। তিনি যে জাতীয় নাটকের সূত্রপাত করলেন, মধুসূদনের প্রহসন, দীনবন্ধুর নাটক ইত্যাদিতে তার অনুবৃত্তি দেখতে পাই।

॥ ৩ ॥

বিবেকবান সামাজিকের বস্তুবোধ আর সহৃদয় সাহিত্যিকের সামাজিক প্রতীতির রূপ এক নয়। অথচ তার ভিত্তি অভিন্ন। একজন মানুষ চারপাশে তাকিয়ে সমাজের যে চেহারা দেখতে পায়, তার একটা ব্যবহারিক হিসেব দেওয়া কঠিন নয়। এবং সে হিসেবে চোখের সাক্ষ্য প্রধান। তবে চোখের দ্বারা সংগৃহীত তথ্যগুলির মানসিক বিন্যাসের ওপরই সমাজচিত্রের পূর্ণাঙ্গতা নির্ভর করে। তাই সামাজিকের চোখের দেউড়ি পেরিয়ে তার মনের ভেতর প্রবেশ করলে দেখা যায় একটা বস্তুগ্রাহ্য চেতনা। এই চেতনা লেজমুড়ো সাজিয়ে সামাজিক ছবিটাকে স্পষ্ট করে তোলে বলেই তাকে সংশ্লেষণধর্মী (synthetic) বলা যায়।

চাক্ষুষ প্রমাণগুলিকে মানসিক চেতনার সংশ্লেষণ-সূত্রে বিন্যস্ত করে নিতে পারলেই সামাজিক অভিজ্ঞতার জন্ম হয়, সন্দেহ নেই—তবু সেই বস্তুবোধ বহির্মুখী, জড়রাজার খাজনা জুগিয়েই তার সার্থকতা, বড়জোর পারিপার্শ্বিক জড়স্তূপের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বা ঐতিহাসিক হিসেব (Dialectical or Historical Materialism) পর্যন্ত তার দৌড়। অর্থাৎ চারদিকের অবেষ্টনীর মধ্যে যে বাস্তব তথ্য (আর্থিক-রাষ্ট্রিক-সামাজিক তথ্য) মেলে তা-ই হচ্ছে বিবেকবানের বস্তুবোধের 'মূল' (base) এবং সেই গাঁটছড়ার বন্ধন থেকে তার আর মুক্তি নেই। অবশ্য তার প্রয়োজনই বা কোথায় ?

অন্যদিকে সাহিত্যিকের সামাজিক প্রতীতিতে এই বাস্তব 'বেস' অস্বীকৃত না হলেও তার বন্ধন প্রত্যক্ষভাবে মেনে নেওয়া হয় না। আর্থিক-রাষ্ট্রিক-সামাজিক ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে সাহিত্যের 'ফুল' (super-structure)। এই 'মূলের' সঙ্গে 'ফুলের' বা 'বেসের' সঙ্গে 'সুপারস্ট্রাক্চারের' সম্পর্ক বেশ জটিল এবং সেই কূটত্ব নিরসন করতে পারলেই সামাজিকের বস্তুবোধ ও সাহিত্যিকের সামাজিক প্রতীতির ভেদ নির্ণয় করা সহজ হয়।

'বেসের' সঙ্গে 'সুপারস্ট্রাক্চারের' সম্পর্ক নির্ণয় সাহিত্যের সৃষ্টি-রহস্য উদ্ঘাটনের নামান্তর। শিল্পীর সৃষ্টির জগৎ নিঃসন্দেহে অলৌকিক মায়ার জগৎ, সুতরাং তা অনির্দেশ্য—এ-জাতীয় কথা বললে সমস্যাটাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে হয়তো দেখা যাবে, একটা কিছু অনির্দেশ্যকে মেনে নিতে হচ্ছে। তবু সাহিত্যের সৃষ্টির মধ্যে যেটুকু যান্ত্রিকতা তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অনেকে বলেন, পঙ্কজের শেকড় পাঁকে প্রোথিত থাকলেও ফুলের রঙে গন্ধে সেই পাঁকের কোন ছাপ থাকে না। অথচ সেই পাঁকের বন্ধন অস্বীকার করেও পঙ্কজ আপনাতে আপনি বিকশিত হতে পারে না। সাহিত্যিকের চেতনাগ্রাহ্য সামাজিক-আর্থিক-রাষ্ট্রিক 'বেসের' সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির 'সুপারস্ট্রাক্চারেরও' ঠিক এই ধরনের সম্বন্ধ।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত থেকেই আবার একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। তা হচ্ছে—সাহিত্যিক কোন্ কৌশলে আর্থিক-রাষ্ট্রিক-সামাজিক ভিত্তির ওপর সাহিত্যের শিরঃসৌধ নির্মাণ করেন? কি জাতীয় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পঙ্কের বন্ধনের মধ্যেও পঙ্কজ আপনাকে প্রকাশ করে?

গাছের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি জানিনে, কিন্তু তার একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, প্রত্যেক গাছেরই একটা নিজস্ব প্রাণ-প্রবর্তনা বা স্বাভাবিকী বলক্রিয়া আছে এবং সেই পৃথক পৃথক নিহিতার্থেই বটের বটত্ব বা পঙ্কজের পঙ্কজত্ব। এ থেকে আর একটু অগ্রসর হয়ে বলা যায়, প্রত্যেক গাছের নিজস্ব প্রাণ-প্রবর্তনা বা স্বাভাবিকী বলক্রিয়াই গাছের মূলের রসকে ফুলের রসে পরিণত করে। তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যিকের মনই হচ্ছে সেই স্বাভাবিকী বলক্রিয়া এবং তারই সংস্পর্শে ও প্রভাবে আর্থিক-রাষ্ট্রিক-সামাজিক তথ্য সাহিত্যের সত্যে পরিণত হয়। তাই প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, 'ইন্দ্রিয় যে উপকরণ সংগ্রহ করে মন তাই নিয়ে কারিগরি করে। এই বর্ণ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময় জগতে যে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ে মন সুখলাভ করে শুধু তাই আর্টের উপকরণ।' রবীন্দ্রনাথের মতও অনুরূপ—'স্বভাবত বিশ্বজগৎ আমাদের কাছে তার বিশুদ্ধ প্রাকৃতিকতায় প্রকাশ পায়। কিন্তু মানুষ তো কেবল প্রাকৃতিক নয়, সে মানসিক। মানুষ তাই বিশ্বের উপর অহরহ আপন মন প্রয়োগ করতে থাকে। বস্তুবিশ্বের সঙ্গে মনের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তোলে। জগৎটা মানুষের ভাবানুষঙ্গে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। মানুষের ব্যক্তিরূপের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মানবিক পরিণতির পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটে।' অর্থাৎ বিশ্বের প্রাকৃতিকতায় (যার মধ্যে আর্থিক-রাষ্ট্রিক-সামাজিক উপকরণ আছে) সাহিত্যিকের মন যতখানি সুখলাভ করে, যতখানি তাকে সে প্রভাবিত করে, ঠিক ততখানিই তা সাহিত্যের বিষয় হয়ে ওঠে। সুতরাং মনের কারিগরিতেই আর্থিক-রাষ্ট্রিক-সামাজিক

বেস থেকে সাহিত্যের সুপারষ্ট্রাক্চারের নির্মিতি। মনই সেই পাতনযন্ত্র যার মাধ্যমিকতায় বস্তুবিশ্ব 'শুদ্ধ' হয়ে সাহিত্যের খোশদরবারে আসন লাভ করে। সুতরাং একথা মেনে নিতেই হবে যে, সাহিত্যসৃষ্টির প্রক্রিয়ায় বিষয়বস্তুর কোন-না-কোন প্রকার শুদ্ধি (sublimation) বা রসগত পরিণতি ঘটে। অবশ্য সাহিত্যিকের aesthetic faculty ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় থেকে aesthetic quality নিষ্কাশিত করেই এই শুদ্ধি ঘটায় না, ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়ও বিশেষ বিশেষ সংস্থিতিতে ভালোমন্দ মেশানো জড়রূপেই অন্তরাবেগের কাছে মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে। এবং তা-ও শুদ্ধি না হোক রস-পরিণতি তো (literary idealisation) বটেই।

সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম, সাহিত্যিকের মনের কারিগরিতে আর্থিক-রাষ্ট্রিক-সামাজিক উপকরণ শুদ্ধ হয়ে বা রস-পরিণতি নিয়ে সাহিত্য গড়ে তোলে। আর তাই বিবেকবান সামাজিকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাহিত্যিকের সামাজিক প্রতীতির একটা পার্থক্য আছে। সামাজিকের অভিজ্ঞতা জড়ধর্মী ও বহির্মুখী, সাহিত্যিকের সামাজিক প্রতীতি ভাবধর্মী ও অন্তর্মুখী। একে বিষয়প্রধান, অন্যে বিষয়ী বা ব্যক্তিপ্রধান। সামাজিকের লক্ষ্য অভিজ্ঞতার পূর্ণতা, সাহিত্যিকের সাধনা অভিজ্ঞতার রস-পরিণতি। শুধু তাই নয়, সামাজিকের বস্তুবোধ তাঁর চিন্তা ও ক্রিয়াকর্মে সর্বত্র বিশ্লেষণযোগ্য, কিন্তু সাহিত্যিকের সামাজিক প্রতীতি তাঁর উচ্চতর সৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন ও দুর্নিরীক্ষ্য এবং তার ব্যবহারিক হিসেবও সর্বত্র সহজ নয়। অবশ্য নীচু স্তরের সাহিত্যে সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রকাশ যতটা থাকে, শিল্পীর সামাজিক প্রতীতির স্বাক্ষর ততটা নাও থাকতে পারে।

মধুসূদনের প্রহসন দুটি বিচারের আগে এ ভূমিকা স্মরণীয়। কারণ আলোচনার আরম্ভেই যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে চাই, তার মীমাংসার জন্য এই তত্ত্বগত আলোচনার প্রয়োজন ছিলো। প্রশ্নটা হচ্ছে, মধুসূদনের প্রহসনে কি শুধু সমসাময়িক সামাজিক

অভিজ্ঞতার বস্তুভার আছে না সহৃদয় সাহিত্যিকের সামাজিক প্রতীতির রস-পরিণতি ঘটেছে ? আর এই প্রশ্নের উত্তরের ওপরই নির্ভর করছে তাঁর রচনা দুটির আপেক্ষিক উৎকর্ষ বা কালাতিশয়ী সার্থকতা।

'একেই কি বলে সভ্যতা ?' প্রহসনটির ঘটনাস্থল কলকাতা। ইয়ং বেঙ্গল বা নববাবুদের চরিত্রদোষ পরিস্ফুটনই এর রচনার উদ্দেশ্য। নবকুমারের বাবা গোঁড়া হিন্দু, সরল প্রকৃতির মানুষ। তাই নবকুমার ও তার বন্ধু কালীনাথ সাধু ও নিরীহ সেজে তাকে প্রতারণা করতে দ্বিধা করে না। 'অকালের বাদল' বুড়োকে এড়িয়ে তারা মদ খায়, তাদের বিলাসের ক্ষেত্রকে সংস্কৃত বিদ্যা ও ধর্মশাস্ত্র অনুশীলনের পীঠস্থান বলে চালিয়ে দিয়ে তারা স্ফূর্তির অবসর খোঁজে। অথচ কালীনাথ শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা ও গীতগোবিন্দের নাম পর্যন্ত শোনেনি। তারপর দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে দেখতে পাই, সিক্‌দারপাড়া ষ্ট্রীটের একটি চিত্তাকর্ষক চলচ্চিত্র। এ তো বিশেষ একটি সড়ক মাত্র নয়, যেন ইয়ংবেঙ্গলবিধৃত বাঙলা দেশেরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। কর্তাবাবু ছেলে নবকুমারকে জানেন ; আরও জানেন, কলকাতা সহর বিষম ঠাঁই। তাই তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে বাবাজীকে পাঠালেন সিকদারপাড়া ষ্ট্রীটে। কি দেখলেন তিনি ? বারবনিতার সরস কৌতুক, বেসামাল মাতালের উষ্মা, চৌকিদারের বিড়ম্বনা, অর্থপিশাচ সার্জেণ্টের বজ্জাতি, মদবাহী মুটিয়াদের আক্ষেপ, খেমটাওয়ালীদের রুচি-বিকার ইত্যাদি মিলে যেন একটা রুদ্ধশ্বাস আবহাওয়া।

তারপর পথ থেকে ঘর, সিকদার পাড়া ষ্ট্রীট থেকে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার আসর। কয়েকজন বাবুর সমাবেশে আড্ডাটি জমজমাট। চৈতন্যবাবু চেয়ারম্যান হলেন এবং বিয়ারের 'গঙ্গাজল' ছিটিয়ে আসরটাকে 'শুদ্ধ' করে তোলার ব্যবস্থা করলেন। নতুন চেয়ার-ম্যানের স্বাস্থ্য পান করা হলো। তারপর খেমটাওয়ালীদের নাচ, মুহুর্মুহু মদ্যপান। কিছু বাতচিতের পর সভায় বক্তৃতা করতে

উঠলো নবকুমার। তার মুখে শোনা গেলো—জ্ঞানের বাতির দ্বারা তাদের অন্ধকার দূর হয়েছে, তারা 'সুপারষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েছে,' পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করে না তারা। 'মেয়েদের এডুকেট কর, তাদের স্বাধীনতা দেও, জাত-ভেদ তফাৎ কর'—এই সব হচ্ছে তাদের মূলমন্ত্র। তারা সব কিছুই করে, এমন কি মদ খায়—ইন্ দি নেম্ অব ফ্রিডম্। শেষ গর্ভাঙ্কে অন্দরমহলের দৃশ্য। ঘরে মেয়েরা তাস খেলে, একে অন্যকে রসিকতার কাদা ছুঁড়ে মারে, এমন কি ভাইবোনকে নিয়ে কদর্য ঠাট্টা করতে দ্বিধা করে না। তারপর সদ্য গৃহে প্রত্যাগত মাতাল নবকুমারের বেলাল্লাপনা। কর্তা বুঝলেন সবই, কলির রাজধানী কলকাতা ছেড়ে সকলকে নিয়ে বৃন্দাবনে যাওয়ার সঙ্কল্প করলেন। নবকুমারের স্ত্রী হরকামিনীর আক্ষেপোক্তিতে নাটকের পরিসমাপ্তি হলো—'বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সাহেবদের মতন সভ্য হয়েছি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ মাংস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়?—একেই কি বলে সভ্যতা?'

কাহিনীর এই বিশ্লেষণে নববাবুদের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাই। চিরাচরিত পারিবারিক শাসন তারা মানে না; সমাজ আর ধর্ম তাদের অবজ্ঞার বিষয়; মদ আর মেয়েমানুষ তাদের বিলাস; সাম্য, স্বাধীনতা ও শিক্ষার কথা নববাবুদের মুখের বুলি। সমসাময়িক অন্যান্য সাক্ষ্য থেকেও আমরা এই রকমের একটা ধারণা পাই। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলতে দ্বিধা করেন নি—'তাহা যে অবিকল হইয়াছে ইহার প্রমাণার্থে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে প্রায়ঃ তৎসমুদায়ই আমাদিগের জানিত কোন না কোন বাবু দ্বারা আচরিত হইয়াছে।' আর প্রহসনটিতে নববাবুদের কথা ঘনিষ্ঠভাবে বর্ণিত হয়েছে বলেই তারা এর অভিনয় বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। অতএব 'একেই কি বলে সভ্যতায়' মধুসূদনের সত্যদর্শন ও সামাজিক অভিজ্ঞতায় কোন ফাঁকি নেই। আর এই বিষয়ে তাঁর

চেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ জ্ঞান আর কার ছিলো ? তিনি নিজেও ছিলেন ইয়ং বেঙ্গলেরই একজন। আপন মন ও মননে, সংবেদনশীল চেতনায়, সমগ্র সত্তার অচ্ছোদ আধারে একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ ছিলো বলেই মধুসূদনের চিত্রদর্শন অন্তরঙ্গ ও নিষ্ঠাসম্পন্ন। একজন ব্যক্তি বা একটা সমাজকে দু'ভাবে চেনা যায়—হয় দূরে দাঁড়িয়ে, নয় কাছে গিয়ে। মধুসূদন শুধু কাছে গিয়ে ইয়ং বেঙ্গলকে দেখেন নি, সমগ্র জীবন দিয়ে তার সঙ্গে পরিচয় করেছেন। তাই তাঁর সামাজিক অভিজ্ঞতা অল্প মূল্যে কেনা নয়, স্পর্শকাতর ইন্দ্রিয় আর সজীব চৈতন্যের বেদীতে তার প্রাণায়ন। হয়তো মাঝে মাঝে নাট্যকারের বক্তব্য নিষ্ঠুর সত্যভাষণ হয়ে উঠেছে, তবু তা মিথ্যার বেসাতির চেয়ে সমাদরণীয়। এখানে মধুসূদন আর যা-ই করুন, সত্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি এবং সে অর্থেই তাঁর সত্য-দর্শন আত্মসমীক্ষারই নামান্তর মাত্র।

'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' অন্য প্রহসনটির মতো মধু-সূদনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত নয়। নবকুমারে নাট্যকারের আত্মক্ষেপ (self-projection) ঘটেছে, সন্দেহ নেই ; কিন্তু 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে তিনি একটু দূরে দাঁড়িয়ে সামাজিক সত্যের মুখদর্শন করেছেন। তবে সে ব্যবধান ঐতিহাসিকের দূরত্ব নয়, নিরাসক্ত দ্রষ্টার দূরত্ব। এবং সেই দূরস্থিত সাধনায় সামাজিক জ্ঞানের ছাড়পত্র নিয়েই সত্যের আনাগোনা ঘটেছে। তরঙ্গের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে নয়, তীরে দাঁড়িয়েই তিনি সমুদ্রের সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।

ভক্তপ্রসাদ জমিদার, কিন্তু অর্থপিশাচ। প্রজা হানিফের ফসল হোক বা না হোক তাতে তার কিছু যায় আসে না। কোম্পানীর নামে সে গরীব মানুষকে শোষণ করে বেড়ায়, অথচ মেয়েমানুষের জন্য অর্থ ব্যয়ে তার কোন কার্পণ্য নেই। পরস্ত্রী পঞ্চীর রূপ দেখে সে আবেশে ভারতচন্দ্রের কবিতা আবৃত্তি করে। বাইরে ভক্ত-প্রসাদ পরম বৈষ্ণব, আহারে বিহারে বেশ বাছ-বিচার ; কিন্তু

গোপনে যবনী-সংসর্গে তার কিছুমাত্র অরুচি নেই। কারণ—'হাঁ, স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি?' তাই ভক্তপ্রসাদ কুটনী পাঠিয়ে হানিফের স্ত্রী ফতিমাকে হাত করতে চায়। স্বামীর অনুমতি নিয়ে ফতিমা পুকুরের ধারে ভাঙা শিবমন্দিরে যায়, কিন্তু বাচস্পতি (আর একজন নিষ্পেষিত ব্যক্তি) আর হানিফ আড়ালে লুকিয়ে থাকে। এদিকে ভক্তপ্রসাদের সময় আর কাটতে চায় না, সারাদিনটাই তার কাছে অনর্থক দীর্ঘ বলে মনে হয়। তারপর সন্ধ্যা হতে না হতেই যুবকের মতো সাজসজ্জা করে অভিসারে রওনা হয়ে যায়। শেষ দৃশ্যে হানিফের কাছে হাতে নাতে ধরা পড়ে ভক্তপ্রসাদের মনঃপীড়া আর অর্থনাশের অন্ত রইলো না। তাই তার শেষ প্রার্থনা—'এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে, এমন দুর্মতি যেন আমার আর কখনো না ঘটে।'

রামগতি ন্যায়রত্ন বলেছেন, এই কাহিনী-বিন্যাসে সত্যের অপলাপ হয়েছে। কিন্তু আমরা ভিন্নমত পোষণ করি। কারণ বাঙলাদেশের সমাজের আনাচে কানাচে ভক্তপ্রসাদের উত্তরপুরুষরা আজও বিরাজিত, 'বামুনের মেয়ের' চাটুজ্জে মশায় তার প্রমাণ। 'একেই কি বলে সভ্যতায়' সমাজের এক সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রূপের শাণিত অস্ত্রচালনার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় এই দ্বিতীয় প্রহসনখানি রচিত—এ-মতও অশ্রদ্ধেয়। মধুসূদনের আর যাই না থাক পৌরুষের অভাব ছিলো না, আর তাই কুপিত ইয়ং বেঙ্গলকে খুশি করবার অগভীর মনোভাবে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁর' জন্ম হতে পারে না। মধুসূদনের জীবনে ভ্রান্তির অভাব ছিলো না, কিন্তু সাহিত্যের আসরে তিনি অভ্রান্ত। তাঁর প্রহসনেও একটা সৃষ্টিক্ষম আত্মবিশ্বাস ও নিগূঢ় শিল্পনিষ্ঠা বিবেকবান সামাজিক চেতনার পটে প্রকাশ-তৎপর হয়ে উঠেছে।

সুতরাং মধুসূদনের প্রহসন দুটিতে সত্যদর্শী সামাজিকের দায়িত্ব স্বীকৃত। নাট্যকারের সামাজিক অভিজ্ঞতা কখনও ব্যক্তিগত প্রক্ষেপের অন্তরঙ্গতায়, কখনও বা নিরাসক্ত দৃষ্টির দূরত্বে তাৎপর্যবহ।

কিন্তু, আগেই বলেছি, সাহিত্যিকের কর্তব্য এইখানেই শেষ হতে পারে না। সামাজিক অভিজ্ঞতার বস্তুপুঞ্জভারের ওপর মধুসূদনের মনের প্রয়োগ কোথায় ও কতখানি এবং অন্তরাবেগের কাছেই বা তার আবেদন কতটুকু, তারই ওপর তাঁর রচনা দুটির সার্থকতা নির্ভর করছে।

বিশেষ ঘটনা বা কাহিনীর ওপর সাহিত্যিক মনের প্রয়োগে নির্বিশেষ সত্য নিষ্কাশিত হয়। এককালীন সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসে চিরকালীন সমস্যা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আধুনিক সমস্যা বলে কোন পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের। রত্নাকরের গল্পটার মধ্যেই তার প্রমাণ পাই। রত্নাকর গোড়ায় ছিলেন দস্যু, তারপর দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ হরণবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন তখনি সুন্দরের আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল।' এই যে বিশেষ সত্য থেকে নির্বিশেষ সত্যের প্রকাশ, তার যাদু ছড়িয়ে ছিলো বাল্মীকির মনের রসায়নে। মোলিয়েরের ব্যঙ্গনাটকেও চতুর্দশ লুইয়ের কালের বিশেষ বিশেষ ঘটনা আছে—কিন্তু আজকের দিনে সেই ঘটনাগুলির বিশেষ তাৎপর্য না থাকলেও কতগুলি নির্বিশেষ ব্যঞ্জনা-সত্যের জন্যই তা আজও মূল্যবান। সাধুতার খোলসে ভণ্ডতা, প্রেমের বৃত্তে আত্মপরতা, বীরত্বের মণ্ডলে বীর্যহীনতা কিংবা বিদ্যার গর্ভে মূর্খতার লজ্জাকর অসঙ্গতিই তো* মোলিয়েরের নাটকগুলির চিরকালের অন্তরবার্তা। অথচ সমসাময়িক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অভিজ্ঞতার মধ্যেই তাদের জন্ম। এ থেকেই সিদ্ধান্ত করতে হয়, বিবেকবান সামাজিকের অভিজ্ঞতাকে আপন মনের প্রয়োগে সহৃদয় সাহিত্যিকসুলভ সামাজিক প্রতীতিতে পরিণত করতে পেরেছিলেন বলেই তার রসগত পরিণতিতে এমন নির্বিশেষ সত্যের দ্যোতনা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে।

মধুসূদনের প্রহসন দুটির বিশেষ সমস্যার বিশ্লেষণ আমরা

* দ্রষ্টব্য: ফরাসী সাহিত্যের বর্ণ-পরিচয়—প্রমথ চৌধুরী।

করেছি। কিন্তু সেই বিশেষ বিশেষ সমস্যার মধ্যে ছড়িয়ে আছে কোন্ কোন্ নির্বিশেষ ব্যঞ্জনা তা-ই এবার বিচার করে দেখত হবে নিজে ইয়ং বেঙ্গলের একজন হয়েও তিনি নবকুমারকে আঘাত করতে ছাড়েন নি ; কারণ তাঁর মন নিশাচর ছিলো না, কাপট্য তাঁর ধাতে সইতো না। যেখানে সত্যের মুখোশ পরে মিথ্যার রাজত্ব, সাধুতাকে ফাঁকি দিয়ে ব্যভিচারের দাপট—সেখানে মধুসূদনের সাহিত্যিক মন নির্ভীক। তাঁর শিল্পী-মানসের এই নির্বিশেষ সত্য-সন্ধিৎসাই 'একেই কি বলে সভ্যতায়' মুখর হয়ে উঠেছে। অথচ ব্যক্তিগত আক্রোশের প্রশ্ন ছিলো না : নবকুমারের জন্যই নবকুমারকে তিনি আক্রমণ করেন নি। আর সংসারে নবকুমারেরা যুগে যুগেই দেখা দেয়—হয়তো ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে, তবু তারা চিরকালই আছে। এইভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে মধুসূদনের মনের ধাঁচটি ধরতে পারি। দ্বিতীয়তঃ অত্যন্ত সংযত হলেও সহানুভূতি নাট্যকারের বিদ্রূপাত্মক মনোভাবের সহগ। হুল ফোটাতে গিয়েও তিনি শেষ পর্যন্ত ঠিক নির্মম হতে পারেন নি। মাতাল নবকুমার বাড়িতে এসে হাঙ্গামা বাধিয়ে তুলেছে, কর্তার কানে পৌছোলে অনর্থ ঘটাতে পারে মনে করে সবাই সন্ত্রস্ত। কিন্তু কর্তার প্রতিক্রিয়া দেখুন—

'কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করবো। এ লক্ষ্মীছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই। চল, আমরা যাই, এ বানরটা একটু ঘুমুক।'

এখানে কার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো ? ধর্মনিষ্ঠ সাধুচরিত্র গোঁড়া হিন্দু কর্তা মশায়ের ? না, মমতাশীল কবিকণ্ঠই এখানে ধ্বনিত। 'লক্ষ্মীছাড়া', ও 'বানর' শব্দ দুটির সংস্থান মমতাসূচক। এখানে লেখকের বক্তব্য হচ্ছে ঃ নবকুমারের স্বভাবের জন্যই তাকে বিদ্রূপ করতে চেয়েছি। তার ওপর আমার কোন অহেতুক বিদ্বেষ নেই। নবকুমার শান্তি পাক, স্বস্তি পাক, নবকুমার ঘুমুক—এই তো আমার মনের একমাত্র অভিলাষ।

'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁতে' নাট্যকার অন্যপথ নিয়েছেন। সেখানে তাঁর সহানুভূতি তাঁকে নিয়ে গেছে আরেকটু এগিয়ে। ভক্তপ্রসাদের পরিবর্তনে তিনি শুধু poetic justice-ই দেখান নি, একটা সরস কৌতুক ও রঙ্গরসের মধ্যে সমস্ত কটু-কষায় স্বাদ মিলিয়ে দিয়ে নিজের সহৃদয় চিত্তবৃত্তির প্রমাণ দিয়েছেন। এই ক্ষমাসুন্দর মনোভাবই প্রহসনটির একবারে শেষে একটি কৌতুককর ছড়ার শীতল পাটি বিছিয়ে দিয়ে ভক্তপ্রসাদের মর্মজ্বালাকে সহনীয় করে তুলেছে—অন্যথায় দুশো টাকা খেসারত দিয়েই লম্পটপ্রবর নিস্তার পেতেন না, পেটে পিঠে উত্তম মধ্যমও পেতেন।

সুতরাং আমার সিদ্ধান্ত, মধুসূদনের প্রহসন দুটি শুধু বিবেকবান সামাজিকের বস্তুবোধের দিক থেকে লক্ষণীয় নয়, সহৃদয় সাহিত্যিকের সামাজিক প্রতীতির দিক থেকেও মোটামুটি বিশ্লেষণীয়। সামাজিক অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যিক প্রতীতিতে পরিণত করতে পেরেছিলেন বলেই কর্তামশায় ('একেই কি বলে সভ্যতা?') ও বাচস্পতি ('বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ') একই রক্ষণশীল আদর্শের ধারক হয়েও একে অন্যের চেয়ে মহত্তর হয়ে উঠেছে, একই ছাঁচে ঢালাই হয়ে, ব্যক্তিচরিত্র হারিয়ে একটা বিশেষ শ্রেণীর প্রতীক হয়ে ওঠেনি। মধুসূদনের সাহিত্যিক মনের রসায়নেই প্রহসন দুটি শ্রেণীগত মানুষের কাহিনীতে নয়, 'ব্যক্তিগত মানুষ আর মানুষগত শ্রেণীর' ইতিকথায় পরিণত হয়েছে। সত্যের কাছে হিন্দু-মুসলমান কোন ভেদাভেদ থাকতে পারে না; মধুসূদনের সাহিত্যের সত্যেও ভণ্ড হিন্দুর ক্ষমা নেই, অথচ সৎ মুসলমানের সমাদর আছে। শুধু সামাজিক অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে অগ্রসর হলে মধুসূদন কখনও এমন অপক্ষপাত মানবতার পূজারী হতে পারতেন কি?

তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে। প্রহসন বলেই রচনা দুটির উদ্দেশ্যমূলকতা অত্যন্ত স্পষ্ট। আর উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্যে বিবেকবান সামাজিকের অভিজ্ঞতা স্বভাবতঃই তেমন শুদ্ধি

লাভ করতে পারে না ; কারণ প্রহসনকারের সামাজিক অভিজ্ঞতা তাঁর মনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে শুদ্ধি লাভ করলে তার উদ্দেশ্যমূলকতা নষ্ট হয়ে যায়। তা অভিপ্রেত আলোড়ন বা আঘাত সৃষ্টি করতেও পারে না। ফলে প্রহসন মাত্রই তার লক্ষ্য অব্যর্থ রাখতে গিয়ে একটা নীচু স্তরের সাহিত্যিক সৃষ্টিতে পরিণত হয় এবং তার স্থূলতাও অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে। এই কারণেই মধুসূদনের প্রহসনে উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যিক সৃষ্টির মতো সামাজিক অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণ রস-পরিণতি বা সাহিত্যিকের সামাজিক প্রতীতির (যার বিষয়ে প্রবন্ধের আরম্ভে আলোচনা করা হয়েছে) রসোজ্জ্বল অখণ্ড প্রকাশ আশা করা উচিত নয়।

উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যের প্রথম দিকের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে সামাজিক নক্সা। 'সমাচার-দর্পণে' প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যান', 'বৃদ্ধের বিবাহ' ইত্যাদি থেকে শুরু করে 'নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস', 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা', 'কুলীন কুলসর্বস্ব' প্রভৃতি এই জাতীয় রচনার নিদর্শন। মধুসূদনের প্রহসন দুটিকেও সামাজিক নক্সা বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ তখন সামাজিক পরিবেশে বিচিত্র আদর্শের যে আলোড়ন চলছিলো তারই অভিব্যক্তি হিসেবে এগুলির মূল্য অনেক, বাঙলা দেশের সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ ছড়িয়ে আছে রচনাগুলির মধ্যে। তবে শিল্পকর্ম ও সাহিত্য রূপে 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁর' সার্থকতা অন্যান্য সামাজিক নক্সাগুলির চেয়ে বেশি। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের রসাস্বাদ নিয়ে লিখেছেন বলেই প্রহসন দুটির রচনায় মধুসূদন সিদ্ধকাম। এবং অব্যর্থলক্ষ্যও বটে।

মধুসূদন জানতেন, জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার আগে জাতির নাট্যরুচি ঠিক গড়ে উঠবে না এবং সেই যথার্থ নাট্যরুচি গড়ে তোলার জন্য চাই ক্ল্যাসিকাল নাটকের সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয়। দর্শকসমাজের রসবোধ সুনিয়ন্ত্রিত না হওয়া পর্যন্ত প্রহসন রচনা

করা উচিত নয় বলেও তিনি মনে করতেন। তবু যে প্রহসন লিখতে বসলেন তার কারণ বোধ হয় 'কুলীন কুলসর্বস্বের' মতো সমাজচিত্রের জনপ্রিয়তা এবং এই জাতীয় রচনায় দর্শক ও পাঠক-সাধারণের আগ্রহ। কিন্তু লিখতে গিয়ে মধুসূদনের শিল্পী-সত্তা ও রসবোধ অতন্দ্র প্রহরীর মতো সদাসতর্ক ছিলো, দর্শকদের মনোরঞ্জনের বাসনা তাঁর সাধনাকে বিচলিত করতে পারেনি।

প্রথমতঃ ধরা যাক প্রহসন দুটির পরিসরের কথা। বিষয়ের সঙ্গে যেখানে অনুকূল বা প্রতিকূল সামাজিক আবেগ জড়িত, সেখানে ভাবালুতার সূত্রে অতিরঞ্জনের সম্ভাবনা প্রচুর। শুধু তা-ই নয়, অতিরঞ্জনের সাহায্যে একটা বাদ-প্রতিবাদ-স্পৃহা জাগিয়ে তোলা যায় বলেই সেদিকে প্রহসনের প্রবণতা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু মধুসূদন প্রহসন দুটির যে নিটোল ও দৃঢ়পিনদ্ধ রূপ দিয়েছেন, তাতে অতিকথনের কোন স্থান হতে পারে না। 'একেই কি বলে সভ্যতায়' মোট দুটি অঙ্ক ও দুটি অঙ্কে চারটি দৃশ্য আছে। প্রতিটি দৃশ্যই নাট্যকাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য ও রঙে রেখায় উজ্জ্বল। আর চরিত্র-চিত্রণের দিক থেকেও প্রতিটি সংলাপ সুপ্রযুক্ত, বক্তাদের বিশিষ্ট মনোভাবের দ্যোতক ও অন্তঃসত্তার স্পন্দনে জীবন্ত। বস্তুতঃ 'কুলীন কুলসর্বস্বে' রামনারায়ণের সংলাপ রচনায় যে কৃতিত্ব, নাট্যোপযোগী সহজ ভাষা সৃষ্টিতে যে পারদর্শিতা দেখা গেছে, মধুসূদনের প্রহসনে তার আরও মার্জিত সুন্দর রূপ দেখতে পাই। মেঘনাদবধকাব্যের স্রষ্টার হাতে যে এমন সহজ, স্বাভাবিক অথচ জীবন্ত ভাষা ফুটেছে, একথা বিশ্বাস করতে মন চায় না। এক কথায়, ঘটনার পরিবেশন, চরিত্র বর্ণনা, কৌতুকরস সৃষ্টি, সংলাপ রচনা ইত্যাদি সব মিলিয়ে প্রহসন দুটি সুন্দর।

তবে তুলনামূলক বিচারে 'একই কি বলে সভ্যতার' চেয়ে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' অধিকতর প্রশংসনীয়। কারণ নাট্য-সজ্ঘাতময় কাহিনী রচনায়, চরিত্র রূপায়ণে ও ব্যঙ্গকৌতুক সৃজনে মধুসূদনের মুন্সিয়ানা 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁতে' যতখানি

প্রকাশিত, অন্য প্রহসনটিতে ততখানি নয়। নবকুমারকে ঘরে দেখেছি, জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় দেখেছি, মত্ত অবস্থায় শয়নমন্দিরেও দেখেছি—কিন্তু তার চরিত্রের কোন পরিবর্তন নেই, পরিবর্তন হওয়ার মতো কোন নাটকীয় পরিস্থিতি নেই, নাটকীয় পরিস্থিতি জমিয়ে তোলার উপযুক্ত ঘটনাগত বা ভাবগত দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত নেই প্রতিটি খণ্ড দৃশ্য সরস ও কৌতুকাবহ, চিত্রধর্মী ও উদ্দেশ্যমূলক হলেও ঘটনাগত জটিলতা ও ভাবগত আরোহণ-অবরোহণের অভাব আছে এই অঙ্কে-দৃশ্যে বিভক্ত কাহিনীর সরল রূপায়ণ ততটা নাট্যরসাশ্রিত হয়ে উঠতে পারেনি। তার চেয়ে বরং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র কাহিনী অপেক্ষাকৃত জটিল; নায়কের মনের ভাব আরোহণ-অবরোহণের দোলায় আন্দোলিত; ঘটনাগত সংঘর্ষ, অনিশ্চয়তা, উত্তেজনা ও চমৎকারিত্ব (dramatic excellence) এখানে একটু বেশি। প্রথম গর্ভাঙ্কে গদাধর, হানিফ, বাচস্পতি, ভগী ও পঞ্চীর সান্নিধ্যে ভক্তপ্রসাদের জীবন ও মনের চেহারা পরিস্ফুট, ফতিমা-সংক্রান্ত ঘটনার বীজও দৃশ্যটিতে উপ্ত। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ফতিমা ও পুঁটির কথোপকথন থেকে ভক্তপ্রসাদের লোলুপ জিহ্বার সম্প্রসারণের কথা জানতে পারি, কিন্তু বাচস্পতি ও হানিফের শলাপরামর্শ আমাদের অগোচরে থেকে যায়। ফলে রাত্রিতে যে 'তামাশা' হতে চলেছে তার সম্পর্কে একটা কৌতূহল না জেগে পারে না। তারপর ভক্তপ্রসাদের আকুল প্রতীক্ষায় তার লালসার তীব্রতার প্রকাশ। রাত্রিতে ভাঙা শিবের মন্দিরে বাচস্পতি ও হানিফের আত্মগোপনের পরে ফতিমার কাছে ভক্তপ্রসাদের অসৎ আচরণের সঙ্গে সঙ্গে বাচস্পতি ও হানিফের আত্মপ্রকাশ ও ভক্তপ্রসাদের কাছ থেকে জরিমানা আদায়—সমস্ত পরিস্থিতি দেখে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি হয় ও কৌতুকরসের আস্বাদন ঘটে। সুতরাং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ-র' কৌতুক-হাস্য কাহিনীর নাট্যধর্মিতা থেকে উৎসারিত। এবং সে কারণেই অধিকতর রসিকজনপ্রিয়।

মোলিয়েরের 'Le Tartuffe' (the Hypocrite) নাটকের কাহিনীর সঙ্গে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ-র' কাহিনীর মিল আছে। এই মিল হয়তো নিতান্তই আকস্মিক; কারণ প্রহসনটি রচনার সময় মধুসূদন ফরাসী ভাষা জানতেন কিনা সন্দেহ এবং তখন পর্যন্ত ইংরেজী অনুবাদ ভারতবর্ষে এসে না-ও পৌঁছোতে পারে। তবে তৌলন বিচারে দেখা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে মোলিয়েরের চেয়ে মধুসূদনের শিল্পদক্ষতা অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট। বিশেষভাবে উভয় নাটকের উপসংহারের দিকে দৃষ্টি দিলে তা-ই মনে হয়। মোলিয়েরের কাহিনী বাঙলা প্রহসনটির চেয়ে বেশি পরিসর পাওয়ায় ঘটনাগত দ্বন্দ্ব ও জটিলতা, নাট্যধর্ম ও রসস্ফূর্তির দিক থেকে সমৃদ্ধতর, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার্তুফের চতুরালিতে ভুলে যে অর্গ 'makes him the sole confident of all his secrets, and the sage adviser of all his actions', সেই অর্গকেই যখন তার্তুফ আদায়-করে-নেওয়া একটা দলিলের জোরে শুধু ভিটে-মাটি ছাড়াই করতে চায় না, রাজকীয় অপরাধীর গোপন দলিলপত্র রাখার অভিযোগে তাকে জেলে পাঠাতেও অগ্রসর হয়, তখন তার্তুফের ভণ্ডামি একটা চরম নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। কিন্তু পুলিশ অফিসার অর্গকে গ্রেপ্তার করতে এসে যখন তার্তুফকেই গ্রেপ্তার করে বসে তখন আমাদের মন খুব খুশি হয় বটে, কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার কার্যকারণ সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করতে চায় না। রাজা চতুর্দশ লুইয়ের সর্বব্যাপী দৃষ্টির মহিমা কীর্তনেও সেই বিশ্বাসের প্রতিশ্রুতি নেই—

'We live under a king who is an enemy to fraud, a king whose eyes look into the depths of all hearts and who cannot be deceived by the most artful imposter. Gifted with a fine discernment, his lofty soul at all times sees things in the right light .. From the first his quick perception pierced through all the

vileness coiled round that man's heart, who coming to accuse you, betrayed himself ...'

—*Translated by A. R. Waller.*

পুলিশ অফিসারের দীর্ঘ বক্তৃতা থেকে জানা যায়, রাজার কাছে অর্গে'র বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে গিয়েই নিজেকে উদ্ঘাটিত করে ফেলেছে তার্তুফ। মানুষকে চেনার এই গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকলে রাজ্যশাসনের সুরাহা হয় বটে, কিন্তু তাতে নাটকের দাবি মেটে না। আসল কথা, নাটকের কাহিনীকে মোলিয়ের এমনভাবে সাজাতে পারেন নি, যাতে তার্তুফের শাস্তি ঘটনাবর্তের অপরিহার্য পরিণতি হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ভক্তপ্রসাদের বিড়ম্বনা ও শাস্তি পূর্ব-পরিকল্পিত এবং ঘটনাধারার মধ্য থেকে উদ্ভূত। দেখুন—

'ভক্ত। (চিন্তিতভাবে) অ্যাঁ—মন্দিরের মধ্যে ?—হাঁ ; তা ভগ্ন শিবের তো শিবত্ব নাই, তার ব্যবস্থাও নিয়েছি। বিশেষ এমন স্বর্গের অপ্সরীর জন্যে হিন্দুয়ানি ত্যাগ করাই বা কোন্ ছার ?

নেপথ্যে গম্ভীর স্বরে। বটে রে পাষণ্ড নরাধম দুরাচার ? (সকলের ভয়)।

ভক্ত। (সত্রাসে চতুর্দিকে দেখিয়া) অ্যাঁ—আ—আ—আ আমি না ! ও বাবা ! একি ! কোথা যাব ?

* * *

বাচ। কত্তাবাবু, আমি এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেম, মানুষের গোঁগানির শব্দ শুনে এলেম। তা বলুন দেখি, ব্যাপার কি ? আপনিই বা এ সময়ে এখানে কেন ? আর এরাই বা কেন এসেছে ? এ-ত দেখছি হানিফ গাজির মাগ।

ভক্ত। (স্বগত) এক দিকে বাঁচলেম, এখন আর এক দিকে যে বিষম বিভ্রাট ! করি কি ? (প্রকাশে বিনীতভাবে) ভাই, তুমি তো সকলি বুঝেছ, তা আর লজ্জা দিও না। আমি যেমন কর্ম করেছিলাম, তার উপযুক্ত ফলও পেয়েছি।...'

অর্থাৎ বাচস্পতি ও হানিফের বুদ্ধির খেলায় ভক্তপ্রসাদের

ভণ্ডামির অবসান ঘটলো এবং দর্শকসাধারণ সেকথা জানতো বলেই বৈষ্ণবপ্রবরকে নাজেহাল হতে দেখে তাদের কৌতুকের অন্ত থাকে না। এই কারণেই মধুসূদনের শিল্পদক্ষতা মোলিয়েরের চেয়ে কম নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

আর একটি কথা। প্রহসন দুটির মধ্যে অশ্লীলতা আছে কি? আমার মনে হয়, পঞ্চীকে দেখে ভক্তপ্রসাদের চিত্তবিকার ('বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ') এবং প্রসন্নময়ী ও হরকামিনীর ('একেই কি বলে সভ্যতা?') ভাইদের নিয়ে রসিকতার ভাষা ঠিক সুরুচিসম্মত নয় বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, কিন্তু বিরংসাপ্রবণ অশিক্ষিত গ্রাম্য জোতদারের কিংবা কলকাতার বাবুদের কুল-ললনাদের মুখে এমনিতর রসিকতা ঠিক বেমানান নয়। 'হুতোম'-প্রসঙ্গে আগে বলেছি, অশ্লীলতার কোন সর্বজনীন মানদণ্ড নেই; একজনের মুখে যা বেমানান, অন্যজনের মুখে তা-ই মানানসই হতে পারে, শ্লীল-অশ্লীলের বিচার হওয়া উচিত স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী। সেদিক থেকে প্রহসন দুটির বিরুদ্ধে কোন ক্ষেত্রেই অভিযোগ তোলা চলে না। পঞ্চীর প্রতি ভক্তপ্রসাদের লোলুপ দৃষ্টিপাত ও অর্গ-এর স্ত্রীর প্রতি তার্তুফের দৃষ্টিপাত প্রায় একই ভাষায় বর্ণিত। অথচ মোলিয়েরের নাটকটিকে কেউ কি অশ্লীল বলেন? আমার তো মনে হয়, প্রহসন দুটির সমস্ত আবহাওয়ার পক্ষে তাদের ভাষা খুবই সঙ্গত, 'শর্মিষ্ঠা' বা 'কৃষ্ণকুমারীর' ভাষায় যে প্রহসন দুটি লেখা হয়নি, তাতে মধুসূদনের প্রশংসা করতে হয়।

॥ ৪ ॥

'শর্মিষ্ঠা' মধুসূদনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক। এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিচারে তখন পর্যন্ত প্রকাশিত নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক মূল্যায়নেও এই সিদ্ধান্তের কোন

রদবদল হয়নি। তাছাড়া সমকালীন রসরুচির সাক্ষ্য নাটক বিচারের সময় স্মরণীয়। শতাব্দীর সেই বিশেষ পর্বে আর যে সব নাটক রচিত হয়, তাদের আর যে গুণই না থাক, অন্ততঃ জনগণের চলমান জীবনপ্রবাহের সঙ্গে তাদের যোগ ছিলো এবং বাস্তব পরিবেশের প্রতিফলনের জন্য নাটকগুলির মর্মস্পর্শিতা ছিলো অবিসম্বাদিত। কিন্তু 'শর্মিষ্ঠার' বিষয়বস্তু পৌরাণিক এবং সমসাময়িক জীবন-রস-রসিকতার সূত্রে গ্রথিত নয়। তৎসত্ত্বেও রাজেন্দ্রলাল কেন 'শর্মিষ্ঠার' শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ, তা বুঝে দেখতে হবে।

নাটক জীবনসম্পর্কিত। আর যে জীবন তার উপজীব্য, তার সঙ্গে সমকালীন ঘটমান জীবনের সাযুজ্য থাকলে তার সামাজিক আকর্ষণ ও তাৎপর্য বাড়ে। কিন্তু এই জীবনাশ্রিত বাস্তবতাই নাটকের একমাত্র গুণ নয়। বিষয় যা-ই হোক, তার পরিবেশনায় যে পঞ্চসন্ধি থাকে, তুই বিরোধী শক্তির সংস্থাপন ও পারস্পরিক দ্বন্দ্বজনিত ক্রিয়াকলাপ ক্লাইম্যাক্সের মধ্য দিয়ে যখন গ্রন্থিমোচন ও উপসংহারে পৌঁছোয়—তখন সামগ্রিক ফলশ্রুতি হিসেবে একটা গতিক্রিয়া (action) দেখা দেয়। এবং সেই গতিক্রিয়ার দ্রুতি ও দীপ্তিকেই তো বলে নাট্যগুণ। সেক্সপীরীয় নাটকে এই নাট্যগুণের অভাব নেই। মধুসূদনের নাটকের মধ্যে সদ্বোক্ত নাট্যরীতি ও নাট্যগুণের অঙ্গীকার আছে, আছে যাত্রা ও সংস্কৃত নাটকের অজানা নতুন রসরুচির প্রতিশ্রুতি। দ্বিতীয় কথা, পুরনো কাহিনীর পুনর্বিন্যাস ও স্থানবিশেষে পাত্রপাত্রীদের চরিত্র পরিবর্তন করেও তিনি নাটকের ক্ষেত্রে যুগদৃষ্টির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 'শর্মিষ্ঠায়' এই সব নতুন দিকই সুন্দরভাবে সমুদ্ভাসিত, একথা বলতে চাইনে। কিন্তু তার জন্য চেষ্টা আছে, সন্দেহ কি ?

সংস্কৃত নাটকের নান্দী ও প্রস্তাবনা 'শর্মিষ্ঠায়' নেই, কাহিনী অঙ্কে ও গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই নূতনত্ব বহিরঙ্গীয় এবং এতে মধুসূদনের গৌরবেরও কিছু নেই। তাঁর পূর্ববর্তীদের

কোন কোন নাটকেই তো বর্জিত হয়েছে দিশি নাটকের বর্জনীয় অংশগুলি। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ নিশ্চয়ই প্রস্তাবনা অংশ দেখতে না পেয়েই বিরূপ মন্তব্য ('আমরা ফতে হয়ে গেলে তোমার বই খুব চলবে') করেন নি, তাঁর বিমুখতার আরও অনেক কারণ ছিলো। আর রামনারায়ণকে ব্যাকরণগত অশুদ্ধি সংশোধনের অতিরিক্ত যে কিছু করতে মধুসূদন দেন নি, তার কারণ নিজের নাট্যদৃষ্টি সম্বন্ধে মধুসূদন ছিলেন সচেতন। তাই, তাঁর নিজের ভাষায়, 'Ram Narayon's "version" as you justly call it, disppoints me'। আসল কথা, 'শর্মিষ্ঠায়' মহাভারতের কাহিনী বিন্যাসেই মধুসূদনের মৌলিকতা। মহাভারতে যযাতির জীবনে দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার আবির্ভাবের পেছনে কোন পূর্বরাগের সূত্র নেই, তারা রাজার প্রেমের উপযাচিকা মাত্র। যেখানে প্রেমে একপক্ষ মাত্র সক্রিয়, সেখানে আধুনিক দৃষ্টিতে প্রেম অশ্রদ্ধেয়। তাই মধুসূদনের নাটকে কূপ থেকে উদ্ধারের পর শুধু দেবযানীই প্রণয়াসক্ত হননি, যযাতিও হয়েছেন তার প্রেমমুগ্ধ। অন্যদিকে মহাভারতের শর্মিষ্ঠা যযাতির দেহলুব্ধা, তার তথাকথিত প্রেম নিজের দেহে যযাতির সন্তান ধারণের আকাঙ্ক্ষার নামান্তর। এই নারীর প্রগল্‌ভ প্রত্যাশাকে নাট্যকার পূর্বরাগে রূপান্তরিত করে শুধু উন্নত রুচির পরিচয় দেননি, প্রেমের চিরন্তন ত্রিভূজ রচনা করে নাটকীয়তার উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করেছেন। অবশ্য সেই ক্ষেত্র শেষ পর্যন্ত অকর্ষিতই থেকে গেছে। এক পুরুষের জীবনবৃত্তে দুই নারীর আবির্ভাবে নাটকোচিত দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টির যে অবকাশ ছিলো, নাট্যকার তা উপযুক্তভাবে কাজে লাগাতে পারেন নি, সেই সুযোগের অপচয় ঘটেছে। দ্বিতীয়তঃ মহাভারতীয় দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার মধ্যে শর্মিষ্ঠাকে মধুসূদনের নায়িকাপদে বরণ দুঃসাহসিক। কারণ যেভাবেই হোক দেবযানী যযাতির বিবাহিতা পত্নীর মর্যাদায় অভিষিক্ত ও পাটরাণী রূপে স্বীকৃত। অন্যদিকে শর্মিষ্ঠা—ঈর্ষান্বিতা ও কলহপরায়ণা শর্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসী মাত্র এবং সকল রকমের

সমাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিতা। কিন্তু মধুসূদনের নব্যরুচি এই বঞ্চিতা শর্মিষ্ঠার মধ্যেই দেখতে পেয়েছে সত্যিকারের নাটকীয় নায়িকাকে। যে নারী প্রণয়াসক্তা ও বিবাহিতা হয়েও স্ত্রীর মর্যাদা পায়নি, গর্ভে একাধিক সন্তান ধারণ করা সত্ত্বেও সেই সন্তানদের পিতৃপরিচয় দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিতা তার দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠাই তো আধুনিক যুগের সমাজমন্ত্র। শুধু তাই নয়, শর্মিষ্ঠার বিড়ম্বিত ও দুঃখবেদনামথিত জীবনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠাকামিতার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বৈপরীত্য মধুসূদনের কাছে যথার্থ নাট্যরসাশ্রিত বলে মনে হয়েছে। আমার মনে হয়, যে কারণে রাম বা লক্ষ্মণ নয়, রাবণ বা ইন্দ্রজিৎই তাঁর কাছে প্রিয়, সে কারণেই দেবযানীর চেয়ে শর্মিষ্ঠাই তাঁর কাছে মনোহারিণী। 'কাদম্বরীর' আখ্যান নিয়ে কাব্য বা নাটক রচনা করলে মধুসূদন বোধ হয় পত্রলেখাকেই নায়িকা করতেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শর্মিষ্ঠাকে নায়িকাপদে বরণ ও তার নামে নাটকের নামকরণ সেকালের রসিকের রসবোধে নতুন স্বাদের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সমাগত। তবে আয়োজন যতই অভিনব ও দুঃসাহসিক হোক না কেন, নাটকটি পড়লে কিন্তু দেবযানীকেই বেশি করে চোখে পড়ে। শর্মিষ্ঠার প্রতি সহৃদয় সহানুভূতি সত্ত্বেও দেবযানীর কার্যকলাপের প্রভাব অধিকতর, সমগ্র কাহিনী জুড়ে তার ব্যক্তিসত্তা প্রকটিত। যযাতির প্রতি তার প্রেম ও স্ত্রী হিসেবে আনুগত্য, শর্মিষ্ঠার সঙ্গে যযাতির সম্বন্ধ আবিষ্কারের পর তার কোপ, ঈর্ষা ও অভিমান, পিতার কাছে অভিযোগ ও যযাতিকে জরাগ্রস্ত করার ব্যবস্থা, পরে আত্মধিক্কার ও অনুতাপ ইত্যাদি দ্রুত পরিবর্তনশীল ও আবেগচঞ্চল নানা কর্মোদ্যোগ নাটকটির মধ্যে সঞ্চারিত করেছে একটা বেগ ও গতিক্রিয়া—প্রত্যাশিত পরিমাণ না হোক কিছু পরিমাণ তো বটেই। তার তুলনায় শর্মিষ্ঠার নির্জীবতা ও আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ ব্যক্তিত্বের অভাব আমাদের পীড়িত করে। এক কথায়, শর্মিষ্ঠাকে নায়িকা করার কল্পনা আছে এবং সেই কল্পনায় একটা নতুন দৃষ্টি ও মূল্য-

বোধের চেষ্টাও আছে, কিন্তু সেই কল্পনাকে কার্যে রূপায়িত করতে গেলে শর্মিষ্ঠায় যে চরিত্র সঞ্চার করা অপরিহার্য ছিলো তার কোন ব্যবস্থা হয়নি।

একজন সমালোচক বলেছেন, নাটকটিতে কালিদাস ও শকুন্তলার প্রভাব আছে। একথা সত্য * : কিন্তু তাতেই মধুসূদনের নব্যদৃষ্টি অস্বীকৃত হয়ে যায় না। আসল কথা হচ্ছে, নাট্যকারের সামগ্রিক নিরিখ ও মানসপ্রবণতা, তাঁর মন ও মেজাজ। আর দু'চারটি ছত্র বা পাত্রপাত্রীদের কিছু কিছু আচার-আচরণই সেই মন ও মেজাজ নিরূপণের একমাত্র মাপকাঠি নয়। তার বাইরে বা ভেতরে আরও কিছু চাই। শেষ পর্যন্ত যযাতির সঙ্গে দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা উভয়ের মিলন ও একটা শান্তির মধ্যে নাটকীয় সঙ্ঘাতের মধুর পরিসমাপ্তি আধুনিক নারীব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস ও জীবন-জিজ্ঞাসার পরিপন্থী সন্দেহ নেই, তার বদলে অন্তর্জ্বালা নিয়ে কোন একজনের ট্র্যাজিক পরিণতি অপেক্ষাকৃত স্বভাবধর্মী ও যুক্তিসঙ্গত হতো, একথাও বলা যেতে পারে। তবু মহাভারতীয় কাহিনীর যেটুকু পুনর্বিচার আছে, তাতেই—সেই পরিবর্তন-মুকুরেই মধুসূদনের মনের আধুনিক চেহারাটা মোটামুটি ধরা পড়ে।

'শর্মিষ্ঠায়' স্বগতোক্তি সংখ্যাবহুল ও প্রয়োগভঙ্গিমা সংস্কৃতানুসারী বলেও একজন সমালোচক মনে করেন—'যে সংস্কৃত আদর্শকে তিনি গ্রহণ করিতে চাহেন নাই, তাহারই প্রভাবে পরিবেশ সৃষ্টির জন্য, কোনো আঙ্গিক অভিনয়ের বাচনিক ব্যাখ্যার জন্য বা কাহিনীর কর্মহীন বর্ণনার জন্যই তাঁর নাটকে প্রায় সবগুলি স্বগতোক্তির প্রয়োগ হইয়াছে।' সত্য কথা সেক্সপীয়ারের নাটকের স্বগতোক্তি ব্যক্তির বিশেষ সময়ের অন্তঃসত্তার বহিঃপ্রকাশ, জীবনে উপলব্ধ তীব্রতপ্ত অভিজ্ঞতার কথাভাষা এবং চরিত্রবিকাশের দিক থেকে তার তাৎপর্য অনস্বীকার্য। কিন্তু 'শর্মিষ্ঠায়' স্বগতোক্তিগুলি প্রায়ই অদৃশ্যে সঙ্ঘটিত ঘটনার পরোক্ষ বিবৃতি মাত্র, কাহিনীর শূন্যপাদ

* দ্রষ্টব্য : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)—ডাঃ সুকুমার সেন।

পূরণে নিয়োজিত। একটা টেকনিক্যাল ত্রুটি দূর করতে গিয়ে মধুসূদনের আর একটা টেকনিক্যাল ত্রুটি ঘটিয়ে ফেলার অপরাধ নিশ্চয়ই অমার্জনীয়, তবে সেটাকে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব বলে বর্ণনা করা সমীচীন নয়। সমস্ত ঘটনা ও ক্রিয়াকর্ম চোখের সামনে ঘটুক, অন্তরালে বা অতীতে সঙ্ঘটিত কোন কিছুর কথা অন্যের মুখে শুনতে চাইনে—এটাই হচ্ছে দৃশ্যকাব্যের কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশা। নাট্যকাহিনী ও চরিত্রগুলির পক্ষে অত্যাবশ্যক অনেক ঘটনাই চোখে না দেখিয়ে স্বগতোক্তির মাধ্যমে শুনিয়েছেন মধুসূদন। এবং তাতে অনেক স্থলেই ঘটনাধারা দৃশ্যমান না হয়ে বিবৃতিমূলক পড়েছে। নাটকীয় ঘটনাবিন্যাসের এই বিবৃতিমূলক রীতি অনুসরণের ফলে নাটকের স্বগতোক্তি হয়ে পড়েছে সংখ্যায় বহুল এবং প্রকৃতিতে তাৎপর্যবিহীন। আর এই ধরনের স্বগতোক্তি নবনাট্যের পক্ষে টেকনিক্যাল ত্রুটি, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে সংস্কৃতের প্রভাব হিসেবে বর্ণনা করা ঠিক সুবিচার নয়।

মধুসূদনের দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ নাটক 'পদ্মাবতীর' (রচনারম্ভ: ১৮৫৯। প্রকাশকাল: ১৮৬০) বিষয়ের মধ্যে নূতনত্ব আছে; কারণ নারদ, কলি, শচী, রতি ইত্যাদি পৌরাণিক চরিত্র-চিত্রণ ও স্বর্গ-মর্ত্যের নানা স্থানের দৃশ্য-পরিকল্পনা থাকলেও মনগড়া কাহিনী নিয়েই নাটকটি রচিত। গ্রীক পুরাণের একটি পরিচিত গল্পের অনুসরণে 'পদ্মাবতীর' পরিকল্পনা, পারিসের বিচারের মতো এতেও আছে ইন্দ্রনীলের বিচার। ওখানে জুনো ভেনাস্, ডিসকরডিয়া, পারিস ও হেলেন আর এখানে শচী, রতি, নারদ, ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতী। তবে মধুসূদন গ্রীক আখ্যায়িকার যে প্রাচ্যরূপ দিয়েছেন, তাতে তার বিজাতীয়ত্ব ধরা পড়ার উপায় নেই। এ যেন এক কল্পনাঘন রোমন্টিক কাহিনী, সুন্দরী নারীদের পারস্পরিক ঈর্ষার এক মনোহর গল্প। 'শর্মিষ্ঠায়' নূতনত্ব থাকলেও তা পৌরাণিক নাটক ছাড়া আর কিছু নয়; কিন্তু 'পদ্মাবতীতে' পৌরাণিকত্ব আরোপিত হলেও আসলে তাকে কাল্পনিক নাটকই বলা যায়।

এই নাটকটির মধ্যে মধুসূদনের সৃজনী-শক্তি তু'দিক থেকে চরিতার্থতা চেয়েছে। প্রথমতঃ ঘটনাগত দ্বন্দ্বে নাটকের যে বীজ উপ্ত, 'পদ্মাবতীতে' তার সুযোগ সন্ধান করেছেন তিনি। মানস-সরোবরের বুকে প্রস্ফুটিত কনকপদ্ম মধুসূদনের চোখে শুধু সৌন্দর্যের স্বপ্ন ঘনিয়ে আনেনি, তার রূপের অন্তরালে তিনি দেখেছেন রক্তমুখী কীট। সুযোগ পেলেই সেই কীট জেগে ওঠে, বিষ ছড়ায়, অশান্তি আনে। সুন্দরী নারী এই কনকপদ্মেরই নামান্তর। নারীর মনে যে নার্সিসাসী আত্মমোহ, পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় তার সর্বনাশা রূপ ফুটে উঠেছে পুরাণের 'Apple of discord'-এর কাহিনীতে, ইলিয়াডে। 'পদ্মাবতীতে' সোনার পদ্মের গর্ভকোব থেকে ঝঞ্ঝামত্ত প্রবৃত্তির সেই নাট্যলীলা বিকশিত। সুতরাং নাটকীয়তার দিক থেকে একটা আকর্ষণীয় কাহিনীর সন্ধান পেয়ে মধুসূদনের শিল্পী-মন সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তৎপর হয়েছে যথার্থ নাট্যরস সৃজনে। তাছাড়া সেক্সপীয়ারের নাটকে যেমন প্রবৃত্তির স্বভাব-সৌন্দর্য আমরা দেখতে পাই, তেমনি পদ্মাবতীতেও দেখতে পাই সুন্দরী নারীদের ঈর্ষাকাতর স্বভাব-সৌন্দর্য।

দ্বিতীয়তঃ শচী, রতি ও মুরজার কলহ এবং ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর জীবনে তার প্রতিক্রিয়ায় শুধু নাট্যরসের সম্ভাবনা ছিলো না, ছিলো রোমান্টিক কল্পনারও সম্ভাবনা। ইংরেজী সাহিত্যের রোমান্টিক যুগ মধুসূদনের কবিসত্তায় ছাপ রাখেনি এমন নয়। 'মেঘনাদবধের' তুঃখবিলাসে ও 'বীরাঙ্গনার' নারীচিত্তসৌন্দর্যে রোমান্টিকতার লক্ষণ ছড়িয়ে আছে, পুরো না হোক কিছুটা তো বটেই। এমন কি, 'তিলোত্তমায়' সুন্দ-উপসুন্দের যে সৌন্দর্যতৃষ্ণা ও তার চরিতার্থতা আনতে গিয়ে যে আত্মনাশের কথা আছে, তার মূলেও রয়েছে রোমান্টিক চেতনা ও রেনেসাঁসের নবজাগ্রত নতুন মানুষের যোগ্য সঙ্গিনী সন্ধানের কল্পনা। যদি হেলেনের মতো আমাদেরও একটি চিরকালের প্রেমিকা নারী থাকতো, তবে মধুসূদনের কল্পনা তারই মধ্যে সৃষ্টি করতো তাঁর নতুন নায়িকাকে। আর তারই অভাবে

পদ্মাবতীর প্রেমমণ্ডলে তাঁর মনের অভিসার। দ্বিতীয় ও তৃতীয়াঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে সৌন্দর্যাশ্রিতা পদ্মাবতী যেন রক্তমাংসের মানবী নয়, 'কবিতা কল্পনালতা' মাত্র। সুতরাং এক কল্পনাঘন সৌন্দর্যের জগতে মানসাভিসারের আকৃতির দিক থেকেও 'পদ্মাবতী' লক্ষণীয়।

এতো গেলো নাটকটিতে মধুসূদনের শিল্পী-চিত্ত কি চেয়েছে তারই কথা। কিন্তু তাঁর সার্থকতা কতটুকু, এ প্রশ্নও স্বভাবতঃই করা যেতে পারে। এলিজাবেথীয় নাটকের প্রথম পর্বে যেমন প্রত্যক্ষ ঘটনার মধ্যে দিয়ে কাহিনী যতটা অগ্রসর হতো, তার চেয়ে বেশি অগ্রসর হতো পরোক্ষ বিবৃতির মধ্য দিয়ে, তেমনি 'শর্মিষ্ঠায়' বিষয়ের প্রত্যক্ষ ঘটমানতার চেয়ে পুরাঘটিত বিষয়ের পরোক্ষ বিবরণের ওপর নির্ভর করেই কাহিনীর অগ্রগমন। কিন্তু 'পদ্মাবতীর' অধিকাংশ ঘটনাই দর্শকের চোখের সামনে ঘটেছে, পরের মুখে ঘটনার ঝাল খেতে হয় না। তার প্রমাণ স্বগতোক্তির সংখ্যাহ্রাস। এতে নাটকটির অভিনেয়তা বেড়েছে, সন্দেহ নেই। নির্দ্বন্দ্ব ঘটনার বদলে ঘটনাগত দ্বন্দ্ব ও গতিক্রিয়া সৃষ্টির ফলে 'পদ্মাবতীর' নাটকীয়তা অসংশয়িত। কিন্তু প্রথম দৃশ্যে দ্বন্দ্বের সূচনা ('introduction') যতটা নাট্যসঙ্গত হয়েছে, পরাকাষ্ঠার পথে সেই দ্বন্দ্বের ক্রমবিকাশ ('exposition') ঠিক ততটা নাট্যসঙ্গত হয়নি, দৃশ্যগুলি আশানুরূপভাবে পরস্পর গ্রথিত নয়, পূর্ববর্তী দৃশ্যের বীজ পরবর্তী দৃশ্যে বিকশিত করার চেষ্টা সর্বত্র নেই, চরিত্রগুলির মনোবিকাশের মধ্যেও কোন বেগ ফুটে ওঠেনি।* তবে 'শর্মিষ্ঠার' সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে 'পদ্মাবতীর' ঘটনাসংস্থান, দ্বন্দ্বাবর্ত রচনা ও কাহিনী পরিবেশন নিঃসন্দেহে অধিকতর নাটকীয়। একদিকে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর মিলনে মোহময়ী রতির অক্লান্ত প্রয়াস, অন্যদিকে সুচতুরা শচীর ঈর্ষাকাতর চরিত্রের সর্বনাশ-সাধনার শেষ পরিণতি দেখার কৌতূহল পাঠকের মধ্যে জাগিয়ে রাখার কৃতিত্ব মধুসূদনকে দিতে হবে। বস্তুতঃ দুই জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নাটকটি অন্ততঃ কিছুটা

* দ্রষ্টব্য : বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা—বৈদ্যনাথ শীল।

গতিশীল হয়ে উঠেছে। ইন্দ্রনীলের ছদ্মবেশ ধারণের পেছনে কাহিনীর কোন প্রয়োজন ছিলো না সত্য, তবে নাট্যকার একটা রহস্যময় পরিবেশ রচনা করে নাটকসুলভ চমক ও বিস্ময় সৃষ্টির সুযোগ খুঁজেছেন—যদিও সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার হয়নি। দ্বন্দ্বমূলক নাটকের চরিত্র হিসেবে শচী উল্লেখযোগ্য। অবশ্য সেক্সপীয়ারের গনেরিল বা লেডী ম্যাকবেথের সঙ্গে তার তুলনার চেষ্টা একটু অতি সাহসের কথা, তবু ট্র্যাজিক চরিত্র হিসেবে তার রূপায়ণ আমাদের রসবোধকে পরিতৃপ্ত করে। শচীর সঙ্কল্প দুর্জয়, বুদ্ধি উন্মেষশালিনী ও মানসিক দার্ঢ্য কঠিন ও কঠোর—তিনি কারো কাছে পরাজয় স্বীকার করতে জানেন না, রতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তার জয় প্রায় অবধারিত। কিন্তু অদৃষ্ট বিরূপ বলেই তাকে মাথা নত করতে হলো। একেই তো ট্র্যাজেডি বলে! চাঁদসদাগর যেমন অটলবীর্যের অধিকারী হয়েও শেষ পর্যন্ত বাঁ-হাতে মনসার পূজো করতে বাধ্য হয়েছিলেন, বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ যেমন ললাটলিপির অমোঘ নির্দেশে মৃত্যুকে বরণ না করে পারেন নি, তেমনিভাবেই 'পদ্মাবতীতে' শচী দৃঢ়তার অধিকারী হয়েও অবশেষে নিরুপায় হয়ে গেলেন। নাটকটির নিষ্প্রভ চরিত্রগুলে শচীই একমাত্র উজ্জ্বল নক্ষত্র, যদিও তার প্রতিহিংসা-জর্জর চিত্তের প্রতিফলন বাক্যে যতটা ঘটেছে, কর্মে ততটা ঘটেনি। দ্বিতীয়তঃ পদ্মাবতীর রোমান্টিকতা যতটা কাব্যোচিত, ততটা নাট্যোচিত নয়। যদি তাই হতো, তবে ইন্দ্রনীলের ছদ্মবেশ ঘুচে গিয়ে তার যথার্থ পরিচয় ব্যক্ত হওয়ার সময়ে পদ্মাবতীর মধ্যে একটা বিস্ময়মিশ্রিত পুলক ও অপ্রত্যাশিত হৃদয়ালোড়ন দেখা দিতো। তাছাড়া অঙ্গিরার আশ্রমে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর পুনর্মিলনও তেমন রসঘন হয়ে ওঠেনি, কারণ স্বামীবিচ্ছিন্না পার্বতীকে পিতার মৃত্যুসংবাদই দেওয়া হয়েছিলেন, স্বামীর মৃত্যুসংবাদ নয়। যেখানে পূর্বাপর পুনর্মিলনের ক্ষীণ প্রত্যাশাও থাকে, সেখানে সেই পুনর্মিলনের চরম মুহূর্তটি কি তেমন রোমান্টিক বা ড্রামাটিক হয়? তবে এই ত্রুটি

সত্ত্বেও 'পদ্মাবতীতে' পূর্বরাগ ও বিবাহিত জীবনের অনুরাগ যে মোটামুটি একটা রোমাঞ্চকর আবহাওয়া ঘনিয়ে তুলেছে, তাতে সন্দেহ নেই। আসল কথা, 'পদ্মাবতীতে' মধুসূদন যথার্থ নাটকের পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যদিও তাঁর নিজস্ব সিদ্ধি প্রশ্নাতীত নয়। তাঁর লেখায় নবনাট্যনীতির আরম্ভ আছে, পরিণতি নেই। এইজন্যই তাঁকে অলিখিত মহাকাব্যের কবি বলা হয়।

যা লিখবেন বলে সঙ্কল্প করেছিলেন এবং যা লিখতে পারার প্রতিভা নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন, তা লিখতে পারেন নি বটে—তবে তিনি আমাদের একেবারে বঞ্চিত করে যাননি। 'কৃষ্ণকুমারী' তার প্রমাণ। তাঁর সাধ ছিলো অনেক, সাধ্যও ছিলো প্রচুর, তবে সাধনা পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতীর' তুলনায় 'কৃষ্ণকুমারীর' (রচনা: ১৮৬০। প্রকাশ: ১৮৬১।) নাট্যগুণ অধিকতর, একথা তিনি জানতেন: তবু সেই অধিকতর থেকে অধিকতম নাট্যগুণের স্বপ্ন তিনি দেখতেন—'We ought to take up Indo-Mussulman subjects. The Mahommedans are a fiercer race than ourselves, and would afford splendid opportunity for the display of passion. Their women are more cut out for intrigue than ours'. তাঁর সাধের 'রিজিয়া' লেখা হলে হয়তো আমাদের নাটকীয় রসের প্রত্যাশা সম্পূর্ণ চরিতার্থ হতো, তবু 'কৃষ্ণকুমারীতেও' তাঁর নাট্য প্রতিভার সুন্দর পরিণতি দেখে আমরা তৃপ্ত না হয়ে পারিনে। এখানে তাঁর সিদ্ধি অসংশয়িত। বাঙলা সাহিত্যের নাট্যশাখায় 'কৃষ্ণকুমারীর' বিশিষ্টতার দুটি প্রমাণ নির্দেশ করা যেতে পারে—এটি হচ্ছে প্রথম ঐতিহাসিক নাটক ও প্রথম যথার্থ ট্র্যাজেডি। অবশ্য বিয়োগান্ত নাটক এর আগেই রচিত হয়েছে, কিন্তু তাদের ট্র্যাজেডি বলা অসঙ্গত। অথচ 'কৃষ্ণকুমারী' সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য নয়। নাটকটির ট্র্যাজেডি যেন দ্বিবীজপত্রী—তার একটি বীজ লুকিয়ে আছে ধনদাসের কাপট্যে আর একটি বীজ মদনিকার চাতুরীতে

দু'জনের বুদ্ধির খেলায় উদয়পুরের রাজকন্যার দু'জন পাণিপ্রার্থী জড়িয়ে গেলো : একদিকে জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ, অন্যদিকে মরুদেশের রাজা মানসিংহ। কিন্তু উদয়পুররাজ নিরুপায়, কারও বিরোধিতা করার মতো অর্থবল, সৈন্যবল বা মনোবল তার ছিলো না। এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় কৃষ্ণকুমারীর আত্মদান। মন্ত্রীর পরামর্শে রাজভ্রাতা হত্যাকার্যে অগ্রসর হলেন, কিন্তু সেই সুকঠোর কর্তব্য সাধনের সাহস তিনি শেষ পর্যন্ত সঞ্চয় করতে পারলেন না। কৃষ্ণকুমারী মানসিংহকে ভালোবেসেও আত্মহত্যা করে রাজা ও রাজসিংহাসনকে কণ্টকমুক্ত করে গেলো, পিতৃব্যকে মুক্ত দিয়ে গেলো এক অমানুষিক নৃশংসতা করার দায় থেকে।

এ কাহিনীতে ট্র্যাজেডির পরিকল্পনায় কোন খুঁত নেই। শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডির মতো হয়তো 'passions'-এ তীব্রতা নেই, তবে 'intrigue' যথেষ্টই আছে—শুধু পুরুষ চরিত্রে নয়, নারী চরিত্রেও। মদনিকা তার প্রমাণ। একজন পুরুষ আর একজন নারীর বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়ে কৃষ্ণকুমারীর জীবনের অকাল অবসান ও ভীমসিংহের মস্তিষ্ক বিকৃতি ভীতিজনক ও শোকাবহ, করুণ ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। সত্য বটে, শেক্সপীয়ারের ম্যাক্‌বেথ, ওথেলো, লীয়ার ইত্যাদির ট্র্যাজিক পরিণতির জন্য দায়ী তারা নিজেরা, তাদের জীবনের কারুণিক প্যাটার্ণ অন্যের হাতে গড়া নয়। কিন্তু কৃষ্ণকুমারীর ক্ষেত্রে সেই স্বখাত-সলিল নেই, এক জটিল পরিস্থিতির মধ্যে পড়েই তার যা কিছু বিড়ম্বনা। যদি সে আত্মশক্তিতে পুরুষায়িত হতো, প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়বার ক্ষমতা অর্জন করতে পারতো তবে নাটকীয় সংগ্রাম হয়ে উঠতো আরও তীব্র ও তপ্ত, গভীর ও গম্ভীর। তখন বিরূপ অদৃষ্টের জন্যই এক শক্তিশালী চরিত্রের মহান পতনে আমরা বিস্ময় ও করুণা অনুভব করতে পারতাম। কিন্তু কৃষ্ণকুমারীর নিজস্ব ভ্রান্তি নেই, স্বকৃত অপরাধ নেই ; সে শুধু ঝড়ের রাতের বৃন্তচ্যুত কুরুবক মাত্র। সেই কোমলভাবাপন্না সরল বালিকাকে ট্র্যাজেডির

নায়িকা বলে গ্রহণ করতে অনেকেই দ্বিধা করেন। কিন্তু আমার মনে হয়, সেক্সপীরীয় ছকে ট্র্যাজেডির নায়িকার বিচারের পদ্ধতিটা প্রয়োজনমতো কম-বেশি রদ-বদল করা দরকার। অন্ততঃ কৃষ্ণকুমারীর ক্ষেত্রে। কারণ সেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডির প্রধান চরিত্র পুরুষ—লীয়ার, ম্যাক্‌বেথ, হ্যামলেট, ওথেলো, জুলিয়াস সীজার। সেখানে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ভ্রান্তিজনিত কারুণ্য দেখানো সম্ভব হয়েছে, নারীচরিত্রপ্রধান ট্র্যাজেডিতে তা দেখানো সম্ভব না-ও হতে পারে। কারণ পুরুষ আত্মরক্ষায় যতটা সমর্থ ও অদৃষ্টের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যতটা তৎপর, নারী ততটাই অদৃষ্টবশ ও অসহায় ক্রীড়নক। লেডী ম্যাকবেথ বা গনেরিল ('কিং লীয়ার') অনেকটা পুরুষায়িত হওয়ার ফলে চারিত্রিক দৃঢ়তা পেয়েছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই (আরোপিত বা স্বরূপভূত) ব্যক্তিত্বের গুণেও তারা কিন্তু সেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠেনি, তাদের নামে নাটকের নামকরণ হয়নি। সেদিক থেকে মধুসূদন এক নতুন পরীক্ষায় অবতীর্ণ; তাই নারীনামপ্রধান ট্র্যাজেডি রচনায় তাঁর সাহসিক পদক্ষেপের বিচার নতুন নিরিখেই হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণকুমারীর সত্যিই কি কোন ভ্রান্তি ছিলো না? যে দেশে যে কালে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর ছিলো না আত্ম-প্রতিষ্ঠার সহজ স্বাভাবিক অধিকার, সে অবস্থায় (অন্যের চাতুরীর ফলে হলেও) পরপুরুষকে ভালোবাসাও এক প্রকারের মানবিক ভ্রান্তি। নিজের মনের বাসনাকে রূপায়িত করার শক্তি থাকলেই ভালোবাসার অধিকারও স্বীকৃতি পায়। যদি কৃষ্ণকুমারী মানসিংহকে ভালো না বাসতো, তবে জয়পুরের রাজা জগৎসিংহের গলায় মালা পরিয়ে দিয়েই সঙ্কটের অবসান ঘটাতে পারতো। কিন্তু তার হৃদয় তা হতে দিলো না আর তাই ঘটলো তার হৃদয়-বিদারণ। পদ্মপাতায় ফুল ধরে, লৌহখণ্ড ধরে না; ভালোবাসারও দায় আছে এবং অনেক সময় তা যথেষ্টই গুরু। কৃষ্ণকুমারীর দুর্বল শরীরেও ভালোবাসা প্রবেশ করে চরম সর্বনাশ আনলো। এ যেন নলের

শরীরে কলির প্রবেশ। তাই কৃষ্ণকুমারীর জীবনপত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো—ভীমসিংহ হয়ে গেলেন উন্মাদ। অন্য কোন সামাজিক পরিস্থিতিতে হয়তো পরিণতি হতো ভিন্নতর। অন্তরের প্রবৃত্তির তাড়নায় ও সুন্দরী নারীর মুখ দেখে উৎসাহিত হয়ে পুরুষ সমুদ্রের বুকে হাজার জাহাজ ভাসায় বটে, কিন্তু পুরুষের রূপ আর প্রেমের আগুনে নারীর জ্বলে পুড়ে মরাটাই কি বেশি চোখে পড়ে না? এখানেও তাই।

সুতরাং আমার সিদ্ধান্ত, 'কৃষ্ণকুমারীকে' মোটামুটি ভালো ট্র্যাজেডি হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া উচিত। হ্যামলেট বা ম্যাকবেথের মানবিক ভ্রান্তি ও তজ্জনিত জীবন-সংগ্রাম মধুসূদনের নায়িকায় নেই বটে, তবু তা ট্র্যাজিক। তাছাড়া, কৃষ্ণকুমারীতে যা নেই, ভীমসিংহে তা আছে। পিতাপুত্রী পরস্পর পরিপূরক, তাই সমগ্রভাবে পাঠকের বিশেষ লোকসান হয় না।

এ তো গেলো ট্র্যাজেডি হিসেবে নাটকটির বিচার। অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করলেও দেখা যায়, মধুসূদনের শিল্প-স্বাক্ষর মুদ্রিত। ভীমসিংহ যেন 'বিসর্জনের' জয়সিংহের পূর্বপুরুষ—অবশ্য রবীন্দ্র-নাথের হাতে জয়সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্ব যতটা ফুটেছে, মধুসূদনের হাতে ভীমসিংহের অন্তর্দ্বন্দ্ব ততটা ফুটে ওঠেনি। এবং তা সম্ভবও ছিলো না। মদনিকা নাট্যকারের মানসপ্রিয়া। তার বুদ্ধির দীপ্তি ও কার্যকলাপের চতুরালি সেকালের নাগরিকাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। সমস্ত নাটকীয় সঙ্কটের মূলে সে; কৃষ্ণকুমারী ও মানসিংহের প্রেম তো তারই হাতে গড়ে ওঠে, তারই কৌশলে দেখা দেয় ধনদাস ও মরুদেশের দূতের বিবাদ। সবচেয়ে বড়ো কথা, ভীমসিংহের যা কিছু সঙ্কট, তা মদনিকার রচনা। সমস্ত ঘটনাসূত্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই 'কৃষ্ণকুমারীতে' মদনিকার ভূমিকা 'মৃচ্ছ-কটিকের' মদনিকার চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধির খেলায় ধনদাস তার কাছে পরাজিত, যদিও ক্রূরতা ও চতুরতায় তার চরিত্রও কম লক্ষণীয় নয়। নাট্যকার দু'জনকেই সমান নৈপুণ্য দিয়ে

সৃষ্টি করলেও শেষ পর্যন্ত অপক্ষপাত মনোভাব বজায় রাখতে পারেন নি; ধনদাস শাস্তি পেয়েছে তার অপরাধের জন্য, কিন্তু স্রষ্টার সহানুভূতিই আড়াল দিয়ে চরম বিপর্যয়ের গভীর খাতে পতনের হাত থেকে রক্ষা করেছে মদনিকাকে। এতে সাহিত্যিক ন্যায় ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারেনি।

আসল কথা, শুধু ট্র্যাজেডি হিসেবে নয়, চরিত্র-চিত্রণেও নয়, সমগ্র নাটকীয় পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণের দিক থেকেই 'কৃষ্ণকুমারী' মধুসূদনের সার্থকতম রচনা। দৃশ্যগুলি পরস্পর ঐক্যবদ্ধ, ঘটনা-ধারার সমাবেশ তাৎপর্যপূর্ণ, কাহিনীর গতি সাবলীল ও চরিত্রগুলির জীবন সজীব। নাট্যরচনায় মধুসূদনের পূর্ণ ক্ষমতার আভাস 'কৃষ্ণকুমারীতে' আছে।

মধুসূদনের শেষ নাটক 'মায়াকানন' (মৃত্যুশয্যায় রচিত; ১৮৭৪ খৃঃ প্রকাশিত।) তাঁর প্রতিভার ভস্মকুণ্ডে জন্ম নিয়েছে। এর অঙ্গে অঙ্গে ছড়িয়ে আছে মৃত্যুমুখী স্রষ্টার চিত্তদাহ ও বেদনা-ভার। রাজ্যচ্যুত গান্ধাররাজের কন্যা ইন্দুমতী ও সিন্ধুদেশের যুবরাজ অজয়সিংহ একদা মায়াকাননের পাষাণকায়ার আরাধনা করতে গিয়ে প্রণয়াসক্ত হন, কিন্তু সেই শুভক্ষণের আকস্মিক ঝড় ও বজ্রনির্ঘোষে ছিলো একটা অশুভ ইঙ্গিত। তপস্বিনী অরুন্ধতী জানতেন, তাদের মিলনে দেবতাদের অনিচ্ছা আছে; তাই তিনি বিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে গিয়ে একদিকে যেমন গান্ধারের বর্তমান যুবরাজ জয়কেতুকে ইন্দুমতীর পাণিপ্রার্থী করবার ষড়যন্ত্র করলেন, অন্যদিকে তেমনি ব্রতপালনের অছিলায় এক বছরের জন্য বিয়ে বন্ধ রাখতে ইন্দুমতীকে পরামর্শ দিলেন। তারপর জয়কেতুর পিতা ধূমকেতুর শিবিরে যাওয়ার আগে ইন্দুমতী আত্মহত্যা করলো। অজয়ও অনুসরণ করলো তার প্রেয়সীকে। তখন পাষাণকায়া বিদীর্ণ হয়ে গেলো; ঋষ্যশৃঙ্গের মুখে শোনা গেলো, নিজের সম্মুখে অধিকতর সুন্দরী নারীর আত্মহত্যার ওপরই এতদিন নির্ভর করছিলো রতির অভিশাপে প্রস্তরীভূতা রাজকন্যা ইন্দিরার মুক্তি। সমস্ত নাটকটি

পড়লে মনে হয়, চরিত্রগুলির মাথার ওপরে যেন নিয়তির কালো ছায়া নিত্য সঞ্চালিত। আর অরুন্ধতী সেই নিয়ামক নিয়তির প্রতিনিধি। তিনি ইন্দুমতী-অজয়ের মিলনে শুধু বাধা দিয়েই ক্ষান্ত হননি, জয়কেতুকে রঙ্গমঞ্চে এনে তাদের জীবনের অবসানকে অনিবার্য করে তুলেছেন। কৃষ্ণকুমারীর আত্মহত্যার তবু একটা অর্থ আছে—দেশের মঙ্গল; কিন্তু ইন্দুমতীর আত্মবিসর্জন যেন একেবারেই নিরর্থক। যে অপরাধ তারা করেনি, সেই অপরাধের জন্য দুটি জীবন নষ্ট হয়ে গেলো কেন—এই বেদনাতুর জিজ্ঞাসা নাটকটিতে বেজে ওঠেছে। আসল কথা, প্রশ্ন তুলেও নিয়তিকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না, তার শাসনের মর্মান্তিকতা থেকে মানুষের আর মুক্তি নেই। গ্রীক নিয়তিবাদের এই তত্ত্ব যেমন 'মায়াকাননের' নায়ক-নায়িকার ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি তাদের স্রষ্টার ক্ষেত্রেও সত্য। কে জানে হয়তো নাটকটি উনিশ শতকী রেনেসাঁসের সন্তানের অচরিতার্থ জীবন ও অতৃপ্ত কামনার নাট্যভাষ্য মাত্র। কিন্তু অচরিতার্থ জীবনে প্রতিভার আগুন নিভে যেতে যেতেও কি সৃষ্টি করে যেতে পারে, তার প্রমাণ আছে 'মায়াকাননের' ইন্দুমতী ও চাণক্যের চরিত্রে, কাহিনীর সংগঠনে, কৌতুকের ক্ষণিক স্ফুরণে।

নাটকগুলির খণ্ড খণ্ড বিচার থেকে মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া গেছে। তবে প্রশ্ন উঠবে, কোথায় নাট্যকার মধুসূদনের বড়োত্ব নিহিত? কিসের গুণে তিনি পূর্ব-বর্তীদের চেয়ে উন্নততর স্রষ্টা এবং পরবর্তীদের কাছে পথপ্রদর্শক? সেক্সপীয়ার সম্বন্ধে বলা হয়—'There is indeed hardly a glory of Shakespeare's drama which might not be matched by a fragment or an aspect of some other play of the period. He did not—how could he?—surpass the pathos of the poetic sublimity of the last scenes of Marlow's Faust. He created no atmosphere of grief and horror more agonizing than that envelops Webster's Duches of Malfi. Not one of his plays is

more solidly constructed than Jonson's Valpone, Epicoene and Alchemist. None of his comedies is more skilfully staged than Beaumount and Fletcher's knight of the Burning Pestle, none of his tragedies than their Maid's Tragedy. He has created no character more singularly original than Dekker's old Friscobaldo...Every element in Shakespeare's drama might thus, in isolation, be matched by the best of the contemporary writers for the stage at their best. What, then, is distinctive in Shakespeare? এর উত্তর হচ্ছে—'First, his combination of all gifts which were scattered or isolated in the work of others, the multifariousness of his curiosity, and the extreme diversity of his talents .. Besides his variety, the poets capital gift was certainly that he could endow historical and imaginary beings with life... ' মধুসূদন ও তাঁর পূর্ববর্তী নাট্যকাররা সেক্সপীয়ার ও তাঁর যুগের অন্যান্য নাট্যকারদের সঙ্গে সর্বতোভাবে তুলনীয় নন, কারণ উনিশ শতকী বাঙলা নাট্যকারদের চেয়ে এলিজাবেথীয় কালের নাট্যকাররা অনেক বেশি প্রতিভাবান ছিলেন। তবু মিলিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, মধুসূদনের আগেই তাঁর পূর্বসূরীরা কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন আদর্শ দেখিয়েছিলেন, অনেক কিছু পুরনো আদর্শও করেছিলেন বর্জন। তবে সামগ্রিক বিচারে দেখা যাবে, মধুসূদনের নাটকেও সেক্সপীয়ারের নাটকের মতোই 'combination of all the gifts which were scattered or isolated in the work of others' ঘটেছে। তাছাড়া তিনিও দেব ও মানবচরিত্রকে যতটা সম্ভব জীবন দান করতে সচেষ্ট ছিলেন। সর্বত্র হয়তো সার্থক হননি, তবে প্রয়াস ছিলো। যদি তাঁর নাটকের অভিনয়ের প্রত্যাশিত সুব্যবস্থা হতো, যদি পাঠক-সমাজের কাছ থেকে নিরন্তর উৎসাহ পেতেন, তবে নাট্যবৃত্তে মধুসূদনের সৃষ্টি-ক্ষমতার আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতো।

প্রহসনের অভিনয় হলো না, অন্যান্য নাটকও আকাঙ্ক্ষিত পরিমাণ সমাদর পায়নি, তাই মধুসূদনের মন ভেঙে যাওয়া স্বাভাবিক—'Mind, you broke my wings once about the farces : if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew or Chinese.' তা না হলে যিনি জাতীয় নাট্যশালার কথা ভেবেছেন এবং তার মধ্য দিয়ে জাতীয় রুচি নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছেন, যিনি বাঙলা নাটক অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হওয়া উচিত বলে সিদ্ধান্ত করতে ভোলেন নি, সর্বোপরি নিরন্তর পরীক্ষায় যাঁর শিল্পী-মনের কিছুমাত্র ক্লান্তি ছিলো না, তিনি আরও মঞ্চসফল ও রসোত্তীর্ণ নাটক উপহার দিয়ে যেতেন।

বাঙলা কাব্যে মধুসূদনের আত্মপ্রকাশ একটা প্রচণ্ড জেদের বশে নয়। 'রত্নাবলীর' অভিনয় দেখে সমসাময়িক বাঙলা নাটকের নিকৃষ্টতায় তিনি নিঃসন্দেহ হন। আর তাই তাঁর য়ুরোপার্জিত শিল্পী-সত্তা 'শর্মিষ্ঠা' রচনায় এগিয়ে আসে। মধুসূদনের বন্ধু ছিলেন রঙ্গলাল, অথচ তাঁর সঙ্গে ছিলো রুচির মৌলিক ভেদ। আর তাই রঙ্গলালের বায়রণ, মূর ও স্কট-প্রীতিকে উন্নত কবিত্বের অনুকূল বলে তাঁর মনে হয়নি। আসল কথা, রামনারায়ণদের চমক লাগিয়ে দেবার জন্য নয়, মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে বাজি রেখে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করতে গিয়েও নয়, নিজের পরিশীলিত শিল্পী-মনের গরজেই মধুসূদন নাট্যকার ও কবি। তাঁর সমস্ত চরিত্রের মধ্যেই বাহ্যতঃ একটা লোক-দেখানো-ভাব—showmanship—ছিলো, তাই অনেকের ধারণা আছে, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি যেন আলাদিনের আশ্চর্য-প্রদীপের কেরামতী। কিন্তু তা সত্য নয়, সত্য হতে পারে না।

প্রমাণ তাঁর চিঠিপত্র আর সাহিত্যব্রতে তাঁর ন্যায়নিষ্ঠতা।

বাণীর পূজোয়, বিশেষ করে ইংরেজী সাহিত্যের পাঠ গ্রহণে মধুসূদনের কোন ত্রুটি নেই। ডিরোজিওর ছড়িয়ে-দেওয়া আবহাওয়ায়, রিচার্ডসনের প্রত্যক্ষ সাহচর্যে তাঁর মন সত্য অর্থে য়ুরোপযাত্রী হয়েছিলো। সেকালের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে ইংরেজমন্যতা ছিলো, কেউ কেউ শ্বেতদ্বীপের কাছে বুদ্ধি ও বিবেক বিকিয়ে দিয়ে বসেও ছিলেন—কিন্তু বহিরঙ্গে ইংরেজীপনা সত্ত্বেও অন্তরঙ্গে তারা অনেকেই ছিলেন আভ্যাসিক গতানুগতিকতার দাস, নিরাপদ গার্হস্থ্য জীবনই ছিলো তাদের অন্বিষ্ট। সেদিক থেকে মধুস্সূদন সবচেয়ে নিষ্ঠাবান য়ুরোপ-মাতাল, পাশ্চাত্ত্য দেশের ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অভিযান স্পষ্টতঃই সদ্বিবেকী ও আন্তরিক, পরিশ্রমী ও সাহসিক। তিনি য়ুরোপে শুধু তাঁর জীবনের আদর্শ খোঁজেন নি, খুঁজেছেন মনের খোরাকও—তাই তিনি কেবল ইংল্যাণ্ডের নয়, ল্যাটিন য়ুরোপেরও অভিযাত্রী। '…পদ্যে যে মৌলিক প্রয়োজন কি সে বিষয়ে তাঁর ইওরোপীয় জ্ঞানের কল্যাণে আর জানতে বাকি ছিল না এবং তাঁর রুচি বা মানদণ্ড ছিল সভ্য অর্থাৎ বিশ্বমানবিক আশ্চর্য মাত্রায়। আশ্চর্যই, কারণ তিনি যে ভিক্টোরীয় সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক মাত্র প্রজা ছিলেন, সে সাম্রাজ্যের লোকেরা একধারে দ্বীপমণ্ডূকতায় আর বিশ্বব্যাপী পণ্য-ব্যবসায়ী সামরিক শাসনের চারিত্রিক দোষত্রুটিতে ছিল আচ্ছন্ন।…(দেশের) মুষ্টিমেয় ইংরেজিনবিশদের মধ্যে সংবেদনবৃত্তি ও বোধবিচারসম্পন্ন মানুষ নিতান্তই আঙুলে গোণা যেত। অল্পসংখ্যক বাবুই ভালো জিনিসকে সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারতেন এবং যাঁরা পারতেন তাঁদের প্রায় সবই হয় মাইকেলের পৃষ্ঠপোষক নয় তো তাঁর বন্ধু-বান্ধব ছিলেন।…আমার বক্তব্য কেবলমাত্র এই যে, প্রকৃত সংবেদনশীল মানুষ কলকাতার সমাজে অত্যন্ত কম এবং যে বিষঙ্গ বা অসংহতি বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের দীর্ঘ সর্বনাশের দিকে ঠেলছিল তার প্রভাবে নিছক মননের প্রক্রিয়াও স্বাস্থ্য হারাচ্ছিল।' ফলে মধুসূদনই ছিলেন তখনকার দিনের

বিরল কবিকর্মী, যিনি তীক্ষ্ণ সংবেদ্যতায় প্রায় তুলনাহীন—'a proud, silent, lonely man of song.'। এ যে অত্যুক্তি নয়, তার প্রমাণ পাই তাঁর রসাস্বাদনশক্তিতে, পাশ্চাত্ত্য কবিদের সত্য মূল্যায়নে। তাঁর মতে—বাল্মীকি, হোমার, ভার্জিল, কালিদাস, টাসো ও মিল্টন—'these কবিকুলগুরু's ought to make a first rate poet if nature has been gracious to him.'। ফলস্টাফ যেমন শুধু নিজে হাসেন নি, অন্যের মধ্যেও হাসির উদ্রেক করেছেন, তেমনি এঁরাও নানা দেশের নানা কবির সৃষ্টি-প্রেরণার উৎস। এঁদের প্রতিভার গভীরতা ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে মধুসূদনের ধারণা যথার্থ। তার চেয়েও বড়ো কথা, বিষ্ণু দে বলেছেন, যে কালে বিলেতেও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থবাদীরা অনাগত, সে কালে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সম্বন্ধে মধুসূদনের মন্তব্য আশ্চর্য রকমের কালোত্তীর্ণ পরিণত বুদ্ধির পরিচায়ক। স্কট ও মূরকে তিনি বড়ো কবি বলে মনে করতেন না, বায়রণেরও এখানে সেখানে মাত্র উচ্চতম কাব্য-নির্মাণ-ক্ষমতার দৃষ্টান্ত পেয়েছিলেন তিনি। নিজের দেশের শিক্ষাদীক্ষা যুগধর্ম ইত্যাদির নানা অসঙ্গতির মধ্যে বাস করেও স্বচ্ছদৃষ্টিতে কাব্য-সাহিত্যের এমন পরিণত মূল্য বিচার আশ্চর্যের নয় কি?

আসল কথা, মধুসূদনের মধ্যে অনেকদিন ধরেই একটা প্রস্তুতি চলছিলো, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের আত্মাটি ধরবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। আর তাই হোমারের ভক্ত হয়েও তিনি বলতে ছাড়েন নি—'Homer is all battles'। কেবল যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনায় তাঁর শিল্পী-মন যে সার্থকতা চায়নি, এটা প্রশংসার কথা। তিনি অবশ্য বলেছেন, তাঁর মহাকাব্য নাকি তিন-চতুর্থাংশ গ্রীক। কিন্তু যাঁর কাছে আমাদের পূর্বপুরুষদের পুরাণকাহিনী অনুরাগের বিষয় ও হোমার যুদ্ধবিত্তার কবি মাত্র, তাঁর এই স্বীকারোক্তি সন্দেহের উদ্রেক করে। আমার মনে হয়, মধুসূদনের নাটকে কালিদাসের রচনাংশ পাওয়া যেমন দুষ্কর নয়, তেমনি তাঁর কাব্য থেকেও পাশ্চাত্ত্য ভাব ও বর্ণনা, আখ্যায়িকা ও কল্পনাদর্শ, উপমা ও ছন্দ খুঁজে বের

করা যায়। কিন্তু শুধু বিলিতি বিদ্যার আহরণপটুতার মধ্যে তাঁর কবিত্বশক্তির পরিমাপ হতে পারে না। কবির সজ্ঞান অভিপ্রায় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে শিল্প-জনোচিত বোধ ও বুদ্ধির পাঠ গ্রহণ, নিজের স্বাভাবিক অনুভবশক্তি ও রূপদক্ষতাকে শাণিয়ে নিতে গিয়েই তাঁর য়ুরোপের সাহিত্য-ভাণ্ডার আবিষ্কারে এমন অক্লান্ত প্রয়াস। সেই শিল্পীজনোচিত বুদ্ধি আহরণ করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর মুখে শুনতে পাই—'I shall not borrow Greek stories, but write, rather try to write, as a Greek would have done.'। অথচ তাঁর ওপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের পরিমাণের ওপর বিচার যতখানি হয়েছে, সেই প্রভাবের প্রকৃতির বিশ্লেষণ ততখানি হয়নি। য়ুরোপ তাঁর সাহিত্যরুচি তৈরি করেছে, এ কথা অনেকখানি সত্য; কিন্তু তার চেয়েও বড়ো সত্য, তাঁর কাব্য তৈরি করেছে তাঁর নিজের মন। আর সে মনের মূল ছিলো দেশের মাটিতেই প্রোথিত।

মধুসূদনের য়ুরোপার্জিত সাহিত্যরুচিরও একটা ভূমিকা আছে। শৈশবে মায়ের সান্নিধ্যে দেশজ কাব্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় শুধু কথার কথা নয়, তা তাঁর অন্তরাত্মার ঠিকুজী। ছেলেবেলায় রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কন চণ্ডী ইত্যাদির সঙ্গে যে সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিলো, দুর্বার ইংরেজিয়ানার ভেতর দিয়েও তা ছিন্ন হয়ে যায়নি। রক্তের চেনা সেই ঐতিহ্য-স্মৃতি, সেই দেশজ ভাষার কথ্যচ্ছন্দ তাঁর মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে ছিলো। এমনিভাবে স্বদেশ আত্মার বাণী-মূর্তি আর য়ুরোপীয় সাহিত্য-লক্ষ্মীর সান্নিধ্যে মধুসূদনের যে মন তৈরি হয়েছিল, তা-ই অনুকূল পরিবেশে সৃষ্টিমুখর হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন ধরে অন্তঃসত্তায় বাণীর বসতি না ঘটলে এমনটি হতো না।

সে যাই হোক, তাঁর মনের চেহারা ও সাহিত্যিক বুদ্ধিতে রেনেসাঁসের ছাপ স্পষ্টই চোখে পড়ে। কলোনিয়েল মানুষ সীমাবদ্ধ জাগরণের দিনে যতটা শিক্ষা ও রুচির পাঠ নিতে পারে, মধুসূদনের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তখনকার নব্য মানুষের মধ্যে তাঁর

বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সহজেই চোখে পড়ে। এবং সেই ব্যক্তিত্বের শক্তিমত্তা যতখানি আপনাকে গণ্ডীমুক্ত করতে পেরেছে অন্তর্নিহিত দুর্দমনীয়-তায় আর আত্মপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে সৃষ্টিশীল সঙ্কল্পনায়, ঠিক ততখানিই তিনি রেনেসাঁসের সম্মানিত সন্তান। অন্যদিকে বিশ্বসাহিত্যের মান-বোধ (sense of values) ও প্রথম শ্রেণীর রসরুচির জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাঁর সৃজনবৃত্তি যেখানে ক্রমোৎকর্ষে ঐতিহাসিক তাৎপর্য লাভ করেনি সেখানে তার কারণ খুঁজতে হবে সমকালীন সমাজ ও যুগধর্মের অসঙ্গতির ভেতরে, কিছুটা বা তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের অস্থির বিক্ষিপ্ত উৎক্রান্তির মধ্যে। অবশ্য সেই উৎক্রান্তিও অংশতঃ যুগ-প্ররোচিত। মধুসূদনের সাহিত্যে আরম্ভের প্রতিশ্রুতি থাকলেও পরিণতির স্ফূর্তি না থাকার জন্য তাঁর নিজের একটা ভুল ধারণাও দায়ী। বিষ্ণু দে দেখিয়েছেন, 'মাইকেল অত্যন্ত রকম উনিশ শতকী নব্য-মধ্যবিত্ত বাঙালী, যিনি ইওরোপের তুলনা টানতে গিয়ে স্থান-কাল-পাত্র বিষয়ে বিভ্রান্ত, যিনি পশ্চিম ইওরোপের রেনেসান্স আর আমাদের মহারাণীর যুগ প্রায় সমার্থক ভেবে বসেছিলেন। তাই তাঁর জীবন করুণ অপরিচ্ছন্নতায় অকালে শেষ হয়...'। অর্থাৎ তখনকার বাস্তব অবস্থার সঙ্গে কবির স্বপ্নজগতের ছিলো অনেকটা ভেদ, তাই কবির শক্তি কাব্যকলার বহিরঙ্গে প্রতিষ্ঠা পেয়েও হোমার, ভার্জিল বা মিল্টনের মতো মহান কিছু সৃষ্টি করে যেতে পারেনি। ডক্টর সীতাংশু মৈত্রের মতে, এ অচরিতার্থতার বেদনা শুধু মধুসূদনেই নয়, বিদ্যাসাগরেও ছিলো। এটাই হচ্ছে যুগের অনিবার্য ফল। আর তাই মিল্টনের ভক্তকে শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রসাদের তাগিদে কালিদাসের সঙ্গে মিল খুঁজেই তৃপ্ত হতে হয়। অবশ্য মিল্টন হওয়া সম্ভবও ছিলো না, কারণ কঠোর পিউরিটান প্রেরণা ও পরিবেশ তিনি পাননি। গ্রীক-ল্যাটিন কাব্যের ক্ল্যাসিকালিটির সংযম সংহতিও যুগের কাছ থেকে লাভ করেন নি তিনি—তাই হোমার-ভার্জিল ছিলো তাঁর স্বপ্নের মানুষ মাত্র; পার্থিব আদর্শ নয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সমকালীন দেশ ও কালের মধ্যে নির্ধারিত ছিলো মধুসূদনের সৃষ্টির সীমা ; ব্যক্তিগত আত্মস্থতার অভাবে সেই সীমার মধ্যেও তাঁর সৃজনী-শক্তির সম্ভবপর লীলা ব্যাহত হয়েছে। তবু মধুসূদন সে-যুগের সবচেয়ে বড়ো কবিকর্মী, তাঁর লেখাতেই পাওয়া যায় ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের যা কিছু আভাসময়তা, অনুশীলিত সাহিত্যিক বুদ্ধির কর্মিষ্ঠ প্রকাশ। যে কবিত্ব তাঁর ওপর ভর করেছিলো, তা শুধুই দেশজ মানসের সঙ্গে কবি-মানসের সাযুজ্য-সঞ্জাত নয়, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে তাঁর মনের যে নতুন স্বাস্থ্য তা থেকেও তাঁর কবিত্ব উৎসারিত। অবশ্য প্রথম দিকে এই দুই প্রেরণার পরিমাণ নিয়ে তাঁর সাহিত্যিক বুদ্ধির অস্থিরতা ছিলো, কিন্তু চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে এসে দেখতে পাই তিনি শেষ পর্যন্ত দেশের মাটির মধ্যেই অনুসরণীয় পথের সন্ধান পেয়েছেন। যদিও বড়ো দেরিতে। তাই তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কবি-জীবন উভয়ই ট্র্যাজেডি মাত্র হয়ে রইলো।

মধুসূদনের কাব্যপাঠের এই ভূমিকা স্মরণীয়, কারণ 'তিলোত্তমা-সম্ভব' (প্রকাশ : ১৮৬০), 'মেঘনাদবধকাব্য' (প্রকাশ : ১৮৬১), 'ব্রজাঙ্গনা' (প্রকাশ : ১৮৬১), 'বীরাঙ্গনা' (প্রকাশ : ১৮৬২) ও 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে' (প্রকাশ : ১৮৬৬) তাঁর যে কবি-মানসের প্রকাশ, তার মূল্যায়নের জন্য যুগপ্রবৃত্তি ও কবিপ্রকৃতি সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। কবির কয়েকটি প্রধান কাব্যের খণ্ড খণ্ড বিচার অন্যত্র করেছি,* এখানে তাই সংক্ষেপে তাঁর কাব্য-বিচার সম্পূর্ণ করবো।

উনিশ শতকের সাহিত্যক্ষেত্রে মধুসূদনই সবচেয়ে গর্বিত ও নিঃসঙ্গ এক কবি-পুরুষ ; বিশ শতকের সারস্বত-মণ্ডলে প্রমথ চৌধুরই সবচেয়ে স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল এক জ্যোতিষ্ক। অথচ প্রথম

* মৎপ্রণীত 'মধুসূদনের কাব্যবৃত্ত' দ্রষ্টব্য।

জনের চোখে ভারতচন্দ্র যেখানে নিকৃষ্ট কবিগোষ্ঠীর জনক মাত্র, সেখানে দ্বিতীয় জনের কাছে ভারতচন্দ্রীয় মার্গই হচ্ছে যথার্থ কবিপন্থা। দুজনেই য়ুরোপের সাহিত্যে ঘনিষ্ঠ পাঠ নিয়েছিলেন আর দুজনেই ছিলেন বিদগ্ধ মার্জিত মনের অধিকারী। তা সত্ত্বেও তাঁদের দৃষ্টির ভেদ ঐতিহাসিক সত্য : কারণ মধুসূদনের সামনে প্রধান সমস্যা ছিলো মধ্যযুগীয় রূপ ও আত্মার ক্ষয়িষ্ণু বন্ধন থেকে বাঙলা কাব্যের উদ্ধার, প্রমথ চৌধুরীর লক্ষ্য ছিলো নবযুগের সাহিত্যের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য পুরনো ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা। বিসর্জন ও নববোধনের মন্ত্র এক হতে পারে না, একথা মনে রাখলেই মধুসূদন প্রমথ চৌধুরীর মতো ভারতচন্দ্রের প্রতিভায় বিশ্বাস রেখেও কেন কৃষ্ণনাগরিক পথ বর্জন করতে চেয়েছেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না। তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন, 'তিলোত্তমাসম্ভবে' (১৮৬০) শুধু নতুন আদর্শের অঙ্গীকার নেই, তাতে আছে পুরনো আদর্শ অস্বীকারের সজ্ঞান প্রয়াস : 'I have actually done something that ought to give our national poetry a good lift, at any rate, that will teach the future poets of Bengal to write in a strain very different from that of the man of Krisnanagar, the father of a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genious.'

প্রশ্ন উঠতে পারে, 'তিলোত্তমাসম্ভবে' প্রাচীন কাব্যের কি কি লক্ষণ নেই? কিংবা নতুন কাব্যের কি কি লক্ষণ আছে? প্রথম উত্তর, সেকালের আদিরস বা হাস্যরসপ্রবণতা মধুসূদনের কাব্যে নেই। বৈষ্ণব ও মঙ্গল কাব্যের রসপ্রবাহের আক্রমণ থেকে মুক্ত বলেই 'তিলোত্তমায়' রসরুচির নতুন স্বাদ আমাদের তৃপ্ত করে। 'অন্নদামঙ্গলের' সুড়ঙ্গ পথ তো শুধু বিদ্যা ও সুন্দরের রতিবিলাসের পথ ছিলো না, তা ছিলো সেকালের কবিরুচির অধোগামিতারও পথ। জনজীবনে উচ্চাদর্শের অভাব থেকে যে স্থূলতা জন্ম নেয়, সন্ধিযুগের কবিরা এমন কি দেববদেবীর বেনামীতে তারই আরাধনা

করেছেন। লোকসাহিত্যে ভারতচন্দ্রের 'সারালো ও ধারালো' লেখার মার্জিত উত্তরাধিকার অবৈধ ও স্থূল দেহমিলনের রূপ নেয় এবং উনিশ শতকে তারই জের চলতে থাকে 'নববিবিবিলাস' ও 'কামিনীকুমারের' মতো কামায়ন সাহিত্যের মধ্যে। অথচ 'তিলোত্তমায়' তার নামগন্ধ নেই (অবশ্য রঙ্গলালেও ছিলো না), যদিও এক অতুলনা রূপসীকে নিয়েই কাহিনী গড়ে উঠেছে। সুন্দরের আগমনে হীরা মালিনীর ভাঙা মানঞ্চে যে ফুল ফুটেছে, সুড়ঙ্গপথের কামনা-কুটিল অন্ধকারে তা শেষ পর্যন্ত হারিয়ে গেছে ; অথচ যে দুটি পদ্ম দিয়ে মধুসূদন তিলোত্তমার পদযুগল রচনা করলেন, তারা রসিকের আলোকিত মানসে চির-উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তিলোত্তমাকে দেখে সুন্দ-উপসুন্দ তপস্যার ফল হারিয়েছেন, স্বর্গলোক থেকে তাদের স্খলন ঘটেছে মৃত্যুলোকে— কিন্তু নিজের সৃষ্টির মোহে বারেকের জন্যও বাক্-প্রগল্ভ হয়ে ওঠেন নি মধুসূদন, তিলোত্তমার পাদপীঠতলে সুন্দরের মন্ত্রোচ্চারণে তিনি পূর্বাপর গভীর ও গম্ভীর, ধ্যানলীন ও সংযতবাক্। তিলোত্তমার সৃষ্টির বর্ণনায় ও তাকে দেখে অসুরদ্বয়ের উন্মত্ততার চিত্রে আবেগ আছে, অথচ আবিলতা নেই ; ভাব আছে, ভাবালুতা নেই।

> 'কি আশ্চর্য ! দেখ, ভাই', কহিল শূরেন্দ্র
> সুন্দ ; 'দেখ চাহি, ওই নিকুঞ্জ মাঝারে।
> উজ্জ্বল এ বন বুঝি দাবাগ্নিশিখাতে
> আজি ; কিম্বা ভগবতী আইলা আপনি
> গৌরী।'

এ তো মদনের অলক্ষ্য চাতুরীর পূর্বেকার কথা। কিন্তু ফুলশর নিক্ষেপের পরও ক্লেদ কোথায় ?

> জর জর ফুলশরে, উভয়ে ধরিলা
> রূপসীরে। আচ্ছন্নিল গগন সহসা
> জীমূত !

কামমদে মত্ত এবে উপসুন্দাসুর
বলী, সুন্দাসুর পানে চাহিয়া কহিলা
রোষে ; 'কি কারণে তুমি স্পর্শ এ বামারে,
ভ্রাতৃবধূ তব, বীর ?' সুন্দ উত্তরিলা—
বরিনু কন্যায় আমি তোমার সম্মুখে
এখনি ! আমার ভার্যা গুরুজন তব ;
দেবর বামার তুমি ; দেহ হাত ছাড়ি।'

এখানে রুচিবিকারের কোন স্বাক্ষর নেই, আবেগের স্রোতে পঙ্ক জমে ওঠেনি, কলহের উত্তাপে ভদ্রনীতির ব্যত্যয় ঘটেনি। কিন্তু কবি তাতেও সন্তুষ্ট হননি, সেই বাসনা-মদির দৃশ্যের ওপরে কালো মেঘের ঘেরাটোপ পরিয়ে দিয়ে তবে তাঁর রুচি তৃপ্তি পেয়েছে। তিলোত্তমার সঙ্গে অ-পূর্ব সাক্ষাতে ব্যক্তিমনের যে আলোড়ন, তা সম্পূর্ণ মানবিক ও স্বভাব-সৌন্দর্য-সমন্বিত। নবযুগের কবির চোখে তিলোত্তমা এক অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্যের জগৎ খুলে দিয়েছে বলেই বিশ্বসুন্দরীর প্রতি অসুরদ্বয়ের দুর্বলতায় মধুসূদনের প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি ছিলো—'I myself like those two fellows, and it was once my intention to have another book to place them more conspicuously before the reader...'। আমার বিশ্বাস, দেবাসুরের কাহিনীতে মানবিক রস সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই জেনেও (রাজনারায়ণের কাছে লিখিত পত্র দ্রষ্টব্য) কবি যে তাতে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন তার কারণ তিলোত্তমার সৌন্দর্য-সত্তা এবং সেই সৌন্দর্য-সত্তার প্রতি রেনেসাঁসের কবির রোমান্টিক চেতনা থাকাই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় কথা, মধুসূদনের কল্পনা ও ভাবানুষঙ্গে আধুনিক-পূর্ব বাঙলা কাব্যের কোন ছাপ নাই। তাঁর কবি-মানস আভ্যাসিক মার্গে চলতে চায়নি ; স্বর্গ-মর্ত্য-গিরি-আকাশ বর্ণনায়, প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনে, চরিত্রগুলির গতিবিধির পরিবেশ রচনায় একটা নতুন কবি-স্বপ্ন ও চারুপমা কল্পনা পরিস্ফুট। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছেন,

সর্বত্রই সুচারু রসাত্মক ভাব অতি প্রোজ্জ্বল বাক্যে বিভূষিত। ঐ সকল ভাব যে কালিদাস, ভবভূতি, হোমার, মিল্টন প্রভৃতির রচনা থেকে আহরিত, তাও উল্লেখ করতে তিনি ভোলেন নি ; তবু তাঁর মতে, সেই পরস্ব ভাব কবির মনের রসায়নে ও স্বাভাবিক কল্পনা-বৃত্তির কৌশলে নতুন অবয়ব ধারণ করেছে। আজও রাজেন্দ্রলালের এ-মত সুচিন্তিত ও বিদগ্ধজনোচিত মনে হয়। তাঁর সদ্য-সৃজিতা তিলোত্তমাকে দেখে আমাদের মনে পড়তে পারে মিল্টনের নবরূপা ঈভকে, কিন্তু এই পাশ্চাত্ত্য আদর্শের কথা যতটা সাধারণ ভাবে অনুমেয়, ঠিক ততটা আভ্যন্তরীণ প্রমাণসাপেক্ষ কি ?

> অমৃত সঞ্চারি তবে দেব-শিল্পি-পতি
> জীবাইলা কামিনীরে ;—সুমোহিনী-বেশে
> দাঁড়াইলা প্রভা যেন, আহা, মূর্তিমতী !
> হেরি অপরূপ কান্তি আনন্দ-সলিলে
> ভাসিলেন শচীকান্ত ; পবন অমনি,
> প্রফুল্ল কমলে যেন পাইয়া, স্বনিলা
> সুস্বনে !

শুধু শচীকান্ত নন, একালের রসিকের চোখেও এ অপরূপ মূর্তি অদৃষ্টপূর্ব ও মৌলিক। শুধু তা-ই নয়, মনে হয় কবির কল্পনার ফার্ণেসে ঢালাই করা তিলোত্তমায় ঈভের ছায়াপাত প্রান্তীয় ক্ষীণ রেখা মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। যেমন পরাজিত দেবতাদের বর্ণনা পড়ে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, কবি 'Hyperion' পড়েছিলেন। তার বেশি কিছু বললে মধুসূদনের প্রতি অবিচার করা হবে।

এর পরে আসে 'তিলোত্তমার' ছন্দ ও ভাষাভঙ্গির কথা। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বলেছিলেন, বাঙলা accent বা শ্বাসাঘাতবর্জিত ও বিস্তারধর্মী ভাষা হওয়ায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের পক্ষে তা উপযোগী নয়, ইংরেজী অমিত্রাক্ষরের ধ্বনি-সুষমা ও ওজোগুণান্বিত শ্বাস-পর্ব বাঙলায় সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কিন্তু মধুসূদন তা মানতে পারেন নি ; তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন

যে, বাঙলা হচ্ছে শব্দসম্পদপরিপূর্ণ ও ধ্বনিগাম্ভীর্যময় সংস্কৃতের দুহিতা এবং সেই কারণেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের দাবি পূরণে সম্পূর্ণ সমর্থা। কবির এই বিশ্বাসেরই ফল 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'। সেকালের সাহিত্যরসিক যতীন্দ্রমোহন, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল, রাজনারায়ণ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ইত্যাদি পয়ার-ত্রিপদী-সর্বস্ব বাঙলা ছন্দের এই পরিবর্তন ও নবরূপায়ণে খুশি না হয়ে পারেন নি। বাঙলা নাটক ও কাব্যের ভবিষ্যৎ অমিত্রাক্ষরের মধ্যে নিহিত, মধুসূদনের একথা হয়তো পরবর্তী কালে সর্বাংশে সত্য হয়ে ওঠেনি (গৈরিশ ছন্দের প্রচুর প্রয়োগ হয়তো নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের অপরিহার্যতা স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু কাব্যে মধুসূদনের ছন্দোরীতির অক্ষম অনুকরণ কিছুকাল চললেও শেষ পর্যন্ত চিরতরে বর্জিত হয়েছে); তবু নবযুগের কবি-সাধকের এই অভিনব কাব্যরীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনাস্বাদিত মুক্তির বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে। সমাজ ও পরিবারের দাসত্ববন্ধন থেকে যে মুক্তি-কামনা মধুসূদনের ব্যক্তিতন্ত্রের মূল তাৎপর্য, ছন্দ-শৃঙ্খলের অস্বীকরণের মধ্যে তারই সাহিত্যিক প্রকাশ আছে বলে মনে হয়। কোন নিগড়েই তাঁর মনের সায় নেই, তাই তিনি 'ব্রজাঙ্গনায়' মিত্রাক্ষর রচনা করতে গিয়েও বলতে দ্বিধা করেন নি—'What have I to do with Rhyme?' সুতরাং যতই ত্রুটি থাক, 'পদ্মাবতীর' কয়েকটি অংশে প্রযুক্ত অমিত্রাক্ষরের প্রথম সর্বাত্মক ব্যবহারের দিক থেকে 'তিলোত্তমার' ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

কাব্যটির ছন্দোগত ত্রুটি সম্বন্ধে কবি ছিলেন সচেতন ('The versification in many places is rather defective'. 'I find the versification, very Kancha in many places.')। ভাষাও যে অনেকস্থলেই শক্ত, কর্কশ ও অমার্জিত, তাও তিনি জানতেন (আরও জানতেন অমিত্রাক্ষরের ভাষা বেশ শক্তই হয়ে থাকে, যেমন মিল্টনের ভাষা)। তাই প্রতি

সংস্করণেই ভাষা ও ছন্দের পরিমার্জনায় তাঁর প্রয়াসের অন্ত ছিলো না। যেখানে চারটি সর্গের মধ্যে কোথাও ঢিলে-ঢালা চাল-চলন নেই, রূপ ও রীতিগত অসংহতি নেই, কবিকল্পনায় মাধুরী আছে আর আছে ভাবৈশ্বর্য, সেখানে সৎকবির প্রশংসা মধুসূদনের প্রাপ্য এবং ছোটখাট নিন্দার কারণ উপেক্ষণীয় ('You no doubt excuse many things in a fellow's First poem'—মধুসূদনের এ প্রার্থনা স্মরণীয়)। আর 'তিলোত্তমাকে' মহাকাব্য বলে কবি নিজেই দাবি করেন নি, তা শুধু মহাকাব্যের ধরনে বর্ণিত—heroically told—কাহিনী মাত্র; তাই মহাকাব্যের নিরিখে তাকে বিচার করার প্রশ্ন ওঠে না।

'মেঘনাদবধের' আলোচনায় মধুসূদনের একটি মানস-বৈশিষ্ট্যে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। জাতীয় জীবনের পরিবর্তন ও উন্মাদনার মধ্যে জন্মেছিলেন বলেই, তাঁর জীবনের আবহাওয়া কোনদিন শান্ত হয়নি বলেই মধুসূদনের কবি-প্রকৃতি দ্বিধা-বিভক্ত ছিলো। তিনি ছিলেন ক্লাসিক কাব্যের ভক্ত—হোমার, ভার্জিল, ট্যাসো, মিল্টনের লেখায় তিনি এক অসামান্য কাব্যাদর্শের সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সচেতন শিল্পী-মন ক্লাসিক কাব্যের আদর্শ বেছে নিলেও যুগের ধর্ম তাকে খাঁটি ক্লাসিক কবি হতে বাধা দিয়েছে, শান্ত সমাহিত সামাজিক maturity-এর বদলে পরিবর্তন-যুগের সামাজিক immaturity ও চঞ্চলতা তাঁর মহাকাব্যের সার্থকতার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। মধুমত্ত ভৃঙ্গের মতো যিনি পাশ্চাত্ত্য ক্লাসিকের রস আহরণ করতেন—তাঁর মনের ঋদ্ধি ছিলো বৈ কি! গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের সৌন্দর্য ও স্থাপত্যশিল্প তিনি যেভাবে আপন কাব্যের অঙ্গীভূত করতে চেয়েছেন, বিভিন্ন চরিত্রের মানসলোক উদ্‌ঘাটনে যে অন্তর্দৃষ্টি ও চরিত্র-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, রাবণের রাজসভার বর্ণনায় এবং লঙ্কাপুরীর আভ্যন্তরীণ চিত্রে যে রুচি, বোধ ও বুদ্ধির প্রকাশ দেখিয়েছেন, চতুর্থ সর্গে মানব জীবনের সমস্ত

সুখ-দুঃখ-বেদনাবোধকে যে আন্তরিকতায় সর্বব্যাপী শান্তরসের মধ্যে লীন করে দিতে চেয়েছেন তাতে কবির অপরিমেয় মানসিক ঋদ্ধির স্বাক্ষর আছে। আরো দেখি, সে-মন পরিণতির পথে চলেছে 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য থেকে 'মেঘনাদবধকাব্যের' দিকে। তিনি পাশ্চাত্ত্যের পূর্বসূরীদের সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, বাল্যে ও মাদ্রাজ-প্রবাসকালে ব্যাস-বাল্মীকির সাহিত্য-সাহচর্য লাভ করেছেন—গ্রীক, রোমক আর ইংরেজের মতো সুসভ্য জাতির ইতিহাসের সঙ্গেও তিনি ছিলেন পরিচিত।

রাম-লক্ষ্মণের বাহুশক্তির সঙ্গে রাবণ-মেঘনাদের সংগ্রাম এবং অমোঘ অদৃষ্টের বিরূপতায় তাদের পরাজয় মহাকাব্যোচিত, সন্দেহ নেই। কাহিনীর বিশাল ও সুগম্ভীর পটভূমিকা, ঘটনাবস্তুর সরল বলিষ্ঠ রূপায়ণ, ভাবের সমুন্নত মহিমা, রাবণের রাজসভার গঠনের মতোই ওজন-ভারী দৃঢ়-ভিত্তি কাব্য-গঠন-রীতি, কুশল স্থপতির মতো শব্দ ও ভাষার মোটা টানে সৌন্দর্য-সৃষ্টি, ভাষা ও ছন্দের উদাত্ত গভীর ধ্বনিগৌরব ও অর্থমহিমা 'মেঘনাদবধকাব্যে' দেখতে পাই। এবং তাতেই মহাকাব্যটির মধ্যে যে একটা চিরায়ত (classical) কাব্যাদর্শ আছে, তা বুঝতে পারি। এই পর্যন্ত মধুসূদনের কাব্যে ক্লাসিক ধ্যান-ধারণার প্রকাশ।

অন্যদিকে যুগের উন্মাদনা ও রূপ-রস-রঙ তিনি কাব্যটিতে উপেক্ষা করতে পারেন নি। তিনি এখানে মানুষকে সবচেয়ে বড়ো করে দেখেছেন; যে মানুষকে দেখেছেন—সে বলবীর্যসম্পন্ন, অপ্রতিহতশক্তি, আত্মপ্রত্যয়ধারী অথচ দৈবাহত। সে যেন দুর্ভাগ্যের জলতলে অর্ধ-মগ্ন একটি শৈল—তার সেই বিসদৃশ অবস্থাকে ঘিরে আছে প্রিয়তমা পত্নী, পিতৃভক্ত পুত্র, লক্ষ্মীশ্রী পুত্রবধূ, সমদুঃখভাগী সেবক। এই জাতীয় মানুষ-চরিত্র ক্লাসিক কল্পনায় দেখা দেয় না, দেখা দেয় রোমান্টিক কল্পনায়। মনে হয়, আমাদের পর-শাসন-পীড়িত, অদৃষ্ট-বিড়ম্বিত ব্যথাহত জীবনের সঙ্গে 'মেঘনাদবধকাব্যের' মানবীয় চরিত্রগুলির কোথায় যেন মিল আছে।

সবচেয়ে বড়ো কথা, সমস্ত কাব্যটি জুড়ে যে করুণ রসের প্রকাশ—তার মধ্যে ক্লাসিক কাব্যের বস্তু-প্রাধান্যের চেয়ে রোমান্টিক কাব্যের আত্ম-প্রাধান্যের পরিচয় আছে। নৈরাশ্য ও দুঃখ কবির জীবনে এসেছে—বেশি করেই এসেছে—তার জন্য কবির মন ভেঙেছে, আত্মা কেঁদেছে। 'মেঘনাদবধকাব্যের' করুণ রস যেন কবির সেই ব্যথাহত আত্মার অশ্রুর নির্ঝর। সুতরাং কাব্যটির সকরুণ গীতধর্মী অংশ যেমন মধুসূদনের ব্যক্তিগত জীবনের, তেমনি জাতীয় জীবনের রোমান্টিক মর্মসঙ্গীত। অতএব, 'মেঘনাদবধকাব্যকে' কোন একটি নামে অভিহিত করা যায় না। তার মধ্যে ক্লাসিক্যাল ও রোমান্টিক উভয় আদর্শেরই অনুবর্তন দেখা যায়। নতুন নিরিখে বিচার না করলে মধুসূদনের প্রতি অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে—অনেকে তাই ভুল বুঝেছেন কবিকে।

এলিয়টের মতানুসারে, মৌলিকতা ও বিদ্রোহ সত্ত্বেও ক্লাসিক কবিকে জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যেরই ধারক হতে হবে। 'মেঘনাদবধকাব্যে' সত্যিই কি তা দেখতে পাওয়া যায় ?

আমরা জানি, কাব্যটির মধ্যে রামায়ণের সিদ্ধরসের ব্যত্যয় ঘটেছে। রাম বিষ্ণুর অবতার, মহৎ কিছু কর্তব্যভার নিয়ে তিনি ধরাতে অবতীর্ণ—এই সংস্কারই শতাব্দীর পর শতাব্দী আমাদের মনের মধ্যে গড়ে উঠেছে। কিন্তু 'মেঘনাদবধকাব্যে' সেই শক্তিধর যুগাবতার রামচন্দ্রকে পাইনে। তিনি একেবারেই দুর্বল, অসহায়, আত্মপ্রত্যয়হীন, দেবতানির্ভর একটি নিকৃষ্ট চরিত্র—পাঠকের মনে তাঁর প্রতি বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা জাগ্রত হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি মধুসূদন মনুষ্যত্বের যে অভিনব মর্যাদাবোধ ও জীবন সম্পর্কে যে গভীর শ্রদ্ধা অঙ্গীকার করেছেন—তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে রামচন্দ্রকে নিয়তির অলঙ্ঘ্য নিয়মের ধারক মাত্র মনে হয়, একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসেবে প্রতীতি হয় না। বীর্য ও দার্ঢ্য তাঁর চরিত্রের নিহিতার্থ হয়ে ওঠেনি। তাই রামচন্দ্র 'মেঘনাদবধকাব্যে' আপন চিরায়ত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হননি। তিনি প্রমীলার সঙ্গে

যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছেন—তার যে নৈতিক কারণ তিনি শুনিয়েছেন, সেটা কথার কথা মাত্র। আসলে বীর্যবত্তায় তিনি অপরিমেয় নন, তার চেয়েও বড়ো কথা, আত্মবিশ্বাস তাঁর মধ্যে নেই বললেই চলে। দূতীর আকৃতি দেখে তিনি ভয় পেয়েছিলেন—ফলে 'যুদ্ধসাধ ত্যজিনু তখনি।' লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ জরা-জর্জর অন্ধ-আতুর স্ত্রীলোকেরই মতো। লক্ষ্মণ নেই। 'রাখিবে আজি কে, কহ আমাকে?' এ কোন্ রামচন্দ্র? নিশ্চয় পুরুষোত্তম নন। লক্ষ্মণ রামের তুলনায় উন্নত চরিত্রের—স্বেচ্ছায় বনবাসজীবন যাপন তাঁর ব্রহ্মচর্যের উদাহরণ, চণ্ডীর দেউলে যাত্রাকালে সমস্ত ছলনাকে তিনি জয় করেছেন আপন চরিত্রশক্তিতে। তবু ষষ্ঠ সর্গে ইন্দ্রজিতের সামনে তাঁকে অত্যন্ত ছোট বলেই মনে হয়, তস্কর বলতে তাকে দ্বিধা হয় না, অস্ত্রহীন ইন্দ্রজিৎ-নিধনে ক্ষত্রকুলের সন্তান লক্ষ্মণকে আগ্রহী দেখে একটু বিতৃষ্ণাই জাগে।

এইভাবে বিচার করলে, রাবণ ও ইন্দ্রজিতের তুলনায় রাম-লক্ষ্মণকে নিষ্প্রভ বলে মনে হয়। মহাকাব্যোচিত মর্যাদাবোধ, ক্ষত্রিয়ের চরিত্রশক্তি ও পুরুষের আত্মপ্রত্যয়ের পরীক্ষায় তাঁরা সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। আসলে মানুষ হয়েও মনুষ্যত্বে তাদের বিশ্বাস ততটা নেই—যতটা আছে দেবত্বে। তাই রামচন্দ্রের মুখে শুনতে পাই—'সুফল ফলে দেবের প্রসাদে।' অতএব ঊনবিংশ শতাব্দীর কবির মানব-বীক্ষা ও মানব-দীক্ষাই রামচন্দ্রের চিরায়ত চরিত্র-কল্পনার বিরোধিতা না করে পারেনি—এই দুটি চরিত্রকে ঘিরে যে সিদ্ধরসের সঞ্চার, তা-ও উপেক্ষা করতে কবির কুণ্ঠা হয়নি। কারণ মনে রাখতে হবে, 'no poetry can be regarded as truly heroic unless the major successes of the hero are achieved by more or less human means.'।

দ্বিতীয়তঃ, মধুসূদন সমসাময়িক যুগের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের দৃষ্টিতে রামায়ণের কাহিনী পুনর্বিবেচনা করেছিলেন। সীতা-হরণকে ঘটনা হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব

দিতে তাঁর মন সরেনি, কারণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তা অপরাধের নয়। মধুসূদনের কাছে সীতা-হরণের চেয়েও গুরুতর ঘটনা রামচন্দ্রের স্বাধীন লঙ্কা আক্রমণ। আর রাবণ, বীরবাহু, ইন্দ্রজিৎ? তারা শত্রুর হাত থেকে, পররাজ্যলোলুপের গ্রাস থেকে স্বদেশের সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন—তাঁরা বীর, স্বদেশপ্রেমিক, আত্মবিশ্বাসী পুরুষ। আসল কথা, দেশে জাতীয়তার যেটুকু মন্ত্রোচ্চারণ তখন শোনা যাচ্ছিলো—তারই প্রভাবে, নিজেরই অজ্ঞাতসারে, মধুসূদন রামায়ণের ঘটনাকে এমনভাবে জাতীয়তাবোধের দিক থেকে বিশ্লেষণ করতে প্রয়াস পান। জানি, তাঁর জীবনেতিহাসে ইয়ং বেঙ্গলের কথাটাই প্রধান হয়ে আছে, তার মধ্যে থেকে কবির জাতিগত প্রাণের বার্তা ব্যাখ্যা করা কঠিন; তবু 'মেঘনাদবধকাব্য' পড়তে পড়তে মনে হয়, কবির মনুষ্যত্বের দৃষ্টি ছিলো, ছিলো জাতীয়তার দৃষ্টি—আর তা সমসাময়িক যুগেরই অনিবার্য সৃষ্টি। আর heroie poetry-তে কবির এই দৃষ্টিই সঙ্গত; সি. এম্. বাওরা বলেছেন, 'It works in conditions determined by special conceptions of manhood and honour'।

'মেঘনাদবধকাব্য' শুধু বিষয়বস্তুর রূপায়ণের দিক থেকেই অভিনব নয়, অভিনব আরো অনেক দিক থেকে। মিত্রাক্ষরের বেড়ী তিনি ভেঙেছিলেন—পয়ারের একচ্ছত্র অধিকার তিনি করেছিলেন অস্বীকার। ছন্দের খাতিরে ভাবকে নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছা মধুসূদন বরদাস্ত করতে পারেন নি, মানতে পারেন নি ভাব-যতির (sense-pause) নির্দিষ্টতা। তাই তাঁর হাত থেকে অমিত্রাক্ষরের জন্ম হলো—ইন্দ্রজিতের তেজোদীপ্ত ভাষণ থেকে শুরু করে সীতার করুণ-কোমল গুঞ্জন পর্যন্ত তার মধ্যে আপন আসন করে নিলো। শব্দ-চয়নে ভাষা-রচনায় নতুনত্বের অন্ত দেখিনে। মনে হয়, এ যেন এক নতুন কণ্ঠের নতুন ধ্বনিগুচ্ছ। নামধাতুর অভাব আমাদের ভাষাকে এলিয়ে দিয়েছে—তিনি বুঝতে পেরে-ছিলেন—তাইতো ভালো-মন্দের নানা নামধাতুর প্রাচুর্যে কাব্যকে

ভরিয়ে দিয়েছেন তিনি। ধ্বনি-গৌরব ও ব্যঞ্জনা-মহিমার জন্য নিয়মের রাজ্য ছাড়িয়ে যেতে তিনি দ্বিধা করেন নি। রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এ সমস্তই অপরাধ—কিন্তু একটু উদার ও অভিনব রসবোধ প্রয়োগ করলে মধুসূদনের উদ্দেশ্যের সততা ও কাব্যের সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যাবে।

সুতরাং 'মেঘনাদবধকাব্য' বুঝতে হলে, তার মধ্যে থেকে রস গ্রহণ করতে হলে—পাঠককে মানসিক পক্ষপাতিত্ব বিসর্জন দিতে হবে, সিদ্ধরসের আকাজ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে, অভিনবকে সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ ও আস্বাদন করবার জন্য মনের দিক থেকে প্রস্তুত হতে হবে। অন্যথায় কবির প্রতি অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং দেখা গেলো, 'মেঘনাদবধকাব্যে' মৌলিক চিন্তা আছে, বিদ্রোহ আছে। তৎসত্ত্বেও 'in retrospect, we can see that he is also the continuer of their traditions, that he preserves essential family characteristics, and that his difference of behaviour is a difference in the circumstances of another age.'। মধুসূদনের ক্ষেত্রে ক্লাসিক কবি সম্পর্কে এলিয়টের এই মন্তব্য প্রয়োগ কারো কাছে যদি অযৌক্তিক মনে হয়, তবে একজন বাঙালী সমালোচকের উক্তি উদ্ধৃত করেও একই সিদ্ধান্তে পৌছোতে পারি—'কিন্তু বিষয়টি গভীরভাবে বিচার করিলে মাইকেলের এই বিকৃতি সাহিত্যের দিক দিয়া তেমন দোষাবহ নাও হইতে পারে। সমস্ত প্রাচীন কাহিনীই কালক্রমে বিবর্তনের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠে এবং তাহাদের অল্পবিস্তর পরিবর্তন হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে রাম রাবণের যুদ্ধ প্রথমে ছিল আর্য-অনার্য সভ্যতার সংঘর্ষের কাহিনী, কিন্তু পরে যখন আর্যসভ্যতা ও অনার্যসভ্যতার সংমিশ্রণ হইয়া গেল তখন এই বিরোধের ভাবটি কাটিয়া গেল। এই পরিবর্তনের জন্য এবং অন্যান্য কারণের জন্যও পরবর্তী কালে রাম যুযুৎসু আর্যসভ্যতার প্রতীক না হইয়া ভক্তবৎসল দেবতায় রূপান্তরিত হইলেন। মেঘনাদবধে

কাহিনীর রূপান্তরণের আর একটি ধাপ পাওয়া যায় মাত্র। অবশ্য এই পরিবর্তন পূর্ববর্তী পরিবর্তন অপেক্ষা অনেক বেশী দূরপ্রসারী।'

অনেকে বলেন, 'মেঘনাদবধকাব্যে' কোন নীতি-চেতনার (sense of morality) প্রকাশ নেই। নীতি বলতে যদি ধর্মনীতি বোঝায়, তবে কাব্যটিতে তার অভাব আছে নিশ্চয়ই। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার, সীতা লক্ষ্মীস্বরূপা। সমগ্র কহিনীতে ছড়িয়ে আছে ভক্তবৎসল দেবতা এবং শাশ্বত সত্য, ন্যায় ও ধর্মের মূর্ত প্রতীক রামচন্দ্রের অনতিক্রম্য নৈতিক শক্তির তত্ত্ব। তিনি রাজার পুত্র হয়ে বনে গেলেন কেন—পিতৃসত্য পালনের জন্য। স্বাধীন লঙ্কা আক্রমণে তাঁর তৎপরতা অপহৃতা ধর্মপত্নী-উদ্ধারের জন্য, তিনি আসল সীতাকে বনে নির্বাসন দিয়ে স্বর্ণ-সীতা নিয়ে জীবন কাটালেন রাজধর্ম রক্ষার জন্য। সুতরাং রামায়ণের কাহিনী বিস্তারে, তার চরিত্র-কল্পনায় একটা চিরায়ত ধর্মনীতি অনুস্যূত হয়ে আছে, সন্দেহ নেই।

কিন্তু 'মেঘনাদবধকাব্যে' রামায়নের কাহিনীর পুনর্বিচার আছে, আছে তার বহুমুখী রূপান্তর। রামায়ণে যেখানে রামচন্দ্রের সত্য-ন্যায়-বোধ ও নৈতিক শক্তির ওপর জোর ছিলো, সেখানে মধুসূদনের কাব্যে জোর সরে এলো রাবণ-ইন্দ্রজিতের মানবিক ও ক্ষাত্রশক্তির ওপর। এই পরিবর্তনের পেছনে কাজ করেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার সমাজ, সমসাময়িক যুগধর্ম, কবির মনের প্রবণতা, হোমারের প্রভাব। ফলে রামায়ণের বহুশ্রুত ধর্মনীতি অক্ষুণ্ণ থাকেনি। মধুসূদনের এক ভক্ত সমালোচক অবশ্য একথা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, রাক্ষসদের প্রতি কবি যতই সহানুভূতি পোষণ করুন না কেন, তাঁর যুদ্ধবর্ণনা যত তেজোদৃপ্তই হোক না কেন, তাঁর কাব্যে বাহুবলের সংগ্রামকে আচ্ছন্ন করে আছে নৈতিক শক্তির অপ্রতিরোধ্য প্রভাব। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, চিত্রাঙ্গদার সেই স্পষ্টোক্তি : 'হায়, নাথ ; নিজ কর্মফলে মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলে আপনি।' এমন কি রাবণের আরাধ্য

শিবের মুখেও শোনা গেছে—'অধর্ম-আচারী এই রক্ষঃকুলপতি।' শুধু তাই নয়, রাবণের চোখেও জানকী—'পাবক-শিখারূপিণী।' সুধী সমালেচকের মতানুসারে, এই কাব্যের রাম ভীরু হতে পারেন, কিন্তু তাঁর ভীরুতাও মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে এবং এই নৈতিক আদর্শ সমস্ত কাব্যখানিকে বিস্তৃতি ও ঐক্য দান করেছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, 'মেঘনাদবধকাব্যের' এমনিতর কষ্টকৃত নৈতিক ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই, তা মধুসূদন ও তাঁর কাব্যেকে বুঝতে সহায়তা করে না, এমন কি ভুল বোঝার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। তার কারণ, এই ধরনের নৈতিক শক্তির অনুপ্রাণনা কাব্যটিতে থাকলেও কবি তার ওপর জোর দেননি। দ্বিতীয়তঃ শিব আর চিত্রাঙ্গদার উক্তিতে যেমন ধর্ম ও নীতির কথা আছে, তেমনি রাবণের বিভিন্ন মন্তব্যে বিরূপ অদৃষ্টের উল্লেখ আছে। অতএব পাশ্চাত্ত্য অদৃষ্টবাদ ও ভারতীয় কর্মফলবাদ উভয়ের দ্বন্দ্ব কাব্যটিতে দেখা যায়। বিস্তৃত আলোচনা সাপেক্ষে বলা যায়, রাবণকথিত অদৃষ্টবাদের ওপরই কবি যেন অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর লঙ্কেশ্বরের সমগ্র চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে, তার অজস্র কথার আলোকে বিচার করে সিদ্ধান্ত করা যায়—'পাবক-শিখারূপিণী' বিশেষণের জন্ম বক্তার শোকোচ্ছ্বাসের প্রবলতার মধ্যে, আন্তরিক সত্যবোধের মধ্যে নয়। অতএব মেনে নেওয়াই ভালো, 'মেঘনাদবধকাব্যে' শাশ্বত ধর্মনীতির কথা নেই এবং নেই বলেই রামায়ণের সঙ্গে, এমন কি মিল্টনের প্যারাডাইস্ লষ্টের সঙ্গে (এবং দান্তের কাব্যের সঙ্গে) তার মৌলিক পার্থক্য আছে।

মিল্টনে কি দেখি? তিনি যুগের আকাশে নিঃসঙ্গ আত্মা হয়েও ছিলেন সেই যুগেরই সত্য-প্রতিনিধি। ছুটো বিপরীত শক্তির সঙ্ঘাত—প্যাগানিজম্ ও খৃষ্টিয়ানিটির দ্বন্দ্ব—তিনি আপন অন্তরে অনুভব করেছিলেন। পিতৃসূত্রে শৈশবেই মিল্টন পেয়েছিলেন অনির্দেশ্য আধিদৈবিক বিশ্বাস। তবে রেনেসাঁসের আদর্শগত ফ্যাসান স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং বছর তিরিশেক বয়স পর্যন্ত রেনেসাঁসের

সন্তান ছিলেন। কিন্তু যেদিন ইংল্যাণ্ডের আকাশ জুড়ে রাজা ও পার্লামেণ্টের বিবাদ শুরু হলো, সেদিন রেনেসাঁসের সৌন্দর্য ও প্রেমের হাতছানি উপেক্ষা করে মিল্টন আপনার ভেতরে এক প্রবল ধর্মচেতনা জাগিয়ে তুললেন। আগেও তাঁর মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখেছি—যখন ইংল্যাণ্ডের চার্চের ওপর অত্যাচার চলছিলো, আচার অনুষ্ঠানকে রোমীয় রূপ দিয়ে পিউরিটান ধর্মভাবের অবমাননার চেষ্টা হচ্ছিলো। ইংল্যাণ্ডের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও ধর্মগত কলহের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য রেষ্টোরেসনের যুগে তিনি ব্যক্তিজীবনে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন (১৬৬০ খৃঃ), একমাত্র বাইবেলের মধ্যে মনের আশ্রয় খুঁজে নিলেন। ফলে জন্ম হলো প্যারাডাইস্ লষ্টের। কাব্যখানিতে বাইবেলকে কেন্দ্র করে মিল্টনের পিউরিটান মনের যে ভাবনা, তারই প্রকাশ দেখি—বাইবেল তাঁর চোখে যে দৃষ্টি দিয়েছিলো—সেই দৃষ্টিই এই মহৎ সৃষ্টিতে সমুদ্ভাসিত। 'He projects himself, his feelings, knowledge and aspirations into the characters of his epic, both the primitive human creatures and the super-human beings, whether celestial or infernal.'

যুগ, সমাজ ও মন মিল্টনের কাব্যে যেমন পিউরিটান খৃষ্টান ধর্ম ও একটা সর্বব্যাপী নৈতিক আদর্শের ছবি ফুটিয়ে তুলেছে, তেমনি মধুসূদনের 'মেঘনাদবধকাব্যে' যুগ আর যুগপ্রভাবিত মনের প্রবণতাই একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছে, চিরকালের ধর্মনীতি পরিহার করেছে। একথা যদি মনে থাকে তবে কাব্যটিতে রামচন্দ্রের নৈতিক আদর্শের প্রভাব খুঁজে বেড়ানোর ব্যর্থ প্রয়াস করতে হয় না।

আর একটি কথা। 'মেঘনাদবধকাব্যে' চিরাচরিত ধর্মনীতির কথা নেই সত্য, কিন্তু তাতে কোন নীতিই নেই, এ কথাই বা বলি কি করে? শুধুই কি এপিক আকার, ক্লাসিক আদর্শ, অভিনব অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও ওজোস্বিনী ভাষার বজ্রনির্ঘোষ তাকে মহৎ কাব্যে

পরিণত করেছে? এসবই তো কাব্যের বহিরঙ্গ। এবং সেই বহিরঙ্গের ওপর নির্ভর করে একটা কাব্য কখনও মহৎ হয়ে উঠতে পারে না। তবে কি সেই অন্তরঙ্গ ভাব ও ভাবনা যা 'মেঘনাদবধকাব্যকে' যুগোত্তীর্ণ সৃষ্টিতে পরিণত করেছে? এর উত্তরে বলবো, সর্বকালের ধর্মনীতি নয়, চিরন্তন আদর্শ নয়—এক অভিনব জীবননীতিই কাব্যটির প্রাণ। বীরবাহু, রাবণ ও ইন্দ্রজিতে যে জীবনতৃষ্ণা দেখেছি, যে মানবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি পেয়েছি—বিরূপ অদৃষ্টের হাতে শত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তা আপন মাহাত্ম্যে গরীয়ান ও মহিমময় হয়ে উঠেছে। ধর্মনীতি মানুষকে কতটা লাভবান করে তা আলোচনা করে লাভ নেই, কিন্তু এই মানবতাবাদ ও জীবনতৃষ্ণা মানুষকে যে ঠকায় না একথা বলার দরকার আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, ধর্মনীতি যেখানে আদর্শ নয়—সেখানে রামায়ণের কাহিনী নির্বাচন করা হলো কেন? মধুসূদনের বিষয়-নির্বাচন সম্পর্কে একথাই বলা চলে যে, পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে একটা নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্ত জীবনের আদর্শ সংগঠিত করার সুযোগ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন।

'মেঘনাদবধকাব্যের' কারুকর্ম অনন্য শিল্প-প্রতিভার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মহাকাব্যে সূক্ষ্ম তুলির আঁচড় টানার সুযোগ নেই, অনুভূতিবেদ্য মধুর ব্যঞ্জনা সৃষ্টির অবসর নেই, নেই কোন কল্পনা-নির্ভর শিল্প-সঙ্কেতের সম্ভাবনা। মানুষের প্রাথমিক চিত্তবৃত্তি, তার সহজ সরল সৌন্দর্যবোধ ও স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ জীবনরূপই মহাকাব্যে রূপায়িত হয়—তাই সেখানে সূক্ষ্মতার সাধনা নিষিদ্ধ, চারুতার অতিশয়তা অবাঞ্ছিত। কিছু শব্দরেখায় ফুটিয়ে তুলবো, আর কিছু পাঠকের কল্পনাবৃত্তির জন্য রেখে যাবো—এই ধরনের চিন্তা মহা-কাব্যকারের নেই। নিপুণ স্থপতির প্রতিভা নিয়ে এক গুরুভার কাব্যসৌধের শিল্প-সৌন্দর্য রচনা করাই তাঁর ধ্যান।

মধুসূদন মহাকাব্যের কারুকর্ম অনেকটা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন 'মেঘনাদবধকাব্যে'। আমরা আগেই দেখেছি—একটি ক্লাসিক কাব্য রচনার উদ্দেশ্য থাকলেও কবি খাঁটি ক্লাসিক কাব্য

রচনা করতে পারেন নি, নানা কারণে সমগ্র রচনাটির মধ্যে একটি রোমান্টিক মন উঁকি মেরেছে। তবু 'মেঘনাদবধকাব্য' যে পুরোপুরি রোমান্টিক কাব্য হয়ে ওঠেনি—তার অন্যতম কারণ কাব্যটির আঙ্গিক। ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদির দিক থেকে মধুসূদন যতটা সম্ভব মহাকাব্যের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁচেছেন।

কবির হাতে মোটা তুলি ছিলো—সন্দেহ নেই, সেই তুলির মোটা টানে সরল বলিষ্ঠ চিত্র ফুটে উঠতো—মালমশলা নির্বাচনের সময় শক্তির দিকে দৃষ্টি রাখতেন তিনি। তাই তাঁর বাক্য কোথাও এলিয়ে পড়েনি—শব্দধ্বনি ক্ষীণশ্রুতির সৃষ্টি করেনি, ভাষা-চিত্রে কিছুই অস্পষ্ট থেকে যায়নি। প্রথম সর্গে রাবণের রাজসভার বর্ণনা আছে—সে বর্ণনায় কোন সৌন্দর্য-সঙ্কেত নেই, কোন অনাবিষ্কৃত মাধুর্যলোকের রহস্যভেদের চেষ্টা নেই, ভাষা-ছন্দ-ধ্বনির কোন সূক্ষ্মধর্মিতা চোখে পড়ে না। যতটুকু বলা হয়েছে তার চেয়ে বেশির দিকে মনকে টানতে পারে না এই সভা বর্ণনা। সভাগৃহের স্তম্ভ থাকা স্বাভাবিক—তবে এটি স্বর্ণলঙ্কার রাজসভা বলেই তাতে বিচিত্র বর্ণের রত্নের সমাবেশ হয়েছে। সেই সারি সারি সমুন্নত স্তম্ভগুলি ধরে আছে স্বর্ণছাদ—যেমন বাসুকী আপন মস্তকে ধরে আছেন বসুন্ধরাকে। এখানে কোন বিস্তৃত বর্ণনা পাইনে, সৌন্দর্য-বস্তুর প্রাচুর্য কবি এড়িয়ে গেছেন--কিন্তু এই মহাকাব্যিক উপমাই (Epic Similie) তাঁর সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়েছে। বাসুকীর শক্তি স্তম্ভগুলির শক্তির কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, আবার বিচিত্র সৌন্দর্যের লীলানিকেতন ও ঐশ্বর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার এই পৃথিবী স্বর্ণছাদের ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের ধারণা সহজেই জাগিয়ে তোলে। তবে এই উপমার তাৎপর্য বোঝার জন্য কোন গভীরতর রসবোধের প্রয়োজন হয় না, উপলব্ধির সূক্ষ্ম স্তরে পাঠককে আরোহণ করতে হয় না—সহজ সরল অথচ বলিষ্ঠ এই চিত্র-রচনা-কৌশল। সভাগৃহের তলদেশ? অযুত রত্নখচিত। স্বর্ণছাদ নিরাভরণ নয়—ঝালরে ঝলিছে মুকুতা। এমনিতর রাজসভায় পাত্রমিত্রসহ উপবিষ্ট আছেন

লঙ্কাধিপতি—দেখে মনে হয়, স্বর্ণকূট পর্বতের একটি তেজোদীপ্ত স্বর্ণশৃঙ্গ যেন শোভা পাচ্ছে। এই যে রাজসভার বর্ণনা—তার মধ্যে সূক্ষ্মতা কোথায়, ব্যঞ্জনা কোথায়? তুলির কারিগরিতে, তার আধো-স্পষ্ট আধো-অস্পষ্ট রেখায় কোন অন্তর্লীন সৌন্দর্যের ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি কিংবা বিচিত্রবর্ণ ইন্দ্রধনুর সৌন্দর্যচ্ছটাও এখানে নেই। বিভিন্ন সাহিত্যে রাজসভার যে বর্ণনা পাই—মধুসূদনের বর্ণনায় যেন তারই প্রতিফলন—শুধু হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের একটু প্রাচুর্য ঘটেছে। তা হলে কি সমস্ত বর্ণনাই অসার্থক? না, তা নয়। যে কয়েকটি সৌন্দর্য-বস্তুর আমদানী তিনি করেছেন—তারই গঠন-কৌশলে, বিন্যাস-নৈপুণ্যে, সংস্থাপন-সামঞ্জস্যে তিনি সমগ্রভাবে এক বৃহদাকার সৃষ্টির গথিক সৌন্দর্য (Gothic beauty) ফুটিয়ে তুলেছেন। মহাকাব্যকারের কাছ থেকে এইটুকুই আশা করা যায় এবং সেই আশা পূরণে মধুসূদন সম্পূর্ণ সমর্থ হয়েছেন।

কিংবা ধরা যাক অশোক-কাননে বিষাদময়ী সীতার বর্ণনা। এখানে কবি কোন কল্পনা-নির্ভর ব্যঞ্জনা-শক্তির পরিচয় দিতে চাননি—শুধু কয়েকটি উপমা রচনা করে ও দুই একটি শব্দ বাজিয়ে নিয়ে সীতার মর্মস্পর্শী অবস্থা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। প্রথম চরণটি 'একাকিনী' শব্দ দিয়ে শুরু, 'নীরব' শব্দ দিয়ে শেষ—মাঝখানে 'শোকাকুলা', 'রাঘববাঞ্ছা' 'আঁধার কুটীরের' উল্লেখে সমস্ত পরিস্থিতির চিত্র দেখি। দুঃখের দিনে প্রিয়জনের কাছে বেদনা প্রকাশ করে আমরা মনের ভার লাঘব করি—কিন্তু তখন যদি 'একাকিনী' থাকতে হয়? তবে দুঃখের বোঝা আরও ভারী হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের বালিকাবধূর ক্রন্দন যখন দেয়ালে বাধা পেয়ে ফিরে আসে—তখন পাঠকের মনও হাহাকার করে ওঠে। তাই 'নীরবে' কথাটির মধ্যে শব্দার্থশক্তির একটা চরম পরীক্ষা হয়ে গেছে—তার যতটুকু শক্তি, তার চেয়ে বেশি ব্যঞ্জনা তার মধ্যে আছে। পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তিতে 'আঁধার কুটীরের' পর একটু নিঃশ্বাস

টেনে 'নীরবে' শব্দটি উচ্চারণ করতে হয়—সীতার বেদনা প্রকাশের পক্ষে শব্দটির নির্বাচন ও সংস্থান অত্যন্ত উপযোগী হয়েছে। তারপর সীতাকে হীন-প্রাণা হরিণী ও চেড়ীদের বাঘিনী, মলিনবদনা দেবীকে খনি-গর্ভের সূর্যকান্তমণি কিংবা সাগরতলের রমার সঙ্গে তুলনা দেওয়ার মধ্যেও একটা বলিষ্ঠ বিষাদ-চিত্র আছে। কোনপ্রকার লিরিক সুর জমে ওঠার সুযোগই কবি এখানে রাখেন নি। এইক্ষেত্রে আমরা দেখি, এপিক কবির মতোই মধুসূদন উপমার মালায় কাব্যের কণ্ঠ সাজিয়ে তুলেছেন এবং ভাব-প্রকাশের পক্ষে উপমাকে উপযুক্ত বলে গ্রহণ করতে একটুও ইতস্ততঃ করেন নি। পবনের 'রহিয়া রহিয়া' স্বননের মধ্যে লিরিকের একটু ব্যঞ্জনা আছে এবং তরুর মনস্তাপে সাজ খুলে ফেলার মধ্যে তা আরেকটু অগ্রসর হয়ে কবির রোমান্টিক কল্পনা-মধুর্যে আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে। 'না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে। ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে?'—বারেক (রোমান্টিক) লিরিক সুরের শেষে আবার যেন এপিক সুরেই ফিরে এলেন কবি। এইভাবে যদি বিচার-বিশ্লেষণ করি—তবে চিত্র-রচনায় ও দৃশ্য-বর্ণনায় এপিকের বৈশিষ্ট্য 'মেঘনাদবধকাব্যে' যথেষ্টই সন্ধান পাই।

অন্যদিকে—

নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,—
অভাগিনী! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর? কি কহিব, সুধিবেন যবে
সীতা, 'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর! কি বলে বুঝাব
উর্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে?
উঠ, বৎস! আজি কেন বিমুখ হে তুমি

সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে।
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন ; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা ; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে,
প্রাণাধিক ?

রামচন্দ্রের এই শোকের বর্ণনা—ঠিক ক্লাসিক নয়। এখানে একটি উপমাও নেই, যুক্তাক্ষর তৎসম শব্দ অত্যন্ত কম, কোন বাক্যই দীর্ঘ নয়। ছোট ছোট কথায় থেকে থেকে রামচন্দ্রের বিলাপ 'মর্মরিয়া' উঠেছে। শোকের প্রবলতায় ভাবের মধ্যে সরল ধারাবাহিকতা থাকেনি, চিত্তচাঞ্চল্যে ভাব থেকে ভাবান্তরে যাওয়ার পরিচয় আছে। এ সমস্তই রোমান্টিক কাব্যের—লিরিক কাব্যের লক্ষণ, ক্লাসিক কাব্যের ধর্মবিরোধী। পূর্বের উদাহরণ দুটিতে দেখেছি—দুই একটি বাক্যে লিরিকের সুর জমে উঠতেই উপমার জোরালো আঘাতে তার আবেশটুকু দূর হয়ে গেছে, কবি যে মহাকাব্য রচনা করেছেন—সে সম্বন্ধে অবিলম্বেই সচেতন হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এখানে কবি যেন তাঁর কাব্যাদর্শ ভুলে বসে আছেন, রামের বিরামহীন বিলাপে তিনি যেন তন্ময় হয়ে গেছেন, মন্ময় সুরে সুরে তাকে লীলায়িত করতে কবির যেন ক্লান্তি নেই। যেমন অলঙ্কারের অভাব আছে, আছে ভাষায় কোমলতা—তেমনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ চরণগুলিকে উদাত্ত শক্তি, ঐশ্বর্য ও ওজোগুণ দান না করায় গীতধর্ম প্রবল হয়ে উঠেছে। রামের বিলাপ পড়তে পড়তে মনে হয়, 'বীরাঙ্গনার' কোমলধ্বনি যেন শুনছি।

অতএব দেখা গেলো, কবি যেখানে দুঃখের বর্ণনায় কাব্যের আদর্শ বিস্মৃত হয়েছেন—সেখানেই রোমান্টিক ও লিরিক সুর বেজে উঠেছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সচেতন থেকে মধুসূদন যে ক্লাসিক আঙ্গিক রচনা করতে পেরেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধকাব্যের' আলঙ্কারিকতা বহু আলোচনার অপেক্ষা রাখে। বস্তুতঃ, তাঁর কবিধর্ম ও ভাবধর্ম যতটা গুরুত্বপূর্ণ, কবিকর্ম তার চেয়ে কম নয়—অলঙ্কার-সৃষ্টির মধ্যে তাঁর সচেতন মন ক্লাসিক কাব্য-গঠন-পদ্ধতি অনুসরণ করার সুবর্ণ-সুযোগ দেখতে পেয়েছিলো। তাই নিরবচ্ছিন্ন অলঙ্কার-অনুশীলনে তাঁর ক্লান্তি দেখিনে। পণ্ডিতেরা এই সমস্ত অলঙ্কার কতটা শাস্ত্রসম্মত তা নিয়ে তর্ক করতে পারেন, কিন্তু সেই তর্কের ফলাফল যা-ই হোক না কেন, তাঁর সাধনায় বাঙলা অলঙ্কারশাস্ত্রের গৌরব যে বেড়েছে, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। যেখানে অজস্রতা আছে, সেখানে ভালোর সঙ্গে মন্দ থাকবেই। তাই তাঁর কাব্যে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার যেমন দেখি, তেমনি নিকৃষ্ট অলঙ্কারও চোখে পড়ে।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে 'লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে।' ভূতলশায়ী সেই বিরাট শক্তিকে, মৃত্যুবজ্রাহত সেই পুরুষসিংহকে কবি একটি মালোপমায় তুলে ধরেছেন।

নির্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।

এখানে অজস্র কথার ফুলঝুরি নেই, অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর নেই, আছে বিষয়ের গাম্ভীর্যব্যঞ্জক একটি উপমা-চিত্র। সেই চিত্রে ইন্দ্রজিৎ-নিধনের গুরুত্ব সুপরিস্ফুট, একটা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার মতোই তা যে শোকাবহ ও বিপর্যয়কর—একটি মাত্র আলঙ্কারিক বচন-বিন্যাসে কবি তা বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন। সংক্ষিপ্ত কথাচয়নে ব্যাপক অর্থ ব্যঞ্জিত করার কৃতিত্ব এখানে মধুসূদনের প্রাপ্য। এ উপমা নিঃসন্দেহে ক্লাসিক কল্পনাঘটিত, এ যেন মেঘনাদের শ্মশান-স্তম্ভে খোদিত এক চিরায়ত স্মরণ-বাণী (classical epitaph)।

আর একটি উদাহরণ দেখুন—

স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,

শৈবাল দলের ধাম ? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে ?

কবি-কল্পনা এখানে আরও পরিচিত, অন্তরঙ্গ জগতে নেমে এসেছে। নির্বাণ পাবকের কল্পনায় না থাক, শান্তরশ্মি ত্বিষাম্পতির কল্পনার মধ্যে যে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী পটভূমিকা (cosmic range) ছিলো—বর্তমান উদাহরণে তা অনুপস্থিত। এই অলঙ্কার দুটি বাইরে থেকে আরোপিত বলে মনে হয় না, এ যেন কবি-ভাবনার একই প্রযত্নে অভিব্যক্ত কাব্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ মাত্র। তাই পূর্বের মালোপমার চেয়ে বর্তমান উদাহরণ সহজ স্বাভাবিক। হয়তো ইন্দ্রজিতের ভাবাবেগে স্পন্দিত বলেই উদ্ধৃতাংশ সম্বন্ধে আমাদের দুর্বলতা একটু বেশি। সে যাই হোক, এখানে অধিকতর সহজ স্বাভাবিকতা ও পরিচিত জগতের আবহাওয়া থাকলেও ক্লাসিক অলঙ্কারের আদর্শ অব্যাহত আছে।

যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী
চণ্ডী, দেব-অস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে
অট্টহাসি, লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী
রক্ষঃকুল-অনীকিনী—উগ্রচণ্ডা রণে।

এখানে দেবতেজ, দানবনাশিনী চণ্ডী ইত্যাদির উল্লেখে একটা পৌরাণিক আবহাওয়া, পুরাণঘটিত কল্পলোকের রহস্যরস সঞ্চারিত। অলঙ্কারসূত্রে এই ধরনের পুরাণ-প্রসঙ্গের অবতারণা নিঃসন্দেহে মহাকাব্যসম্মত।

উল্লাসে শুষি
অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা—শুষে শুক্তি যথা
যতনে, হে কাদম্বিনি, নয়নাম্বু তব।

উপমেয়ে রোমান্টিকতা এই উদাহরণে আছে—বসুন্ধরার উল্লাসে অশ্রুবিন্দু শোষণ করার কল্পনা রোমান্টিক পর্যায়ের। ফলে সমস্ত উপমাটিই দাঁড়িয়ে আছে এক রোমান্টিক ভাবনা-ভিত্তিতে। বস্তুতঃ,

যেখানে বাস্তববোধের মধ্যে অলঙ্কার জন্ম নেয়নি, জন্ম নিয়েছে কল্পনাভিসারী অনুভূতির মধ্যে—সেখানে অলঙ্কারের মধ্যে রোমান্টিক ব্যঞ্জনা একটু-আধটু দেখা না দিয়ে পারে না। ত্রুটি? হ্যাঁ, আছে বৈ কি! বসুন্ধরার ক্ষেত্রে 'উল্লাস' আর শুক্তির ক্ষেত্রে 'যতনের' প্রয়োগ সুষম হয়নি, কল্পনার সামঞ্জস্য তাতে রক্ষা পায়নি।

তস্কর যেমতি
পশিলি এ গৃহে তুই! তস্কর-সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে গোপনে প্রবিষ্ট লক্ষ্মণকে তস্করের সঙ্গে তুলনা করার মধ্যে কবিকল্পনার কৃতিত্ব নেই। এ উপমা গতানুগতিক, রসসম্ভাবনাহীন, নির্জীব। দ্বিতীয় চরণে সেই তস্করের তুলনাকেই আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন কবি। কিন্তু কিসের লোভে? সৌন্দর্য—রস—ব্যঞ্জনা? কোনটাই নয়। এ একেবারেই নিরর্থক।

আর একটি কথা। 'মেঘনাদবধকাব্যে' কবি অনেক অলঙ্কার রচনা করেছেন, কিন্তু সঙ্গতি-বোধ পরিমিতি-জ্ঞান ক্ষুণ্ণ করে নয়। এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব, অপরিসীম কৃতিত্ব।

'মেঘনাদবধকাব্যের' ভাষা নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। নিন্দা প্রশংসা দুই-ই তার অদৃষ্টে জুটেছে। স্বীকার করতেই হবে, সমসাময়িক যুগের কাব্যের ভাষার সঙ্গে তার প্রভেদ স্থূল চোখেই ধরা পড়ে। মধুসূদনের ভাষার ঐতিহ্য উত্তরকাব্যেও অনুসৃত হয়নি। হেমচন্দ্র যেটুকু ঢক্কানিনাদ তুলেছিলেন, তা মধুকবির অক্ষম অনুকরণের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ভাষায় যে আলোর উৎস ও প্রাণের মহোৎসব থাকলে সাহিত্যের ইতিহাসে তার প্রতিষ্ঠা হয়, মধুসূদনের ভাষায় তার স্বাক্ষর কই? মনে রাখতে হবে, চৈতন্যের গভীরে জন্ম নিলেই ভাষার অঙ্গে অঙ্গে প্রবহমাণ জীবনের দায় জড়িয়ে থাকে। অন্যদিকে সমষ্টিমানসের শিক্ষা বা চর্চার দ্বারা লব্ধ

উৎকর্ষের নাম যদি হয় সংস্কৃতি, তবে যে ভাষা মানুষের প্রাণের গরজে সৃষ্টি তার দেহে সেই উৎকর্ষের সৌরভ ছড়িয়ে থাকবেই। ব্যক্তিগত শিল্পী-মনের সোহাগ-স্পর্শে ভাষায় কোনো বিশিষ্ট লাবণ্য আসে না, একথা বলিনে—কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই, জন-মানুষের প্রত্যয়ের প্রত্যক্ষতায় যে বাণী স্থিরলক্ষ্য অথচ জীবনের অপরিহার্য প্রবহমাণতায় যা গতিশীল—তাকে ভিত্তি করেই প্রতিভার প্রাতিস্বিকতার জয়যাত্রা চলে। সহজ করে আবার বলি, এলিয়ট যাকে বলেছে common style, তা-ই individual style-এর ভিত্তিভূমি। কথাটা হচ্ছে, মধুসূদনের ভাষাভঙ্গি কি সম-সাময়িক বাঙলা গদ্যপদ্যের common style-এর সমুন্নত রূপ? সেকালের অনুশীলনাত্মক সংস্কৃতির চিহ্ন তার অবয়বে কতটুকু দেখা যায়? না কি তাঁর ভাষা একেবারে ব্যক্তিগত বিজয়-বৈজয়ন্তী ছাড়া আর কিছু নয়?

মিল্টনের ভাষার কথা একটু আলোচনা করে নিলে প্রশ্নগুলির সদুত্তর দেওয়া সহজ হবে, কারণ মধুকবি ভাষামার্গে মিল্টনের আদর্শানুসারী। এলিয়ট বলেছেন, 'His (Milton's) style is not classic style, in that it is not the elevation of a common style, by the final touch of genius, to greatness. It is, from the foundation, and in every particular, a personal style, not based upon common speech, or common prose, or direct communication of meaning.'

জনসনও তাঁর ভাষার ভক্ত ছিলেন না। তিনি বলতে ছাড়েন নি, মিল্টনের সমস্ত উচ্চশ্রেণীর কাব্যে একটা অদ্ভুতরকমের ভাষাদর্শ ও প্রকাশভঙ্গি দেখা যায়, যার সঙ্গে পূর্বসূরীদের লেখার কোন মিল নেই। সাধারণের ব্যবহৃত ভাষার সঙ্গে মিল্টনের ভাষার আকাশ-পাতাল তফাৎ বলেই পাঠকেরা তাঁর বইয়ে একটা নতুন ভাষা দেখে চমকে ওঠেন। এডিশন্ আরও একধাপ এগিয়েছেন। তাঁর

মতে, মিল্টন ইংরেজী ভাষাটাকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে গেছেন। বিদেশী ইডিয়মে ইংরেজী শব্দ ব্যবহারের কসরত যিনি করেছেন, তিনি নির্ঘাৎ বিকৃত ও ভারসর্বস্ব ষ্টাইলের সাধক। এই সব আলোচনা থেকে মনে হয়, মিল্টনের ভাষায় পূর্বানুবৃত্তি নেই, common speech-এর ভিত্তি নেই, উত্তরসূরীদের কাছে তাঁর ভাষা আদর্শ হতে পারে নি।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধের' ভাষা সম্পর্কেও এমনিতর মন্তব্য উপযুক্ত বলেই মনে হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যের ভাষার সঙ্গে তার মিল কতটুকু? কবিওয়ালাদের লেখায় ও ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে যমক-অনুপ্রাসের ঘটায়, ত্রিপদী পয়ারের একঘেয়েমিতে যে ভাষাভঙ্গি দেখা যায়—তার আদল 'মেঘনাদবধকাব্যে' কোথাও নেই। রঙ্গলালের বাণীভঙ্গি সমসাময়িক কাব্যের ভাষার ষ্টাইল মেনে নিলেও মধুসূদনের কাছে তা রুচিকর হয় নি। স্বীকার করা কর্তব্য, তাঁর সামনে এমন কোন মহান ও সম্মানিত কবি-পুরুষের ভাষাদর্শ ছিলো না, যা তিনি আত্মসাৎ করে উপকৃত হতে পারেন। আর রেনেসাঁসের সেই সোনা-গলা দিনে, জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে, বাঙলা গদ্য গড়ে উঠছিলো বটে, কিন্তু তখনও তাকে ঠিক পাকা ভাষা বলা যায় না, সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের পুরো ছাপ তখনও তার ওপর পড়েনি। তাঁর প্রহসনে, হুতোমের নক্সায়, আলালের ঘরের দুলালে যে নিদর্শন দেখি—তা-ই যদি তখনকার কমন্ স্পীচ্ হয়ে থাকে তবে মহাকাব্যে তার দ্বারস্থ হওয়া মধুসূদনের পক্ষে সম্ভব ছিলো না, কারণ তাঁর ভাষাদর্শ মিল্টনের পদাঙ্ক অনুসরণে ছিলো কৃতসঙ্কল্প। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, মধুসূদনের আগেকার ভাষাগত ঐতিহ্য সুনিয়মিত অথচ অচেতন উন্নতিতে মহাকাব্যের উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি—বাঙলা ভাষার তখনকার অবস্থা ক্লাসিক সাহিত্যের অনুকূল ছিলো বলে মনে হয় না।

তবু মহাকাব্য লিখবেন বলে তিনি নিজের কাছে 'নিজে

প্রতিশ্রুত। তাই তাঁর ভাষাও মধুসূদনকে তৈরি করে নিতে হলো। মিল্টনের ভাষা পড়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—অর্থব্যঞ্জনা নয়, ধ্বনিব্যঞ্জনার জন্যও অনেক শব্দের চাবিকাঠিতে মোচড় দিতে হয় - গোটা বাক্য বা অনুচ্ছেদের সঙ্গীত-ঝঙ্কারে পাঠকের কান পরিতৃপ্ত করাই কবির উদ্দেশ্য। অর্থের দিকে নজর রাখবার প্রয়োজন এখনে নেই বললেই চলে। আর যেখানে অর্থের দ্যোতনা অপরিহার্য, সেখানেও ধ্বনির আলাপ সোনায় সোহাগা হতে পারে। তার জন্য যদি অপ্রচলিত বা কঠিন শব্দ ব্যবহার করতে হয়, বিপর্যস্ত পদান্বয়রীতি অনুসরণ করতে হয়, ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করতে হয়—তবু পশ্চাদ্‌পদ হলে চলবে না। মিল্টনতো এইভাবেই নিজের ভাষার ষ্টাইলকে করে তুলেছিলেন—'more Latin than that of any other English poem।' শুধু তাই নয়, তাঁর ভাষার ক্রম ছিল আলঙ্কারিক (rhetorical sequence), আরও নির্দিষ্ট করে বলা যেতে পারে, সাঙ্গীতিক। ধ্বনিধর্মই মিল্টনের পদান্বয়ের নিয়ামক ছিলো। মধুসূদন এসবই জানতেন, শুধু জানতেন না—অনুসরণ করবার চেষ্টাও করেছেন।

ফলে 'মেঘনাদবধকাব্যে' সংস্কৃত অভিধানের শরণাপন্ন হয়েছেন কবি—বাছা বাছা ওজন-ভারী, ধ্বনিসমৃদ্ধিময় ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'গরুতমতীর' অর্থ যে পাল-খাটানো নৌকো, 'সুনাসীর' যে ইন্দ্রের নাম, 'প্রক্ষ্বেড়ন' যে লৌহাস্ত্র বিশেষ, 'কোলম্বকের' অর্থ যে বীণার ঠাট তা সংস্কৃতব্যবসায়ী ছাড়া আর ক'জন জানতো ? শুধু ধ্বনি আর কাঠিন্যের লোভেই মধুসূদন এদের আমদানী করেছেন। 'ইরম্মদ' থেকে অগ্নিবৃষ্টি হয়, কিন্তু ধ্বনিবৃষ্টি যে কম হয়না, তা কবি বুঝতে পেরেছিলেন। 'হর্যক্ষের' অক্ষি-গোলকে শুধু রক্তবর্ণ নেই, তার মুখে গর্জনও আছে। বস্তুতঃ, এই সমস্ত শব্দের মিউজিক ছাড়া কোনো অর্থগৌরব নেই। মিউজিকের লোভ যে মধুসূদনকে কোথায় নিয়ে গেছে, তার ভালো উদাহরণ—

হুঙ্কারি কুলিশী রোষে ধরিলা কুলিশে,
অমনি হরিল তেজঃ গরুড় ; নারিলা
লাড়িতে দম্ভোলি দেব দম্ভোলিনিক্ষেপী !
প্রহারিলা ভীম গদা গজরাজশিরে
রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি
অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে
ঝড়ে ! ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িলা
হাঁটু গাড়ি।

আর-

সত্য-যুগ-রণে
সম্মুখসমরে হত রথীশ্বর যত,
দেখ এই ক্ষেত্রে আজি, ক্ষত্রচূড়ামণি !
কাঞ্চনশরীর যথা হেমকূট, দেখ
নিশুম্ভে, শূলীশুম্ভনিভ পরাক্রমে ;
ভীষণ মহিষাসুরে, তুরঙ্গমদমী :
ত্রিপুরারি-অরি শূর সুরথী ত্রিপুরে ;—
বৃত্র- আদি দৈত্য যত, বিখ্যাত জগতে।

পর্বতের সানুদেশের ডাক যেমন শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয়ে কেবলই বাজতে থাকে, এখানেও কবির ধ্বনির ডাক যুক্তাক্ষর শব্দের আনাচে-কানাচে, বুকে বুকে কেবলই বেজে বেজে বেড়ায়। অর্থ অনুধাবনের আগেই সঙ্গীতের উপঢৌকনে শ্রবণ-মন পূর্ণ হয়ে ওঠে। আর এই ধ্বনির খাতিরে কবি বাক্যে দূরান্বয় দোষ ঘটাতে দ্বিধা করেন না, ব্যাকরণ-দুষ্ট পদবিন্যাসে লজ্জা পান না। তাঁর 'তেজস্কর', 'রক্ষেন্দ্র', 'প্রফুল্লিত' ধ্বনি ছাড়া অন্য কিছু প্রসব করতে পারে নি। 'যাদঃ-পতি-রোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে'—বাক্যটিতে কান পাতলে সমুদ্রের শঙ্খনাদ শোনা যায়, শব্দের ধ্বনিস্রোতে চলোর্মির ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়। সুতরাং মিল্টনের কাব্যের কোন কোন অংশ যেমন শুধু মিউজিকের জন্য পাঠ করতে হয়, তেমনি মধুসূদনের

কাব্যের অনুচ্ছেদ বিশেষ শুধু মিউজিকের লোভে পড়তে হয়।

ভাষায় ধ্বনি আনতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ হসন্ত বর্ণের দ্বারস্থ হয়েছেন, তাতে তাঁর ভাষার ধ্বনিব্যঞ্জনা বেড়েছে—অথচ কৃত্রিমতা দেখা দেয়নি, কারণ হসন্তপ্রাণতা বাঙলা ভাষার নিজস্ব ধর্ম। তা না হলে গণেশকে 'গণ্‌শা' বলে ডাকা হতো না। কিন্তু মধুসূদন আশ্রয় নিলেন যুক্তবর্ণের, সেই যুক্তবর্ণের লোভে হাত পাতলেন সংস্কৃত অভিধানের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাষা ভারসর্বস্ব, শক্ত-কঠিন ও কৃত্রিম হয়ে উঠলো, কমন্‌ স্পীচ্‌ আর কমন্‌ ষ্টাইল থেকে সরে এলো অনেক দূরে। তাই পাঠক যখন পাঠে অগ্রসর হয়, তখন কাব্যটির ভাষা নতুন বলেই তাঁর কাছে মনে হয়। মধুসূদনের নাটকের ভাষার সঙ্গে 'মেঘনাদবধকাব্যের' ভাষার তুলনা করলেই মহাকাব্যটির বাণীভঙ্গির কৃত্রিমতা ও বাহ্যিক পারিপাট্য ধরা পড়ে। তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দনের অভাব আছে, তাই রসিক পাঠকের প্রতিক্রিয়াও অনুকূল হয় না। যে বাণীর বসতি আমাদের রসনায়, তার স্বাভাবিক রসব্যঞ্জনার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সংস্কৃত যুক্তবর্ণ শব্দের সহায়তায় একটা কষ্টকৃত আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য সৃষ্টির দিকেই মধুসূদন দৃষ্টিপাত করেছিলেন। ফলে কমন্‌ স্পীচ্‌ আর কমন্‌ ষ্টাইলের হাত থেকে মুক্তি নিয়ে 'মেঘনাদবধের' কবি একটা ভাষাগত নিজস্ব ষ্টাইলের জন্ম দিয়েছেন। পূর্বগামীদের ভাষাদর্শের সঙ্গে তার মিল দুর্নিরীক্ষ্য, অনুগামীদের রচনায় তার সার্থক অনুবর্তন অবিশ্বাস্য—তাই মধুসূদনের কবিভাষা পূর্বাপর অসংলগ্ন। হয়তো মহাকাব্য রচনায় এ ছাড়া উপায় ছিলো না, তবু পাঠকের অভিযোগ উচ্চারিত হবেই।

মধুসূদনের ভাষার নিষ্প্রাণতা প্রশ্নের উদ্রেক করতে পারে। ভাষা যেখানে প্রাণোচ্ছল নয়, সেখানে কাব্যটিও কি প্রাণহীন নয়? কিন্তু 'মেঘনাদবধ' পড়তে খারাপ লাগে কই, আর রসের আস্বাদ কি পাওয়া যায় না? উত্তরে বলতে চাই, কবির অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি ও

যুগধর্মী জীবননীতির মধ্যে একটা সজীবতা আছে। সেই সজীবতার রস ও প্রাণ যখন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমাণতায় সমর্পিত হলো, তখন ভাষাও কিছুটা সপ্রাণ হয়ে উঠলো। কিন্তু অন্যনিরপেক্ষভাবে ভাষার বিচার যদি করা হয় (সেখানে বিষয়টা নীরস ও গতানুগতিক সেখানেই এই বিচার সম্ভবপর), তবে তা কম-বেশি কৃত্রিম ও নিষ্প্রাণ বলে মনে হবেই। চতুর্থ সর্গে দণ্ডকারণ্যের স্মৃতি-রোমন্থনে ও সীতা-সরমার আন্তরিক আলাপে যে জীবন-রস-রসিকতার প্রকাশ, তা-ই সর্গটিকে আস্বাদ্য ও মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। অবশ্য মধুসূদনও আমাদের হৃদয়ের অনেকটা কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, মহাকাব্যের কবির মতো নিরাসক্তির স্বাতন্ত্র্যে দূরে সরে থাকেন নি ; ভাষাকেও মধুরভাবের উপযুক্ত করে তুলেছেন। কিন্তু যেখানে যুদ্ধ বা নরক বর্ণনা করেছেন, যেখানে বিষয়ের মধ্যে নিজেকে ঢেলে দেওয়ার সুযোগ নেই, সেখানে তাঁর ভাষার বিচার করে দেখুন—ঘনঘটা আছে, ধ্বনি-নির্ঘোষ আছে—কিন্তু প্রাণ নেই।

মধুসূদনের বিশেষণ-প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। 'মেঘনাদবধে' স্থানবিশেষে একই বিষয়ের একাধিক বিশেষণে শুধুই কথার পুনরাবৃত্তি আছে, নতুন কোনো অর্থ-ব্যঞ্জনা নেই। যেখানে প্রতিশব্দে একটুও অনাস্বাদিত রূপের আভাস নেই, সেখানে তা ব্যবহারের সার্থকতা আছে কি ? উদাহরণ দেওয়া যাক—

গতজীব মেঘনাদ বলী

ৎ!

'বলীর' পর 'শত্রুজিৎ' নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে প্রযুক্ত হয়েছে কি ? বলীরা তো শত্রুজিৎ হয়েই থাকেন, তা না হলে তারা বলী হবেন কেন ? অর্থাৎ পুনরুক্তবদাভাস অলঙ্কার রচনায় মধুসূদন ঠিক সার্থক নন। অসঙ্গত বিশেষণ প্রয়োগও কাব্যটিতে লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় সর্গে প্রমীলার উক্তিতে যিনি 'ভিখারী রাঘব', এক পঙ্‌ক্তির ব্যবধানে তিনিই 'নৃমণি।' একই নিঃশ্বাসে এই বিপরীত

বিশেষণ-ব্যবহার অসঙ্গত নয় কি? আবার বিশেষণের ক্ষেত্রে মধুসূদনের কৃতিত্বও উল্লেখযোগ্য।

মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে।

আপাততঃ মনে হয়, 'মৃগেন্দ্র' ও 'কেশরী' উভয় শব্দের অর্থ 'সিংহ'। কিন্তু গভীরতর বিচারে ধরা যায়, 'মৃগেন্দ্র' শব্দটি 'পশুরাজ' অর্থে প্রযুক্ত এবং শব্দটির ওপর emphasis দেওয়াই কবির উদ্দেশ্য।

সবচেয়ে শেষে মধুসূদনের ভাষাদর্শ সম্পর্কে, এলিয়টী ভাষায়, একটি সাহসিক মন্তব্য করা যেতে পারে: The remoteness of his verse from ordinary speech, his invention of his own poetic language, seems to me one of the marks of his greatness.

'ব্রজাঙ্গনা' মধুসূদনের প্রতিভার খেলা। কিন্তু সেই খেলাকে লঘুতাবাচক মনে করার কোন কারণ নেই। কাব্যের কাননে স্বচ্ছন্দ-বিহারের প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন যিনি, মিত্র ও অমিত্রচ্ছন্দে তার সমান অধিকার থাকা স্বাভাবিক। মিত্রচ্ছন্দে তাঁর কোন অনুরাগ ছিলো না, তবু সেই ছন্দেই তিনি রাধার বিরহকথা রচনা করলেন। তাতে প্রমাণ হয়, মিত্রচ্ছন্দ রচনার শক্তি তাঁর ছিলো এবং সেই শক্তি ছিলো বলেই তিনি তার শৃঙ্খল মোচন ও অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। মধুসূদনের বিশ্বাস ছিলো, অমিত্রাক্ষরেই বাঙলা কাব্যের মুক্তির পথ নিহিত। 'ব্রজাঙ্গনার' মিত্রচ্ছন্দ সেই বিশ্বাসের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের ভাবিয়ে তোলে। মিত্রচ্ছন্দ রচনার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যিনি অমিত্রাক্ষরের কথা বলেছেন, তাঁর বক্তব্যকে লঘুভাবে নেওয়া অপরাধ নয় কি?

তবু 'ব্রজাঙ্গনাকে' কবির প্রতিভার খেলা বলতে হয় এবং তাঁর প্রতিভার কাজ থেকে তাকে পৃথক করে বিবেচনা করা ছাড়া উপায়

নেই। অমিত্রচ্ছন্দে তাঁর মনের প্রধান ও প্রবল প্রবণতা ছিলো বলেই 'তিলোত্তমা', 'মেঘনাদবধ' ও 'বীরাঙ্গনা' মধুসূদনের প্রতিভার কাজ। আর মিত্রচ্ছন্দে তাঁর পক্ষপাত ছিলো না, তাই 'ব্রজাঙ্গনা' তাঁর প্রতিভার খেলা। কিন্তু সত্যিকারের ক্ষমতা যাঁদের আছে, তাঁদের কাছে কাজ ও খেলায় কোন পার্থক্য নেই; যথার্থ শিল্প-নিষ্ঠা নিয়ে সৃষ্টির আসরে নেমেছিলেন বলেই মধুসূদনের প্রতিভার কাজ ও খেলায় শক্তির সমান স্ফূর্তি। আর এই কারণেই 'ব্রজাঙ্গনাকে' সুন্দর ও রসোত্তীর্ণ রচনা বলে মনে করি।

আর এই শিল্প-নিষ্ঠার প্রসঙ্গে আর একটা কথাও পরিষ্কার হওয়া দরকার। মহাজনেরা যে পদাবলী রচনা করে গেছেন, তাতে শুধু শিল্প-স্বাক্ষরই নেই, আছে ভক্তের আন্তরিক আকূতি। তাতে কবি ও সাধক একাকার হয়ে গেছেন। বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদের দিনে, চৈতন্যদেবের ভাব-পরিমণ্ডলে বাস করে সে-কালের কবিদের কেবল রস-চর্বণায় নয়, ভক্তি-কামনায়ও উদ্বেল না হয়ে উপায় ছিলো না। কিন্তু আজকের দিনে সেই বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদের জগৎ থেকে অনেক দূরে আমরা চলে এসেছি, সে-কালের সাধকের হৃদ্-স্পন্দন ও এ-কালের রসিকের হৃদ্-স্পন্দন এক নয়। বর্তমানে রাধাকৃষ্ণ বেঁচে আছেন শুধুমাত্র রসিকজনচিত্তে, সৌন্দর্যের অম্লান প্রতীক রূপে। সে-দিনের ভক্তিমাহাত্ম্য আমাদের নেই আর তাই সেদিক থেকে রাধাকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ মূর্তির মূল্যও নেই। মধুসূদন তা জানতেন। তাই তাঁর মনে রাধা রসসম্ভবা ও সৌন্দর্য-বিভূষিতা নারী মাত্র। পূর্বে বলেছি, হেলেনের মতো আমাদের কোন চিরকালের নায়িকা নেই। আছেন একমাত্র রাধা, কিন্তু তিনিও রসবোধের মধ্যে বেঁচে নেই, বেঁচে আছেন ভক্তির ভাবালুতার মধ্যে, বিশেষ একটা ধর্মগোষ্ঠীর সাধনার বেদীতে। এই ধর্মবোধের ধূম্রলোক থেকে রাধাকে উদ্ধার করে সৌন্দর্য ও রসের মনোহর লোকে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করাই মধুসূদনের উদ্দেশ্য। রাধা সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি ধার্মিক নয়, ঈস্‌থেটিক্যাল। তাই তিনি ব্রাহ্ম রাজনারায়ণকে অনুরোধ করেছেন—'When you

sit down to read poetry, leave aside all religious bias. Besides, Mrs. Radha is not such a bad woman after all. If she had a "Bard" like your humble servant from the beginning, she would have been a very different character. It is the vile inagination of the poetasters that has painted her in such colours'. অর্থাৎ রাধাকে ঘিরে যে ধর্মভাবের কুহেলী জমে উঠেছে, তার জন্য দায়ী তথাকথিত কবিদের দুষ্ট কল্পনা। সুতরাং এ-যুগে রাধাকে নিয়ে কবিতা লিখিতে হলে ধর্মের সংস্কার শিকেয় তুলতে হবে। তাঁকে দেখতে হবে সংশয়বাদী ব্রাহ্মের দৃষ্টিতে নয় (সেটাও তো একটা সংস্কার!), ভক্তিবাদী বৈষ্ণবের দৃষ্টিতেও নয়, যথার্থ রসবেত্তার দৃষ্টিতে—শিল্পীর নিরিখে। 'Mrs. Radha'—এই দুটি শব্দের মধ্যে সেই নতুন দৃষ্টিরই ইঙ্গিত। সুতরাং 'ব্রজাঙ্গনা' সম্বন্ধে প্রশংসার কথা হচ্ছে এই যে, রাধা ঠাকুরাণীকে নতুন যুগের মানুষের নতুন রোমান্টিক চেতনার উপযুক্ত করে রচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন কবি।

দ্বিতীয়তঃ 'ব্রজাঙ্গনায়' বিরহবিধুরা রাধার মনোধারা যে যে পটভূমিকায় চিত্রিত, তার মধ্যেও শিল্পী-চিত্তের রসানুভব ও সৌন্দর্য-এষণার স্বাক্ষর আছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে বিভিন্ন ঋতুতে বিচিত্র পরিবেশে রাধার মনের ফুল ফুটেছে সন্দেহ নেই, তবু সেখানে মনোবিন্যাসের রীতিতে রসসূত্রটারই ওপরই জোর বেশি, প্রকৃতি তার গৌণ চালচিত্র মাত্র। কিন্তু 'ব্রজাঙ্গনায়' রাধার মনের সঙ্গে প্রকৃতির অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ—প্রকৃতির আরশিতে যেন সেই মনের সত্যিকারের প্রকাশ।

ফুটিছে কুসুমকুল মঞ্জু কুঞ্জ বনে, রে,
যথা গুণমণি!
হেরি মোর শ্যামচাঁদ, পীরিতের ফুল-ফাঁদ
পাতে লো ধরণী!

কি লজ্জা! হা ধিক্ তারে, ছয় ঋতু বরে যারে,
আমার প্রাণের ধন লোভে সে রমণী?

—বংশী-ধ্বনি, ব্রজাঙ্গনা কাব্য।

লক্ষণীয়, এখানে কবির কাব্যক্রম আলঙ্কারিক ও চিত্রানুগ, সেই চিত্রে রূপতৃষ্ণা সুস্পষ্ট। আর সেই চিত্রধর্মিতা ও রূপতৃষ্ণার সূত্রেই প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর আন্তরিক যোগ। শুধু তাই নয়, রাধার আকুলতার চেয়েও প্রকৃতির সুষমার দিকে কবির লক্ষ্য বেশি। তার প্রমাণ আছে খণ্ডাংশগুলির শিরোনামায়—উষা, কুসুম, কৃষ্ণচূড়া, নিকুঞ্জবনে, বসন্তে ইত্যাদি। এই কবি-মনোভাব নবযুগের উপযুক্ত, সন্দেহ নেই।

'ব্রজাঙ্গনার' কাব্যরীতির বিচারে ছন্দের কথা ছাড়া আরও কথা উঠতে পারে। মহাজনপদাবলী গান, তাদের সঙ্গে রয়েছে সুরের যোগ। তাই কথা ও সুর মিলিয়ে তাদের ভাব ও রসের পূর্ণতা। কিন্তু 'ব্রজাঙ্গনার' কবিতাগুলি পাঠ্য চরণগুচ্ছ মাত্র, ছন্দের তান ছাড়া অতিরিক্ত কোন সুরের সহযোগ তাদের মধ্যে নেই। গেয় গানে ছন্দের খোঁচ-খাঁচ যেমন সুরে ভরিয়ে তোলা যায়, তেমনি কণ্ঠস্বরের দ্বারা কথার বুকে অন্তরের স্পন্দন বাজিয়ে তোলা যায়। কিন্তু সুরের আওতার বাইরে বৈষ্ণব পদের রূপগত সৌন্দর্য ও ভাবগত মাধুর্য কতখানি সৃষ্টি করা সম্ভব—সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিক থেকে 'ব্রজাঙ্গনার' মূল্য অনস্বীকার্য। রাধাকে নিয়ে কবি যে Ode-জাতীয় গীতিকবিতা রচনা করেছেন—তার শ্রুতি-সৌন্দর্যও আমাদের রসবোধকে পরিতৃপ্ত করে:

কেন এত ফুল তুলিলি, স্বজনি—
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী
তারার মালা?
আর কি যতনে কুসুম রতনে
ব্রজের বালা?

এখানে কান পাতলে নতুন কাব্যের ছন্দোধ্বনি শোনা যায় না কি? শুধু তাই নয়, নতুন ধরনের স্তবক রচনায় 'ব্রজাঙ্গনার' কবির সিদ্ধিও এখানে চোখে পড়ে।

আর একটি কথা বলেই এ-প্রসঙ্গ শেষ করবো। মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন—'Some fellows here pretend to be enchanted with them (i e. Odes of Brajangana)। এই উক্তিতে, কেউ কেউ বলেছেন, কবিতাগুলি সম্বন্ধে মধুসূদনের আগ্রহ অপেক্ষা কৌতুক বেশি। আমি বলি, হ্যাঁ, কৌতুকই; তবে সত্যিকারের কবিমানসের কাব্যকৌতুক, লঘুচিত্তের তরলমতিত্ব নয়।

'বীরাঙ্গনায়' মধুসূদন আবার ফিরে এলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে। তিনি 'পদ্মাবতীতে' প্রথম যে অমিত্রচ্ছন্দ ব্যবহার করেন তা পরিমাণে সামান্য, ছন্দঃস্পন্দহীন ও জড়তাময়। তাতে শব্দের অনুচিত প্রয়োগের জন্য শ্রুতিকটুতা ও আড়ষ্টতা দেখা দিয়েছে, ছেদ ও যতির সুন্দর প্রয়োগের অভাবে সে-ছন্দ যথার্থই গতিশীল ও প্রবহমাণ হয়ে উঠতে পারেনি।

> শশাঙ্ক যে কলঙ্কী—সে আমার ইচ্ছায়!
> ময়ূরের চন্দ্রক-কলাপ দেখি, রাগে
> কদাকারে পা-দুখানি গড়ি তার আমি!

প্রথম চরণে সাত মাত্রার পরে ছেদ ও আট মাত্রার পরে যতি-পাত হওয়ায় ছন্দোগতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। 'সে' অক্ষরটি এত সবল নয় যে, তার আগে-পরে ছেদ-যতির চাপ চলতে পারে। দ্বিতীয় চরণে অর্ধ-যতি সন্নিবেশ করা হয়েছে 'কলাপ' শব্দটিকে ভেঙে। 'তিলোত্তমা' সমগ্রভাবে অমিত্রচ্ছন্দে রচিত। এতে ছেদ ও যতির অধিকতর নিপুণ প্রয়োগ আছে, আছে শব্দের অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু প্রয়োগ। ছন্দঃস্পন্দের দিক থেকে কাব্যটির ছন্দ মোটা-মুটিভাবে সুশ্রাব্য, যদিও কবির নিজের মতেই তাতে কাঁচা হাতের লক্ষণ সুস্পষ্ট।

ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণ-দর্শন ;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল ;
যেন উর্ধ্ববাহু সদা, শুভ্রবেশ ধারী,
নিমগ্ন তপঃ সাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগীকুলধ্যেয় যোগী।

এখানে প্রতি চরণে যে ছন্দঃপ্রবাহ, তার আরও উন্নতি সম্ভবপর ছিলো। বিশেষ করে পঞ্চম চরণে তিনমাত্রার দুটি শব্দের মধ্যে দু'মাত্রার 'তপঃ' শব্দটির প্রয়োগ সঙ্গত হয়নি। কারণ বাঙলা শব্দ যোজনায় জোড়ের সঙ্গে জোড়ের, বিজোড়ের সঙ্গে বিজোড়ের সন্নিবেশই শ্রুতিসম্মত। মধুসূদন তা জানতেন বলেই পুনর্লিখিত অংশে বিশেষ পরিবর্তন দেখতে পাই—

ধবল নামেতে খ্যাত হিমাদ্রির শিরে
দেবাত্মা, ভীষণ-মূর্তি, অভ্রভেদী গিরি,
অটল, ধবল-কায় ; ব্যোমকেশ যেন
উর্ধ্ববাহু শুভ্রবেশে, মজি চিরযোগে
যোগী-কুলে পূজ্য যোগী।

এই সংশোধন-স্পৃহা ও ছন্দোজ্ঞানের বশেই 'মেঘনাদবধের' উন্নততর ছন্দের সৃষ্টি। সংশোধিত 'তিলোত্তমায়' অধিকতর যুক্তাক্ষর ব্যবহারের যে চেষ্টা ছিলো, 'মেঘনাদবধে' তারই সুপ্রয়োগে ছন্দ বেশ সাবলীল ও ওজস্বী হয়ে উঠেছে। কাব্যটির প্রথম খণ্ডে কিছু কিছু ত্রুটি থাকলেও দ্বিতীয় খণ্ড নিখুঁত।

কভু বা উঠিয়া
পর্বত-উপরে সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে ; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি-বচন-
সুধা, হায়, কব কারে ?

এখানে যুক্তাক্ষর শব্দ কম। কতকগুলি সহজ শব্দের নরম মাটি ভেঙে ছন্দের স্রোত তর্‌তর্‌ করে বয়ে চলেছে। আর যেখানে যুক্তাক্ষরের বাহুল্য, সেখানেও আমাদের জিহ্বা হোঁচট খায় না—

> কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থমা রথী,
> মারি সুপ্ত পঞ্চ শিশু পাণ্ডব-শিবিরে
> নিশীথে, বাহিরি, গেলা মনোরথগতি,
> হরষে তরাষে ব্যগ্র, দুর্যোধন যথা
> ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্র রণে।

কিন্তু এইটুকু বললেই 'মেঘনাদবধের' ছন্দ সম্বন্ধে সব বলা হয় না। প্রতিটি চরণের ছন্দোমাধুর্য বৃদ্ধির জন্য কবির যে চিন্তা ও চেষ্টার পরিচয় চিঠিপত্রে আছে, তাতেই মনে হয়, নতুন কবির চেতনায় শিল্পকলার তাৎপর্য ছিলো খুবই গভীর—'Allow me to give you an example of how the melody of a line is improved when the 8th syllable is long—I believe you like the opening lines of the Second Book of the Meghanad. In that the description of evening you have these lines,—

> আইলা তারাকুন্তলা, শশী সহ হাসি
> শর্বরী; বহিল চারিদিকে গন্ধবহ।

How if you throw out the তারাকুন্তলা and substitute সুচারুতারা you improve the music of the line, because double syllable ন্ত mars the strength লা…'। মধুসূদনের ছন্দের কান যে তীক্ষ্ণ ছিলো, তার প্রমাণ মেলে অষ্টম অক্ষরের দীর্ঘীকরণের প্রসঙ্গে। বিষ্ণু দে যা-ই বলুন, 'তারাকুন্তলা'-এর চেয়ে 'সুচারুতারা' অনেক বেশি সুখশ্রাব্য, অস্বীকার করার উপায় নেই। 'ন্ত' যুক্তাক্ষরের জন্যই 'লা'-এর মাধুর্য ধরা পড়ে না, এ-ও সত্যি; তবে চরণটির ত্রুটির কারণ কিন্তু 'ন্ত' নয়। তিন মাত্রার দুইটি

শব্দের মধ্যে দ্বিমাত্রিক 'তারা'-এর প্রয়োগ রীতিসম্মত হয়নি বলেই কানে ঠেকে ('আইলা কুন্তলা তারা'—এই ভাবে লিখলে শ্রুতিমাধুর্য বাড়ে, কারণ দুইটি তিনমাত্রার শব্দের পাশাপাশি সংযোজন রীতিসম্মত। অবশ্য তাতে অর্থ বজায় থাকে না)। আসল কারণটি ধরতে না পারুন, ছন্দের ত্রুটি যে ধরতে পেরেছিলেন এটা একটা বড়ো কথা। সে-যাই হোক, 'মেঘনাদবধেও' ছন্দ নিয়ে কবির পরীক্ষার অন্ত ছিলো না।

মধুসূদনের ক্লান্তিহীন ছন্দ-চর্চার চরম পরিণতি—উৎকর্ষাত্মক পরিণতি আছে 'বীরাঙ্গনায়'। মাধুর্য ও লালিত্যের দিক দিয়ে পত্রকাব্যটির ছন্দ 'মেঘনাদবধের' দ্বিতীয় খণ্ডের চেয়েও উৎকৃষ্টতর 'বীরাঙ্গনার' অমিত্রাক্ষর দেখে মনে হয়, তা সকল রকমের ভাব-প্রকাশের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে।

ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি পাইব সত্বরে
পাদপদ্ম! কাঁপে হিয়া দুরুদুরু করি
শুনি যদি পদশব্দ! উল্লাসে উন্মীলি
নয়ন, বিষাদে কাঁদি হেরি কুরঙ্গীরে!
গালি দিয়া দূর তারে করি করাঘাতে!
ডাকি উচ্চে অলিরাজে; কহি—'ফুলসখে
শিলীমুখ, আসি তুমি আক্রম গুঞ্জরি
এ পোড়া অধর পুনঃ

কিংবা—

মহাযাত্রা করি
চলিল অভাগী জনা পুত্রের উদ্দেশে!
ক্ষত্র-কুলবালা আমি; ক্ষত্র-কুল বধূ;
কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য ধরি?

* * *

যাচি চির বিদায় ও পদে!
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,

নরেশ্বর, 'কোথা জনা?' বলি ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি 'কোথা জনা?' বলি!

'বীরাঙ্গনা' শুধু অমিত্রচ্ছন্দের দিক থেকে নয়, নারী-ভাবনার দিক থেকেও রসিকচিত্তকে আকর্ষণ করে। 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী' ও 'কৃষ্ণকুমারী' নামক নারী-নাম-প্রধান নাটকগুলিতে যেমন, তেমনি 'মেঘনাদবধকাব্যের' চিত্রাঙ্গদা, প্রমীলা, মন্দোদরী ও সীতা চরিত্রে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, একটা নতুন আদর্শ দেখতে পাই। বস্তুতঃ, তার মানসকন্যাদের পরিকল্পনা ও রূপায়ণে কবির সৃষ্টিশক্তির চরম পরীক্ষা হয়ে গেছে। মনের বিচিত্র সৌন্দর্যরসে জারিত করে, বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত প্রয়োগ করে, স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন অনুধ্যানে মধুসূদন নারী-প্রতিমাগুলির মধ্যে জীবন সঞ্চার করেছেন। চিত্রাঙ্গদা ঝড়ের আকাশে ক্ষণসম্ভবা বিদ্যুল্লতা। কেশ তার অবিন্যস্ত, বেশ তার বিস্রস্ত, বুক তার জ্বালাভরা। আর তার চোখে অশ্রুবন্যা—সেই অশ্রুর সায়রে প্রতিফলিত এক রোষায়িত মনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। এমন মূর্তি তখনকার বাঙলা সাহিত্যে দেখেছি বলে তো মনে হয় না। প্রমীলার জীবনের রাজটীকা হচ্ছে প্রেম – 'দীপিছে ললাট মাঝে মহিমার শিখা।' সেই প্রেমের প্রকাশ কখনও ললিত লাবণ্যে, কখনও বহ্নিবিভাসে। সীতার মধ্যে প্রেমদীপ নিয়তই জ্বলেছে —কিন্তু তাতে জ্বালা নেই, তীব্রতা নেই, বিক্ষোভ নেই, অস্থিরতা নেই। সে প্রেম বিরহে-দুঃখে জীবনকে পুড়িয়ে দিতে গিয়েও সৌন্দর্যের দ্যুতি ছড়িয়েছে, ছড়িয়েছে কল্যাণের সৌরভ। মা ও মহিষী—এই দুই রূপের সংমিশ্রণ ও সামঞ্জস্যে মন্দোদরীর চরিত্র মহিমময়। রাবণ ও লঙ্কাপুরীর ভাগ্যকে নিজের ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছেন তিনি—তাই পুত্রের কল্যাণ কামনায় অনিদ্রায় অনাহারে উমেশকে পূজো করা ছাড়া তার আর গত্যন্তর নেই। বিধাতার নির্দয় নির্দেশে তার হৃদয়পাত্র ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। শোকের এক বাঙ্ময় ঝটিকাময় প্রকাশ দেখেছি চিত্রাঙ্গদায়, তার বিপরীত প্রকাশ দেখা গেলো মন্দোদরীতে—অন্তর্লীন, বাক্যহারা, সুগভীর। সুতরাং

দেখা যাচ্ছে, 'মেঘনাদবধের' নারীচরিত্রে আছে মানবীয়তার সুন্দর বিচিত্র অভিব্যক্তি, প্রতিষ্ঠাকামী নারী-চৈতন্যের সাবলীল স্ফুরণ। য়ুরোপের রেনেসাঁস নারীর জীবনে এনেছিলো মুক্তি ও স্বীকৃতির বার্তা; বাঙলার রেনেসাঁসের সন্তান মধুসূদনের কাব্যেও যুগোপযোগী নারী-ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে।* 'বীরাঙ্গনায়' আছে তার সুন্দরতম উদাহরণ।

কাব্যটির নামকরণ এই সদ্যোক্ত নারী-ভাবনারই পরিচায়ক। ওভিদের 'Heroides'-এ যে গ্রীক প্রেম-কাহিনী স্থান পেয়েছে, তার চরিত্রগুলির পরিচয় Hero (GK. Hro)। মধুসূদন 'Heroides'-এর দ্বারা প্রভাবিত 'বীরাঙ্গনায়' চরিত্রের পরিচয়-প্রদানে এই 'Hro' শব্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং ইংরেজী 'Heroine' শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে 'বীরাঙ্গনা' শব্দটি চয়ন করেছেন। ইংরেজীতে 'Hero' ও 'Heroine' শব্দদ্বয়ের আধুনিক অর্থ যথাক্রমে নায়ক ও নায়িকা এবং এই নায়ক ও নায়িকা যে বীরপুরুষ ও বীরনারী হবেনই এমন কোন কথা নেই। শব্দসচেতন কবি মধুসূদন শব্দটিকে সুশোভনা নারী অর্থেই গ্রহণ করেছেন, হয়তো 'বীর' কথাটির মধ্যে সেই নারীর স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে। নারী সম্বন্ধে এই সশ্রদ্ধ ও সুন্দর মনোভাব আধুনিক, সন্দেহ নেই।

'বীরাঙ্গনার' প্রতিটি নায়িকার মনের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে প্রেম। পত্রলেখিকাদের মনোজগৎ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সেখানে স্থায়ীভাব রতি এবং সেই স্থায়ীভাবকে অবলম্বন করে কয়েকটি সঞ্চারী ভাব বর্তমান। এমন কি কেকয়ী, জাহ্নবী ও জনা সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। স্বামী-প্রীতির স্থায়ী ভাবকে আশ্রয় করেই নিজের মনের সঞ্চারী ভাবগুলি—সপত্নীর প্রতি বিদ্বেষ, মাতৃত্বের

* রামমোহনের সময় থেকে যে নারী আন্দোলন বাঙলা দেশে চলেছিলো, ছাত্র অবস্থাতে মধুসূদন তার সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে তিনি পুরস্কার পান। তিনি লিখেছিলেন: এদেশে নারীরা পুরুষের পাশববৃত্তি চরিতার্থ করার উপকরণ মাত্র।

গর্ব, প্রিয়তমা পত্নীর অভিমান ও অনুযোগ, সাহসিকার ব্যঙ্গ, স্বার্থপরের রোষ—কেকয়ী প্রকাশ করেছেন। 'জনা' পত্রিকায় ক্ষত্রবালার রোষ, রাজপত্নীর ক্ষোভ, মাতৃহৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস, ক্ষত্রজননীর বীরধর্ম ও পুত্রের বীরত্বে গৌরববোধ, সাহসিকা নারীর আত্মমর্যাদাজ্ঞান ইত্যাদি সঞ্চারী ভাবগুলি পাঠকের রসবোধকে আকর্ষণ ও তৃপ্ত করে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কি জনার মনের স্থায়ী ভাব পতিপ্রেমের স্বরূপটিও আভাসিত হয় না? বস্তুতঃ জনা নিজেই ফাল্গুনীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে অগ্রসর হতে পারেন, কিন্তু বীর স্বামীর বর্তমানে পতিপরায়ণা স্ত্রীর পক্ষে কি তা করা সম্ভব? আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, জাহ্নবী রাজা শান্তনুর সঙ্গে দাম্পত্য-বন্ধন ছিন্ন করার পক্ষপাতী। কিন্তু গভীরতর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, নিজের দেবী-ভাব প্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষা প্রধান হলেও জাহ্নবী আপনার নারী-হৃদয়টি মাঝে মাঝে উন্মোচিত করেছেন। নির্দিষ্ট সময়ের শেষে স্বর্গের দেবী স্বর্গে ফিরে গেছেন—তখন মর্তের মানুষকে পত্র লেখার এই আগ্রহ তাঁর হলো কেন? আমার মনে হয়, রাজা শান্তনুর প্রতি মমতাবশতঃই তিনি এই পত্র লিখেছেন; কিন্তু বিধির বিধানে স্বর্গের দেবী হওয়ায় নিজের দেবী-মহিমা প্রচার করা ছাড়া তার আর গত্যন্তর ছিলো না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—এই তিনটি পত্রিকারই স্থায়ী ভাব প্রেম, কিন্তু সংশ্লিষ্ট সঞ্চারী ভাবগুলি স্থায়ী ভাবের পোষকতা করেনি বলে এবং তাদের ছাপিয়ে উঠেছে বলে পত্রিকাগুলির রস-নিষ্পত্তি সম্বন্ধে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। আর অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রেমভাবের প্রকাশ সম্বন্ধে যে সন্দেহ ওঠে না, তা বলাই বাহুল্য।

কাব্যটির বিভিন্ন পত্রিকায় স্থায়ী ভাব প্রেমের বিভিন্ন রূপ প্রস্ফুটিত। এক একটি পত্রিকায় সঞ্চারী ভাব এক এক রকমের, ফলে স্থায়ী ভাবের বৈচিত্র্য না থাকা সত্ত্বেও সঞ্চারী ভাবের বৈচিত্র্যের জন্যই পত্রিকাগুলির মধ্যে রস-বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। তাছাড়া 'বীরাঙ্গনার' প্রেমিকা নায়িকারা নানা নারীসমাজের প্রতিনিধি—

তাদের প্রেমের স্বরূপ, উপলব্ধি, উপভোগ, সফলতা, নিষ্ফলতাও নানা প্রকৃতির। এই কারণেই প্রতিটি পত্রিকা 'নব-নব রসে অনুপ্রাণিত ও নব-নব ভাবে পল্লবিত।' সীমন্তিনী তারা, পতিহীনা সূর্পনখা, কুমারী রুক্মিণী ও বারাঙ্গনা উর্বশী পূর্বরাগের প্রেরণায় পত্র রচনা করেছেন; ঋষিতনয়া শকুন্তলা, রাজমহিষী কেকয়ী, বীরাঙ্গনা জনা, রাজকুলবধূ ভানুমতী, দেবী জাহ্নবী, পঞ্চবল্লভা দ্রৌপদী ও রাজকন্যা দুঃশলা পত্র রচনা করেছেন মিলনোত্তর অনুরাগের বশে। তারা, সূর্পনখা, রুক্মিণী ও উর্বশী যেমন পূর্বরাগের চারটি সম্ভাব্য রূপ অভিব্যক্ত করেছেন, তেমনি শকুন্তলা, কেকয়ী, জনা, ভানুমতী, জাহ্নবী, দ্রৌপদী ও দুঃশলা দাম্পত্য-প্রেমের সাতটি সম্ভাব্য রূপের সন্ধান দিয়েছেন। পৌরাণিক সাহিত্য থেকে প্রেমবতী নায়িকা নির্বাচন ও পরিবেশন করতে গিয়ে মধুসূদন নারী-জীবনের বিভিন্ন শ্রেণীর দিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন ও নিজের কল্পনাবৃত্তির ওপর অনেকটা নির্ভর করেছিলেন, সন্দেহ নেই।

এই প্রেমের সূত্রে যে রোমান্টিক আবহাওয়া ও লিরিক্যাল সুর জমে উঠেছে, তার সামাজিক পটভূমি ও ব্যক্তিগত উৎস বুঝে নেওয়া দরকার। আজকের দিনে সকলেই স্বীকার করেন, পুরো রোমান্টিক মন ধনতন্ত্রের চরমতম স্ফূর্তির পরমতম সৃষ্টি। ভারতে ইংরেজের পদার্পণ ফিউডাল সমাজবিন্যাসে যে বুর্জোয়া ব্যবস্থার পত্তন করে তারই সূত্রে, ইংরেজের স্বার্থের টানে, ধনতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। সামন্ততান্ত্রিক আদর্শের পুরো উচ্ছেদ হলো না বটে, তবু নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভবে সমাজমানসে এলো গতিশীলতা ও উন্মাদনা, জাগলো ব্যক্তির বন্ধন-মুক্তি ও জাতির স্বাধীনতার স্বপ্ন, দেখা গেলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন আলোর অভীপ্সা। নবজাগ্রত বুর্জোয়া চেতনার ক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টির যে বেগবান প্রেরণা, মধুসূদন তারই প্রথম বাণীমূর্তি রচনা করেন। 'মেঘনাদবধে' রামচন্দ্র সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি, দেবতারাও সেই সমাজেরই কল্পনার সৃষ্টি—অন্যদিকে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ নতুন-জাগা ধনতান্ত্রিক আদর্শের প্রথম

রূপমূর্তি। ফলে কাব্যটি আধা-ক্লাসিক—কারণ সামন্ততন্ত্রের প্রভাব; আর তা যে আধা-রোমান্টিক—তার কারণ ধনতন্ত্রের যাদুস্পর্শ। কিন্তু 'বীরাঙ্গনায়' মধুসূদন সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন—ধনতন্ত্রের রসপুষ্ট তাঁর রোমান্টিক মন ছাড়া পেয়েছে। কবির মুখে শুনি—'there is a wide field of romantic and lyrical poetry before me and I think, I have a tendency in the lyrical way.' এই 'lyrical way' আসলে 'romantic way'-র নামান্তর মাত্র। মধুসূদনে—ধনতান্ত্রিকতার প্রথম পর্বে—এই যে রোমান্টিক চেতনাশিখার অনিশ্চিত শিহরণ, রবীন্দ্রনাথে—উনিশ শতকী ধনতন্ত্রের চরম পর্বে—তার দীপ্যমান দাহ।

অন্যদিকে শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙলা দেশে ইংরেজী সাহিত্যের নবাগত রোমান্টিক ভাবধারা ও ওভিদের মধ্যযুগীয় রোমান্টিক কাব্য 'Heroides'-এর প্রভাব আছে বীরাঙ্গনায়। এতে পরিকল্পনার বিশালতা নেই, উদাত্ত গম্ভীর সমুন্নত ভাবের মহিমা নেই, বুদ্ধিবাদের লীলাখেলা নেই—আছে হৃদয়-ভাবের প্রাবল্য, সূক্ষ্মানুভূতির স্বপ্নমুগ্ধতা। কাব্যটির ভাবভঙ্গি চিরায়ত নয়, দৃষ্টিভঙ্গি নয় গদ্যময়। মানব-জীবনের, আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায়, নারী-জীবনের শুদ্ধ, সমঞ্জস, স্থির ও সংহত সত্তার ভাষ্যকার হিসেবে মধুসূদনকে এখানে পাইনে। এখানে দেখি তাঁর কল্পনাপ্রবণতার কম-বেশি বিস্তার। কবি যেন কিছুটা স্বপ্নের আলোকে ও মনের রঙ মিশিয়ে জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন, গ্রহণ করেছেন। 'বীরাঙ্গনায়' যে সমস্ত দৃশ্য ও চরিত্র আছে, তা কবির ব্যক্তিগত ভাবরসে জারিত। ফলে কাব্যটি পৌরাণিক বিষয়ে রচিত হয়েও মৌলিক হয়ে উঠেছে। এর রচনারীতি অভিনব, দৃষ্টিভঙ্গি বিস্ময়-বিমুগ্ধ।

'বীরাঙ্গনার' প্রতিটি নায়ক-নায়িকা পৌরাণিক। সেই পৌরাণিক চরিত্রগুলিকেই মধুসূদন ব্যক্তিগত আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে, উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী-মনের আলোকে পুনর্বিচার করেছেন।

প্রত্যেকটি চরিত্রের মুখে তিনি নতুন কথা দিয়েছেন—যে আদর্শে তিনি চরিত্রগুলিকে সৃষ্টি করতে চান, সেই আদর্শানুসারেই তিনি রচনা করেছেন কথা। পৌরাণিক ঘটনা তিনি যথেষ্টই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সেই সমস্ত ঘটনা নির্বাচনে ও গ্রহণে তিনি নিজের রুচি ও প্রয়োজনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, অনেক পৌরাণিক ঘটনার নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং পৌরাণিক কাহিনী থেকে অভিনব ন্যায় ও নীতির আদর্শ নিষ্কাশিত করেছেন। ফলে 'বীরাঙ্গনা' অনেকটা পরিমাণে উনিশ শতকের নব-পুরাণ হয়ে উঠেছে। তাছাড়া মধুসূদন যে যে অবস্থায় নায়িকাদের দিয়ে পত্র লিখিয়েছেন, তার পরিকল্পনার মধ্যেও রোমান্টিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি নায়িকাদের পৌরাণিক ইতিহাস পড়েছেন এবং তাদের জীবনেতিহাসের আবেগ-উন্মনা মুহূর্তগুলির সুযোগ তিনি পূর্ণভাবেই করেছেন গ্রহণ। নায়িকাদের পত্র লেখার উপযুক্ত 'সিচুয়েসান' আবিষ্কারে ও সৃষ্টিতে কবির বিস্ময়-বিমুগ্ধ ও রস-সন্ধানী চিত্তের প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর আছে।

মধুসূদনের এক গভীরতম উপলব্ধির দিনে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর' সৃষ্টি। কাব্যটিতে তাঁর মর্মরাঙা চিত্র আছে, অন্তরঙ্গ জীবনের রসাস্বাদ আছে। আমরা জানি, পৃথিবীর সাহিত্যে সনেট কবির হৃদয়-উদঘাটনের একটি স্বীকৃত মাধ্যম। জীবনে যে ঢেউ উঠে, মনে যে সুর জাগে—সনেটের সীমিত পরিসরে তার নিটোল মুক্তোরূপ রচনা করা যায়। পেত্রার্কের সত্তায় লরার অস্তিত্ব ছিলো রক্ত-মাংসের মতোই সজীব ও অবিচ্ছেদ্য। দেশে বিদেশে, জনতার ভিড়ে আর নির্জন নিরালায়, সুখের আলোয় আর দুঃখের তিমিরে তিনি লরার দুর্মর স্মৃতি বুকে নিয়ে ফিরেছেন। পেত্রার্কের এই অন্তরঙ্গ জীবনের মধুর আলেখ্য আছে সনেটে। সহজ মানুষ, কাছের মানুষ, অন্তরঙ্গ মানুষ সেক্সপীয়ারকেও পাই সনেটে। এক শ' চুয়ান্নটি চতুর্দশপদীতে কবির ব্যক্তিগত হৃদয়-ঝঙ্কার শুনতে পাওয়া যায়, তাঁর সুখ-দুঃখ রাগ-অভিমানে গড়া আন্তর মূর্তিটি চোখে পড়ে। শিল্পী-জীবনের

তৃতীয় পর্বে একটি বন্ধু মানুষ আর একটি উপেক্ষিকা নারীকে উপলক্ষ্য করে সেক্সপীয়ার আপনার বেদনার বার্তা সনেটে সরাসরি নিবেদন করেছেন। মধুসূদন 'মেঘনাদবধে' বিরাট প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, পরিশীলিত শিল্পী-মানসের সমুচ্চ মহিমার স্বাক্ষর রেখেছেন—সেখানে তিনি বড়ো বেশি পোষাকী। অথচ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ ও উত্থান-পতনের ইতিহাস কম বিচিত্র নয়, অনেক ভুলের শেষে সত্য-পথের উপলব্ধি তাঁর নাটকীয় সত্তার মর্মকথা। ফ্রান্সের ভর্‌সেল্‌স্ নগরীতে থাকার সময়ে মর্মান্তিক দুঃখের আঘাতে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, অন্তরের দৃঢ়মূল প্রত্যয়, পায়ের তলার শক্ত মাটির মতোই যা অপরিহার্য, তা তিনি অর্জন করতে পারেন নি। যৌবনাবেগে স্বপ্ন তিনি দেখেছেন, অকারণ অবারণ চলার উল্লাস পেতে চেয়েছেন ; কিন্তু সেই স্বপ্ন-রঙীন জীবনের প্রজাপতি-পাখা শুধুই ক্লান্তিতে ভরে উঠেছে, তাঁকে ঘাটের বদলে আঘাটায় পৌঁছে দিয়েছে। তাই সেদিন আপন জন্মভূমিকে যেন নতুন করে মধুসূদন দেখলেন, চিনলেন ও জানলেন। তাঁর দৃষ্টি ফিরলো দেশের দিকে, দেশের মৃন্ময় সত্তা আর চিন্ময় ঐতিহ্যের দিকে। এই নতুন করে আত্মোপলব্ধির পরিচয়, এই স্বদেশ-আবিষ্কারের পদচিহ্ন ছড়িয়ে আছে 'চতুর্দশপদী কবিতা-বলীতে।' কবির মন যে মাতৃভূমি থেকে একদা ছিন্নমূল হয়েছিলো, তাকে তিনি শুধু শিল্পের ভেতরে নয়, জীবনের ভেতরে প্রত্যয় রূপে স্বীকার করে নিলেন। তাই কাব্যটিকে আত্মজীবনীমূলক বলা যেতে পারে।

কিন্তু কবির এই স্বদেশ-আবিষ্কার, এই জাতীয় চেতনা কি তাঁর বিদেশী সংস্কৃতির প্রতি বিতৃষ্ণা সূচিত করে ? না, তা নয়। ভর্‌সেল্‌স্ থেকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেছেন—'...ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এত দুঃখের মধ্যেও ইতালীয়, জার্মাণ ও ফরাসী এই তিনটি সাহিত্য-সমৃদ্ধ এবং শিক্ষণীয় ভাষা শেখবার মতো মানসিক বল ও স্থৈর্য্য অটুট ছিলো। জানো গৌর, প্রধান য়ুরোপীয় ভাষায় জ্ঞান লাভ

করবার গৌরব সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিশাল ও সমৃদ্ধ রাজ্য জয়ের তুল্য। যদি ফেরবার সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তা হলে আশা রাখি, আমার শিক্ষিত বন্ধুদের মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে সেই সকল ভাষার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারবো।' সুতরাং কবির বিদেশকে মনের দিক থেকে বর্জন করার প্রশ্ন ওঠে না। আসল কথা, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এতকাল পরে মধুসূদনকে দেশ চিনিয়েছে, মাতৃভূমিকে নতুন করে ভালোবাসতে শিখিয়েছে।

অতএব দেখা গেলো, মধুসূদন নতুন প্রত্যয়সিদ্ধ অন্তর উদ্ঘাটনের জন্য সনেটের রূপাবয়ব নির্বাচন করেছেন। তাছাড়া. নিজের ক্ষয়িষ্ণু সৃষ্টিশক্তি ও অস্তায়মান প্রতিভারবির কথা হয়তো তাঁর চেতনায় ছিলো। সনেট ইতালী, ইংল্যাণ্ড ও ফরাসী দেশে উচ্চদরের শিল্প। তবু পাশ্চাত্ত্য দেশে বহুশতাব্দীব্যাপী চর্চার ফলে সনেটের যে মূল্য স্বীকৃত, বাঙলা কাব্যে সনেট প্রথমেই সেই মূল্য বহন করতে পারে না। মধুসূদন একথা জানতেন না কি ? তবু কেন তিনি সনেটের শরণাপন্ন হলেন ? ব্যক্তিগত ভাব-উপাদান প্রকাশের জন্য এই নতুন আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হলেও সনেটের চেয়ে মহত্তর কোন শিল্পকৌশলের দ্বারস্থ হওয়া কবির পক্ষে তখন সম্ভব ছিলো বলে মনে হয় না। প্রথম সংস্করণের শেষ কবিতায় ('সমাপ্তে') তাঁর মুখে শুনতে পাই—

বিসর্জিব আজি, মাগো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি !)
ও প্রতিমা ! নিবাইল দেখ হোমানলে,
মনঃকুণ্ডে অশ্রু-ধারা মনোদুঃখে ঝরি !

* * *

ডুবিল সে তরী,
কাব্য-নদে, খেলাইনু যাহে পদ-বলে
অল্প দিন !

মধুসূদনের যে হোমানল নিভে গেছে, তা সৃষ্টির হোমানল। প্রমিথিউস স্বর্গ থেকে আগুন নিয়ে এসেছিলেন ; কবিও আগুন নিয়ে আসেন—সৃষ্টির আগুন। মধুসূদন একদা যৌবনে কাব্যনদীতে শক্তির অদম্য উল্লাসে অনায়াসে বিচরণ করেছেন, কিন্তু আজ দুরদৃষ্টের অভিশাপ এসেছে, সৃষ্টির আগুন নিভে গেছে—মনঃকুণ্ডে অশ্রু-ধারা মনোদুঃখে ঝরি। তাই গাণ্ডীবীর চোদ্দ চরণের চেয়ে বেশি ওজনের গাণ্ডীব তুলবার ক্ষমতা নেই। মনে রাখতে হবে, এর পরে আর কোন পূর্ণাঙ্গ কাব্য তিনি রচনা করতে পারেন নি। নিছক কবিত্ব ও রসাভিব্যক্তির দিক থেকে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' যে প্রশংসার দাবি করতে পারে না, মধুসূদনের ক্ষীয়মাণ সৃষ্টিশক্তির মধ্যে তার কারণ নিহিত।

এবার শিল্পকর্ম হিসেবে মধুসূদনের সনেট বিচার করা যাক। কবির জীবনের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে তার যত মূল্যই থাক, সাহিত্যিক সার্থকতাতেই তার চরম মূল্য নির্ভর করে। সত্য বটে, কবিতাধর্ম, কল্পনাবৃত্তি ও রসানুরাগের কথা মধুসূদনের সনেটে আছে, তবু কবিতা হিসেবে তাঁর সব সনেট উপভোগ্য নয়। তবে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তিনি সার্থক স্রষ্টা। তিনি প্রথম আট পঙ্‌ক্তিতে দুটোর বেশি মিল দেখান নি—যেখানে দেখিয়েছেন ('কাশীরাম দাস') সেখানে একটু ভিন্নতর পন্থা অববলম্বনের লোভ প্রবল হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বড়ো কথা—শ্লাঘার কথা—তিনি সনেটের ছাঁচটি ধরতে পেরেছিলেন, চৌদ্দচরণের আঁটসাঁট শক্ত-সমর্থ কায়া-রূপের মধ্যে, বলতে পারি তার নিটোল মুক্তোরূপের মধ্যে গভীর ভাবের প্রাণটি তুলে ধরবার কৌশল আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। যেখানে ভাব তার সহায়, সেখানে ('বিজয়া-দশমী,' 'সমাপ্তে' 'কপোতাক্ষ নদ', 'বঙ্গভাষা,' 'সীতা দেবী' ইত্যাদি সনেট) তিনি সিদ্ধকাম। তবু 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' মধুসূদনের কবি-প্রতিভার সার্থকতম সৃষ্টি নয়। পেত্রার্ক, মিল্টন, সেক্সপীয়ার, রসেটি, রঁ সার্দ-এর সনেটে যে বিষয়-গরিমা ও ভাব-মহিমা আছে, মধুসূদনের অনেক

চতুর্দশপদীতেই তা নেই। ভাব যেখানে কবিমনের সোহাগ-স্পর্শে রস-সিক্ত হয় না সেখানে কবিতা লেখা নিরর্থক। শোক-দুঃখের তাপে মধুসূদনের মনটা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনার সময় ঠিক রসমুখী ছিলো বলে মনে হয় না। তাই অনেক সনেট শুধুই গদ্যাত্মক, কাব্যের ভঙ্গি আছে—কিন্তু প্রাণ নেই। আবার অনেক সনেট দাঁড়িয়ে আছে একটু আলঙ্কারিক মারপ্যাঁচের ওপর। কাব্যে অলঙ্কার ভালো, কিন্তু তার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা বিপজ্জনক। এই সব কারণে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর সনেটের ভাষারূপ নদীতে পিঠ-উঁচিয়ে-দেওয়া চড়ার মতো—শুধু খট্‌খটে মাটি, জল গেছে শুকিয়ে।

৪ হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র

হেমচন্দ্র ব্যাচিলর অব আর্টস ; কিন্তু সে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া ডিগ্রি। সাহিত্যের রসলোকে আস্বাদন-শক্তির সার্টিফিকেট হিসেবে তার মূল্য কানাকড়ির সমান। তবে সত্যিকারের প্রশংসাপত্র তিনি পেয়েছিলেন মধুসূদনের কাছে ; তাতে বলা হয়েছিলো, হেমচন্দ্র 'এ রিয়েল্ বি. এ.'। কিন্তু আজকের রসবেত্তাদের কাছে মধুসূদনের সার্টিফিকেটও অচল ; কারণ হেমচন্দ্রের রচনাবলীতে প্রশংসাসূচক কথাগুলির উপযুক্ত সমর্থন নেই। অন্ততঃ সাহিত্যের বিশুদ্ধ (absolute) মূল্য পরীক্ষার দিক থেকে তা-ই মনে হয়। মধুসূদনের কাব্যকৃতি বাঙালী পাঠকের যে রসবোধ জাগিয়ে তুলেছে, 'রিয়েল্ বি. এ.'-এর লেখায় তার রসদ যোগানোর ব্যবস্থা নেই। পূর্বসূরীর সৌন্দর্যলোক উত্তরসূরীর অজ্ঞাত ও অনায়ত্ত। তবে হেমচন্দ্রের সাহিত্যচর্চার ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করে নিতে হয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যকলার আদর্শ ঈশ্বর গুপ্তের পথ বেয়ে, রঙ্গলালে কিছুটা পরিস্রুত হয়ে হেমচন্দ্রে যে রূপ নিয়েছে তাতে ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু এরই মাঝখানে মধুসূদনের সৃষ্টি একটা বিরাট বিস্ময় এবং সেই বিস্ময়ের ধাক্কায় বাঙলা কাব্যের ধারাবাহিক সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন হেমচন্দ্র। ফলে বাঙলা কাব্যের উত্তরাধিকারের সঙ্গে মিলিয়ে নয়, মধুসূদনের কাব্যাদর্শের নিরিখেই হেমচন্দ্রকে বিচার করার চেষ্টা দেখা যায়। এবং সে-বিচারে তিনি উত্তীর্ণ হন না। তাই হেমচন্দ্রের বিড়ম্বিত অবস্থাটা কিছুটা সহানুভূতির অপেক্ষা রাখে।

ঈশ্বর গুপ্তের আমল থেকে বাঙলা সাহিত্য পুরোপুরি নগর-

কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ছাপ আমাদের সাহিত্যকর্মে মুদ্রিত হতে থাকে। বাঙলা সাহিত্যের পূর্বাগত ঐতিহ্যে নতুন ভাব ও রীতি প্রবর্তনে এই নব্যশিক্ষাসমৃদ্ধ নাগরিকতার ভূমিকা প্রধান। কবিগানের বাঁধনদার হলেও গুপ্তকবি ছিলেন কলকাতার মানুষ, রঙ্গলালের জন্মস্থান বর্ধমান জেলার একটি অখ্যাত গ্রামে হলেও খিদিরপুরেই তাঁর প্রথম জীবন কেটেছে। মধুসূদনের বাল্যকাল সাগরদাঁড়িতে কাটলেও কলকাতাই তাঁর সত্যিকারের জীবনভূমি। শিক্ষা ও কর্মসূত্রে কলকাতার সঙ্গে উনিশ শতকের কবিদের যোগাযোগের জন্যই নব-নাগরিক সাহিত্যের সূত্রপাত ও বিকাশ। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাগরিক কবিমণ্ডলের অন্যতম এবং নতুন সাহিত্যের উত্তরসাধক।

হেমচন্দ্রের জন্ম মাতুলালয়ে—হুগলী জেলার গুলিটা রাজবল্লভহাটে। দরিদ্র পিতার সন্তান হলেও অবস্থাপন্ন মাতামহের সংসারে তিনি সুখেই বড়ো হয়েছেন। তারপর বছর নয় বয়সে তিনি মাতামহের খিদিরপুরের বাড়িতে চলে আসেন। এখানেই তাঁর বিদ্যাশিক্ষার সত্যিকারের আরম্ভ। প্রতিবেশী প্রসন্নকুমার অধিকারী স্বেচ্ছায় তাঁর ইংরেজী শিক্ষার ভার নেন এবং তাঁরই চেষ্টায় হেমচন্দ্র হিন্দুকলেজে স্কুল-বিভাগের উচ্চতর শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ায় তাঁর সেবা ও যত্ন ছিলো। আর তারই জন্য তিনি যেমন হিন্দু কলেজের শিক্ষক প্রসন্নকুমারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন, তেমনি একাধিক বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, শিক্ষক-শিক্ষণ পরীক্ষায়ও হেমচন্দ্রকে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে দেখি। ১৮৫৭ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্রমাধব ঘোষ, গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদির সঙ্গে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়াও তাঁর পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। এইভাবে নিজের

বিদ্যানুরাগের পরিচয় দিয়ে তিনি ক্রমে ক্রমে বি. এ. ও বি. এল ডিগ্রি লাভ করেন। সুতরাং হেমচন্দ্র উপাধিধারী শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন এবং সেই অর্থে ই ছিলেন পরিশীলিত মন ও মার্জিত রুচির অধিকারী।

কেরানী রূপে হেমচন্দ্রের প্রথম কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। তারপর তাঁকে দেখতে পাই হাইকোর্টের ব্যবহার-

রূপে। এখানে আশারূপ প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে না পারায় কিছুকালের জন্য মুন্সেফিও করেন। সবশেষে আবার তিনি হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে ফিরে আসেন এবং এই স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করার ফলে হাইকোর্টের প্রধান সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। কিন্তু কর্মজীবনের আর্থিক সচ্ছলতা সত্ত্বেও তাঁর শেষজীবনের ইতিহাস বড়োই করুণ। জরা ব্যাধি আর শোক দুঃখে তাঁর অবস্থা মর্মান্তিক হয়ে ওঠে, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে তিনি একেবারে অসহায় হয়ে পড়েন।

হেমচন্দ্রের ছাত্রজীবন ও কর্মজীবনের এই ইতিহাস মধুসূদনের মতো চমকপ্রদ নয়। তিনি মন দিয়ে লেখাপড়া করেছেন, পরীক্ষার পর পরীক্ষা পাশ করেছেন, উপযুক্ত বৃত্তির সন্ধানে কিছুদিন ঘুরে বেড়িয়ে অবশেষে আইন ব্যবসায়ী রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। মনে হয়, একজন স্বাধীন সুখী সচ্ছল মানুষ রূপে জীবন পরিচালনার অভীপ্সা ছাড়া আর কোন বৃহত্তর বা মহত্তর আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিলো না। স্কুল কলেজের ভালো ছাত্ররূপে তাঁকে দেখেছি, কিন্তু ডিগ্রি লাভের চেয়ে জ্ঞান লাভের পিপাসা তাঁর মধ্যে প্রবল ছিলো কিনা সন্দেহ। হেমচন্দ্রের সাহিত্য-প্রীতিও পরবর্তীকালের, ঠিক ছাত্র-জীবনের নয়। মাঝে মাঝে সাহিত্য পাঠ ও কাব্যরচনায় আত্ম-নিয়োগ করলেও বঙ্গবাণীর তপশ্চর্যা তাঁর প্রথম জীবনের লক্ষ্য ছিলো না। সাহিত্য ছিলো তাঁর দ্বিতীয় জীবনের সাধনা। হয়তো মধুসূদনের সঙ্গে পরিচয়ে সেই সাধনার সূত্রপাত। কিংবা বাল্য-

সুহৃদ্ শ্রীশচন্দ্র ঘোষের আত্মহত্যার মর্মান্তিকতা থেকেই তাঁর কবি-ভাবনা উৎসারিত। সার কথা, সাহিত্য রচনার জন্মগত প্রতিভা হেমচন্দ্রের ছিলো না, তেইশ বছর বয়সের আগে তাঁর মধ্যে তেমন কোন সৃষ্টির বেগ দেখা যায় নি।

কবির প্রথম কাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিণী' (১৮৬১)। তারপর ক্রমে ক্রমে 'বীরবাহু কাব্য' (১৮৬৪), 'কবিতাবলী' (১৮৭০), 'বৃত্রসংহার (১ম খণ্ড—১৮৭৫), 'আশাকানন' (১৮৭৬), 'বৃত্রসংহার' (২য় খণ্ড —১৮৭৭), 'কবিতাবলী' (২য়খণ্ড—১৮৮০), 'ছায়াময়ী' (১৮৮০), 'দশমহাবিদ্যা' (১৮৮২) ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া 'হুতোম প্যাঁচার গান' (১২৯১), 'নাকে খৎ' (১৮৮৫ ?), 'ভারতভিক্ষা' (১৮৭৫), 'ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব' (১৮৮৭) 'চিত্তবিকাশ' (১৮৯৮) ইত্যাদিও উল্লেখ করা যেতে পারে। দু'খানি ইংরেজী নাটকের বঙ্গানুবাদের কৃতিত্বও তাঁর প্রাপ্য—'নলিনী-বসন্ত নাটক' (টেম্পেষ্ট অবলম্বনে। ১৮৬৮) ও রোমিও-জুলিয়েত' (১৮৯৫)।

প্রথমতঃ বিচার করা যাক মধুসূদনের উত্তরাধিকারী হিসেবে হেমচন্দ্রের কৃতিত্বের কথা। অনেকে মনে করেন, মধুসূদনের কাব্য-কৌশল হেমচন্দ্রের পক্ষে অনধিগম্য ও অনায়ত্ত ছিলো ; 'মেঘনাদ-বধের' সৌন্দর্য অনুধাবন করার মতো কবিবুদ্ধি তাঁর ছিলো না। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। 'মেঘনাদবধের' প্রথম ও সংশোধিত মুখবন্ধ হেমচন্দ্রের বিচারশক্তি ও রসবোধের পরিচায়ক। অমিত্রাক্ষরের বিশিষ্টতা যে যতির বিচিত্র বিন্যাসের ওপর নির্ভরশীল, একথা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। তিনি নিজেই বলেছেন—'(বাঙলা ছন্দের) প্রণালী স্বতন্ত্র, অর্থাৎ মাত্রা গণনা করিয়া তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, একাদশ, দ্বাদশ এবং চতুর্দশ-অক্ষরের পর বিরাম যতি থাকে এবং আবৃত্তির সময় সেই সেই স্থানে, ছন্দ-অনুসারে, শ্বাস-পতন করিতে হয় ; এবং যে সকল স্থানে শব্দের মিল থাকে, আপাততঃ বোধহয়, যেন শব্দের মিলনই এ প্রণালীর প্রধান অঙ্গ :

কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবনা করিলেই বুঝা যায় যে, শব্দের মিল ইহার আনুষঙ্গিক এবং শ্বাসক্ষেপের নিয়মই প্রধান কৌশল।' অর্থাৎ তাঁর মতে পদান্তের মিল বাঙলা কবিতার প্রধান অঙ্গ নয়। দ্বিতীয়তঃ অমিত্রাক্ষরে ভাবের প্রবহমানতা যে ভাব-যতির (ছেদ) ওপর নির্ভরশীল, তাকে তিনি শ্বাস-যতির সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন নি। তাঁর মুখেই শুনতে পাই, অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতা পাঠ করতে হলে অর্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে শ্বাস ফেলতে হয়। তৃতীয়তঃ কোন্ কোন্ অক্ষরের পর যতি দেওয়া বাঙলা ছন্দের নিয়ম তা-ও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তাঁর মতে, বাঙলা ছন্দে যতি-বিন্যাসের যত প্রকার নিয়ম আছে, তা-ই কৌশলের সঙ্গে যোজনা করে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর রচনা করেন। হেমচন্দ্রের এই ছন্দ-বিচার যুক্তিসম্মত। তেমনি যুক্তিসম্মত চরণের তৃতীয় মাত্রার পরে পূর্ণচ্ছেদ বিন্যাসের বিরুদ্ধে তাঁর মন্তব্য; কারণ তাতে সত্যি ধ্বনিস্রোত অকস্মাৎ ভেঙে গিয়ে শ্রুতিতুষ্টি ঘটে। ছন্দের পরে আসে ভাষার কথা। হেমচন্দ্র ভারতচন্দ্রের 'সুকোমল বাক্যলহরী' মধুকবির কাব্যে পাননি বটে, কিন্তু যা পেয়েছেন সেই 'শব্দপ্রতিঘাতে দুন্দুভি-নিনাদ এবং ঘনঘটা গর্জনের গম্ভীর প্রতিধ্বনিতেই' তিনি সন্তুষ্ট। তাঁর স্মরণীয় উক্তি ঃ 'বিদ্যাসুন্দরের শব্দাবলীতে মেঘনাদবধ বিরচিত হইলে অতিশয় জঘন্য হইত।' অন্যদিকে দূরান্বয়, নির্বিচারে নামধাতু গঠন, অলঙ্কারের উপর্য্যুপরি প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর আপত্তিও প্রণিধানযোগ্য।

এতো গেলো 'বাগ্দেবীর বীণাযন্ত্রের নূতন ধ্বনির' কথা। তার পরে ধরা যাক 'সুমধুর কবিতারসের' কথা। হেমচন্দ্র জানতেন, ছন্দ ও পদ কবিতার পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার স্বরূপ। কাব্যের প্রাণ তার রস। আর সেই রসসৃষ্টি কবিত্বশক্তিসাপেক্ষ। মধুসূদনের সৃজনী-প্রতিভার দুটো বড়ো গুণ হেমচন্দ্রের চোখে পড়েছে—তেজস্বিতা ও উদ্ভাবকতা। মধুসূদন-পূর্ব যুগের কাব্যে করুণ ও আদিরস ছাড়া আর কিছুই নেই—তাতে বীর বা রৌদ্ররসের লেশ-

মাত্রও পাওয়া কঠিন। হেমচন্দ্রের চোখে 'মেঘনাদবধ' বীর ও রৌদ্ররসের আকর এবং কবির তেজস্বিতার সুমহান প্রকাশ। কথাটা আংশিক সত্য। 'মেঘনাদবধে' বীররসাদি আছে, কিন্তু করুণরসও কম নেই। মূলতঃ বীর ও করুণ এবং গৌণতঃ অন্যান্য রসের নানা বিচিত্র মিশ্রিত স্বাদের জন্য কাব্যটি যথার্থই উপভোগ্য তবে মধুসূদনের উদ্ভাবনী শক্তির সত্যিই তুলনা নেই। হেমচন্দ্রের ভাষায়, তাঁর কাব্যোদ্যানে কুহকিনী কল্পনাদেবীকে কত প্রকার সম্মোহিনী বেশে ভ্রমণ করতে দেখা যায়। কখনও ধীরে ধীরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাল্মীকির পদতল থেকে পুষ্প হরণ করছেন, কখনও স্বকীয় নিকুঞ্জ থেকে নব কুসুমাবলী বিস্তৃত করছেন। কখনও ইন্দ্রজিৎজায়া প্রমীলার বেশে লঙ্কা প্রবেশ করছেন, আবার কখনও মায়াবেশে শ্রীরামচন্দ্রের পথপ্রদর্শিনী হয়ে ধর্মরাজ ভবনে গমন করছেন। অর্থাৎ সুচারু কল্পনার বহুমুখিনতা 'মেঘনাদবধে' চোখে পড়ে। সেই কল্পনার দৌড় শুধু পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ নয়, তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র প্রসারিত এবং অতীত, বর্তমান, অদৃশ্যকালের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তাঁর বাক্যচিত্রে দেব, দানব ও মানবের বিচিত্র কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ ও দর্শনগোচর হয়ে উঠেছে। 'মেঘনাদবধ' পড়তে পড়তে 'অন্তর্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহ্যেন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়।' এই কল্পনার সাড়ম্বর সমারোহ ও বিশ্বোজ্জ্বল বর্ণনা হেমচন্দ্রের কাছে নয়ন ও শ্রবণসুখকর মনে না হয়ে পারে নি। মধুসূদনের কাব্যে কবিকৌলীন্যের এই যে শ্রেষ্ঠ লক্ষণগুলি হেমচন্দ্র দেখতে পেয়েছেন, তা মোটামুটি তর্কাতীত। উত্তরসাধকের রসবোধ ও বিচারবুদ্ধি এখানে যেমন দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতায় অবিচার করেনি, তেমনি অত্যুক্তির উচ্ছ্বাসেরও প্রশ্রয় দেয় নি। 'মেঘনাদবধের' ত্রুটিগুলি ছুটো মুখ-বন্ধেই যথোচিতভাবে নির্দেশিত, একথাও মনে রাখতে হবে।

সুতরাং মধুসূদনের কাব্য-কৌশল হেমচন্দ্রের কবিবুদ্ধির পক্ষে অনধিগম্য ছিলো না। তার নব্যতা, রসাভিব্যক্তি, ভাবৈশ্বর্য, রূপবন্ধ ও ছন্দ-মহিমা হেমচন্দ্র ধরতে পেরেছিলেন। তাই

মধুসূদনের সার্টিফিকেটে 'রিয়েল বি.এ.' কথা দুটি থাকা আশ্চর্যের নয়। তবু যদি উত্তরসাধকের দায়িত্ব হেমচন্দ্র বিশ্বস্তভাবে পালন না করে থাকেন, তবে তার কারণ খুঁজতে হবে অন্যত্র, 'মেঘনাদবধ' সম্পর্কে ভুল ধারণার মধ্যে নয়। হেমচন্দ্রের আর যে অভাবই থাক, সাহিত্যবুদ্ধির অভাব ছিলো না। ভালো কবিতা বলতে কি বোঝায়, কবিতাকৌলীন্যের লক্ষণ কি, কাব্যের উদ্দেশ্যই বা কি তা তিনি জানতেন। তাঁর মতে—'যেখানে যে কথাটি খাটে, যে ব্যক্তির মুখে যেরূপ উক্তি সম্ভব, কোন্ উৎপ্রেক্ষা কোন্ কালের উপযোগী, কোন্ শব্দটি, কোন্ পদটি উচ্চারণ করিলে কোন্ রসের উদ্দীপন করে এ সকলের প্রতি যে লেখক দৃষ্টি রাখিতে পারেন, তাঁহার লেখাই সমুৎকৃষ্ট হয়।' অর্থাৎ ভালো কবিতায় ঔচিত্যবোধের ব্যতিক্রম ঘটে না। একথা সত্য। তিনি আরও বলেছেন, কাব্য-রচনার প্রধান উদ্দেশ্য, লোকের মনোরঞ্জন করা। এর অর্থ এই নয় যে, সাহিত্য খেলনা মাত্র। সাহিত্যরাজ্যে খেলনা পেয়ে লেখক বা পাঠক কারোরই যে মনস্তুষ্টি হয় না তা তাঁর অজানা ছিলো না। তবে যে সৃষ্টিতে লেখকের আনন্দ, তা পড়ে পাঠকেরও আনন্দ না হয়ে পারে না; কারণ লেখার গুণে লেখকের আনন্দ অবশ্যই পাঠকের অধিগম্য হয়ে ওঠে। এবং সে অর্থেই কবিতা মনোরঞ্জন করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, হেমচন্দ্র ছিলেন উনিশ শতকের নাগরিক বাঙলার মানুষ, রেনেসাঁসের সন্তান, নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত কবিপুরুষ, মার্জিত রসরুচি ও সমৃদ্ধ সাহিত্যবুদ্ধির অধিকারী। তবু কেন তিনি মধুসূদনের ঐতিহ্য সুষ্ঠুভাবে বহন করতে পারলেন না? তার কারণ একাধিক।

হেমচন্দ্র বলেছেন, মধুসূদনের অবলম্বিত প্রণালীর চেয়ে উৎকৃষ্টতর দ্বিতীয় প্রণালী আর নেই। শুধু তা-ই নয়, মধুসূদনের মতো যশ অর্জনের সৌভাগ্য অন্যের পক্ষে অলভ্য—'বোধহয়, লেখকের (হেমচন্দ্রের) ন্যায় অনেকে মনে করেন যে, এই বিপুল

যশ তাহাদের কপালে ঘটিল না।' হেমচন্দ্রের এই উক্তি শুধু অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে নয়, 'মেঘনাদবধের' সামগ্রিক কাব্যাদর্শ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এ তাঁর অন্তরের বিশ্বাস, এ তাঁর কবিত্বশক্তির সত্য মূল্যায়ন। মধুসূদনের মতো কাব্য সৃষ্টি করতে গেলে যে জাতীয় সৃজনী প্রতিভার প্রয়োজন, তা হেমচন্দ্রের ছিলো না, এ স্বীকারোক্তি আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। উপযুক্ত উত্তরসাধকের অভাবের আশঙ্কাতেই হেমচন্দ্র আরও বলেছেন—'কবি মাইকেলের এই কীর্তি কতদিন যে সজীব থাকিবে, বলা দুঃসাধ্য।'

দ্বিতীয় কথা, মধুসূদনের নতুন কাব্যপন্থায় শ্রদ্ধা থাকলেও ভারতচন্দ্রের প্রতি হেমচন্দ্রের দুর্বলতা ছিলো। তাঁর চোখে ভারতচন্দ্র আদর্শ কবি, বিদ্যাসুন্দরের স্রষ্টার মতো সুলেখক তিনি এদেশে আর দেখেন নি, ভবিষ্যতেও দেখা যাবে কিনা সন্দেহ পোষণ করতেন। রসিকতা, চতুরতা ও মনুষ্যপ্রকৃতিতে বিলক্ষণ জ্ঞানের দিক থেকেও ভারতচন্দ্র তুলনাহীন। এই সব কারণেই হেমচন্দ্রের ধারণা ছিলো—'কবিতাকেশরী রায়গুণাকরের পর কবিতারচনা করিয়া যশঃ লাভ করা অসাধ্য। ইহা জানিয়াও এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া আপাততঃ মূঢ়ের কার্য বলিয়া বোধ হইতে পারে।' মধুসূদনের উৎপাদিকা শক্তিতে তিনি চমৎকৃত হয়েছেন, তাঁর বিচিত্র রসের সাধনায় শ্রদ্ধান্বিত হয়েছেন, 'মেঘনাদবধে' কল্পনাপ্রবণতার বিপুল প্রসারে তাঁর বিস্ময়ের অন্ত ছিলো না, তবু ভারতচন্দ্রের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিলো অক্ষুণ্ণ। মধুসূদন হেমচন্দ্রের কাছে ছিলেন শ্রেয়কবি আর ভারতচন্দ্র ছিলেন প্রেয়কবি। তাই মধুকবির কবিত্বশক্তি ও জনপ্রিয়তা দেখে তাঁর মন্তব্য: 'বুঝিবা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় কবিকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে হয়।' এখানে কবির কণ্ঠে কি একটু বেদনার সুর বেজে ওঠেনি?

আর এই দুটি কারণের জন্যই শেষ পর্যন্ত মধুসূদনের পন্থা অনুবর্তনের নিষ্ঠাপূর্ণ প্রয়াস হেমচন্দ্রের মধ্যে অনুপস্থিত।

মধুসূদনের সৃষ্টিশক্তি হেমচন্দ্রের ছিলো না, তাঁর কবিপ্রকৃতি

ছিলো ভিন্ন ধাতুতে গড়া। মধুসূদনের কল্পনাপ্রবণতা তাঁর কবি-স্বভাবের চরাচরব্যাপী অভিক্ষেপ, আপন মানসের আভ্যন্তরীণ তাগিদেই তিনি স্বপ্নবিলাসী। এই কবিস্বভাবের কল্পনাপ্রবণতাকে আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাবের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু হেমচন্দ্রের কল্পনাশক্তি তাঁর কবি-মানসের স্বভাবজ ধর্ম নয়। তাঁর কাব্যে, বিশেষতঃ 'বৃত্রসংহারে' যে কল্পনার অপরিসীম বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়, তার সূত্রটি বুদ্ধিধৃত এবং বাইরে থেকে কবি-মানসের সঙ্গে যুক্ত। হেমচন্দ্রের কবিপুরুষের মূল স্বভাবে ভাবতান্ত্রিকতা ছিলো না বলেই তাঁর কল্পনাধর্মেরও কবি-স্বভাবের সঙ্গে কোন অবিচ্ছিন্ন সম্পৃক্তি নেই। তাই তাঁর কল্পনার কথাভাষ্যকে বানানো কথা বলে মনে হয়। কালিদাস রায় বলেছেন—'হেমচন্দ্রের কাব্যের প্রধান ঐশ্বর্য ভাবে নয়, ভাষায় নয়, ভঙ্গীতেও নয়—তাঁহার কাব্যের ঐশ্বর্য কল্পনার অবাধ গতিতে। এমন সববাধাবন্ধনহীন মুক্ত-পক্ষ কল্পনাশক্তি অতি অল্প কবিরই ছিল বা আছে।...বৃত্রসংহারে কবি-কল্পনার লীলা অনন্যসাধারণ। কি বিশ্বকর্মার কর্মশালা, কি দধীচির তপোবন, কি বৃত্রাসুরের রাজসভা, কি দেবগণের মন্ত্রণা-পরিষদ—সর্বত্রই হেমচন্দ্রের কল্পনা অপূর্ব রূপচিত্রসৃষ্টির পরিচয় দিয়াছে। মাইকেলের কল্পনার চেয়েও যেন হেমচন্দ্রের কল্পনার সবলতা, প্রসার ও সৃজনীশক্তি স্থলে স্থলে বেশি বলিয়া মনে হয়।' এই উক্তির প্রথমাংশ সত্য—হেমচন্দ্রের কল্পনাশক্তি সুদূরপ্রসারী ছিলো; তবে, আগেই বলা হয়েছে, তাঁর সেই কল্পনাশক্তি তাঁর কবিস্বভাবের অবিচ্ছিন্ন ধর্ম নয়। অন্যদিকে হেমচন্দ্রের কল্পনার সবলতা, প্রসার ও সৃজনীশক্তি মধুসূদনের চেয়ে কোনমতেই সমধিক ছিলো না। মধুসূদনের কল্পনায় যেখানে গভীর ও গম্ভীর ভাবজগৎ গড়ে উঠেছে, সেখানে হেমচন্দ্রের কল্পনা বানানো বর্ণনায় ও অফুরন্ত বক্তৃতায় উল্লসিত হয়েছে মাত্র। সুতরাং সেদিক থেকে মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের মধ্যে তুলনা টেনে লাভ নেই।

সংগঠন-নৈপুণ্যেও হেমচন্দ্র মধুসূদনের সমকক্ষ নন।

'মেঘনাদবধ' পূর্বাপর অচ্ছেদ্য সূত্রে গঠিত, নিয়মিত ভাবকল্পনায় সংহত এবং এক অখণ্ড রসলোকে সুবলয়িত রচনা। তাতে ঘটনাধারা তথ্যপুঞ্জমাত্র নয়, গভীরতর ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ ও তাৎপর্য-মণ্ডিত। কিন্তু হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার শিথিলবদ্ধ, সাঙ্কেতিকতাবর্জিত ও তথ্য-সমাবেশ-সর্বস্ব। এতে রসাভিব্যক্তির একমুখিনতা নেই, নেই ভাবকল্পনার নিয়মিত পরিণতি। আসল কথা, পুরাণ থেকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন উপকরণ মাত্র সংগ্রহ করে আপন কবিমনের প্রবর্তনায় মধুসূদন যেমন অ-পূর্ব ভাবজগৎ গড়ে তুলতে পারতেন, হেমচন্দ্রের পক্ষে তেমন সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর ছিলো না। মধুসূদনের সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর সংগ্রহের পার্থক্য অনেক, কিন্তু হেমচন্দ্রের কাব্যজগৎ তাঁর অন্বেষিত পুরালোকেরই উন্নততর সংস্করণ মাত্র, তাদের মধ্যে কোন মৌলিক ভেদ নেই। একজন পুরনোকে একেবারে ঢেলে সাজিয়ে নতুন করে তুলেছেন, অন্যজন পুরনোর এখানে সেখানে পরিবর্তন ক'রে তার সমুন্নত রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। সুতরাং কলা-কৌশলের দিক থেকেও মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের আদর্শ অভিন্ন নয়।

মধুসূদনের আলোচনায় আমরা দেখেছি কবির অনন্য জীবন-তৃষ্ণার ছবি। বিরূপ অদৃষ্টের হাতে জীবনের নিদারুণ লাঞ্ছনায় কবি নিজে যেমন বিড়ম্বিত, তেমনি বিড়ম্বিত তাঁর মানসপুত্র ইন্দ্রজিৎ। তবু জীবনপ্রেম ও মানববাদই যেন কবির অন্বিষ্ট : মাটি কেটে সর্পের আয়ুহীন জনকে দংশন করার চেয়ে বড়ো সত্য জীবনের প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসার আকর্ষণ। আর এই জীবন-তৃষ্ণার মূল্যেই দৈবপ্রসাদপুষ্ট রামচন্দ্রের চেয়ে দৈবনিগৃহীত ইন্দ্রজিৎ বড়ো। মোট কথা, মধুসূদনের কাব্যে পাই একটা নতুন জীবন-নীতি—যে নীতির ভিত্তি পৃথিবীর মাটি আর মনুষ্যত্বের প্রতি প্রীতি। কিন্তু হেমচন্দ্রে নতুন নীতি-চেতনার অঙ্গীকার নেই, তাঁর প্রমাণ পাই তাঁর কাব্যের দেব-চরিত্রে। 'বৃত্রসংহারের' দেবতারা ভারতীয় পুরাণের দেবতাই, হোমারের কাব্যের দেবতা

নন। *তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন, মানুষের চেয়ে দেবতা* বড়ো। আর সেই দেবলোক ও অধ্যাত্মজগতের সঙ্গে কবির মন ছিলো ভক্তিসূত্রে সম্বদ্ধ। ফলে নিয়তির হাতে রাবণ-ইন্দ্রজিতের বিবাহত জীবনের মর্মান্তিকতায় মধুসূদনের অন্তরাত্মা যেমনভাবে কেঁদেছে, যে জিজ্ঞাসায় মৃত্যুর আকাশ ধ্বনিত করে তুলেছে, বৃত্রের শাস্তিতে হেমচন্দ্রের তেমনিভাবে মনোবেদনা অনুভবের কারণ ঘটেনি, তেমন কোন জিজ্ঞাসার ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়নি। মধুসূদনের নতুন জীবন-নীতির জন্যই তাঁর প্রিয়পাত্রের মৃত্যু সংশয় ও সংক্ষোভপূর্ণ, হেমচন্দ্রের পুরোন জীবন-নীতিই বৃত্রের মৃত্যুকে বিনা প্রশ্নে নিয়তির অনিবার্য বিধান হিসেবে প্রশান্ত চিত্তে মেনে নেওয়ার প্রধান কারণ। দ্বিতীয়তঃ মধুসূদনের চোখে নরক ও পিতৃলোক শুধুই মানবিক কৌতূহলের বিষয়, কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সঙ্গে তাদের যুক্ত করে দেখার চেষ্টা তিনি করেন নি। তাঁর রসিকচিত্তের তাগিদেই এই সব অজানালোকে তাঁর কল্পনার অভিসার, কতকগুলি নতুন ছবি পাওয়ার লোভ ছাড়া আর কোনো লাভ তাঁর ছিলো না। কিন্তু হেমচন্দ্র এ-সব ক্ষেত্রে মানবিক কৌতূহলের বশবর্তী নন, রসিকের ভূমিকাভিনেতা নন, রূপ-চিত্র-লোলুপও নন। হিন্দুদর্শন ও ধর্মতত্ত্বে তাঁর অধিকার ছিলো। আর সেই দার্শনিকতা ও তত্ত্ববোধ নিয়েই অধ্যাত্মলোকের বিভিন্ন অংশে তাঁর মানসাভিসার। তাই তাঁর ব্রহ্মলোক, শিবলোক, বৈকুণ্ঠলোক ইত্যাদির বর্ণনা শুধুই কাব্যরস আস্বাদন করায় না, 'গুরুপাক দার্শনিক তত্ত্ব হজম' করতেও বাধ্য করায়।

সুতরাং মধুসূদনের দৃষ্টির সঙ্গে হেমচন্দ্রের দৃষ্টির ভেদ অনস্বীকার্য সত্য। একজন যুগপ্রবর্তক কবি বলেই নতুন কবিদৃষ্টি, রসরুচি ও জীবন-নীতি প্রতিষ্ঠায় উন্মুখ, অন্যজন জাতীয় কবি হিসেবে রস, রুচি, ধ্যান ও জ্ঞানে পুরোন ঐতিহ্যের নতুন প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। পাঠকের কাছে মধুকবির দাবি যুগোপযোগী রসজ্ঞতার; হেমচন্দ্রের দাবি জাতীয় ঐতিহ্য-চেতনার। পূর্বস্রূরীর

নতুন কাব্যমন্ত্র প্রচারে আত্মতৃপ্তিই একমাত্র ঈপ্সিত পুরস্কার ছিলো, পাঠকের বিরূপতা তাঁকে আদর্শচ্যুত করতে পারে নি। উত্তরসূরী অজনপ্রিয়তার ভয়ে পাঠকের অভ্যস্ত রসবোধে চিড় কাটতে চাননি. লোকবল্লভতাতেই খুঁজতে চেয়েছেন আত্মতৃপ্তি। মধুসূদনের চিঠিপত্রে পাই একজন সংশয়হীন কবি-পুরুষকে—যিনি কখনও উপেক্ষায়, কখনও বিদ্রূপে, কখনও উপদেশে, কখনও বা সাগ্রহে নতুন পাঠক তৈরি করতে চেয়েছেন, নিজেকে অভ্রান্ত বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আর হেমচন্দ্রের মধ্যে আমরা দেখেছি সেই স্পর্শকাতর ও নিন্দা-সচেতন কবি-মানুষটিকে—যিনি মধুসূদনের কাব্যের ভূমিকা লেখার হঠকারিতায় পরে স্বস্তি পান নি—'একদিন আমি কবিবর মাইকেলের প্রশংসা করিয়া অনেকের নিকট নিন্দাভাগী হইয়াছিলাম।'*

হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্য-প্রচেষ্টা 'চিন্তাতরঙ্গিণী' (১৮৬১)। কবির বয়স তখন তেইশ। কবিতাটি রচনার পেছনে দু'টি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ছিলো। 'ধর্মহীন লক্ষ্যহীন শিক্ষায় শিক্ষিতের হৃদয়ে ঘোরতর অশান্তি' দেখা দেয়—শিক্ষা বিভ্রাটের দরুণ দু'জন শিক্ষিত তরুণ আত্মহত্যা করেন। তাদের একজন ছিলেন হেমচন্দ্রের প্রতিবেশী বাল্যবন্ধু। এই শোককর ঘটনাদু'টির প্রবল প্রতিক্রিয়ায় কবির মধ্যে যে গভীর চিন্তার উদয়, তারই কাব্যরূপ 'চিন্তাতরঙ্গিণী' নামেই প্রকাশ, পদ্যটি চিন্তাত্মক ও দর্শনমুখী। এবং সে-কারণেই রসসম্ভাবনাহীন।

কবিতাটির নায়ক নরসখা বিবাহিত যুবক। বয়সের ধর্মানুযায়ী তার সুখ নেই, আনন্দ নেই, ভোগের স্পৃহা নেই। সে নিত্য চিন্তাব্যাধিতে জর্জর, বিষাদের দ্বারা আচ্ছন্ন। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মাধুর্য তার বিমুখ চিত্তকে কিছুমাত্র আলোড়িত করে না—

চারিদিকে এই সব জগতের শোভা।
কিছুই আমার কাছে নহে মনোলোভা॥

* দ্রষ্টব্য: কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়ার' ভূমিকা।

এই যে আরক্তময় ভানুর মণ্ডল।
এই সব মেঘে যেন জ্বলন্ত অনল॥
এই যে মেঘের মাঝে দিবাকর ছটা।
সোনার পাতায় যেন সিঁদুরের ঘটা॥
এই শ্যাম দূর্বাদল এই নদীজল।
মণ্ডিত লোহিত রবিকিরণে সকল॥
নিরানন্দ রসহীন সকলি দেখায়।
নয়নের কাছে সব ভাসিয়া বেড়ায়॥

নায়কের এই দুঃখবাদ অকারণ নয়, রোমান্টিক চিত্তবিলাসও নয়, তা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সত্যদর্শনের ফল। আসল কথা, উনিশ শতকের গোড়া থেকে আমাদের সামাজিক পরিবেশে যে ভাঙাগড়া চলেছিলো, তা কারও কারও মধ্যে চিত্ত-সঙ্কটের সৃষ্টি না করে পারেনি। আর সেই চিত্ত-সঙ্কটের জের ১৮৬১ সালেও অলক্ষ্য ছিলো না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় যে নব্যশিক্ষার প্রতিশ্রুতি, তার পরিণাম সম্পর্কেও কোন নিশ্চয়তাবোধ তখন পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি। যদিও মোটামুটি ভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে সংগঠনের যুগ বলা যায়, তবু ব্যাপকতর ও গভীরতর সমাজ-মানসে তখনও আলোড়নের জের ছিলো, নবজীবনের বনেদ ছিলো কাঁচা। বিশেষ করে পুরোন জীবনের মূল্যবোধ ও আদর্শ-বাদ ধ্বসে গেলেও নতুন মূল্যবোধ ও আদর্শের বলিষ্ঠ অঙ্গীকার সে-সময়ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। একথা মনে রাখলে নরসখার বিষাদের তাৎপর্য অনুধাবন করা সহজ হবে—

ভেবেছি আমি হে সার, নরক সংসার।
প্রাণী ধরিবার ঘোর কল বিধাতার॥
সাধু পুরুষের নয় রহিবার স্থান।
ভীষণ নরককুণ্ড কূপের সমান॥
দৌরাত্ম্য, নিষ্ঠুরাচার, ধরা অলঙ্কার।
দ্বেষ, পরহিংসা, আর নৃশংস আচার॥

দম্ভ, অহঙ্কার, মিথ্যা, চুরি, পরদার।
প্রতারণা, প্রতিহিংসা, কোপ অনিবার॥
নরহত্যা, অনিবার্য সংগ্রাম দুরন্ত।
কত লব নাম তার নাহি যার অন্ত॥
পরিপ্লুত বসুন্ধরা এই সব পাপে।
স্মরণ করিতে দেহ থর থর কাঁপে॥
প্রতিকার কিসে তার বল দেখি ভাই।
এই দেখ নদীজলে ঝাঁপ দিতে যাই॥

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 'চিন্তাতরঙ্গিণীতে' হেমচন্দ্র যুগ-সঙ্কটের কবি এবং ঈশ্বর গুপ্তেরই ধারারক্ষী। প্রথম কাব্যেই যে সমাজ-সচেতন চিত্তবৃত্তি নিয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন, তা শুভসূচক, সন্দেহ নেই। তবে দুঃখের বিষয়, এই যুগ-চেতনা কোন শিল্পশ্রীর মধ্যে সমর্পিত হয়নি, সৃষ্টির সৌন্দর্য-রসে চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠেনি। কবিত্বের রসস্পর্শহীন গদ্যাত্মক ভাষায় একটি নীরস চিন্তার অভি-ব্যক্তি ঘটায় রচনাটি আমাদের রসচেতনাকে নয়, বুদ্ধিকে একটু আলোড়িত করে মাত্র। যুবক-যুবতীর দাম্পত্য-চিত্রে রসোজ্জ্বল বর্ণচ্ছটার সম্ভাবনা ছিলো, কিন্তু হেমচন্দ্রের তুলিতে অনুরাগের ইন্দ্রধনু-রঙ ফোটে নি—

মুখভাতি, স্থিরজ্যোতি, ক্রমশ উজ্জ্বল।
প্রসারিত, সঙ্কুচিত ললাটের স্থল॥
ওষ্ঠাধর, থর্ থর্, কাঁপে ঘন ঘন।
যেন কোন, সুস্বপন, করে দরশন॥
থেকে থেকে একে একে প্রফুল্ল সকল।
নাসা, কর্ণ, গণ্ড, বর্ণ, হয় সমুজ্জ্বল॥

নরসখার অবহেলায় জগতারার খেদে করুণরসের স্ফূর্তি ছিলো প্রত্যাশিত, তার বুকভাঙা হাহাকারে বিষাদের গুরু আবহাওয়া সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিলো প্রচুর। কিন্তু উপেক্ষিতা নারীর আর্তির বর্ণনায় কবি ঈশ্বর গুপ্তের ভঙ্গি বা তারও অনেক পূর্ববর্তী মঙ্গল-

কাব্যের নারীগণের খেদের ঢঙ্ গ্রহণ করায় প্রসন্ন কবিত্বের সুযোগ-টুকু ব্যর্থ হয়ে গেছে।

আমি নারী অভাগিনী, পতিকোলে বিরহিণী,
না জানি করিছি কত পাপ।
সে ঠেলে চরণে ক'রে, ত্যাজিলাম যার তরে,
জননী ভগিনী ভাই বাপ॥

* * * *

এত বলি উঠে গিয়া, তরি পৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া,
একে একে খোলে আভরণ॥
সাক্ষী করে চন্দ্রতারা, গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা,
দরদর বিগলিত হয়।
'অভাগী পরাণে মরে, বলো সবে প্রাণেশ্বরে,
এ যাতনা আর নাহি সয়॥'

এর সঙ্গে তুলনা করুন ঈশ্বর গুপ্তের—

যার তরে আকিঞ্চন, করিয়া কাতর মন,
এ অবধি না হইল স্থির।
তাহারে এখনো আর, আশা আছে পাইবার,
আরে মুগ্ধ মানস অধীর॥

—প্রেম-নৈরাশ্য।

আসল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত ও হেমচন্দ্রের মানসমণ্ডল এখনও অভিন্ন, একই ভাবলোকের অধিবাসী তাঁরা। আর তারই জন্য বায়রনের চিন্তা-সৌন্দর্য ("কেন বা হইবে আন্, পুরুষের শত টান···সবে নিধি অমূল্য রতন" বায়রণের "Man's love of man's life is a thing apart" ইত্যাদির অনুবাদ) গ্রথিত হওয়া সত্ত্বেও হেমচন্দ্রের 'চিন্তাতরঙ্গিণী' কবি-কীর্তি হিসেবে পুরাতনেরই অনুবৃত্তি মাত্র।

প্রথম কাব্যে হেমচন্দ্রের লাভের ঘর শূন্য ছিলো না—কিছু কবি-খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা তিনি অর্জন করেছিলেন। আর পাঠক-

সমাজও একেবারে বঞ্চিত হয়নি ; যুগগত চিত্ত-সঙ্কট ও তার শোকাবহ পরিণতির চিত্র সমাজ-সচেতন পাঠকের কিছুটা সন্তুষ্টির কারণ হয়েছিলো। কিন্তু 'চিন্তাতরঙ্গিণীতে' যেখানে ফাঁকি ছিলো, সেখানে পাঠকের লোকসানটা কম নয়। শিল্পসৃষ্টি হিসেবে কাব্যটির নিরর্থকতা রসিকের পক্ষে বেদনাদায়ক, সন্দেহ নেই সেদিক থেকে দ্বিতীয় কাব্য 'বীরবাহু' (১৮৬৪) অধিকতর চিত্তা-কর্ষক। প্রথম কাব্যের নায়ক নরসখার নিজের মধ্যে চলেছিলো একটা প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব – সেই অন্তর্দ্বন্দ্বে তার আত্মার যে বেদনা, তাকে সে জয় করতে পারেনি। তাই তার পক্ষে আত্মহত্যা অপরিহার্য ছিলো। কিন্তু 'বীরবাহুতে' দেখতে পাই নরসখার অক্ষমতার প্রায়শ্চিত্ত ; এক অদম্য প্রাণশক্তির জোরে হেমলতাকে হারিয়েও সে শুধু আত্মহত্যাই এড়িয়ে যায়নি, যবন-শত্রু নিপাতের আনন্দে প্রত্যাশিত বেদনার অবসানও এনেছে। বেদনার জগৎ থেকে আনন্দলোকে কবির এই মানসাভিসারের জন্যই 'বীরবাহুতে' কিছুটা রস ও লাবণ্য সঞ্চারিত। শুধু অভিযোগ এই, কল্পিত পুরাবৃত্তের বদলে সমসাময়িক সামাজিক কাহিনীতে আনন্দলোক বিরচন করতে পারলে কবির পক্ষে আরও গৌরবের কারণ হতো। হয়তো ইতিহাসের কল্পলোকে পলায়নেই কবি দেখতে পেয়েছিলেন আনন্দের প্রতিশ্রুতি ; তাঁর যশোলিপ্সু চিত্ত তাই সস্তায় কিস্তিমাৎ করতে চেয়েছে।

আর এই পলায়নের মধ্যেই হেমচন্দ্র পেয়ে গেলেন তাঁর নিজের পথ। আধুনিক যুগের ছোট মানুষের চিন্তাতরঙ্গিণী হারিয়ে গেলো পুরাণ-ইতিহাসের বারিধি-বিস্তারের মধ্যে—যেখানে বড়ো মানুষ বীরবাহু সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

কাব্যটির কাহিনী কাল্পনিক, ইতিহাসমূলক নয়। তবে ঐতিহাসিক ঢঙেই সে-কাহিনীর বয়ন-বিস্তার। একদিকে পাঠান-রাজ আলমগীর, অন্যদিকে কান্যকুব্জের যুবরাজ বীরবাহু। প্রথমে

আলমগীর বীরবাহুকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তার স্ত্রী হেমলতাকে করায়ত্ত করে। পরে বীরবাহু পাঠানরাজকে পরাভূত করে হেমলতাকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। এই ছকে-বাঁধা কাহিনীতে পরিকল্পনার নূতনত্ব নেই, কোন অভিনব জীবন-দর্শন নেই, নেই কোন উচ্চতর চিন্তার স্ফুরণ। শুধু বীরবাহুর অদম্য বল-বীর্য ও গভীর দেশপ্রেম যে যে জায়গায় উচ্ছ্বসিত, সেখানে হেমচন্দ্রের যুগ-ভাবনার পরিচয় আছে। আসল কথা, 'বীরবাহুতে' যে বীররসের সঞ্চার তখনকার শিক্ষিত বাঙালীর কাছে তার মূল্য কম ছিলো না। কারণ তখন জাতীয় মানসে যে সঙ্কটই থাক, আত্মপ্রসারের একটা বেগও ছিলো। হেমচন্দ্রের হাতে বীরযুগের দ্বারোদ্ঘাটনে সেই আত্মপ্রসারের প্রবৃত্তি বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত হয় (রঙ্গলালে তার শুভারম্ভ, একথা এখানে মনে রাখতে হবে)। আর সমসাময়িক বাঙালীর নবজাগ্রত দেশ-চেতনার খোরাক জুগিয়েছিলো বলেই 'বীরবাহুর' মতো কাব্যের একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তিনটি দিক থেকে 'বীরবাহুর' সার্থকতা অস্বীকার করা যায় না—এক, জাতীয় জীবনের আত্মপ্রসার-স্পৃহা ও প্রতিষ্ঠাকামিতা যে বীরযুগে উত্তীর্ণ হয়ে কম-বেশি সার্থক হতে পারে তারই দ্বারোদ্ঘাটন; দুই, জাতীয় চিত্তসঙ্কটে যে বিষাদের সম্ভাবনা ছিলো তাকে শেষপর্যন্ত একটা আনন্দলোকে পরিণতি দান; তিন, বীর-রস ও প্রণয়-রসের অভিসিঞ্চনে কাব্যটিতে কিছু পরিমাণে সরসতা সম্পাদন। অবশ্য কাব্যবিচারের উচ্চতম আদর্শের দিক থেকে নয়, মধ্যবিত্ত কবির মূল্যপরীক্ষার সাধারণ মানের দিক থেকেই মন্তব্যগুলিকে গ্রহণ করতে হবে।

কাব্যটির আরম্ভ বিশেষ রসসিক্ত—সেই রসের আসরে বীরবাহু ও হেমলতা নায়ক-নায়িকা, প্রকৃতি তার রঙ্গভূমি। উপবন-বিলাসী বীরবাহুর জাগর-স্বপ্নে একই সঙ্গে প্রেম ও প্রকৃতির যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত, তা বীররসাত্মক আখ্যায়িকা কাব্যের নয়, রোমান্টিক প্রণয়-কাব্যেরই উপযুক্ত। এখানে কবির রসমুখী মনের পরিচয়

পাওয়া গেলেও অনৌচিত্য দোষ ঘটেছে বলেই মনে হয়। 'মেঘনাদ বধকাব্যে' প্রমোদ-উদ্যানে যে ইন্দ্রজিৎ প্রমীলা-বিলাসে রত, সেই ইন্দ্রজিৎই আবার কুসুমদাম ছিঁড়ে ফেলে রণসজ্জা করেছেন—অথচ কোথাও এতটুকু অসঙ্গতি নেই। মনে হয়, কবির কল্পনায় যে দীপ্ত নারীর আঙিনায় প্রেমের দ্যুতি ছড়ায় তা-ই আবার প্রয়োজনবোধে যুদ্ধক্ষেত্রে দাবানল প্রজ্বলিত করে। কিন্তু পাঠানবিজয়ী বীরবাহু আর প্রেম-কেলি-রত বীরবাহুর দ্বৈত সত্তায় সেই সুন্দর সামঞ্জস্য নেই। এবং সেখানেই হেমচন্দ্রের অসার্থকতা।

কাব্যটির দ্বিতীয় দোষ, পরাজয়ের পর এক মনোহর দ্বীপে বীরবাহুর অলৌকিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মূল আখ্যায়িকার কোন অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ নেই। এ যেন এক উদ্ভট রহস্যলোকের সন্ধান, যেখানে বাস্তব-অবাস্তবের মধ্যে কোন সীমারেখা নেই, মানুষের সহজাত বিশ্বাসপ্রবণতার কোন মূল্য নেই। দৃশ্যটিতে শুধু বীরবাহু স্তম্ভিত নয়। পাঠকও।

আকৃষ্ট হইয়া রায় কায়মনচিতে।
মোহিনী সংগীত সুর লাগিলা শুনিতে॥
দেবী উপদেবী কিবা অপ্সরী কিন্নরী।
কে গাহিল অই মধু সংগীত লহরী॥
কিছুই বুঝিতে নারি ব্যাকুল অন্তর।
কি শুনিল রাজপুত্র ভাবিয়া কাতর॥

মনে হয়, হেমচন্দ্র বর্তমান অংশে কবিত্ব প্রকাশের অপেক্ষায় ছিলেন কিংবা নিজের কল্পনাশক্তিকে চরাচরে পরিব্যাপ্ত করতে গিয়ে এই অবান্তর অংশ যোজনা করতে দ্বিধা করেন নি।

যেন ভূমণ্ডল অনল-শিখায় চলাচল সহ দহিছে।
ঊনপঞ্চাশৎ পবন যেমন তাহার সহিত বহিছে॥
দশদিক্‌পাল নিজগণ সঙ্গে ঊর্ধ্বমুখে সব ছুটিছে।
খেচর ভূচর জলচর আদি হতাশ অন্তরে হাঁকিছে॥
রেণুময় ধরা বারি বায়ু রেণু রেণু রেণু হয়ে উড়িছে।
চরাচর পুরে হাহাধ্বনি শুধু পুনঃ পুনঃ পুনঃ উঠিছে॥

এখানে এক গভীর রহস্যলোকের সঙ্কেত আছে ; অজানা পরিবেশ রচনায় হেমচন্দ্রের ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কবির বর্ণনাশক্তির সূক্ষ্ম লীলা সম্বন্ধেও সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্তমান অংশে কবির শক্তির অপব্যয় দুঃখের বিষয়। হেমলতার সংবাদ লাভের জন্য এই বিপুল আয়োজন মশা মারতে কামান দাগারই সামিল। এতে কাব্যটির রূপবন্ধ শিথিল হয়ে পড়েছে এবং কবির সংগঠনশক্তি সম্বন্ধে ভুল ধারণার অবকাশ দেখা দিয়েছে।

'বীরবাহুর' আরেকটি অবান্তর ও অশোভন অংশ যবনের কারাগারে বন্দিনী হেমলতার বিলাপ। যৌবনবতী হেমলতার রূপ যতই লোভের বস্তু হোক, বিষপাত্র ওষ্ঠাধারে নিয়ে তার আত্মরূপের বর্ণনা ও মৃত্যুর পরে সেই রূপের বীভৎস পরিণতির ইঙ্গিত অসময়োচিত ও হাস্যকর। সেই বিশেষ স্থান-কালে হেমলতার আত্মরতি পাঠকের মনে রসাকর্ষণ করা দূরে থাকুক, বিপরীত প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করে। এতে আলঙ্কারিক সৌন্দর্য হয়তো আছে, কিন্তু সময়োচিত স্বভাব-সৌন্দর্য নেই।

জিনিয়া নবনী সর,
সেই যে মাংসের থর,
সেই চারু রূপছটা শশধর গঞ্জনা।
সেই কেশ সেই বেশ,
কিছুই না রবে শেষ,
গুটিকত কীটাণুরে করাইবে পারণা॥

মধুসূদনের তুলির আঁচড়ে যে চরিত্র-চিত্র ফুটেছে 'মেঘনাদবধ-কাব্যে', 'তিলোত্তমায়' তারই পূর্বাভাস আছে। কবি নূতন জীবন-দৃষ্টি নিয়ে মানুষের ছবি আঁকবেন, এই প্রতিশ্রুতি 'তিলোত্তমার' সুন্দ-উপসুন্দের মধ্যে রয়েছে। নবযুগের মানুষের সৌন্দর্যাকাঙ্ক্ষার রূপমূর্তি হচ্ছে সেই অসামান্যা নারী, আর অসুরদ্বয় তারই একান্ত উপাসক। কিন্তু 'বীরবাহুর' চরিত্রমিছিল কোন নূতন জীবনের

বার্তাবহ নয়, 'বৃত্র-সংহারের' ভূমিকা হিসেবে কাব্যটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য কাব্যটির চরিত্র-চিত্রণে নেই, একমাত্র আছে তার আখ্যায়িকায়। আখ্যায়িকা কাব্য-রচনাতেই যে কবির সৃষ্টিপ্রতিভার উল্লাস, কাব্যটি পড়লে এইটুকু মাত্র বোঝায়। বীরবাহুর দেশপ্রেম ও বীর্যবত্তা শ্লাঘার বিষয় এবং সেদিক থেকে সে রঙ্গলালের চরিত্র-গুলিকেও ছাড়িয়ে এসেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই দেশপ্রেম ও বীর্যবত্তা সত্যি তার জীবনের অপরিহার্য নিহিতার্থ হয়ে উঠেছে কি? রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবেশ থেকে তার মন কি সেই চেতনা পেয়েছে, যার পরিণতি দেশপ্রেমের অনিবার্যতায়? কিংবা শিরার রক্তের জোয়ারী প্রবাহে? যে বীরবাহু প্রেয়সীর আঁচল দিয়ে কোকিলাকে লুকিয়ে রেখে ডালে ডালে পিকবরকে ডাকাবার স্বপ্ন দেখে বীরত্বের জগৎ থেকে অনেক দূরে তার বসতি। শুধু তাই নয়, নিজের শরীরে বীর্যের প্রেরণা সে যতটুকু পায়, তার চেয়ে অনেক বেশি পায় পৌরাণিক চরিত্রের আদর্শ স্মরণে, অতীতের বীরসমাজের স্মৃতি রোমন্থনে। এই জন্যই মনে হয়, বীরবাহুর চরিত্রে বীর্যের ছদ্মবেশ মাত্র আছে, বীরধর্মের যথার্থ প্রেরণা তার চরিত্রে বুঝি নেই।

হেমচন্দ্র বর্ণনার কবি এবং আখ্যায়িকার ক্ষেত্র তাঁর বর্ণনাশক্তির উপযুক্ত চারণভূমি। 'বীরবাহুতে' তার কিছু কিছু পরিচয় আছে। তবে তাঁর চিত্রকল্প অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গতানুগতিক, প্রথাসিদ্ধ ও অলঙ্কারসর্বস্ব। নূতন কবিত্বের বড়োই অভাব পাঠকের প্রত্যাশাকে আঘাত হানে।

(১) একদিকে কেতকিনী,
একদিকে কমলিনী,
দুই ধারে রাশি করি ভ্রমরারে খেপাব।
(২) বাসে নারী হেমলতা
যেন তরিতের লতা,
ইন্দ্র-ভয়ে আসি পাশে অনুগতা হইল॥

(৩) মৃগচর্ম পরিধান, মুখে শিব-গুণগান,
করতলে ত্রিশূলের ফলা।
গলিত জটিল কেশ, মহা যোগিনীর বেশ
রুদ্রকরমালাময় গলা॥

(৪) শুখাইল তনুলতা,
শোকভরে অবনতা,
শশধর লীন যেন হয় রাহু উদয়ে॥

এই আখ্যায়িকা-কাব্যের প্রসঙ্গে হেমচন্দ্রের 'বৃত্র-সংহার' (প্রথম খণ্ডঃ ১৮৭৫। দ্বিতীয় খণ্ডঃ ১৮৭৭) স্মরণীয়। কাব্যটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা, তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বলতম নিদর্শন। কিন্তু, 'মেঘনাদ বধকাব্যের' সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে নানা তর্ক-বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়, মধুসূদন অপেক্ষা হেমচন্দ্রের আপেক্ষিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষের আলোচনায় জড়িয়ে পড়তে হয়। যদিও তা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক ও নিরর্থক। কারণ সমসাময়িক হলেও মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের জগৎ ছিলো আলাদা। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, জীবন-চর্যা, নীতি-চেতনা, ঐতিহ্য-বোধ ইত্যাদি কোন দিক থেকেই দু'জনের মধ্যে বিশেষ মিল নেই। তাঁদের প্রতিভার স্বরূপও ছিলো ভিন্নজাতীয়। তাই কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁদের ভেদ অনস্বীকার্য সত্য। দুজনের মধ্যে পরিচয় ছিলো, একজন আরেকজনের কাব্যের দু'টি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন, রিয়েল বি. এ.-এর কাব্যবিচারশক্তি সম্বন্ধে অপরের শ্রদ্ধা ছিলো—এই সামান্য তথ্যটুকুর ওপর নির্ভর করে উভয়ের মধ্যে সমধর্মিতা খুঁজতে যাওয়া বিপজ্জনক কিংবা 'বৃত্র-সংহারের' একটা মহাকাব্যসুলভ বাহ্যিক রূপের দিকে তাকিয়ে তুলনা করতে যাওয়াও অতি-সাহসের কথা। আসল কথা, তাঁদের মন আলাদা, মেজাজ আলাদা, কলম আলাদা। তাই পারস্পরিক তুলনা কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে পারে না।

হেমচন্দ্রের চোখে, আমরা পূর্বে দেখেছি, 'মেঘনাদবধের' রূপ ও আত্মা ধরা পড়েছিলো। মধুসূদন সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধার অভাব ছিলো

না। তিনি জানতেন, মধুসূদনের হাতেই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের গৌরববৃদ্ধির চাবি-কাঠি। তবু তাঁর সাহিত্য-শিক্ষা ও রস-রুচি ভিন্ন পথ গ্রহণ করতে প্রেরণা দিয়েছে। এ অক্ষমতা নয়, কারণ অক্ষম জনেরাও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে অনেক সময় বেশি সাহস দেখিয়ে থাকে। হেমচন্দ্র মধুসূদনের অক্ষম অনুকারকবৃন্দের দলে যে ভিড়তে চাননি, এটা প্রশংসার কথা। অন্যথায় বংশবৃদ্ধি হতো বটে, কিন্তু কুলগৌরব বাড়তো বলে মনে হয় না।

সত্য বটে, 'বৃত্র-সংহারে' মধুসূদনের 'মেঘনাদবধের' প্রভাব অস্পষ্ট নয়। প্রথমতঃ বৃত্রাসুর স্মরণ করিয়ে দেয় রাবণকে, রুদ্রপীড়ের মধ্যে দেখতে পাই ইন্দ্রজিতের ছায়া, ইন্দ্রকে দেখে আমাদের মনে পড়ে রামচন্দ্রকে। হুবহু অনুকৃতি হয়তো নেই, কিন্তু তাদের একই কল্পলোকের অধিবাসী বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। পার্থক্য আছে, তবু প্রমীলা ইন্দুবালারই অগ্রজা; সরমার সঙ্গে চপলার সম্পর্কও সুদূর নয়। শচী সন্নিধানে ঐন্দ্রিলার গমন প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশের ভাবানুষঙ্গে বর্ণিত, রুদ্রপীড়ের মৃত্যুর পর বৃত্রের শোক 'মেঘনাদবধে' রাবণের শোকেরই প্রতিধ্বনি। সীতা ও সরমা সংবাদের দিকে দৃষ্টি রেখেই হেমচন্দ্র বর্ণনা করেছেন শচী ও চপলা সংবাদ। অলঙ্কার রচনায়, নামধাতুর ব্যবহারে, বাক্য-যোজনায়ও হেমচন্দ্রের ওপর মধুসূদনের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। কিন্তু এই সব অনুকরণের ক্ষেত্রেও ফল একরকমের হয়নি; কবিস্বভাব অনুযায়ী অনুকার্যের ভিন্নতর রূপ দাঁড়িয়ে গেছে। তার একটা উদাহরণ দিতে চাই। প্রমোদ-উদ্যান থেকে ইন্দ্রজিতের বিদায় গ্রহণের আগে প্রমীলার প্রতিক্রিয়া সংযত, সুন্দর ও বলিষ্ঠ। সে যুদ্ধক্ষেত্রে স্বামীর সঙ্গিনী হতে চায়, কারণ ইন্দ্রজিৎকে ছেড়ে থাকা তার পক্ষে খুবই মর্মান্তিক। স্বামীর বাহুতে তার স্থান যদি না হয়, তবে পদাশ্রয়ই তার অভিলষিত। মদমত্ত হস্তী ব্রততীর সাধ্য-সাধনায় কর্ণপাত না করলেও তাকে পায়ে স্থান দিতে কার্পণ্য করে না। এই সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রমীলা আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে, কিন্তু আত্মহারা

হতে চায়নি। কিন্তু 'বৃত্র-সংহারে' ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রার কালে ইন্দুবালাকে দেখুন—

দূর হৈতে দেখি পতি, উঠিয়া শিহরি,
ছুটিলা উতলা হয়ে ইন্দুবালা বামা ;
পড়িতে বক্ষেতে তাঁর বাহু জড়াইয়া,
তরুলতা তরুদেহ ঘেরে যথা সুখে।

*　　　*　　　*

ছলিতে আমায় বুঝি সাধ ছিল মনে—
ইন্দুবালা ভাবে ভয় সমরের বেশে,
তাই ভয় দেখাইতে, আইলে প্রাণেশ ?
খোল, প্রভু, রণসাজ—না পারি সহিতে !

*　　　*　　　*

যাবে নাথ ?—যাবে কি হে ছিঁড়িয়া এ লতা ?
বেঁধেছি তোমায় যাহে এত সাধ করি !
ছিঁড়ে কি হে তরুবর, ঘেরে যদি তায়
তরুলতা, ধীরে ধীরে আশ্রয় লভিয়া ?

*　　　*　　　*

বলি মূর্চ্ছাগত ইন্দুবালা ইন্দুমুখী ;
সখীরা যতনে পুনঃ করায় চেতন ;
রুদ্রপীড়ে স্নেহে চুম্বি অধর ললাট,
শিবিরে চলিলা দ্রুত চঞ্চল গতিতে।

এখানে যে ইন্দুবালাকে দেখি, সে প্রমীলার বাঙালীর সংস্করণ মাত্র। প্রমীলার প্রেম কখনও গৃহকোণের দীপশিখা, কখনও বা রণক্ষেত্রের প্রলয়াগ্নি। গৃহী জীবনের ছোট আঙিনায় তার একমাত্র সার্থকতা নয়। কিন্তু ইন্দুবালা পুরুষের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রকে চেনে না, যুদ্ধ-ক্ষেত্রকে সে মনে প্রাণে ভয় করে। তাই তাঁর ভীরু হৃদয় আঁচলের আড়াল দিয়ে স্বামীকে নিজের কাছে ধরে রাখতে চায়। তার জীবনের গণ্ডি ছোট, মনের চারণক্ষেত্র ঘরের আঙিনা মাত্র। এক

কথায়, ইন্দুবালা বাঙালীর মেয়ে, গার্হস্থ্য-পরিবেশে ছোট আশা আর ছোট সুখ নিয়ে জীবনটাকে ভোগ করার চেয়ে বৃহত্তর কোন আকাঙ্ক্ষা তার নেই। ফলে প্রমীলা আর ইন্দুবালা দুই জগতের অধিবাসী। হেমচন্দ্রের সচেতন মনেই এই স্বতন্ত্র ইন্দুবালার জন্ম প্রমীলার সঙ্গে তার আন্তর সত্তার ভেদ স্রষ্টার অভিপ্রেত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিদায়কালীন ভাষণের আইডিয়াটুকু মাত্র হেমচন্দ্র মধুসূদনের কাছ থেকে ধার নিয়েছেন, তার বেশি কিছু নয়। নিজের বিশ্বমানবিক মন ও রুচি নিয়ে মধুসূদন বাঙালীর জগৎ থেকে যতটুকু সরে গিয়েছিলেন তার চেয়েও বেশি পরিমাণে হেমচন্দ্র বাঙালীর জীবনে ফিরে এসেছেন। এখানেই তাঁদের সুস্পষ্ট ভেদ এবং সেই ভেদের দিকে লক্ষ্য রেখেই 'বৃত্র-সংহারের' বিচার বাঞ্ছনীয়।

আর সে-কারণেই মহাকাব্যের মানদণ্ডে 'বৃত্র-সংহারের' বিচার অসঙ্গত। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—'হেমচন্দ্রের সম্বন্ধে এই কথাটাই সত্য যে তিনি কোনদিন মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হন নাই, বা মহাকাব্যের আদর্শকে গ্রহণ করেন নাই। বৃত্র-সংহার মেঘনাদবধের মত এক অখণ্ড রসের অভিব্যক্তি, এক সু-সংযত ভাব-কল্পনার বিকাশ, এক আদ্য-মধ্য-অন্ত সংবলিত অনবদ্য গঠন-সুষমার নিদর্শন নহে। ইহার ঘটনা-বিন্যাসের অন্তরালে কোন নবানুভূত সাংকেতিক তাৎপর্য, কোন তীব্র, একমুখীন হৃদয়াবেগ গভীরতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে নাই। ইহার তথ্য-সমাবেশ কোন নবারুণদ্যুতির আভাসে ভাস্বর হইয়া উঠে নাই। ইহার ধনুকের ছিলা এত টান করিয়া বাঁধা হয় নাই যে ইহার জ্যানির্ঘোষ-টঙ্কার শরক্ষেপের পূর্বেই গতিবেগ ও অভ্রান্ত লক্ষ্যের পূর্বঘোষণারূপে আমাদের অনুভূতিকে বিদ্ধ করে। বৃত্র-সংহার মহাকাব্যের বাহ্যলক্ষণসমন্বিত পৌরাণিক কাহিনী-কাব্য—ইহার ঘটনাবলী শিথিল আকস্মিকতা-সূত্রে গ্রথিত। যাহা ঘটিয়াছে তাহারই একটু সমুন্নত কাব্যরূপ দিয়া ইহা সন্তুষ্ট, কোন নূতন তাৎপর্য আরোপ, কোন সার্বভৌম

ব্যঞ্জনার আভাস ইহার উদ্দেশ্য বহির্ভূত।' এ মন্তব্য, আমার ধারণা, সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য। 'বৃত্র-সংহারকে' পৌরাণিক কাহিনী-কাব্য বা আখ্যয়িকা-কাব্য হিসেবে বিচার করাই বিধেয়। বড়ো জোর, একে মহাকাব্যের গার্হস্থ্য-সংস্করণ বলা যেতে পারে।

প্রথমতঃ ধরা যাক আখ্যায়িকা-কাব্যটির বিষয়-গৌরবের কথা। 'মেঘনাদবধের' মতো পৌরাণিক কাহিনীর পুনর্বিচার ও পুনর্বিন্যাস এতে নেই, রাবণ ও ইন্দ্রজিতের মতো বৃত্রের মহিমাবৃদ্ধির কোন দায়িত্ব কবিকে নিতে হয়নি। কারণ 'বৃত্র-সংহারে' হেমচন্দ্র প্রচলিত কাহিনী ও সিদ্ধরসেরই অনুবর্তন করেছেন। বস্তুতঃ কাব্যটির আখ্যানবস্তু সত্যিই মহান—এদিকে দধীচির আত্মত্যাগ ও দেবতাদের হৃত স্বর্গ উদ্ধার, অন্যদিকে অধর্মের ফলে বৃত্রের সর্বনাশ। সুতরাং এমন একটি কাহিনী হেমচন্দ্র হাতের কাছে পেয়েছিলেন, যার মধ্যে বিশালতা ও মহিমার অভাব নেই। পাঠক সাধারণের প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে যাওয়া অতি বড়ো সাহসের কথা; তাতে সমস্ত কাব্য-সংসারটিকে নতুন করে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হয়। মধুসূদনের সেই সংগঠন-শক্তি ছিলো আর তাই পাঠকের সংস্কারকে দূর করে তার মনকে নতুন অভিজ্ঞতার অভিমুখিন করে তোলার কর্তব্য তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র অত বড়ো সগঠন-প্রতিভা নিয়ে জন্মাননি, মধুসূদনের মতো দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় তাঁর কোন আগ্রহ ছিলো না। সকলের চেয়ে বড়ো কথা, তিনি ছিলেন যশের কাঙাল ('বীরবাহুর' ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। তাই তাঁর পক্ষে 'বৃত্র-সংহারের' কাহিনীই ছিলো উপযোগী, কারণ কাব্যটির বিষয়-সাধনা তেমন দুরূহ নয়।

অথচ নবযুগের কবির সমাজ-চেতনা প্রকাশের সুযোগও ছিলো। হয়তো যুগন্ধর মধুসূদনের মতো নতুন জীবনতৃষ্ণা ও মানবতাবোধ হেমচন্দ্রের সাধ্য ছিলো না। এবং তার জন্য প্রচলিত ধর্মনীতির বিরুদ্ধাচরণ করার প্রয়োজন হয় নি। তবু উনিশ শতকের

বাঙালীর হৃদয়-বেদনা ও বিবেক-বুদ্ধি 'বৃত্র-সংহারের' দেবলীলার মধ্যেও প্রকাশের পথ খুঁজে নিয়েছে। স্ব-ভূমি স্বর্গ থেকে দেবতারা নির্বাসিত—সেখানে আধিপত্য চলেছে অসুরদের। এ কি ইংরেজ রাজত্বের বাঙালীর দুরদৃষ্টের রূপক নয়? দেশপ্রেমিক কবি হেমচন্দ্র তাই দেবতাদের নৈরাশ্যে ধ্বনিত করেছেন স্বদেশ-আত্মার ক্রন্দন, দেবতাদের দৃষ্টির দর্পণে প্রতিবিম্বিত করেছেন বঙ্গভূমির ধূম্রাচ্ছন্ন ছবি

বসিয়া আদিত্যগণ তমঃ আচ্ছাদিত,
মলিন, নির্বাণ-প্রায় কলেবর জ্যোতিঃ
মলিন নির্বাণ যথা সূর্য ত্বিষাম্পতি
রাহু যবে রবিরথ গ্রাসয়ে অম্বরে ;

—প্রথম সর্গ।

'হা ধিক্! হা ধিক্ দেব! অদিতি-প্রসূত!
সুরভোগ্য স্বর্গ এবে দনুজের বাস!
নির্বাসিত সুরগণ রসাতল—ধূমে
অবসন্ন, তেজঃশূন্য, অশক্ত, অলস!'

—প্রথম সর্গ।

নয়নের কাছে কাছে সতত বেড়ায় আঁচে
স্বরগের মনোহর কায়া।
সকলি তেমতি ভাব, দৃষ্টিপথে আবির্ভাব,
কিন্তু জানি সকলি সে ছায়া!

—চতুর্থ সর্গ।

যার যেথা ভালবাসা তার সেথা চির আশা,
সুখ দুঃখ মনের খনিতে।

—চতুর্থ সর্গ।

কে আছে ত্রিলোক মাঝে প্রাণী হেন জন
সুদূর প্রবাস ছাড়ি স্বদেশে ফিরিয়া,
(কি পঙ্কিল, কিবা মরু, কিবা গিরিময়
সে জনমভূমি তার,) নিরখি পূর্বের

পরিচিত গৃহ, মাঠ, তরু, সরোবর,
নদী, খাত তরঙ্গ, পর্বত, প্রাণিকুল,
নাহি ভাসে উল্লাসে, না বলে মত্ত হ'য়ে
'এই জন্মভূমি মম।' কে আছে রে, হায়,
ফিরিয়া স্বদেশে পুনঃ না কাঁদে পরাণে
হেরে শত্রু-পদাঘাতে পীড়িত সে দেশ!

—চতুর্দশ সর্গ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 'বৃত্র-সংহারে' নূতনের প্রবেশ ঘটেছে কাহিনীর যুগোপযোগী পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে নয়, অভিনব জীবন-নীতি প্রতিষ্ঠার সূত্রেও নয়—নির্বাসিত দেবকুলের স্বদেশ-প্রীতির আকর্ষণে, স্বর্গ-পুনরুদ্ধার-প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে। শুধু তা-ই নয়, দেবতাদের স্বর্গ-প্রীতিও এক রকমের ঐহিকতা: কারণ মানুষের কাছে মর্তভূমি যেমন ইহলোক, তেমনি দেবতাদের 'ইহলোক' তাদের স্বর্গভূমি। কবি যেখানে স্রষ্টা সেখানে তিনি বিষয়বোধে প্রবুদ্ধ; যেখানে কাব্যের নায়ক দেবতা, সেখানে স্বর্গই কবি-কল্পনার লীলাভূমি। আর সে-কারণেই দেবকুলের স্বর্গ-প্রীতিকে মানব-সমাজের মর্তপ্রীতিরই বিষয়ানুগ অভিক্ষেপ রূপে গ্রহণ করতে হবে। আসলে ইন্দ্রের দেশপ্রেমের সঙ্গে বীরবাহুর দেশপ্রেমের কোন দূরত্ব নেই।

তাছাড়া, 'বৃত্র-সংহারে' আর একটি বড়ো সত্য অনুস্যূত। বীরবাহুর যে স্বদেশ-বাৎসল্যের উৎস তার বীর্য, তরবারির মুখে তার সরল প্রকাশ, দুঃসহ দুঃখব্রতে তার কঠিন পরীক্ষা। অর্থাৎ দৈহিক ও মানসিক বীর্যই বীরবাহুর পরম পুরুষার্থ। কিন্তু 'বৃত্র-সংহারে' এর অতিরিক্ত আরও কথা আছে। বজ্রে বৃত্রের বিনাশ হয়েছে, সন্দেহ নেই। বজ্রও তরবারির মতোই অস্ত্রবিশেষ, বজ্রের ব্যবহারও নিশ্চয়ই বীর্যের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু 'বৃত্র-সংহারের' বজ্র বীর্যের দ্বারা মেলেনি, তা দেহশক্তির দ্বারা তৈরি নয়। তার পেছনে আছে একদিকে ইন্দ্রের কল্লান্ত কঠোর তপস্যা, অন্যদিকে

দধীচির অতুলনীয় আত্মত্যাগ। সুতরাং, অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মতে, 'বৃত্র-সংহার' কাব্যের গভীর উপদেশে তরবারিকে পরম পুরুষার্থ রূপে স্বীকার করা হয়নি। তার নিহিতার্থ পরহিতব্রত ও একাগ্র তপস্যা। এ থেকেই প্রমাণ করা যায় যে, 'বীরবাহু' কাব্যের মানস-মণ্ডল থেকে কবি আরও এগিয়েছেন, সন্ধান পেয়েছেন বৃহত্তর ও মহত্তর সত্যের। প্রশ্ন উঠতে পারে, এটাই কি কবির যুগবোধ? হেমচন্দ্র চোখের সামনে দেখেছেন—সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ, সিপাহীবিদ্রোহ ইত্যাদি। অনুভব করেছেন নতুন চেতনার জাগরণ আর নিষ্ফল প্রয়াসের বেদনা। ফলে তার দেশপ্রেম যদি একথা স্বীকার করে নেয় যে—শুধ্ বীর্যের দ্বারা দেশের অসম্মান দূর করা যাবে না, তার জন্য চাই তপস্যার একাগ্রতা ও আত্মত্যাগের পুণ্যমন্ত্র—তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ভারতবর্ষের পরবর্তীকালের স্বদেশ-সাধনায় দধীচির আদর্শ ও ইন্দ্রের তামস-তপস্যার কম-বেশি অনুবর্তন দেখেছি বলেই হেমচন্দ্রের দূরদৃষ্টির প্রশংসা করতে হয়। কবির কাব্যের মর্মকথাকে এইভাবে যুগ বোধের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হয়তো সকলের মন চাইবে না। কিন্তু আমি বলি, তাতে ক্ষতি কি? পুরনো সাহিত্যের মধ্য থেকে অভিনব ন্যায় ও নীতি নিষ্কাশিত করতে না পারলে ক্রম-বিকশিত ইতিহাসের দিক থেকে তার কোন সার্থকতা নেই, একথা মনে রাখা দরকার।

হয়তো জোর করেই এ-ব্যাখ্যা করা গেলো। তবে তাছাড়া উপায় নেই। কারণ তখনকার মানুষের চিত্তজগৎ ছিলো এত জটিল ও বহুধাবিভক্ত যে, তার মধ্য থেকে প্রগতিশীল প্রবণতা উদ্ধার করতে গেলে একটু জোর করতেই হয়। যে হেমচন্দ্র 'ভারত-সঙ্গীত' রচনা করেছেন, সেই হেমচন্দ্রই আবার রচনা করেছেন 'ভারত-ভিক্ষা' ও 'ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব।' তখনকার কবিদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছিলো খণ্ডিত, মনের কথা প্রকাশ্যে খুলে বলা সহজ ছিলো না। ফলে হেমচন্দ্রের চিত্ত

সর্বদা অবিচলিত থাকেনি, দৃষ্টি মাঝে মাঝে হয়েছে বিভ্রান্ত। কিন্তু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, তাঁর পরশাসনপীড়িত মন দেশপ্রেমের মধ্যে মুক্তি চেয়েছে—কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও বা পরোক্ষভাবে।

'বৃত্র-সংহারের' আখ্যানবস্তুর মধ্যে যুগানুগ ব্যঞ্জনা যতটুকুই থাক, তার আদিগন্ত প্রসারের মধ্যে একটা বিশালতা আছে। তার পটভূমি স্বর্গ-মর্ত-পাতালে বিস্তৃত, তার ভাবানুষঙ্গ দেশপ্রেমের মহত্ত্বের মধ্যে বিধৃত, তার কল্পনা বীরত্বের উদ্দীপনায় সঞ্চালিত। হয়তো সুদূর পৌরাণিক যুগের সঙ্গে উনিশ শতককে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন বলেই হেমচন্দ্রের কবি-ভাবনায় উৎসাহের অন্ত ছিলো না। সেই উৎসাহের পরিচয় আছে কাব্যটির অনবছিন্ন বীররসের মধ্যে। অনেক দিক দিয়েই মধুসূদন ছিলেন হেমচন্দ্রের চেয়ে বড়ো, কিন্তু বীররস সৃষ্টির প্রতিযোগিতায় তিনি স্পষ্টতঃই হেমচন্দ্রের কাছে পরাজিত। এই বীররসের সঙ্গে রৌদ্ররসও 'বৃত্র-সংহারে' বিশেষ স্ফূর্তি লাভ করেছে। আসল কথা, করুণরসে হেমচন্দ্রের কোন মানসিক অনুরাগ ছিলো না, বীর ও রৌদ্র রসই ছিলো তাঁর প্রিয় রস। ফলে কাব্যটির মধ্যে দেখতে পাই বীরভাবপ্রধান বস্তু-মাবেশ, উদ্দীপিত ঘটনাড়ম্বর ও অক্লান্ত যুদ্ধবর্ণনা। এর মধ্যে যে চারটি সর্গ একান্তই যুদ্ধ-সম্পর্কিত, তাতে ভাবানুভূতিকে অতি উচ্চগ্রামে তোলা হয়েছে এবং পাঠকের উত্তেজিত হৃদয়ের সুযোগ নিয়ে খুলে দেওয়া হয়েছে বীর ও রৌদ্রের প্রস্রবণ। কোথায়ও বীরত্ব মহিমাব্যঞ্জক, কোথায়ও গাম্ভীর্যদ্যোতক, কোথায়ও বা একান্তই বিস্ময়জনক।

> কালাগ্নি জ্বলিছে অঙ্গে, ধাইছে মার্তণ্ড
> উজলি সমরসিন্ধু—উজলি যেমন
> বাড়বাগ্নি ধায় জ্বালি সিন্ধু শত ক্রোশ—
> ঘুরায়ে প্রচণ্ড চক্র অসুরে নাশিছে।
>
> —পঞ্চদশ সর্গ।

কিবা কোদণ্ডের গতি—শিঞ্জিনীর ক্রীড়া।
ফিরিছে বিমানদ্বয় রণক্ষেত্রে সমুদয়,
ক্ষণে দূরে—ক্ষণে কাছে—ঘেরি পরস্পরে,
সহসা সংঘাত যেন—আবার অন্তরে !'

কখন বহু অন্তরে অচল সমান
দুই ব্যোমযান স্থির, ধনু ধরি দুই বীর
খেলায় শর-তরঙ্গ দেখিতে অদ্ভুত !
নিঃশব্দে অনন্ত-দেহে অযুত অযুত

—দ্বাবিংশ সর্গ।

ভীম লম্ফ ছাড়ি
দাঁড়াইলা মহাশূর মনঃশিলাতলে—
শূলহস্তে। লক্ষ্য করি ইন্দ্রবক্ষঃস্থল
ভাবিলা ছাড়িবে অস্ত্র—দূরে হেন কালে
দেখিলা দনুজপতি জয়ন্তপতাকা।
নিরখি ইন্দ্রের পুত্রে নিজ পুত্র শোক
জ্বলিল হৃদয়তলে। স্মরিলা তখন
ঐন্দ্রিলার ভীমবাক্য—প্রতিজ্ঞা কঠোর,
হুঙ্কারিলা ঘোর স্বরে অসুর দুর্জয়,
ছুটিলা উন্মাদ যেন মথি সুররথী,
মথি অশ্ব, মাতঙ্গ, পদাতি অগণন।

—চতুর্বিংশ সর্গ।

তবে মধুসূদনের যুদ্ধবর্ণনার সঙ্গে হেমচন্দ্রের যুদ্ধবর্ণনার একটা পার্থক্য আছে। মধুসূদনের লেখনী যেখানে উপকরণ প্রাচুর্য এড়িয়ে গিয়ে যুদ্ধের অন্তর্নিহিত বেগ ব্যঞ্জিত করেছে, ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে একটা অনুমেয় শক্তির আভাস সেখানে হেমচন্দ্রের লেখনী স্থূল বস্তুপুঞ্জ সমাবেশ ও ঘটনাড়ম্বরের দ্বারা যুদ্ধের বেগবান ভয়ঙ্করতার বিস্তৃত চিত্র অঙ্কনে নিযুক্ত হয়েছে। মধুসূদনের বর্ণনায় রণক্ষেত্রের

উন্মাদনা ও বীভৎসতা ব্যাপকতর ও উজ্জ্বলতর হয়েছে যুধ্যমান উভয় পক্ষের তপঃক্লিষ্ট ও শোকানলদগ্ধ অন্তরের ঐশ্বর্যদীপ্তিতে, হেমচন্দ্রের বর্ণনায় রণক্ষেত্রে সন্নিবিষ্ট বস্তুপুঞ্জের ঘাত-প্রতিঘাতে একটা বহিরঙ্গীয় তীব্রতা ও উজ্জ্বলতা দেখা দিয়েছে—যুদ্ধরত ব্যক্তিদের অন্তরের বিদ্যুৎ-বহ্নি তাতে সঞ্চারিত হয়নি। এক কথায়, মধুসূদনের যুদ্ধচিত্র আড়ম্বরহীন অথচ তাৎপর্যময়, হেমচন্দ্রের যুদ্ধচিত্র বস্তুস্ফীত এবং চিত্রল (picturesque)।

যুদ্ধ-বর্ণনার এই উভয় রীতিই কবিত্বসাপেক্ষ, সন্দেহ নেই। তবে পাঠকের ওপর তাদের প্রতিক্রিয়া সমান নয়। যুধ্যমান দুই পক্ষের মধ্যে কোন এক পক্ষের প্রতি পাঠকের আগে থেকে সহানুভূতি না থাকলে যুদ্ধ-বর্ণনার মধ্য দিয়ে তার হৃদয়ে সাড়া জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয়। সে-ক্ষেত্রে পাঠক যুদ্ধ-দৃশ্যের নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র হয়ে পড়ে এবং আত্মনিরপেক্ষ ঔৎসুক্য নিয়ে উভয়পক্ষের বীর্যবত্তার শেষ পরিণাম লক্ষ্য করতে থাকে। হেমচন্দ্রের 'বৃত্র-সংহারের' যুদ্ধ-বর্ণনা পাঠকের কাছে অনেকটা এই ধরনের নৈর্ব্যক্তিক চিত্র মাত্র। এখানে যুদ্ধের ক্রম-পরিণতি পাঠকের সহানুভূতির সুযোগ নিয়ে তার হৃদয়ে আশা-নৈরাশ্য, আনন্দ-বেদনা, উত্তেজনা নিস্তব্ধতার বিচিত্র দোলা সৃষ্টি করে না। আসল কথা, হেমচন্দ্রের যুদ্ধ-বর্ণনায় সজীব মানবিকতার সরস সংবেদনশীলতা নেই। তবে যুদ্ধবিদ্যাহীন বাঙালী জাতির প্রতিনিধি হয়েও যুদ্ধের বিচিত্র রূপ ও রঙ ফলিয়ে তুলে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা মনে রাখবার মতো।

তারপর কাব্যটির গঠন-কৌশল বিচার করা যাক। পূর্বে বলেছি মহাকাব্যের মানদণ্ডে বিচার করলে মনে হয়, কাব্যটির গঠন অখণ্ড ও সুঠাম নয়; তার ঘটনাবিন্যাস ও তথ্যসমাবেশ, ভাবকল্পনা ও রসসম্ভাবনা পূর্বাপর ত্রুটিহীন নয়। 'বৃত্র-সংহার' শিথিল ঘটনা-সমন্বিত কাব্য, তার বাইরের রূপ ও অন্তরের আত্মা মিলে কোন সুবলিয়ত গড়ন দেখা দেয়নি। আখ্যায়িকা কাব্যের দিক থেকে বিচার

করলে একে বড়ো রকমের ত্রুটি বলা যায় না। কারণ এ-জাতীয় কাব্যে মহাকাব্যের মতো সুঠাম অবয়ব-সংস্থান, সমতলীয় রূপ-পরিধি ও সংহত ভাবানুক্রম কখনই প্রত্যাশা করা উচিত নয়। হয়তো দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনীর (বৃত্রের নিধন) ভূমিকা হিসেবে প্রথম খণ্ডের কাহিনী—পাতালে দেবগণের মন্ত্রণা, আত্মকলহ ও শেষ পর্যন্ত অসুরদের বিরুদ্ধে দিবারাত্র সংগ্রামের সঙ্কল্প, শচীকে দাসী নিযুক্ত করার জন্য ঐন্দ্রিলার প্রস্তাব, শচীকে ধরে আনার উদ্দেশ্যে ভীষণের নৈমিষারণ্যে আগমন, মদনের কাছে সংবাদ পেয়ে শচীর পুত্রকে স্মরণ ও মাতৃরক্ষার সঙ্কল্প নিয়ে জয়ন্তের আগমন, যুদ্ধে ভীষণের মৃত্যু, বৃত্রের ত্রিশূল নিয়ে রুদ্রপীড়ের যুদ্ধযাত্রা, জয়ন্তের মৃত্যু ও শচীর অপহরণ, ঐন্দ্রিলার কাছে রুদ্রপীড়ের দ্বারা শচীর রূপ বর্ণনা ও ঐন্দ্রিলার ঈর্ষার সঞ্চার—অতিরিক্ত মাত্রায় দীর্ঘ এবং কবির পরিমিতিজ্ঞানের অভাবের পরিচায়ক। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথম খণ্ডের ঘটনাধারাকে লক্ষ্যবিহীন ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বলা যায় না। কারণ শচীকে দাসী করার জন্য তাকে অপহরণ করার কাজে ঐন্দ্রিলার যে অপরাধ, স্ত্রৈণতার সূত্রে বৃত্র সেই অপরাধের ভাগী হওয়ায় তার পতন ও মৃত্যু ঘটে—এই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই কবি প্রথম খণ্ডের ঘটনাবলী বিস্তৃতভাবেই গ্রথিত করেছেন। 'বৃত্র-সংহারের' কারণটি যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ও পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে তারই জন্য কবির এই বিরাট আয়োজন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কবি পরিমিতিজ্ঞান অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি, ঘটনাবস্তুর অতিরিক্ত সমারোহে প্রথমাংশকে একটু ভারাক্রান্ত করে তুলেছেন। এই অংশটি স্বতন্ত্র কাব্য হিসেবে মোটামুটি সুখপাঠ্য হলেও সমগ্র কাব্যকাহিনীর দিক থেকে আরও সংহত ও সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত ছিলো। তবে ওজন-ভারী ও সুবিস্তৃত হলেও ঘটনাধারার পারম্পর্য ও স্বাভাবিকত্ব অক্ষুণ্ণ আছে। অন্যদিকে দ্বিতীয় খণ্ডের ঘটনাবলী অতি দ্রুত এবং তারই ফলে একটা বেগ ও দ্রুতি কাহিনীর মধ্যে

সঞ্চারিত। এই অংশের গঠনের মধ্যে কোন অবান্তর প্রসঙ্গ নেই, বস্তুসমাবেশ ও ভাবপ্রবাহ অনিবার্য ভঙ্গিতে পরিণামমুখিন হয়ে উঠেছে। আর সেই কারণেই প্রথমখণ্ডের আপেক্ষিক মন্থরতা একটু বিসদৃশ বলে মনে হয়। কেউ কেউ একবিংশ সর্গে নগেন্দ্রবালার দার্শনিক তত্ত্বকে অপ্রাসঙ্গিক ও কাব্যত্ববর্জিত মনে করেছেন, সমগ্র আখ্যায়িকার গুরুগম্ভীর তাৎপর্যের দিক থেকে ইন্দুবালার অনুপ-যোগিতা সম্বন্ধেও বিরূপ মন্তব্য করতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু আমার মনে হয়, 'বৃত্র-সংহারকে' মহাকাব্যের মানদণ্ডে পরিমাপ করতে গিয়েই ইন্দুবালা সম্পর্কে বিচার-বিভ্রাট ঘটে। কাব্যটির মূল আখ্যানে ঐন্দ্রিলার অহমিকা ও বৃত্রের স্ত্রৈণতা প্রধান ঘটনা এবং সে-কারণেই পারিবারিক চিত্র কাব্যটিতে সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত। আর সেই পারিবারিক চিত্রে ঐন্দ্রিলার অতি-পরুষতার বিপরীত আদর্শ হিসেবে ইন্দুবালার কোমলতা স্বাভাবিক। তবে নগেন্দ্রবালার দার্শনিক তত্ত্ব ভালো কথার সমষ্টি হলেও একান্তই নীরস। ধর্ম-সংস্কৃতিমূলক কাহিনী পড়লে গুরুপাক দার্শনিকতা হজম করতে হয় জানি, কিন্তু তার জন্য সরস ব্যবস্থা থাকা চাই। অন্যথায় পাঠকের রসবোধ বিচলিত না হয়ে পারে না। তবে আখ্যায়িকা-কাব্যের ঢিলে-ঢালা গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এ-মন্তব্য করা হলো, মহাকাব্যের ক্ষোদিত রূপ-প্রতিমার দিকে লক্ষ্য রেখে নয়। আর 'মেঘনাদবধকাব্যের' গঠনের সঙ্গে তুলনা করে 'বৃত্র-সংহারের' সংগঠনগত ত্রুটি নির্দেশ করারও প্রশ্ন ওঠে না, কারণ মধুসূদনের কাব্যে হেমচন্দ্রের কাব্যের মতো কোন আদি-অন্ত-সমন্বিত কাহিনীই নেই।

এবার চরিত্রসৃষ্টিতে হেমচন্দ্রের কৃতিত্ব নিরূপণ করা যাক। পূর্বে নানা প্রসঙ্গে বলেছি, উনিশ শতকের নবজাগরণের দিনে বাঙালীর নূতন জীবনায়ন ঘটে, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়। বিশেষভাবে স্বাতন্ত্র্যসমুজ্জ্বল নারী-ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ এই সময়কার স্মরণীয় ঘটনা। যখন সমাজের মর্মমূলে রসসঞ্চার হয়, একটা মানসিক খোলা

হাওয়ায় জীবন পরিচালনার সুযোগ আসে, বুদ্ধির মুক্তি স্বাধীন আত্মবিকাশের সহায়ক হয়ে ওঠে—তখনই সমাজের অঙ্গ হিসেবে পূর্ণাবয়ব ব্যক্তিত্বের হয় স্ফুরণ। উনিশ শতকটা, বিশেষ করে তার দ্বিতীয়ার্ধ, ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদের যুগ ছিলো বলে সাহিত্যেও ব্যক্তি-মানুষ গোটা চেহারা নিয়ে দেখা দিতে শুরু করে। হয়তো সেই ব্যক্তিমানুষের বিচিত্র ও জটিল ভাবলোকে, তার দুরধিগম্য মানস-রহস্যে, তার বক্র-কুটিল চিত্তবৃত্তির আবর্তে সাহিত্যের অনুপ্রবেশ ঘটেনি এবং তার জন্য মনস্তত্ত্বের অধিকতর চর্চা ও বিশ শতকী উপন্যাস সাহিত্যের আবির্ভাব পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিলো। তবু সেই হেমচন্দ্রের যুগেই সমাজ ও সাহিত্যের অঙ্কে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জন্ম-চিহ্ন দেখিতে পাই। স্মরণ রাখতে হবে, ১৮৭৭ সালের মধ্যে বঙ্কিমের কতকগুলি উপন্যাস বের হয়ে গেছে এবং তার অনেক পূর্বে রঙ্গলালের অস্ফুট ব্যক্তি-উপাদান মধুসূদনের হাতে পুরো মানুষের রূপ নিয়ে জন্ম নিয়েছে। সুতরাং চরিত্রাঙ্কনে হেমচন্দ্রের কৃতিত্বের বিচার এই ঐতিহাসিক পটভূমিকাতেই করতে হবে।

এবং সে-বিচারে আমাদের কিছুটা হতাশ হতে হবে। মধুসূদনের যুগ-মানস দেব-দেবীর চিন্ময় সত্তাকে আধ্যাত্মিকতার ধূম্রজাল থেকে উদ্ধার করে মানবিক প্রাণসত্তায় নূতন প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছে। তাঁর দেবদেবীরা শক্তিমত্তার দিক দিয়ে মানুষের চেয়ে বলিষ্ঠতর হলেও ভাবাদর্শের প্রতীক হিসেবে মানুষের চেয়ে উন্নততর নয়। কিন্তু হেমচন্দ্র দেবদেবীর পরিকল্পনায় ভক্তিবাদের শাসন মেনে নিয়েছেন এবং স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের দিক থেকে, এক একটি ভাবাদর্শের আশ্রয়ে দেবদেবীর চরিত্রকে সঞ্জীবিত করতে চেয়েছেন। হেমচন্দ্রের এই চরিত্রায়ণ-পদ্ধতি সৃষ্টির সূত্র হিসেবে নিন্দনীয় নয়; কারণ দেব-চরিত্র মানবিক হয়েছে কি আধ্যাত্মিক হয়েছে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেটা বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা হচ্ছে, চরিত্রগুলি নিজ নিজ পায়ের ওপর ভর করে স্পষ্টতঃই দাঁড়াতে পেরেছে কিনা।

হেমচন্দ্রের কাব্যের দেব-দেবীরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের প্রতীক হলেও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী নয়। তাঁদের পৃথক সত্তা আছে, কিন্তু স্ব-মহিমায় সগৌরব প্রতিষ্ঠা নেই। কাব্যে তাঁদের সার্থকতা যতটা ভাবাদর্শের দিক থেকে, ততটা বলিষ্ঠ ও সজীব চরিত্রবত্তার দিক থেকে নয়। কাব্যটির প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু ঐন্দ্রিলার দ্বারা শচীর অপমান; সুতরাং আখ্যান-ভাগে শচী চরিত্রের গুরুত্ব আছে। কিন্তু কবির কলমে শচীর যে চিত্র ফুটেছে, তা স্পষ্টতঃই নেতিবাচক। যেন ঐন্দ্রিলার দর্পের সূত্রেই কাহিনীর মধ্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ; দেবতাদের স্বর্গোদ্ধারের কর্মকাণ্ডে তাঁর কোন বিশেষ ভূমিকা নেই, প্রত্যক্ষ দায় নেই। তিনি যেন অপমানের বোঝা কাঁধে নিয়ে বৃত্রের প্রতি শিবের মন বিরূপ করে তুলেছেন এবং দেবতাদের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় পরোক্ষভাবে সহায়ক হয়ে উঠেছেন। এমন চরিত্রকে কাছে পেয়ে অমরকুলের কাজ সহজ হতে পারে, কিন্তু পাঠকের রসচিত্ত খুশি হতে পারে না। তার চেয়ে বরং শচীর চরিত্র সেখানেই বেশি চোখে পড়ে, যেখানে পুত্র জয়ন্তকে দেখে তাঁর মাতৃহৃদয় উল্লসিত কিংবা বেদনামুখর।

পুত্র পেয়ে শচী যেন পাইলা আবার
স্বর্গের বৈভব যত, ঐশ্বর্য তাহার।
বারম্বার শিরঘ্রাণ, চিবুক, আঘ্রাণ,
লইলা, ধরিলা কোলে, পুলকিত প্রাণ।

* * *

কহি দুঃখে কহে শচী 'আমায় উদ্ধারি
কাজ নাই, বৎস আর হৈয়ে অস্ত্রধারি।
জানিলে অগ্রে কি আমি মানসে স্মরণ
করিতাম তোরে হেথা করিতে গমন!
শতবার ঐন্দ্রিলার চরণ সেবিব;
অকাতরে স্বর্গের আসন তারে দিব;

তোমার কোমল অঙ্গে ত্রিশূল-প্রহার
জয়ন্ত, নারিব চক্ষে দেখিতে আবার।

আর এই সহৃদয়তা বশেই ইন্দুবালাকে কাছে টেনে নিতে তিনি দ্বিধা করেন নি। আসল কথা, আর কোন আধ্যাত্মিক শক্তি নয়—স্নেহই শচী চরিত্রের মূল নিহিতার্থ এবং স্নেহের ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র তার চরিত্রের ইতিবাচকতার কোন প্রমাণ আমরা পাইনি। ইন্দ্রের মহত্ত্ব ও কল্যাণধর্মিতা দেবোচিত হলেও তাঁর মধ্যে দেবরাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। শিবের প্রত্যাশিত বলিষ্ঠতা নেই। বৃত্রের একমাত্র অপরাধ তার স্ত্রৈণতা। এবং সেই স্ত্রৈণতার জন্য তাকে শিব যে দণ্ড দিয়েছেন তা গুরুদণ্ড।

মহেশের ক্রোধানল
জ্বলিল প্রদীপ্ত করি গগনমণ্ডল ;
বাজিল প্রলয়শৃঙ্গ শ্রুতি বিদারণ ;
বহিল ঘন হুঙ্কারে ভীষণ পবন ;

*   *   *

নিঃশঙ্ক বৃত্রের নেত্রে পলক পড়িল,
'রুদ্রের ক্রোধাগ্নি-বহ্নি' বলিয়া উঠিল॥

এখানে সর্বদর্শী শিবের পরিচয় কই? তবে জয়ন্ত চরিত্রের ক্ষণিক দীপ্তি আমাদের মুগ্ধ করে।

শুধু দেবচরিত্র নয়, অন্যান্য চরিত্রও হেমচন্দ্রের হাতে সুবিচার পায়নি। পৌরাণিক বৃত্রের স্মৃতিসূত্রে আমাদের মনে যে সংস্কার আছে, হেমচন্দ্রের বৃত্র সেই সংস্কারের পরিপোষক নয়। অথচ সুস্থ সবল নতুন বৃত্রও তাঁর হাতে গড়ে ওঠেনি, যেমন গড়ে উঠেছে মধুসূদনের রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ। মধুসূদন তাঁর রাবণকে হৃদয় দিয়েছেন, সেই হৃদয়ে অজস্র স্নেহ দিয়েছেন, অথচ দৈহিক ও মানসিক বীর্য থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেননি। অন্যদিকে হেমচন্দ্রের বৃত্র তার স্রষ্টার হাত থেকে কিছু কিছু দাক্ষিণ্য পেয়েও বড়ো চরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ হেমচন্দ্র যেমন এক হাতে বৃত্রকে

হৃদয় দিয়েছেন, ভালো মানুষের চরিত্রধর্ম দিয়েছেন, তেমনি অন্য হাতে বৃত্রের স্বোপার্জিত বীর্যবত্তা অপহরণ করেছেন। আর বীর্যহীন হৃদয়বৃত্তি তো অধঃপতনের পথ মাত্র। তাই হেমচন্দ্রের বৃত্র স্ত্রৈণ পুরুষ, বীর পুরুষ নয়। দুটি চিত্র পাশাপাশি রেখে বিচার করা যাক—

ইন্দ্র সঙ্গে নাই, যুদ্ধে পশিছে দেবতা :
বাতুল হয়েছে তারা, কি ঘোর মূর্খতা!
সঙ্কল্প করিনু অদ্য, শুন, দৈত্যকুল,
সঙ্কল্প করিনু হের পরশি ত্রিশূল—
সূর্যেরে রাখিব করি রথের সারথি :
চন্দ্র সন্ধ্যামুখে নিত্য যোগাবে আরতি ;
পবন ফিরিবে সদা সম্মার্জনী ধরি
অমরার পথে পথে রজঃ স্নিগ্ধ করি ;
বরুণ রজকবেশে অসুরে সেবিবে,
দেবসেনাপতি স্কন্দ পতাকা ধরিবে।—

-তৃতীয় সর্গ

বৃত্রের সম্বল—চন্দ্রশেখরের দয়া
চিরদীপ্ত চিরন্তন প্রাক্তনবিভাস ;
সকলি হইল ব্যর্থ তোমা হৈতে বামা—
দানবি, দৈত্যের কুল উন্মূল তো হতে!

*　　　*　　　*

'বামা তুমি'—বলি দৈত্য তুলিলা নয়ন,
হেরিলা ঐন্দ্রিলা-মুখ, গর্বিত, গম্ভীর,
দন্তে ওষ্ঠ প্রস্ফুটিত, চারু বিম্বাধর
বিস্ফারিত ঘন ঘন, প্রদীপ্ত নয়ন।
সে চিত্র নিরখি বৃত্র আবার নীরব।

—দ্বাদশ সর্গ।

এখানে এসে মনে হয়. বীরত্ব বৃত্রের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ নয়,

চরিত্রের নিহিতার্থ নয়, তা নিতান্তই মৌখিক আস্ফালন কিংবা সাময়িক চরিত্র-বিপ্লব মাত্র। শিবের অনুগ্রহে সে শক্তিমান; সেই অনুগ্রহের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সে যতদিন নিঃসন্দেহ, ততদিন তার বীরত্ব-গর্ব। তখন শচী-অপহরণে শুধু সম্মতি নয়, সহযোগিতা করতে পর্যন্ত তার দ্বিধা নেই। কিন্তু মহেশের ক্রোধানলের আভাসমাত্রে সেই বীরত্ব-গর্ব টলে ওঠে, এমন কি ঐন্দ্রিলার কথায় না ভুলে বৃত্র সিদ্ধান্ত করে—'শচীরে ছাড়িব আমি তুষিতে মহেশ।' এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, বৃত্রের সত্যিকারের বীরত্বাভিলাষ নেই; যদি থাকতো তবে সর্বাবস্থাতেই, জয়-পরাজয় সুখ-দুঃখ নির্বিশেষে তাঁর শক্তিমত্ততা প্রকাশ পেতো। সুতরাং পৌরাণিক বৃত্রের গম্ভীর মহিমা যেমন হেমচন্দ্রের নায়কের মধ্যে নেই, তেমনি তার মধ্যে নেই পূর্বাপর অন্তঃসঙ্গতি। প্রথম খণ্ডের বীরত্বাভিমানী বৃত্র দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্হিত। একমাত্র ঐন্দ্রিলাকে জীবন্ত চরিত্র বলে মনে হয়। তার চারিত্রিক বলিষ্ঠতার কারণ তার আত্মপ্রত্যয়। যে 'ঈর্ষাসিন্ধুমন্থনসঞ্জাত' সুধা সে আকণ্ঠ পান করতে চেয়েছে তার জন্য সে আপন পুত্রকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে দ্বিধা করেনি, স্বামীর আরাধ্য দেবতাকে বিমুখ করে তুলতেও পশ্চাদ্‌পদ হয়নি।

> 'এ অশুভ কথা, বৎস, কেন রে শুনালি ?
> কাজ কি সমরে তোর ? একা দৈত্যনাথ
> নাশিবে অমরকুল শঙ্কর-ত্রিশূলে।—
> দৈত্যকুল-পঙ্কজ, সমরে নাহি যাও।'

কিন্তু জননীর এই সস্নেহ নিষেধ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি—

> বান্ধিলা শীর্ষক-চূড়ে বিল্ব সচন্দন,
> কহিলা আশ্বাসি বৎস, এ অর্ঘ্য সতত
> অলক্ষ্যে রক্ষিবে তোরে—এমন আশীষ;
> যাও রণে, রণজয়ী অরিন্দম বীর।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একটা উদগ্র আকাঙ্ক্ষার অঙ্কুশ তাড়নায়, একটা উচ্চাশার দুরন্তবেগে ঐন্দ্রিলার জীবন নিয়ত অস্থির। শুধু

পুত্র সম্পর্কে ক্ষণিক দ্বিধা তার মধ্যে দেখতে পাই। এবং এই দ্বিধাটুকু ছিলো বলেই অমানুষিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও ঐন্দ্রিলা দানবীতে পরিণত হয়নি। অবশ্য স্বীকার করতে হবে, বৃত্র-পত্নীর মধ্যে কোমল বৃত্তির পরিচয় বড়োই কম। মনে হয়, লেডি ম্যাকবেথের আদলে কবি চরিত্রটিকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। সংশয়-জর্জরিত বৃত্রকে উত্তেজিত করার দৃশ্যটি সেক্সপীয়ারের নাটকের অনুরূপ একটি দৃশ্য স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে লেডি ম্যাকবেথের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিবেক-দংশন ঐন্দ্রিলার মধ্যে নেই। সব মিলিয়ে দেখলে ঐন্দ্রিলাকে ভালো লাগে। দুর্বার অহংবোধ ও ক্লান্তিহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে তার চরিত্রে যে দৃপ্ত মহিমা দেখা দিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে স্রষ্টার পক্ষে কৃতিত্বের পরিচায়ক। শেষ পর্যন্ত ঐন্দ্রিলার মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি; কিন্তু পারিবারিক কেন্দ্রচ্যুত এই জ্যোতিষ্কটি যেভাবে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ছুটে বেড়িয়েছে, তাতে চরিত্রটির ট্র্যাজেডি আরও বেশি চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে।

> দহিল ঐন্দ্রিলাচিত্ত প্রচণ্ড হুতাশে
> চিরদীপ্ত চিতা যথা! ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া
> ভ্রমিতে লাগিল বামা—উন্মাদিনী এবে!

উনিশ শতকের রেনেসাঁসের মানুষ কোন্ জাতীয় জীবনের অঙ্গীকার নিয়ে আসবে, তা হেমচন্দ্রের মননে ও ধ্যানে ছিলো। সে জীবন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন,—পরবশ ও পরজীবী নয়।

> স্ববশে স্বাধীন চিত্ত, স্বাধীন প্রয়াস,
> স্বাধীন বিরাম, চিন্তা স্বাধীন উল্লাস;—
> সসর্প গৃহেতে বাস, পরবশ আর;
> দুই তুল্য জীবিতের, দুই তিরস্কার!

—পঞ্চম সর্গ।

এমনিতর একটি চরিত্র ঐন্দ্রিলা—স্বাধীনচিত্তধন্যা ও আত্ম-প্রত্যয়শীলা।

এবার আসা যাক 'বৃত্র-সংহারের' ছন্দ ও বাণীভঙ্গির প্রসঙ্গে কাব্যটির ছন্দ যতটা বিতর্কের বিষয় ও নিন্দার কারণ হয়েছে, আর কিছুই ততটা হয়নি। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের মানদণ্ডে বিচার করলে হেমচন্দ্রের ছন্দ-সৃষ্টির নিন্দা না করে পারা যায় না, একথা সত্য। কিন্তু ধানের ক্ষেতে বেগুন প্রত্যাশা করা অনুচিত; বহু সুর-তাল-লয় সমন্বিত আখ্যায়িকা কাব্যের মধ্যে অখণ্ড সুরের মহাকাব্য 'মেঘনাদবধের' ছন্দ প্রত্যাশা করা ততোধিক অনুচিত। হেমচন্দ্র নিজেই বলেছেন—'নিরবচ্ছিন্ন একই প্রকার ছন্দঃ পাঠ করিলে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া পয়ারাদি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দঃ প্রস্তাব করিয়াছি। এই গ্রন্থে মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দঃই সন্নিবেশিত হইয়াছে। মৃত মহোদয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত সর্বাগ্রে বাঙ্গালা কাব্য রচনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে পদ-বিন্যাস করিয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেন। তদীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ মিল্টন প্রভৃতি ইংরেজ কবিগণের প্রণালী অনুসারে বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজী ভাষাপেক্ষা সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালাভাষার সমধিক নৈকট্যসম্বন্ধ বলিয়া যে প্রণালীতে সংস্কৃত শ্লোক রচনা হইয়া থাকে, আমি কিয়ৎপরিমাণে তাহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছি। বাঙ্গালায় লঘু গুরু উচ্চারণ-ভেদ না থাকায় সংস্কৃত কোন ছন্দেরই অনুকরণ করিতে সাহসী হই নাই, কেবল সচরাচর সংস্কৃত শ্লোকের চারি চরণে যেরূপ পদ সম্পূর্ণ হয়, তদ্রূপ চতুর্দশ অক্ষর বিশিষ্ট পংক্তির চারি পংক্তিতে পদ সম্পূর্ণ করিতে যত্নশীল হইয়াছি।' সুতরাং 'বৃত্র-সংহার' আর 'মেঘনাদবধের' ছন্দ এক হতে পারে না। হেমচন্দ্র সর্বত্র অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন নি; যেখানে করেছেন সেখানেও স্থানবিশেষ তাঁর ছন্দ মিলহীন পয়ার মাত্র।

যেমন—

> সর্বাগ্রে অনলমূর্তি—দেব বৈশ্বানর,
> প্রদীপ্ত কৃপাণ করে, উন্মত্ত স্বভাব,

কহিতে লাগিল, দ্রুত কর্কশ বচনে,
ফুলিঙ্গ ছুটিল যেন ঘোর দাবাগ্নিতে!

এই মিলহীন পয়ারের পাশে তাঁর সত্যিকারের অমিত্রাক্ষর ছন্দের চেহারা দেখা যাক—

ঘোর শব্দ শূন্যে ছাড়ি ছুটিল বেগেতে
না মানি অঙ্কুশাঘাত। ভীম লম্ফ ছাড়ি
দাঁড়াইলা মহাশূর মনঃশিলাতলে—
শূলহস্তে। লক্ষ্য করি ইন্দ্রবক্ষঃস্থল
ভাবিলা ছাড়িবে অস্ত্র—দূরে হেনকালে
দেখিলা দনুজপতি জয়ন্ত পতাকা।
নিরখি ইন্দ্রের পুত্রে নিজ পুত্রশোক
জ্বলিল হৃদয়তলে।

এই অমিত্রাক্ষরে মধুসূদনের ছন্দের মতো সর্বত্র শব্দ-ঝঙ্কার, ধ্বনি-গৌরব, ছন্দ-মাধুর্য, ছেদ ও যতির সঙ্গত প্রয়োগে ভাবের প্রবহমানতা না থাকতে পারে—কিন্তু যা আছে তাতেও কবির গৌরবহানির কোন কারণ নেই। হেমচন্দ্র যে মধুসূদনের একেবারে অনুপযুক্ত উত্তরাধিকারী ছিলেন না, তার প্রমাণ এখানে আছে।

অবশ্য তিনি এমন ছন্দও ব্যবহার করেছেন, যাতে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে। স্থানবিশেষে ছেদের স্বাধীনতা আছে, অথচ মিলও আছে। এই জাতীয় সমিল অমিত্রাক্ষরকে কেউ কেউ বিকৃত ছন্দ নামে ধিক্কার দিতে দ্বিধা করেন নি। যেমন—

ঐরাবণী—বল যার ঐরাবত প্রায়—
পশ্চিমে চলিলা বেগে নদী যেন ধায়।
শঙ্খধ্বজ দৈত্য—যার শঙ্খের নিনাদে
অমর কম্পিত হয়—উত্তর আচ্ছাদে।
দক্ষিণেতে সিংহজটা—সিংহের প্রতাপ—
চলিলা দুর্ধর্ষ দৈত্য, ভয়ঙ্কর দাপ।

—তৃতীয় সর্গ।

মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষরের মিশ্রণে রচিত এই ছন্দের চলৎ-শক্তি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের মতো নয়, সন্দেহ নেই; তবু তাকে পর্যুষিত ছন্দ বলা সঙ্গত নয়। অমিত্রাক্ষর রচনা করতে গিয়ে অক্ষমতাবশতঃ কবি এই মিশ্রছন্দ রচনা করেন নি, নিরবচ্ছিন্ন একই প্রকার ছন্দের গ্রাস থেকে কাব্যকে মুক্তি দিতে গিয়ে তিনি সচেতনভাবে এই ছন্দ সৃষ্টি করেছেন। আর একটি কথা। 'বৃত্র-সংহারে' যেখানে চার চরণের স্তবক আছে, সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্তবক থেকে স্তবকান্তরে ভাব প্রবাহিত হয়নি, এ অভিযোগ সত্য। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, কবি সেখানে সংস্কৃত শ্লোকের অনুকরণে স্তবক রচনা করেছেন, সেখানে তাঁর নিজের স্বীকৃতি অনুসারেই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর আদর্শ ছিলো না। দ্বিতীয়তঃ প্রবহমান ভাবের ছন্দও কাব্যটিতে আছে—যেমন একবিংশ, চতুর্বিংশ ইত্যাদি সর্গে।

তাহলে 'বৃত্র-সংহারের' ছন্দ সম্বন্ধে মূল কথাটা কি দাঁড়ালো? হেমচন্দ্র-প্রসঙ্গের ভূমিকায় বলেছি, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের রূপ ও আত্মা 'বৃত্র-সংহারের' কবির অজানা ছিলো না। তাতে যে বাঙলা ভাষার গৌরব বেড়েছে, এই সরল স্বীকৃতিও হেমচন্দ্রের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি। তবে স্বকীয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে মধুসূদনীয় অমিত্রাক্ষর সর্বত্র তাঁর আদর্শ ছিলো না। তাঁর ধারণা ছিলো, একই প্রকার ছন্দে সমগ্র কাব্য লেখা হলে পাঠকের রসবোধ বিচলিত হয়; কারণ পাঠকের মন স্বভাবতঃই বৈচিত্র্যবিলাসী। বস্তুতঃ এই নির্দিষ্ট প্রশ্নে হেমচন্দ্র সংস্কৃত কাব্যের নির্দেশ শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন. বিভিন্ন রসের বর্ণনায় বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার তাঁর কাছে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছিলো। অমিত্রাক্ষর ছন্দের অন্তর্গূঢ় শক্তি সম্বন্ধে প্রত্যয়হীনতা থেকে নয়, এই ছন্দের সর্বক্ষেত্রব্যবহার্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ থেকেও নয়, সংস্কৃত কাব্যের ছন্দ-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অনুরাগ থেকেই 'বৃত্র-সংহারের' ছন্দ-পরিকল্পনা। কিন্তু অনেকেই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করেছেন বলে মধুসূদনীয়

অমিত্রাক্ষরের বিকৃতিই 'বৃত্র-সংহারে' দেখেছেন, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকে বোঝার চেষ্টা করেন নি। বস্তুতঃ যে জাতীয় আখ্যায়িকা-কাব্য হেমচন্দ্র রচনা করতে চেয়েছেন, তার পক্ষে মুহুর্মুহু পরিবর্তমান ছন্দ দোষাবহ নয়। যেখানে সুরের বিচিত্রতা, রসের বহুমুখিনতা সেখানে একই ছন্দের নিরবচ্ছিন্নতাই বরং কাব্য-সৌন্দর্য অনুধাবনে ব্যাঘাত ঘটায়।

তবে ভাষা ও বাণীভঙ্গির দিক থেকে 'বৃত্র-সংহারের' মোটেই প্রশংসা করা যায় না। তাঁর শব্দচয়ন ও বাক্যসংগঠনে রসাকর্ষণের কোন প্রয়াস নেই। কাব্যের ভাষা যে শুধু বোঝবার জন্য নয়, তা যে বাজবার জন্যও—এ-জ্ঞানের অভাব 'বৃত্র-সংহারের' ভাষারীতিকে গদ্যাত্মক হতে প্রশ্রয় দিয়েছে। তাঁর বর্ণনা প্রায় ঢালাও বক্তৃতা, কোন অর্ধস্ফুট ব্যঞ্জনায় তা কবিত্বপূর্ণ নয়। কাব্যটিতে এমন অনেক বাক্য পাই যা নিতান্তই কথার কথা মাত্র। কোথায়ও বা বাক্য অস্পষ্ট বা অর্থহীন। যেমন—

সাজিলা ঐন্দ্রিলা, মধুর মাধুরী
বসন ভূষণে পড়ে যেন ঝুরি ;
পড়ে যেন ঝুরি চারু পয়োধরে !
লাবণ্য-তরঙ্গ থরে থরে থরে
নাচিল পায়।

—ষোড়শ সর্গ।

এখানে তৃতীয় পঙ্‌ক্তিটি পাদ-পূরণ করেছে, কিন্তু বর্ণনার সৌন্দর্য বাড়ায় নি। হেমচন্দ্রের সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি, সৌষ্ঠব-সুষমা সম্পর্কে তিনি একেবারে উদাসীন। তা না হলে তিনি লিখতে পারতেন না—

(১) ধরিব অঙ্গেতে নবীন প্রকাশ
(২) চারুমূর্তি প্রভাকর শূন্যে সাম্যভাব
(৩) কত ফুল-ক্ষেত্র চারিদিকে শোভে
(৪) বদনমণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া (ঐন্দ্রিলার বর্ণনা)
(৫) চারু শোভাময় মুনি মোহকর

'বৃত্র-সংহারের' ঐন্দ্রিলাকে যিনি দেখেছেন, তার পক্ষে ঐন্দ্রিলার মুখমণ্ডলের ব্রীড়া অবিশ্বাস্য। প্রভাকরে প্রখরত্ব নয়, চারুতা দেখেছেন কবি। এ দেখায় ত্রুটি আছে। অঙ্গে নবীন প্রকাশ ধরার বর্ণনা কষ্ট-কল্পনার আড়ষ্ট প্রকাশ। কবির বাণীভঙ্গির ত্রুটি অলঙ্কার রচনায়ও সুস্পষ্ট। কাননের ফুল দেখে হেমচন্দ্রের মনে পড়ে পালঙ্কের কথা। তাতে ফুলের গৌরব কোথায়? ভগ্নচিত্ত আখণ্ডলের সঙ্গে কবি তুলনা দিয়েছেন—

ভগ্নচিত্ত যথা
দয়ালু দর্শকবৃন্দ নবমীর দিনে,
যূপকাষ্ঠে বান্ধে যবে নির্দয় কামার।
মহিষমর্দিনী দশভুজা মূর্তি আগে
অসহায় ছাগমেষ পূজায় অর্পিতে।

এখানে কবির কাণ্ডজ্ঞানের বিকার, বিষয়বোধের অভাব ও রসরুচির স্খলন অমার্জনীয়। আসল কথা, হেমচন্দ্রের লেখায় প্রসাধন কলার একান্তই অসদ্ভাব। এবং সে-দিক থেকে তিনি মধুসূদনের অযোগ্য উত্তরসূরী।

হেমচন্দ্রের কবিমন আখ্যায়িকা-কাব্যের রসক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়ে আবার চিন্তাক্ষেত্রে পরিক্রমা শুরু করলো 'আশাকাননে'। এখানে তিনি মননবিলাসী। মানবজাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিগুলিকে প্রত্যক্ষীভূত করে তোলা যে কাব্যের উদ্দেশ্য, তার স্বাভাবিক স্বাজাত্য 'চিন্তাতরঙ্গিণীর' সঙ্গে। এই সাঙ্গরূপক কাব্যের মর্মার্থ সহৃদয় পাঠকের রসানুভবশক্তিকে নয়, বুদ্ধিবৃত্তিকে চরিতার্থ করে। 'দশমহাবিদ্যা' পৌরাণিক, দার্শনিক ও নীতিমূলক চিন্তার গর্ভকোষ থেকেই জন্ম নিয়েছে। 'চিত্তবিকাশ' কবির জীবনে অর্জিত প্রজ্ঞার বাণীমূর্তি। এ থেকেই অনুমান করা যায়, হেমচন্দ্র কবি হিসেবে 'বিশ্বরচনার অমৃতস্বাদের যাচনদার' ততটা ছিলেন না, যতটা ছিলেন বিশ্ব-ভাবনা ও জীবন-জিজ্ঞাসার ভাষ্যকার। তাই 'চিন্তা-তরঙ্গিণীর' ভাবজগৎ থেকে তাঁর কোনদিনই মুক্তি ঘটেনি। মনে

হয়, তাঁর ব্যক্তিগত সুখদুঃখবোধ, বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা ও সমসাময়িক সামাজিক চেতনা ঘুরে ফিরে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সংগঠনের পথ খুঁজেছে, অনুসরণীয় আদর্শের সন্ধান চেয়েছে। হেমচন্দ্র সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিকে তিনি নিছক ব্যক্তি হিসেবে কখনোই দেখেন নি, তাকে দেখেছেন বৃহত্তর সামাজিক সত্তার অঙ্গ হিসেছে। তাই তাঁর খণ্ডকবিতা সংগ্রহেও ব্যক্তিহৃদয়ের সুরঝঙ্কারের চেয়ে কালের যাত্রার ধ্বনি বেশি শুনতে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্র-পূর্ব লিরিকের ইতিহাসে হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলীর' স্থান বিহারীলাল-প্রসঙ্গে নির্দেশ করা যাবে। কিন্তু কবির মনোজীবনের বিশিষ্ট স্বাক্ষর ও যুগচিহ্ন যে কবিতাগুলির মধ্যে ছড়িয়ে আছে, একথা বর্তমান প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয়। পূর্বে নানা ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, হেমচন্দ্রের প্রধান প্রাণ-সম্পদ হচ্ছে দেশানুরাগ। এই দেশানুরাগ শুধু পরাধীনতার বেদনা ও স্বাধীনতার স্বপ্নের মধ্যেই উজ্জীবিত হয়নি, তা উজ্জীবিত হয়েছে দেশের মাটি, জল ও আকাশ-ঘেরা ভৌগোলিক সংস্থিতির মধ্যে, মানুষের দূরাগত ঐতিহ্য ও জীবিত চেতনার আন্তরিক স্বীকৃতির মধ্যে, নানা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে পরিবর্তমান দেশজ আদর্শ তুলে ধরবার প্রয়াসের মধ্যে। তাই তার খণ্ডকবিতাগুলি যেমন কিছুটা আত্মগত ভাবধারার প্রকাশ, তেমনি অনেকটা তখনকার শিক্ষিত মানুষের চিত্ত-ভাবনার পরিচয়ও বটে।

ঈশ্বর গুপ্তের খণ্ডকবিতার জন্ম যেমন 'সংবাদ-প্রভাকরে', তেমনি হেমচন্দ্রের খণ্ডকবিতার জন্ম 'এডুকেশন গেজেটে'। 'অবোধবন্ধু' পত্রিকাও ছিলো তাঁর ছোট কবিতাগুলির আরেকটি জন্মপীঠ। এটা তাৎপর্যপূর্ণ। তখনকার দিনের কবিদের সৃষ্টির মূলে ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগের চেয়ে সামাজিক প্রেরণা বেশি সক্রিয় ছিলো। বিশুদ্ধ শিল্পবোধ বা অহেতুকী আনন্দ-সাধনা বা ব্যক্তিগত রস-চর্বণা একেবারে যে ছিলো না, তা নয়; তবু তাঁরা সচেতন সামাজিক মানুষ ছিলেন বলেই সাময়িকতার দাসত্ব করতে দ্বিধা করতেন না। তাই

তাঁদের অনেক খণ্ডকবিতাই লেখা হতো সাময়িক ঘটনা বা সমস্যা নিয়ে; মহাকালের পায়ে দেবার মতো কিছু থাকলে তাঁরা খুশি হতেন নিশ্চয়, কিন্তু খণ্ডকালের কড়ি নিয়ে সাময়িক ঘটনাশ্রিত কবিতা লেখা তাঁদের কাছে অগৌরবের ছিলো না। আর তাই ঈশ্বর গুপ্তের মতো হেমচন্দ্রের হাত থেকেও আমরা পেয়েছি বিচিত্র চিন্তাভর কবিতা—যা কখনও দেশপ্রেমকে, কখনও নীতিশিক্ষাকে, কখনও নারী-মুক্তিকে, কখনও বা জাতীয় ঐতিহ্যকে নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে রচিত। সাময়িক পত্রিকায় সমকালীন বিষয় নিয়ে সৃষ্ট বলেই তাঁর অনেক ছোট কবিতায় সাময়িকতার উগ্র গন্ধ রয়েছে।

অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মতে, বারো শ সাতাত্তর সালের প্রথম থেকে কবি জাতীয় জীবন পরিচালনায় বদ্ধপরিকর হন। আর 'এডুকেশন গেজেটে' কবির খণ্ডকবিতার প্রকাশ শুরু হয় বারো শ পঁচাত্তর সালে। সুতরাং একথা অনুমান করা অন্যায় নয় যে, 'বীরবাহু' কাব্যে কবির যে দেশপ্রেম কল্পিত ঘটনার আশ্রয়ে অভিব্যক্ত, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ক্রম-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কবির সচেতন মন তারই আরও প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত ভাবমণ্ডল রচনায় রত হয়। খণ্ডকবিতাগুলিতে, বিশেষ করে 'ভারতসঙ্গীতের' মতো কবিতায় তার প্রমাণ আছে। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক—

> অযোধ্যা নীরব—বাজে না বীণ্
> বাজেনা সে বাঁশী—নীরব উজীন্;
> নাহি সে বসন্ত-সুরভি-ঘ্রাণ,
> গোকুলে নাহি সে কোকিল-গান;
>
> —ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পূজা।

> কি হবে বিলাপ করিলে এখন,
> স্বাধীনতা-ধন গিয়াছে যখন,
> চোরে শিরোমণি করেছে হরণ
> তখনি সে সাধ ঘুচে গিয়াছে।
>
> —ভারত-বিলাপ।

আজি এ ভারতে, হায়, কেন হাহাধ্বনি।
কলঙ্ক লিখিতে যার কাঁদিছে লেখনী।

—পদ্মের মৃণাল।

বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়॥

—ভারত-সঙ্গীত।

আসল কথা, যে পরিবেশে কবির মনোজীবনের বিকাশ, সেখান থেকে যেন তিনি তাঁর আনন্দ-চেতনার উপকরণ সংগ্রহ করতে পারেন নি। পরশাসনের দৌরাত্ম্যে একটা শুষ্ক, বন্ধ্যা ও দগ্ধভূমি বলে তাঁর মনে হয়েছে ভারতবর্ষকে। নানা সাংসারিক টানাপোড়েনে তাঁর নিজের জীবনেও নিরবচ্ছিন্ন সুখ ছিলো না। তাই আত্মবেদনার সঙ্গে দেশের বেদনা মিলেমিশে একটা স্বাদেশিক আবহাওয়া তাঁর ছোট কবিতায় দেখা দিয়েছে। তিনি যেন সেই স্বাধীন, সুখী ও সচ্ছল ভারতভূমিরই স্বপ্ন দেখেছেন—যেখানে শুধু দেশবাসীর নয়, নিজের 'অর্ধদগ্ধ অন্তরেরও' শান্তি ও স্বস্তি মিলবে।

দেশের কথা, পরাধীনতার কথা বলতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাসে হেমচন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু কখনও কখনও হতাশের আক্ষেপ ছেড়ে তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পথ নিয়েছেন, পরিহাসের তীক্ষ্ণ-তীব্র শর নিক্ষেপে দ্বিধা করেন নি। এই সব ব্যঙ্গ-কবিতায় হেমচন্দ্র স্পষ্টতঃই ঈশ্বর গুপ্তের ধারারক্ষী। গুরুর মতোই তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বযুদ্ধে কোন একটা পক্ষ নিয়ে যে সমস্ত ব্যঙ্গকবিতা রচনা করেছেন, তাতে তির্যক দৃষ্টির সরস প্রকাশ আমাদের খুশি করে। তাতে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কোন স্বাক্ষর নেই; কবির প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি ও সরল কৌতুকপ্রিয়তার জন্যই ব্যঙ্গ কবিতাগুলি পাঠকের মনের মধ্যে জ্বালা ধরায় না, রক্তক্ষরণ ঘটায় না। শুধু তা-ই নয়, ভাবে ও ভাষায় এগুলি ঈশ্বর-

গুপ্তের সমজাতীয় কবিতা থেকে অনেক বেশি মার্জিত ও রুচিসম্মত। অনর্থক আঘাত দিয়ে মর্মভেদ করার জন্য নয়, আঘাত দিয়ে সংশোধন করবার জন্যই এগুলির রচনা।

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
ধারাপাতে মূর্তিমান, চারুপাঠ পড়া,
পেটের ভিতরে গজে দাস্থরায়ী ছড়া!

*　　　　*　　　　*

অঙ্কশাস্ত্রে—বররুচি, গ্যালিলো, নিউটান,
গণ্ডা করি গুন্তে হ'লে জানের বাড়ী যান;
পাত্তেড়ে প'ড়োর মত অক্ষরের ছাঁদ,
কলাপাতে না এগুতে গ্রন্থ-লেখা সাধ!

—বাঙালীর মেয়ে।

এখানে বিদ্যাহীন বিদূষীদের বিদ্রূপের পঙ্ককুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছে, একথা স্বীকার করতেই হবে; কিন্তু নিছক বিদ্রূপের জন্যই কবির এ-বিদ্রূপ নয়, শিক্ষার আলোয় অবহেলিত নারী-সমাজকে উদ্ভাসিত দেখার মহত্তর আকাঙ্ক্ষার 'রিফ্লেক্স' থেকেই এই ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের জন্ম। আসল কথা, কবির যে অন্তর বেদনায় হাহাকার করেছে, সেই অন্তরই কখনও কখনও ব্যঙ্গবিদ্রূপে বক্র-কুটিল হয়ে উঠেছে। আর সেই কারণেই পূর্বোক্ত বিদ্রূপাত্মক কাব্যাংশর সঙ্গে নিম্নোক্ত বেদনামথিত কাব্যাংশগুলির নাড়ীর সম্পর্ক আছে—

হায়রে নিষ্ঠুর জাতি পাষাণ-হৃদয়,
দেখে শুনে এ যন্ত্রণা তবু অন্ধ হয়,
বালিকা যুবতী ভেদ করে না বিচার,
নারী বধ ক'রে তুষ্ট করে দেশাচার
এই যদি এ দেশের শাস্ত্রের লিখন,
এ দেশে রমণী তবে জন্মে কি কারণ?

—বিধবা রমণী।

ডেকেছি মা বিধাতারে কত শত বার,
পূজেছি কতই দেব সংখ্যা নাহি তার,
তবুও ঘুচিল না হৃদয়ের শূল
অমরাবতীতে বুঝি নাহি দেবকুল !
বারেক বৃটনেশ্বরি আয় মা দেখাই
প্রাণের ভিতরে দাহ কিবা সে সদাই ;
কাজ নাই দেখায়ে মা, তুমি রাজ্যেশ্বরী,
হৃদয়ে বাজিবে তব ব্যথা ভয়ঙ্করী।

—কুলীনমহিলা-বিলাপ।

আসল কথা, কবি হেমচন্দ্র খোলা চোখে সমাজ-সংসারকে দেখেছেন, বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর ঐহিকতা ও মানবতাবোধ ছিলো বেশ সজাগ। এই জগৎ ও জীবনের প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসায় তিনি লিখিছেন—

জননী-বদনইন্দু, জগতে করুণাসিন্ধু,
দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন,
শত শশী রশ্মিমাখা, চারু ইন্দীবর আঁকা
পুত্রের অধর ওষ্ঠ নলিন আনন,
সোদরের সুকোমল, স্বসা-মুখ নিরমল,
পবিত্র প্রণয়পাত্র গৃহীর কাঞ্চন—
এ মণি পরশনে, হয় সুখ দরশনে,
মানব জনম সার সফল জীবন।—

—পরশমণি।

এবার রসসৃষ্টি হিসেবে হেমচন্দ্রের ছোট কবিতার সার্থকতা বিচার করা যাক। আগে বলেছি, হেমচন্দ্রের কবিস্বভাবের মূল ধর্ম ভাবতান্ত্রিকতা নয় ; আর তাই আবেগাত্মক কবিতার চেয়ে চিন্তাত্মক কবিতা রচনার দিকে তাঁর ঝোঁক থাকা স্বাভাবিক। তবু কখনও কখনও বুদ্ধি ও চিন্তার ক্ষেত্র এড়িয়ে তাঁর কবিমন রোমান্টিক ও লিরিক্যাল ভাবব্যাকুলতায় সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে

(এ-সম্পর্কে আলোচনা 'বিহারীলাল' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) ঃ

লজ্জাবতী লতা উটি মরি কি সুন্দর !
নিশ্বাস লাগিলে গায়, অমনি শুকায়ে যায়,
না জানি কতই ওর কোমল অন্তর ।—
এ হেন লতার হায়, কে জানে আদর !

—লজ্জাবতী লতা।

জোনাকির পাঁতি শোভে তরু-শাখা 'পরে,
নিরিবিলি ঝিঁঝি ডাকে, জগত ঘুমায় ;—
হেন নিশি একা আসি, যমুনার তটে বসি
হেরি শশী ঢুলে ঢুলে জলে ভাসি যায়।

—যমুনাতটে।

ভুলো না কুহুস্বর—ভুলো না আমায় !
হৃদয়ে গাঁথিয়া মালা দিলাম বৈশাখী ডালা ;
বাসি ব'লে অনাঘ্রাত ফেলো না ইহায় ।—

—কুহুস্বর।

বসন্তের আগমনে, সেরূপে সন্ধ্যার সনে
আর কি দক্ষিণ হতে বায়ু নাহি বহিবে ?
আর কি রজনীভাগে, সেইরূপ অনুরাগে,
কামিনী, রজনীগন্ধ, বেল নাহি ফুটিবে ?

—প্রিয়তমার প্রতি।

কিন্তু এই পর্যন্তই, আর বেশি নয়। কবির রোমান্টিক চেতনার অনিশ্চিত শিহরণে এর চেয়েও চিত্তস্পর্শী কোন লিরিক্যাল সুর-মূর্ছনার জন্ম সম্ভব ছিলো না। আর এইটুকুর মধ্যেই যতটা রসস্ফূর্তি ঘটেছে ততটা শিল্পগৌরবই হেমচন্দ্রের ছোট কবিতার প্রাপ্য। তবে তাঁর চিন্তাঘন কবিতাও সরস আন্তরিকতায় কখনও কখনও স্বাদু ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

তবে খাঁটি গীতিকবিতা রচনার প্রতিভা হেমচন্দ্রের ছিলো না। কারণ তার জন্য যে গভীর আত্মনিমজ্জন অপরিহার্য, হেমচন্দ্রের

বস্তুনির্ভর চক্ষুষ্মানতা তার অন্তরায় ছিলো। এই বহির্মুখী দৃষ্টির সঙ্গে মিলেছিলো তাঁর বক্তৃতা ও বর্ণনাপ্রবণতা। ফলে তাঁর খণ্ড-কবিতাকে আখ্যায়িকা-কাব্যের চূর্ণাংশ বলে মনে হয়, 'বীরবাহু'-জাতীয় কাব্যের সঙ্গেই যেন তার অন্তরের মিল। তবে আখ্যায়িকা-কাব্যের ভাষা ও রচনাশৈলীতে যত্ন ও পারিপাট্যের যে অভাব আছে, হেমচন্দ্রের ছোট কবিতায় তা নেই। তা ছাড়া স্পেনসরীয় স্তবক রচনায়, হাল্‌কা ছন্দের চালে, কথ্য বাগ্‌ভঙ্গিতে, চতুর ও চটুল ভাষাব্যবহারে তাঁর মুন্সীয়ানা স্মরণীয়।

হেমচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন না, প্রতিভার যাদুস্পর্শে সাহিত্যের স্বর্ণবৃষ্টি ঘটানোর কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য নয়। তবু তাঁর কাহিনী সংগঠনের শক্তি, বীররস উদ্দীপন করার ক্ষমতা, অফুরন্ত বর্ণনার কৌশল আমাদের রসচিত্তকে আকর্ষণ করে। তাঁর সমাজ-সচেতনতা, স্বাদেশিক চিত্তবৃত্তি, বস্তুনির্ভর মনোভাবের বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, খোলা চোখ ও স্বচ্ছ দৃষ্টির প্রত্যক্ষতা, সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ায় জন্ম-নেওয়া তির্যক মনোভঙ্গি চমৎকৃত করে আমাদের বস্তুতান্ত্রিক ও ঐতিহাসিক বুদ্ধিকে। হেমচন্দ্র, স্বীকার করতেই হবে, দুর্মর বাঙালী কবি ; রসের শাশ্বত মূল্যে না হোক, ঐতিহাসিক তাৎপর্যে তাঁর সৃষ্টি অবিনশ্বর।

॥ ২ ॥

কবি নবীনচন্দ্র সেনের চিত্তধারা, এক প্রখ্যাত সমালোচকের মতানুসারে, পাগলাঝোরার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পাগলা-ঝোরার জলোচ্ছ্বাসে যেমন একটা অনিয়ন্ত্রিত, আকস্মিক ও অফুরন্ত বেগ থাকে, তেমনি নবীনচন্দ্রের চিত্তভাবের মধ্যেও একটা উল্লসিত, অবিশ্রান্ত ও প্রগল্‌ভ বেগ ছিলো। তিনি কাব্য লিখতে বসে নিজের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে পারতেন না, ধরে রাখতে জানতেন না। তার একটা কারণ চট্টলের প্রাকৃতিক পরিবেশ যেখানে পাহাড় ও সমুদ্রের সম্পর্ক মিতালিমধুর, সেখানে বিধাতার খেয়ালের খুশিতে রূপ-রস-রঙের অজস্রতা। এমনিতর এক মনোহর পটভূমিতে যে জীবনের অঙ্কুরোদ্‌গম ও বিকাশ, তার মধ্যে ভাবের অসংযম ও আবেগের আতিশয্য স্বাভাবিক। কিন্তু তার চেয়েও একটা বড়ো কারণ ছিলো। নবীন সেনের উচ্ছ্বাস-ধর্মিতা প্রশ্রয় পেয়েছে তখনকার শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের নির্বিচার ভাববিলাসের মধ্যে, নবজাগ্রত জাতীয়বাদের সফেন স্ফূর্তির মধ্যে, আত্মসংগঠনের নামে বিবেচনাহীন ঐতিহ্যপূজার মধ্যে। এই সব ভাবধারা সদিচ্ছা-প্রণোদিত হতে পারে, কম-বেশি অন্তর-প্রেরণা সম্ভূতও হতে পারে—তবু তাদের কেন্দ্র করে যে একটা যুগগত ফ্যাসানও দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাইরের দেশ-কালের মধ্যে শত-লক্ষ ঘটনার জোয়ার-ভাঁটা প্রত্যেক সমাজেই দেখা যায়, কিন্তু সেই সব ঘটনার ভাবাবর্তে কবির মনও যদি ভেসে যায় তবে কবিধর্মেও বিচ্যুতি ও বিকৃতি না এসে পারে না। শুধু তা-ই নয়, সেক্ষেত্রে বাইরের জগৎ থেকে নানা অনভিপ্রেত প্রভাবে কবির মনের ওপর অনাত্মভূত গুণ ছড়িয়ে পড়াও অস্বাভাবিক নয়। চট্টলের কবি নবীন সেনের

স্বভাবজ উচ্ছ্বাসধর্মিতা তো ছিলোই, তার ওপর দেশকালের কতকগুলি আবেগাত্মক ফ্যাসান তাঁর চিত্তের সেই উচ্ছ্বাসধর্মিতাকে আরও তীব্র, ব্যাপক ও মুখর করে তুলেছিলো। রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের কাছ থেকে তিনি দেশপ্রেমের পাঠ নিয়েছিলেন: জন্ম হলো 'পলাশির যুদ্ধের'; বঙ্কিমের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন সমন্বয়ধর্ম: সৃষ্টি হলো 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস'; ভূদেব-বঙ্কিমের কাছ থেকে তিনি নিলেন হিন্দু-ঐতিহ্য-প্রীতি: তার প্রভাব দেখা গেলো তাঁর অনেক রচনায়। আর তাতে ভাবাতিরেক ও হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রমাণ রইলো সুস্পষ্ট। তাই বলা যায়, উনিশ শতকের শেষদিকে—মোটামুটি ১৮৭০ থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে—বাঙলা দেশে হিন্দু (বৃহত্তর অর্থে জাতীয়) সংস্কৃতির পুনরুত্থান ও সংগঠনকে কেন্দ্র করে যে ভাবজগৎ তৈরি হয়েছিলো, নবীন-মানসের সঙ্গে তার সম্পৃক্তি অবিচ্ছেদ্য: তার দোষগুণ ভালোমন্দ সমকালীন কবির মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আর সেই যুগগত ভাবধারার সঙ্গে কবির সম্পর্ক আবেগসর্বস্ব ছিলো বলেই তাঁর চিত্তদেশ পাগলাঝোরার উপমা মাত্র। প্রদীপ আগুনের কাছে কণামাত্র দাক্ষিণ্য চায়, অগ্নিমুখের জন্য তার বেশি বাইরের কৃপার প্রয়োজন নেই। কারণ সে তো জ্বলবে আত্মদহনের বহুমূল্যে। কিন্তু নবীনচন্দ্রের চিত্তদীপ বাইরের দেশকালের কাছে কণামাত্র পেয়ে খুশি ছিলো না. চেয়েছিলো অগ্নিপিণ্ড। বিশল্যকরণীর বদলে গন্ধমাদন। তাই তার চিত্তে আলো যতটুকু, ধোঁয়া তার চেয়ে কম নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পেলে হয়তো মানুষের জীবন-বিশ্বাস পূর্ণ হয়, কিন্তু তাতে কাব্য-প্রত্যয় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, উচ্ছ্বাস অনিবার্য হয়ে ওঠে।

তাই নবীন সেন আধুনিক পাঠকের কাছে সমাদৃত কবি নন। তাঁর ভারত-আবিষ্কারের প্রমত্ত-প্রয়াস উদ্ভট কল্পনার বিষয় ছাড়া আর কিছু নয় বলে অনেকের ধারণা। আবার কেউ বা বলেন, তাঁর একমাত্র সুখপাঠ্য রচনা 'আমার জীবন।' কবির কাব্যকে নয়, তাঁর গদ্য-রচনাকে প্রশংসা করার অর্থ সুস্পষ্ট।

তা তিরস্কারের চেয়েও অপমানজনক, দোষ-নির্দেশের চেয়েও বিড়ম্বনার বিষয়। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টির বিচারে নবীন সেনের কাব্যসাধনার যুগগত মূল্য আছে—মহাকালের ভাণ্ডারে তিনি বেশি না হোক কিছু শাশ্বত সম্পদ রেখে গেছেন। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নক্ষত্রমিছিলে তাঁর ব্যক্তিত্ব-বলয় অনুজ্জ্বল নয়।

নবীন সেনের পৈতৃকভূমি চট্টগ্রামের নয়াপাড়া গ্রাম। তাঁরা জাতিতে বৈদ্য; কুলগত পদবী সেন, উপাধি রায়। পিতা গোপীমোহন ও মাতা রাজরাজেশ্বরীর এক দুরন্ত সন্তান ছিলেন নবীনচন্দ্র। গ্রামের পাঠশালায় তাঁর বিদ্যারম্ভ; সেখানেই বছর তিনেক কাটিয়ে আট বছর বয়সে চাটগাঁ সহরে পড়তে আসেন তিনি। তাঁর শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কারও মনে নিশ্চয়তাবোধ ছিলো না। কারণ, তাঁর মতো দুরন্ত ছেলের লেখাপড়ায় অনুরাগ থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু শুভার্থীদের সমস্ত আশঙ্কা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিয়ে তিনি সতের বছর বয়সে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন; দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি অর্জন করে এই অমনোযোগী ছাত্র প্রমাণ দেন তাঁর অসামান্য মেধার। তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি—'যে ছেলের জেঠামিতে এবং দুর্বৃত্তিতে একখানি নূতন কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড রচিত হইতে পারিত, সে প্রথম শ্রেণীতে পাশ হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পাইল, কথাটি কেহ বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিল না।' তারপর তিনি ক্রমান্বয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ. এ. এবং জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইনষ্টিটিউশন থেকে বি. এ. পাশ করেন। এই উভয় পরীক্ষাতে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়াও তাঁর পক্ষে অগৌরবের নয়। কারণ এফ. এ. পরীক্ষার এক মাস আগে লক্ষ্মী-কামিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ এবং বি. এ. পরীক্ষার তিন মাস আগে তাঁর পিতৃবিয়োগ নিশ্চয়ই বিদ্যাচর্চায় ব্যাঘ্যাত সৃষ্টি করেছিলো।

নবীনচন্দ্রের পিতা গোপীমোহন পেশকার হিসেবেই হোক আর উকিল হিসেবেই হোক প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন, খরচ করেছেন দু'হাতে। তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত ও দানশীল। তাই আকস্মিক মৃত্যুর সময়ে তিনি এক বিপন্ন পরিবার আর অজস্র ঋণ ছাড়া আর কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। ফলে যে নবীনচন্দ্রের বাল্য ও কৈশোর কেটেছে আর্থিক সচ্ছলতার মধ্যে, পিতার মৃত্যুতে তাঁকেই দাঁড়াতে হলো বিরূপ অদৃষ্ট ও কঠিন সংসারের মুখোমুখি। তিনি চিনলেন ব্যবহারিক জগৎকে, চিনলেন আত্মীয়-পরিজনদের। তারা অমিত্র, প্রবঞ্চক, পরস্ত্রীকাতর ও উদাসীন। তবু ভেঙে পড়েন নি তিনি। তিনি পেলেন 'অগতির গতি' বিদ্যাসাগরের সাহায্য ও সহানুভূতি, নামলেন কঠোর জীবন-সংগ্রামে। ছাত্র পড়িয়ে ও বিদ্যাসাগরের সাহায্য নিয়ে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতে লাগলেন, নিজের খরচ চালিয়ে পাশ করলেন পরীক্ষায়।

তারপর শুরু হলো নবীনচন্দ্রের কর্মজীবন। প্রথমে মাস-খানেকের জন্য হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতা, পরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাশ করে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের স্থায়ী চাকুরী। নবীনচন্দ্র পদস্থ হলেন। দীর্ঘ ছত্রিশ বছর ধরে তিনি সরকারী কর্মে ঘুরে বেড়ালেন চট্টগ্রাম থেকে পুরী, শাহাবাদ থেকে ডায়মণ্ড হারবার। শুধু সরকারী বৃত্তিতেই নবীনচন্দ্র শক্তি ব্যয় করলেন না, নানা জনহিতকর ও সংস্কারমূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করতেও দ্বিধা করেন নি। ফাঁকে ফাঁকে চললো সাহিত্য-সাধনা, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সেবা।

নবীন সেনের জীবনের এই ছোট ইতিহাস থেকে দুটো কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে। প্রথমতঃ তাঁর দুরন্তপনার কথা। বাল্যে এই দুরন্তপনা জেঠামি ও নষ্টামিতে পর্যবসিত হলেও বোধ-হয় এই দুরন্তপনাই ছিলো তাঁর আত্মশক্তির উৎস। আর আত্ম-শক্তি ছিলো বলেই দুঃখের সংসারের কাছে তিনি পরাভূত হন নি, বরং তাঁকে জয় করে নিয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি ছিলেন কর্ম-

যোগী। তা না হলে নিষ্ঠার সঙ্গে চাকুরী করেও তাঁর পক্ষে সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা করা সম্ভব হতো না। সেদিক থেকে তাঁকে বলা যায় সব্যসাচী।

এ ছাড়াও নবীন সেন সম্বন্ধে বলবার কথা আছে। তাঁর 'আমার জীবন' তাঁকে বুঝতে যেমন সাহায্য করে, তেমনি না বোঝার কুয়াশাও সৃষ্টি করে। আত্মজীবনীতে নবীনচন্দ্রের জীবনেতিহাসের আর সব দিকের বিস্তৃত বর্ণনা আছে, কিন্তু তাঁর কবিজীবনের তেমন কোন পরিচয় নেই। তাঁর যে শিল্পী-সত্তায় সুন্দরের আসন ছিলো পাতা, যেখানে বিচিত্র অনুভূতির সাড়া জাগতো, 'আমার জীবনে' তার দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়নি। বরং নিজের হাতে লেখা কাহিনীতে নবীন সেনের যে আত্মরতি ও অহং-প্রিয়তার ছবি ভেসে উঠেছে, তাঁর কবিসত্তার পক্ষে তা বিড়ম্বনাজনক। হয়তো তখনকার একজন শিক্ষিত মানুষের চিত্ত ছিলো এমনি বিচিত্র ও জটিল। কলোনির মানুষের, বিশেষ করে পাশ্চাত্ত্যবিদ্যাপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী মানুষের আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের অবসান তখনও ঘটেনি, নবজাগরণের নতুন চেতনার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলো ব্যক্তিগত পদস্থতা ও স্বার্থের মোহ। আর সে-কারণেই তাদের চিত্তমুক্তি পুরো ঘটেনি। কলোনিয়াল জীবনের এই অভিশাপ নবীন সেনের ক্ষেত্রেও দুর্নিরীক্ষ্য নয়, অন্ততঃ 'আমার জীবন' পড়ে তাই মনে হয়।

অথচ তাঁর সাহিত্যের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য দেখে মনে হয়, তাঁর অন্নময় ও প্রাণময় কোশের মধ্যে ছিলো একটি স্থায়ী মনোময় কোশ। সৌন্দর্য ও রস ছিলো তাঁর সংবেদনশীল চিত্তের নিত্য খোরাক। তিনি অতি শৈশবেই পিতৃসূত্রে লাভ করেছিলেন কাব্যানুরাগ। পিতা গোপীমোহন ছিলেন কবি, পিতৃব্য ছিলেন যাত্রা-রচয়িতা। তিনি পিতামহীর কাছে নিয়েছিলেন রামায়ণ মহাভারতের পাঠ। আর তাই তাঁর মনে-প্রাণে অস্থি-মজ্জায় ছিলো কাব্যানুরাগ —'পাখীর যেমন গীত, সলিলের যেমন তরলতা, পুষ্পের যেমন সৌরভ, কবিতানুরাগ আমার প্রকৃতিগত ছিল। কবিতানুরাগ

আমার রক্তে মাংসে, অস্থি মজ্জায়, নিশ্বাস প্রশ্বাসে আজন্ম সঞ্চালিত হইয়া অতি শৈশবেই আমার জীবন চঞ্চল, অস্থির, ক্রীড়াময় ও কল্পনাময় করিয়া তুলিয়াছিল।'

নবীন সেনের সেই বালক-কালে ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন বাঙলার কবি-সম্রাট; তাঁর শিষ্যত্ব করেই পরবর্তী যুগের অনেক কবির উদ্ভব। নবীনচন্দ্রও দশ এগারো বছর বয়সে গুপ্তকবির অনুকরণে কবিতা লেখার চেষ্টা করেন। সেই আবাল্য কাব্যানুশীলনের চেষ্টাই যখন বৃহত্তর সমাজে প্রথম স্বীকৃতি লাভ করে, তখন কবি কলকাতা কলেজের ছাত্র। বন্ধু শিবনাথ শাস্ত্রীর আনুকূল্যে 'এডুকেশন গেজেটে' তাঁর 'কোনো এক বিধবা কামিনীর প্রতি' কবিতাটি মুদ্রিত হয়। কবিতাটি সম্পাদক প্যারীচরণ সরকারের প্রশংসা অর্জন করে এবং তাঁরই উৎসাহে গেজেটের পৃষ্ঠায় নবীনচন্দ্রের আরও অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কবির কাব্যচর্চার সূত্রপাতেই সার্থকতার প্রতিশ্রুতি ছিলো।

সরকারী কর্মের ফাঁকে ফাঁকে নবীন সেনের সাহিত্য-সাধনা অক্ষুণ্ণ ছিলো বলেই তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। 'অবকাশরঞ্জিনী' (প্রথম ভাগ—১৮৭১) তাঁর প্রথম গ্রন্থ ও খণ্ড-কবিতাসংগ্রহ। তারপর কালক্রমে 'ভারত-উচ্ছ্বাস' (১৮৭৫), 'পলাশির যুদ্ধ' (১৮৭৫), 'ক্লিওপেট্রা' (১২৯৫), 'অবকাশরঞ্জিনী' (দ্বিতীয় ভাগ—১২৮৪), 'রঙ্গমতী' (১৮৮০) 'রৈবতক' (১২৯৩), 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' (১৮৮৯), 'খৃষ্ট' (১২৯৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৩০০), 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী' (১৮৯৪), 'অমিতাভ' (১৩০২), 'প্রভাস' (১৮৯৬), 'অমৃতাভ' (১৩১৬) মুদ্রিত হয়। তাঁর গদ্যরচনা 'প্রবাসের পত্র' (১২৯৯), 'ভানুমতী' (১৯০০), 'আমার জীবন' (পাঁচ খণ্ড। ১৩১৪—১৩২০।)। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে 'অবকাশরঞ্জিনী', 'পলাশির যুদ্ধ' ও 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' নবীন সেনের সৃজনী-প্রতিভার স্বাক্ষরে সমুজ্জ্বল।

খণ্ডকবিতাসংগ্রহ 'অবকাশরঞ্জিনীতে' নবীন সেনের উচ্ছ্বাসপ্রবণ

কবিচিত্তের অনিয়ন্ত্রিত প্রকাশ ঘটেছে। কোন বিশেষ ভাবপর্যায়ের কবিতা হিসেবে নয়, বহুবিচিত্র মনোভাবের বাণীমূর্তি হিসেবে কবিতাগুলি কৌতূহলোদ্দীপক। কখনও প্রকৃতির মনোলোভা সৌন্দর্যে, কখনও রোমান্টিক প্রেমের হতাশায়, কখনও সমকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ঘটনাবর্তে, কখনও বা নানামুখী সুখ-স্বপ্নে কবির আবেগ এদের মধ্যে স্পন্দিত। কতকগুলি কবিতার মধ্যে আত্মনিরপেক্ষ বস্তু-উপদান যেমন আছে, তেমনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত হৃদয়-সংবেদনায়ও কতকগুলি কবিতা মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। গীতিকবিতার লক্ষণ 'অবকাশরঞ্জিনীতে' কতখানি আছে তা বিহারীলাল-প্রসঙ্গে বিবেচ্য, কিন্তু কবির মনোবিকাশের রূপরেখা যে এই খণ্ডকবিতাগুলির মধ্যে ছড়িয়ে আছে একথা এখানে বলা প্রয়োজন। 'অবকাশরঞ্জিনী' থেকেই আমরা জানতে পারি, কবির দৃষ্টিতে একদিন অতীত ভারতবর্ষের আর্যসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগই ছিলো দেশপ্রেম, যুগচেতনা ছিলো সমাজচেতনারই (রাষ্ট্রচেতনার নয়) নামান্তর। তারপর দেশের পরাধীনতার গ্লানি, স্বাধীনতার স্বপ্ন তাঁর মনে জাগতে শুরু করে ; ডেপুটী কবির দেশপ্রেম মহামান্যা রাণীর কাছে আবেদনের সীমা থেকে বলবীর্যে স্বাধীনতালাভের উদ্দীপনাময় কল্পনার মধ্যে মুক্তিলাভ করে। সুতরাং আত্মোলব্ধির ও যুগ-চৈতন্যের মুক্তির ইতিহাসের দিক থেকে 'অবকাশরঞ্জিনীর' কবিতাগুলির তাৎপর্য আছে। শুধু তা-ই নয়, স্বদেশপ্রেমের বার্তাবহ কবির ব্যবহারিক জীবনে যে বিড়ম্বনা, যে অনিবার্য চিত্ত-সঙ্কট তারও একটা আভাস কবিতাগুলির মধ্যে আছে। যে নবীন সেন একদিন লিখেছিলেন—

> হ'বে কি সে দিন,—কে করে গণনা,
> যেই দিন দীনা ভারত-তনয়
> শিখি রণনীতি, করি' বীরপণা,
> রক্তাক্ত শরীরে ফিরিবে আলয় ?

সেই কবিকেই আবার লিখতে হয়েছিলো 'ভারত-উচ্ছ্বাস'—প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের প্রশস্তি ঃ

রাজ্ঞীপুত্র তুমি, যে হও সে হও,
ভাবী রাজ্যেশ্বর—বৃটিশ-তপন ;
লও ভারতের সিংহাসন লও
বহুদিন পরে জুড়াই নয়ন।

নবীন সেনের খণ্ডকবিতার কলা-সৌন্দর্য তেমন নেই। কারণ অনেকখানি হৃদয়-উদ্বেলতাকে সংযত ও সংহত করে উজ্জ্বল অবয়ব দিতে না পারলে কবিতার রসমূর্তি সুস্পষ্ট হয় না। চট্টলের কবির অনিয়ন্ত্রিত ভাবকল্পনা শিথিলবদ্ধ রূপের মধ্যে বিশৃঙ্খলভাবে অভিব্যক্ত বলেই কাব্যকলাশ্রীর একান্তই অভাব। তাঁর চিন্তা ছিলো অনুভূতিও ছিলো, কিন্তু কতটুকু ব্যক্ত করতে হবে আর কতটুকু পাঠকের রসানুভবশক্তির জন্য অব্যক্ত রাখতে হবে—সে-জ্ঞান তাঁর ছিলো না। নবীন সেনের ধারণায় বক্তব্য পরিস্ফুটনই হচ্ছে কবিতার একমাত্র লক্ষ্য : তাই বহু ভাষণে অন্তরের ভাব বিশ্লেষণের দিকেই তাঁর বাক্য-নির্মাণ-ক্ষমতা প্রযুক্ত। প্রকাশরীতি ও কলাসৌষ্ঠব তাঁর কাছে ছিলো গৌণ, পাঠকের চিত্তাকর্ষণের কলাসম্মত বিধানগুলি তাঁর কবিতায় উপেক্ষিত। বিদেশী কবিতা তিনি পড়েছেন, নানা সুন্দর সুন্দর ভাবও চয়ন করেছেন, কিন্তু সত্যিকারের কাব্যশিক্ষা তার হয়নি। সুতরাং একথা স্বীকার করতে হবে, উচ্ছল ভাবাতিরেক, অসংযত বাক্য-বিস্তার ও অন্তঃ-সঙ্গতির অভাব তাঁর খণ্ডকবিতার প্রধান ত্রুটি।

তবু বাঙলা খণ্ডকবিতার ইতিহাসে নবীন সেনের যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে নিচের উদাহরণগুলিতে—

বাসন্তী চন্দ্রিমা মাখা চারু নীলাম্বর
মধুরে কেমন
মিশিয়াছে অন্য তীরে, মিশিয়াছে নীল নীরে
বঙ্কিম রেখায়, কেন মিশে না তেমন
অনন্তের সহ এই মানব জীবন ?

—মেঘনা।

এক দিন,—প্রিয়তমে! আছে কি স্মরণ?
নহে বহুদিন গত, এই জনমের মত
পেয়েছিনু একদিন যে সুখ-রতন;
এ জনমে আর নাহি পাইব তেমন।

—এক দিন।

এ প্রেম-গোলাপ মম মানস-কাননে,
সৌরভে মোহিত করি', বিষাদ-আঁধার হরি,
বিরাজিত, হাসি' হাসি' প্রফুল্ল যৌবনে,
হেরি' তা'র রূপ-শোভা, অনুপম মনোলোভা,
ভাবিতাম, হাসিতাম আপনার মনে,—
প্রেমের গোলাপ মম অতুল ভুবনে!

—সখের গোলাপ।

কি দিব উত্তর? আমি কেন ভালবাসি?
আজি পারাবার সম,
হায়, ভালবাসা মম,
কেন উপজিল সিন্ধু! এই অম্বুরাশি,
কে বলিবে? কে বলিবে, কেন ভালবাসি?

—কেন ভালবাসি?

শর্ব্বরী যেমতি, সখে একে, একে, একে,
দেখাইত তারারাজি আকাশের পটে,
তেমতি হৃদয় খুলি,
স্মৃতির তরঙ্গ তুলি,
দেখাতাম কক্ষ কক্ষ; সুখ-দুঃখাধার।
ফুরাইল, এ জীবন ফিরিবে না আর।

—বন্ধুতা ও বিদায়।

'পলাশির যুদ্ধ' নবীনচন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় কাব্য; কিন্তু সে জনপ্রিয়তা কাব্যোৎকর্ষের জন্য নয়, আন্তরিক স্বদেশাভিমানের জন্য। বাঙালীর সদ্য-জাগরিত দেশভাবনা কাব্যটিতে এমন একটা

জাতীয় ঘটনাকে আশ্রয় করে উদ্দীপিত, যার সঙ্গে বাঙালী নাতি-দূরবর্তী স্মৃতিসূত্রে আবদ্ধ। রঙ্গলালের কাব্যলোক রাজপুতনা বা উড়িষ্যার দূর-অতীত, হেমচন্দ্রের কল্পনার চারণক্ষেত্রও মুসলমানী ইতিহাসের অস্পষ্ট জগৎ—তাই তাঁদের কাব্যের মধ্যে যে জাতীয় ভাবোন্মাদনা উৎসারিত, তা আন্তরিক হলেও রোমান্সের পর্যায়-ভুক্ত। কিন্তু নবীন সেনের 'পলাশির যুদ্ধের' কাহিনী বর্তমান ভারতেতিহাসের এক বেদনাদায়ক অধ্যায়; তাকে কেন্দ্র করেই আজও সামান্য আঘাতেই বাঙালীর হৃদয় থেকে রক্ত ক্ষরণ হতে পারে। বাঙালীর কাছে পলাশির যুদ্ধ কল্পনার বিষয় নয়, বাস্তব ঘটনা; আর তাই কবির স্বদেশবাৎসল্য কাব্যটিতে মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের কাব্য ইতিহাসাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও দূসর অতীতের স্মৃতিবহ বলেই মেট্রিক্যাল রোমান্সের নামান্তর; আর নবীন সেনের 'পলাশির যুদ্ধ' নিকট অতীতের বেদনাভিত্তিক বলেই জাতীয় গাথাকাব্যের উদাহরণ। দ্বিতীয়তঃ নবীন সেন তার দুজন পূর্বসূরীর চেয়ে অনেক বেশি আবেগধর্মী কবি ছিলেন; যে কোন সংবেদনশীল আইডিয়াকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে উচ্ছ্বাসপ্রবণ বাঙালী পাঠকের হৃদয়ে উদ্বেলতা সৃষ্টির মন্ত্র তিনি জানতেন। সুতরাং যে কাব্যের বিষয়বস্তু সহজেই হৃদয়সংবাদী, যার পরিবেশ বা আবহ আবেগসিদ্ধ, তার জনপ্রিয়তা স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। কারণ মনে রাখতে হবে, জাতি হিসেবে আমরা হৃদয়বাদী এবং উচ্ছ্বাসপ্রবণ।

এই সেদিনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে কাব্য রচনা করা দুঃসাহসের পরিচায়ক। কারণ তখনও প্রকৃত ইতিহাস অজ্ঞাত এবং ইংরেজ পণ্ডিতদের কলম-নির্ভর। অথচ সামান্য বিচ্যুতিতে স্পর্শকাতর জাতির মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা। কারণ পলাশি তাদের ভাগ্য-নির্দেশক ঘটনা; সিরাজ তাদের শেষ স্বাধীন নবাব। তাই বঙ্কিম কাব্যকারের কঠিন দায়িত্বের কথা তুলেছেন, প্রশ্ন তুলেছেন অধিকার-অনধিকারের

প্রশ্ন। আসল কথা, পলাশির যুদ্ধের কবিকে হতে হবে সচেতন ও সতর্ক, অতি সাবধানে তাঁকে পা ফেলতে হবে। নবীন সেনের কবিবুদ্ধি কি একথা মনে রেখেই কাব্য রচনায় অগ্রসর হয়েছিলো?

বোধহয়, না। তিনি কোনকালেই তেমন তথ্যনিষ্ঠ ছিলেন না। টীকা-টিপ্পনী সহ ইতিহাসের পাঠ নেওয়া তাঁর ধাতে সইতো না। তা ছাড়া সত্যিকারের ইতিহাস ছিলো কোথায়? অক্ষয়কুমার মৈত্রের 'সিরাজদৌল্লা' তখনও জন্ম নেয়নি। তাঁর অবলম্বন ছিলো, কলেজে পড়বার সময়ে শোনা পলাশির যুদ্ধ ও যুদ্ধক্ষেত্রের গল্প, বিদেশী মার্সমেন পরিবেশিত কিছু তথ্য। এবং স্বভাবতঃই বিকৃত তথ্য। দ্বিতীয়তঃ কাব্য ও ইতিহাস এক নয়, এই ছিলো তাঁর ধারণা। এই ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে যিনি কাহিনী লিখতে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁর ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা বিতর্কের বিষয় হওয়া স্বাভাবিক। তাই 'পলাশির যুদ্ধের' বিরুদ্ধে অনৈতিহাসিকতার অভিযোগ আমরা অক্ষয়কুমারের মুখে শুনেছি। সিরাজ চরিত্রে কলঙ্ক আরোপের দায়ে তিনি নানা মহলে হয়েছেন অভিযুক্ত। কিন্তু আজকের দিনে আমাদের মনে হয়, অক্ষয়কুমারের সিরাজ-প্রীতি স্বদেশ-বাৎসল্যের পরিচায়ক হলেও সত্যসন্ধিৎসার প্রমাণ নয়। অন্ততঃ আচার্য যদুনাথের মতো ঐতিহাসিকের লেখায় মদ্যপ, কামাচারী, উচ্ছৃঙ্খল ও অস্থিরচিত্ত সিরাজের চিত্রই দেখতে পাই। অন্যদিকে অতিরঞ্জিত হলেও অন্ধকূপ হত্যা অনৈতিহাসিক ঘটনা নয়। সুতরাং সেদিক থেকে নবীন সেনকে অভিযুক্ত করা অন্যায়। তবে সিরাজকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করার প্রশ্নে কবির বিচারবোধ হয়তো আরও বেশি নমনীয় হতে পারতো। সিরাজের ব্যক্তিগত চরিত্রের ওপর তেমন গুরুত্ব না দিয়ে (যেমন 'মেঘনাদ-বধে' মধুসূদন ঘটনা হিসেবে সীতাহরণকে স্বীকার করে নিলেও তার ওপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি ; এই প্রধান ঘটনার আলোকে রাবণের চরিত্র-চিত্র ফোটাবার কোন চেষ্টাই করেন নি) তার অদৃষ্টের সঙ্গে স্বাধীন বাঙলা বা ভারতের অদৃষ্টকে একসূত্রে

গ্রথিত করতে পারতেন এবং সেই সুযোগে আপন স্বদেশাভিমান ও পরাধীনতার বেদনাকে মূল বর্ণনীয় বিষয় করে তোলা অসম্ভব ছিলো না। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে নবীন সেনের মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনের সঙ্কটের কথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। তখন পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তও ছিলো অন্ততঃ খানিকটা পরিমাণে পরবশ। তাই সিরাজ সম্পর্কে মন স্থির করতে পারা নবীন সেনের পক্ষে সহজ ছিলো না, এই নিয়ে তাঁর মধ্যে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব ছিলো। দ্বিতীয়তঃ কবি ছিলেন সরকারী চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত বাঙালী— প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজবিরোধী মনোভাব প্রচারের বাস্তব অসুবিধা ছিলো না কি? কাব্যটিতে যেটুকু সাহসের পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন, তাতেই তাঁর বিড়ম্বনা ও দুর্ভোগের অন্ত ছিলো না। কাব্যের পাঠ পরিবর্তনে তাব প্রমাণ পাই। শাসকসম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপে 'পলাশির যুদ্ধের' যে সমস্ত অংশ পরিবর্তনে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন, তার কয়েকটি উদ্ধৃত করলেই কথাটা পরিষ্কার হবে—

পরিবর্তিত পাঠ—

> আমাদের সঙ্গে দেখ ভাবিয়া অন্তরে
> কিবা ধর্মে, কিবা বর্ণে, আকারে, আচারে
> ভয়ানক অসাদৃশ্য। বাণিজ্যের তরে

পূর্বপাঠ—

> বানর-ঔরসে জন্ম রাক্ষসী-উদরে
> এই মাত্র কিম্বদন্তী; আকারে আচারে,
> ভয়ানক অসাদৃশ্য। বাণিজ্যের তরে
>
> —১ম সর্গ।

পরিবর্তিত পাঠ—

> যে পাপে ডুবিলি আজি ওরে দুরাচার!
> তোর হৃদয়ের রক্তে হইবে বিধান
> উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত;

পূর্বপাঠ—

যে পাপে ডুবিলি আজি ওরে দুরাচার!
নন্দকুমারের রক্তে হইবে বিধান
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ;

—৩য় সর্গ।

পরিবর্তিত পাঠ—

জগতের যুগান্তর অদ্ভুত কেমন
ঘটাইবে ইহাদের শোণিত তরল!
ক্ষতবক্ষে রক্তস্রোত ছুটিল তখন
সবেগে মোহনলাল মুদিল নয়ন।

পূর্বপাঠ—

প্রত্যহ ভারত-অশ্রু হইয়া পতন,
অপনীত হবে এই কলঙ্ক সকল।
চল যাই মুহূর্তেক করিগে দর্শন,
কোথায় সিরাজদৌল্লা, কি ভাবে এখন।

—চতুর্থ সর্গ।

পরিবর্তিত পাঠ—

এইরূপে বিজেতার করে কতবার
হইয়াছে বিলুণ্ঠিত ভারত-ভাণ্ডার!

পূর্বপাঠ—

বাঙলার রাজকোষ—মণিপূর্ণ খনি—
নিবিড় তমসে মাত্র পূর্ণিত এখনি।

—পঞ্চম সর্গ।

সুতরাং নবীন সেনের কাছে আমাদের প্রত্যাশার একটা সীমা থাকা উচিত। দেশ-কাল-পাত্রের কথা স্মরণ রেখে বিচার করলে মনে হয়, কবি সমগ্র জাতির প্রতি সুবিচারই করে গেছেন, কিছুমাত্র অবিচার করেন নি।

নবীন সেনের কাব্যরচনার পূর্বে সিরাজের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা পায়নি। তখন পর্যন্ত বাঙালীর স্বাদেশিক চিত্তবৃত্তি তাকে কেন্দ্র করে পরাধীনতার বেদনা বা স্বাধীনতার স্বপ্ন প্রকাশের প্রয়াস দেখায় নি। সুতরাং নবীন সেন সঙ্গতভাবেই বলতে পারেন —'বাঙালীর মধ্যে বোধ হয় আমিই প্রথম গরীব সিরাজদৌল্লার জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়াছিলাম।' কবির এই চোখের জলের স্বাক্ষরই 'পলাশির যুদ্ধের' প্রধান আকর্ষণ। তাঁর স্বদেশানুরাগ অকপট আন্তরিকতায় ও উত্তপ্ত উদ্দীপনায় অভিব্যক্ত—

সাধে কি বাঙালী মোরা চির-পরাধীন!
সাধে কি বিদেশী আসি দলি পদভরে
কেড়ে লয় সিংহাসন? করে প্রতিদিন
অপমান শত শত চক্ষের উপরে?
স্বর্গ মর্ত্য করে যদি স্থান-বিনিময়,
তথাপি বাঙালী নাহি হবে একমত;

—প্রথম সর্গ।

এই উক্তি দুষ্টবুদ্ধিপ্রণোদিত ব্যক্তির মুখে শোনা গেলেও এর মধ্যে বাঙালীর আত্মজিজ্ঞাসার প্রতিধ্বনি আছে। সত্যি, অনৈক্যই এ-জাতির অধঃপতনের কারণ। যদি ষড়যন্ত্রমূলক ঐক্যমন্ত্রে পাঠকের আপত্তি থাকে তবে রাণী ভবানীর উক্তি শুনুন—

অতএব মহারাজ! এই মন্ত্রণায়
নাহি কাজ; ষড়যন্ত্রে নাহি প্রয়োজন।
শীতলিতে নিদাঘের আতপ-জ্বালায়
অনল-শিখায় পশে কোন্ মূঢ় জন?

*　　*　　*

বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তার
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন;
হও অগ্রসর, নহে করি পরিহার,
জঘন্য দাসত্ব-পথে কর বিচরণ।

—প্রথম সর্গ।

অর্থাৎ স্বাধীনতার পথ হীন ষড়যন্ত্রের পথ নয়—ভয়শঙ্কাহীন তেজোদীপ্ত বলবীর্যের পথ। মনে হয়, সিরাজের ছত্রচ্ছায়ায় প্রতিপালিত হিন্দু-মুসলমানের দেশদ্রোহিতা কবিকে মর্মবেদনায় মুখর করে তুলেছে। সেই ঘনায়মান অন্ধকারে একমাত্র রাণীর হাতেই নবীনচন্দ্র দেখতে পেয়েছেন আলোর পতাকা। আর তাই সেই আলোর বার্তা এমন আবেগময় ভাষায় বর্ণিত। কিন্তু এখানেও শেষ নয়। বীর মোহনলাল রক্তাক্ত অক্ষরে লিখে রেখে গেছে স্বাধীনতাকামী মানুষের শেষ কথা—

কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্র কিরণ।
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি !
তুমি অস্তাচলে, দেব ! করিলে গমন,
আসিবে যবন ভাগ্যে বিষাদ-রজনী !

* * *

কি ক্ষণে উদয় আজি হইলে তপন।
কি ক্ষণে প্রভাত হ'ল বিগত শর্বরী !
আঁধারিয়া ভারতের হৃদয়-গগন,
স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহরি।

* * *

ফিরিও না পুনঃ বঙ্গ-উদয়-অচলে।
কি কায বল না, আহা ! ফিরিয়া আবার ?
ভারতে আলোক কিছু নাহি প্রয়োজন।
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ।

—চতুর্থ সর্গ।

পলাশির প্রান্তরে জাতির আশার আলো নিভে যাচ্ছে—তার গ্লানি মোহনলালের মর্ম-বিদারণ ঘটিয়েছে। আসলে মোহনলালের আর্তনাদ জাতির অন্তরাত্মার ক্রন্দন, কবির বেদনাক্ষুব্ধ হৃদয়ের হাহাকার।

পশিয়া পিঞ্জরান্তরে, বন-বিহগীর
কিবা সুখ, কি অসুখ ?—সমান অধীন।
পরাধীন স্বর্গবাস হতে গরীয়সী
স্বাধীন নরকবাস,.........
চাহি না স্বর্গের সুখ নন্দন কানন,
যদি পাই—কিন্তু হায়! ফুরাল স্বপন!

* * *

যে আশা ভারতবাসী বীরধর্ম-সনে
পলাশির রণরক্তে দিয়ে বিসর্জন,
কহিবে না, স্মরিবে না, ভাবিবে না মনে,
কল্পনে! সে কথা মিছে কহ কি কারণ?

—চতুর্থ সর্গ।

কিন্তু এই অন্তিম বাণী ধ্বনিত হওয়ার আগে যুদ্ধক্ষেত্রে মোহনলালের আহ্বানে ছিলো স্বাধীনতার ডাক, অভয়ঙ্কর ধ্বনি—

দেখিছ না সর্বনাশ সম্মুখে তোমার?
যায় বঙ্গ-সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা-ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব, কি দেখিছ আর?

* * *

কোথায় ক্ষত্রিয়গণ সমরে শমন
ছিছি ছিছি এ কি কাজ?
ক্ষত্রকুলে দিয়ে লাজ
কেমনে শক্ররে পৃষ্ঠ করালি দর্শন?

—চতুর্থ সর্গ।

বুদ্ধিমান পাঠক বলতে পারেন, স্বদেশমন্ত্রে সিদ্ধ হলেও 'পলাশির যুদ্ধ' আবেগসর্বস্ব। কিন্তু আমার ধারণা, এ-রকমের সিদ্ধান্ত পুরো সত্য নয়। নবীন সেনের কাব্যটিতে আবেগের ছবি খুব বেশি করে চোখে পড়লেও বলিষ্ঠ চিন্তার পরিচয়ও আছে।

প্রথমতঃ ধরা যাক কাব্যটির নামকরণের কথা। প্রথানুগত্যবশতঃ নবীন সেন 'সিরাজ-সংহার' বা 'সিরাজবধকাব্য' নামকরণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। কারণ মধুসূদন যে রামায়ণী কথাকে অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছিলেন নায়কের ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ইতিহাসের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ রাবণ বা ইন্দ্রজিতের কাহিনী হচ্ছে সমগ্র রাক্ষসজাতির কাহিনী। তখনকার দিনে শক্তিধর ব্যক্তিমানুষ বিরাট ইতিহাসের নিয়ন্তা ছিলেন বলেই কবির কাব্যের নাম ব্যক্তিনামপ্রধান হয়েছে। 'বৃত্র-সংহার' সম্বন্ধেও এ-কথাই বলা চলে। কিন্তু আধুনিক যুগে ব্যক্তি যত শক্তিধরই হোন না কেন তাকে ঘিরেই ইতিহাসের রথচক্র পরিক্রমা করে না। বৃহত্তর দেশ বা জাতিই হচ্ছে ইতিহাসের সত্যিকারের নিয়ামক। রাবণ বা ইন্দ্রজিৎ বা বৃত্রের পতনের পরেও তাদের স্ব স্ব জাতির টিকে থাকার কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু সিরাজের মৃত্যুই বাঙলা তথা ভারতের স্বাধীনতার শেষ ঘটনা না-ও হতে পারতো। রাণী ভবানীর পরামর্শে চললে সিরাজকে সরিয়ে দিয়েও বাঁচিয়ে রাখা যেতো দেশের স্বাধীনতা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কবি নবীন সেনের চোখে সিরাজ মুখ্য নায়ক নয়। সমস্ত কাহিনীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে যে অদৃশ্য নায়কের সূক্ষ্ম অস্তিত্ব তা বাঙলা তথা ভারতবর্ষ। আর সেই বৃহৎ ভূখণ্ডের ভাগ্য-পরিবর্তন হয়ে গেলো যে যুদ্ধক্ষেত্রে, তারই নামে কাব্যের নামকরণ কবির বৃহত্তর জাতীয় চিন্তারই পরিচায়ক। তাই কাব্যের শেষ কয়েক ছত্রে নবীন সেনের চোখের জলে সিরাজ আর ভারতের চিত্র একাকার হয়ে গেছে—

নামিল যখন,
সিরাজের ছিন্নমুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল
পড়িল, ছুটিল রক্ত স্রোতের মতন।
নিবিল গৃহের দীপ, নিবিল তখন
ভারতের শেষ আশা,—হইল স্বপন।

দ্বিতীয়তঃ বিদেশী ইংরেজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাণী ভবানীর বেনামীতে নবীনচন্দ্র আর একটি মহৎ চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। ইংরেজ যদি স্বাধীনতা-হরণকারী ও পরসম্পদলোলুপ হয়ে থাকে, তবে বিদেশাগত মুসলমানেরাও কি তা-ই নয়?—এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু নবীনচন্দ্রের নায়িকা হিন্দু-মুসলমানের বিভেদকে ইতিহাসের খাতিরেই আর জীবন্ত সত্য বলে মেনে নিতে রাজী নয়। কারণ, তার মতে, মুসলমান বিজয়ীরা বহুবৎসরব্যাপী ভারতবাসের মধ্য দিয়ে, পারস্পরিক সান্নিধ্যের প্রভাবে পড়ে বৃহত্তর জাতীয় সত্তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তাদের আজ হিন্দুদের থেকে পৃথক করে দেখা যায় না, দেখা উচিত নয়।

যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্ধ পঞ্চশত বর্ষ। এই দীর্ঘকাল
একত্রে বসতি হেতু, হয়ে বিদূরিত
জেতা জিত বিষভাব, আর্যসুত সনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত;
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি-ধর্মের কারণে।

—চতুর্থ সর্গ।

বঙ্কিম-ভূদেবের হিন্দু-ঐতিহ্যবাদ যেদিন প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী, যেদিন মুসলমানী সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিরও অভাব ছিলো না সেদিনের কবি নবীনচন্দ্রের এই ঐক্যমন্ত্র প্রচার শ্রদ্ধার্হ। এই মিলিত জাতীয় সত্তার সন্ধান দূরদৃষ্টির পরিচায়কও বটে।

ইতিহাস আর জাতীয় তাৎপর্যের দিক থেকে কাব্যটির এই বিচার অনর্থক নয়। সাহিত্যকে আজ আর আমরা নিতান্তই আকাশ-কুসুম ভাবিনে বলেই তাকে গভীরভাবে তলিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। কিন্তু নবীন সেন চেয়েছিলেন, শুধু কাব্য হিসেবেই 'পলাশির যুদ্ধের' বিচার হোক। তাই অক্ষয়-কুমারের অভিযোগের উত্তরে তাঁর মুখে শুনতে পেয়েছি—'তিনি লিখিয়াছেন ইতিহাস, আমি লিখিয়াছি কাব্য।' সুতরাং

নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধের' কাব্যত্ব সুবিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

যে সৃষ্টিমন্ত্রের বলে জাতীয় জীবনের এক দুর্ঘটনাকে রসসিদ্ধ কাব্যরূপ দেওয়া যায়, সেই সৃষ্টিমন্ত্র কবির জানা ছিলো কি? আমার মনে হয়, নবীন সেনের সাধ যতখানি ছিলো, ততখানি সাধ্য ছিলো না। তাঁর সৃজনের সমুদ্র-মন্থনে যে কবিতাপ্রেয়সী জেগে উঠতো, তাতে কখনও কখনও মাংসপিণ্ড থাকলেও প্রাণময় রহস্যের সন্ধান থাকতো না। কোথাও বা বস্তুর বড়োই অভাব, শুধুই এক রাশ বাষ্প মাত্র। ফলে তাঁর কবিতা রূপে ভোলায় না, প্রাণে আকর্ষণ করে না; কেবল মাত্র একটা অস্পষ্ট অথচ তীব্র আবেগের জানান দিয়ে পাঠকের মনকে চঞ্চল করে তোলে। এই আবেগ-টুকুকে সম্বল করে মহাকালের দেউড়ি পেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাই আজকের দিনের পাঠকের সঙ্গে যখন কাব্যটির বিষয়-উন্মাদনার সম্বন্ধ ক্ষীণ হয়ে এসেছে, যখন কাব্যটির সঙ্গে পাঠক আবেগের সম্পর্কের বদলে রসের সম্পর্ক পাতাতে ইচ্ছুক, তখন কাব্যটির ব্যর্থতা অ-তর্কিত বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

আসল কথা, নবীন সেন প্রাথমিক চিত্তবৃত্তির কবি। বাইরের জগতের বার্তা তাঁর কবি-মনের উপরি-ভাগে যে শিহরণ জাগাতো, বহুল বাক্যবিস্তারে তার ফলাও বর্ণনা দেওয়াই তাঁর রীতি। প্রাথমিক চিত্তস্তরের অগভীর অনুভূতিকে অতলান্ত চৈতন্যের রাজ্যে সংযত ও সংহত রূপ দেওয়ার কৌশল তাঁর অজ্ঞাত ছিলো। এক একটা ভাবকে মনের মধ্যে একান্ত করে ধরে রাখা, ব্যক্তিগত অনুভবশক্তির সংশ্লেষণ-ধর্মে তাকে অন্তরঙ্গ করে নেওয়া এবং চিন্তনে মননে তাকে নিয়ে অনুধাবন করার অলক্ষ্য প্রক্রিয়া তাঁর মনের রাজ্যে ঘটতো কি? শুধু তাই নয়, কবির মনের মধ্যে যে ভঙ্গিতে যে ক্রমে ভাবের উদয় হতো, সেই ভঙ্গিতে সেই ক্রমে তাকে শব্দার্থে সমর্পিত করার কবি-সংস্কার তাঁর ছিলো কি? বোধ হয়, না। যেমন তাঁর খণ্ডকবিতায় তেমনি 'পলাশির যুদ্ধে' বিশৃঙ্খল

বাক্যবিন্যাস, পঙ্গু চরণ-চাল, অদ্ভুত অলঙ্কার-প্রয়োগ, পূর্বাপর ভাবের অসংলগ্নতার প্রচুর উদাহরণ আছে। যেখানে বিষয় ও ভাবের মহিমা ও সৌন্দর্য আছে সেখানেও নবীনচন্দ্রের রস-চবণা ও রূপ-সাধনার অভাব ব্যর্থতা এনে দিয়েছে। অথচ কবির আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা ছিলো, ছিলো শব্দসম্পদ আর লিখন-স্বাচ্ছন্দ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র 'পলাশির যুদ্ধে' গীতরস পেয়েছেন, অভাব দেখেছেন আখ্যান-সৌন্দর্য আর নাট্যগুণের। এই কাব্যে একটা আদ্য-মধ্য-অন্ত্য-সমন্বিত কাহিনী সত্যিই অনুপস্থিত। তিনি এখানে নিটোল কোন গল্প বলেন নি, ঘটনাবৈচিত্র্যের জটাজাল বিস্তারের প্রয়াস পান নি। তাঁর কাব্যের মূল কথাটি হচ্ছে, পলাশির রণাঙ্গনে দেশের স্বাধীনতার অবসান এবং তজ্জনিত হৃদয়-বেদনা। এই মূল আইডিয়াটুকুকে কেন্দ্র করে তিনি একটা অনুকূল আবহ রচনা করেছেন এবং সেই আবহকে ধরে রাখবার পক্ষে অত্যাবশ্যক ঘটনার কাঠামো মাত্র জড়ো করবার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং 'পলাশির যুদ্ধে' ঘটনারস নেই, আছে ভাবরস। আর যেখানে পরিণামমুখী কাহিনী-সংগঠন নেই, ঘটনা-প্রাধান্য নেই, সেখানে ঘটনাশ্রয়ী গতিক্রিয়ার অভাব থাকবেই। তবে ঘটনাশ্রয়ী গতিক্রিয়ার অভাব থাকলেও ভাবগত গতিক্রিয়াব অভাব নেই। সঞ্চরণশীল আবেগের সূত্রেই নবীনচন্দ্র কাব্যটির ভাবগত গতিক্রিয়াকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন। ফলে 'পলাশির যুদ্ধে' ভাবের নাটকীয়তা অনস্বীকার্য। প্রথম সর্গে সিরাজের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রমূলক মন্ত্রণা, দ্বিতীয় সর্গে দেবী ব্রিটানিয়ার আশ্বাসে এক চরম সর্বনাশের দিকে সেই মন্ত্রণার অগ্রগতি। তৃতীয় সর্গে সিরাজের দুঃস্বপ্নের বর্ণনায় ভবিষ্যতের ভয়াবহতার ইঙ্গিত এবং ট্র্যাজেডির উপযুক্ত ভাব-পরিবেশ-রচনা। চতুর্থ সর্গে সিরাজের পরাজয় ও মোহনলালের মৃত্যুতে সর্বনাশের সান্নিধ্য, পঞ্চমে সিরাজ-সংহারে শেষ-আশার পরিসমাপ্তি। সুতরাং কাব্যটিতে ভাগবত পঞ্চসন্ধি বজায় থাকায় অন্ততঃ কিছুটা নাট্যরস উৎসারিত হয়েছে।

নবীনচন্দ্র, বঙ্কিম বলেছেন, বর্ণনায় একরূপ মন্ত্রসিদ্ধ। হেমচন্দ্রও বর্ণনার কবি, তবে ঘটনার বর্ণনাতেই তাঁর কাব্য-কৌতূহল। কিন্তু নবীন সেনের নিপুণতা ভাবের বর্ণনায়। উদাহরণ দেওয়া যাক—

নীরদ-নির্মিত নীল চন্দ্রাতপতলে,
দাঁড়াইয়া তরুরাজি, স্থির, অবিচল,—
প্রস্তরে নির্মিত যেন! জাহ্নবীর জলে,
একটী হিল্লোল নাহি করে টলমল।
না বহে সময় স্রোত; জাহ্নবীর জল;
প্রকৃতি অচলভাবে আছে দাঁড়াইয়া;
অস্পন্দ অন্তরে যেন স্তব্ধ ধরাতল
শুনিছে, কি মেঘমন্দ্র ঘন গরজিয়া,

—প্রথম সর্গ।

একটী রমণীমূর্তি বসিয়া নীরবে,
গৌরাঙ্গিণী, দীর্ঘ-গ্রীবা, আকর্ণ-নয়ন,—
শুকতারা শোভে যেন আকাশের পটে,
শোভিছে উজলি জ্ঞান-গর্বিত বদন।
আবার পলকে সেই নয়নযুগল,
স্নেহের সলিলে হয় কোমলতাময়,
এই বর্ষিতেছে ক্রোধ-গরিমা-গরল,
অমনি দয়াতে পুনঃ দ্রবীভূত হয়!

—দ্বিতীয় সর্গ।

তামসী রজনী শেষে সুনীল অম্বরে
বঙ্কিম রজত-রেখা ভাসিল এখনি
বঙ্গ-ভবিষ্যৎ, আহা, ভাবিয়া অন্তরে
হয়েছে কঙ্কাল-শেষ যেন নিশামণি।
সশস্ত্র সমর-মূর্তি করি দরশন,
ভয়ে নিশীথিনীনাথ ছিল লুকাইয়া

এবে ধীরে দেখা দিল, পলাশি প্রাঙ্গণ,
বৃক্ষ-অন্তরাল হ'তে, নীরব দেখিয়া।

—তৃতীয় সর্গ।

প্রস্তর-পুতুল যেন গবাক্ষে স্থাপিত,
হতভাগা দাঁড়াইয়া রয়েছে এখন :
অস্পন্দ শরীর, সর্ব ধমনী স্তম্ভিত,
অনিশ্বাস, অপলক, নাসিকা নয়ন।
তুমুল-ঝটিকা-বেগে কিন্তু স্মৃতিপথে,
বহিতেছে জীবনের ঘটনানিচয় ;

—পঞ্চম সর্গ।

তবে এই বর্ণনাতেও রূপ-রস-রঙের পরিমাণ সর্বত্র পরিমিত নয়—কোথাও কোথাও তাদের অপচয় ঘটেছে। আসল কথা, কবির হৃদয়-ভাবের মধ্যেই মাত্রাতিরিক্ত প্রাচুর্য ছিলো। দ্বিতীয়তঃ তাঁর বর্ণনা মূলতঃ চিত্রধর্মী, সঙ্গীতধর্মী নয়। অবশ্য তা আশা করাও অনুচিত ; কারণ তাঁর কবিতায় লিরিক্যাল উপাদান থাকলেও তিনি কখনোই বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথের মতো পুরোপুরি আত্মগত ভাব-ধারার কবি ছিলেন না। তৃতীয়তঃ তাঁর কবি-প্রকৃতির ওপর মাতৃভূমি চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রভাব যেমন ছিলো, তেমনি তাঁর বর্ণনায়ও পাওয়া যায় চট্টগ্রামেরই মাটি আর আকাশের রঙ। কবির প্রথম ভালোবাসার ধন চট্টগ্রামের রাঙামাটির রাজ্য—যার প্রকাশ আছে, খণ্ডকবিতা আর 'রঙ্গমতী' কাব্যে—সেই ভালোবাসাই যেন 'পলাশির যুদ্ধে' বৃহত্তর জাতীয় রূপ নিয়েছে।

'পলাশির যুদ্ধের' চরিত্রসৃষ্টি সমালোচকদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এবং চরিত্রসৃষ্টির ওপরই সৃজনশীল প্রতিভার সার্থকতা নির্ভর করে বলে নবীন সেনের বিরুদ্ধে অনেকে প্রতিকূল মন্তব্যও করেছেন। কিন্তু 'পলাশির যুদ্ধ' আখ্যায়িকা-কাব্য নয়, বর্ণনামূলক কাব্য ; তাই তাতে পূর্ণাঙ্গ চরিত্র-চিত্র আশা করা অনুচিত। কবি যেমন ভাব বহনের পক্ষে অত্যাবশ্যক ঘটনার কাঠামো ও কাহিনীর

সূত্র মাত্র গ্রহণ করেছেন, তেমনি বিভিন্ন ভাবের ধারক ও বাহক হিসেবেই কাব্যটিতে চরিত্রের অবতারণা করেছেন। যেখানে ঘটনাবিরলতা ও কাহিনীর গৌণভূমিকা সেখানে ঘটমান বস্তুর ঘাতে-প্রতিঘাতে পুরো মানুষ গড়ে ওঠার সুযোগ নেই। গোটা মানুষ বা জীবন্ত চরিত্রসৃষ্টির জন্য অপরিহার্য জড় সমাবেশ না ঘটায়, ঘটনার চাপে পড়ে প্রাণের স্ফূর্তি না হওয়ায় কতকগুলি মানুষের ছায়ামূর্তি মাত্র 'পলাশির যুদ্ধে' আছে। এবং সেখানেই তাদের অপূর্ণতা। তবে ভাবগত পার্থক্য সূচিত হওয়ায় সেই ছায়ামূর্তিগুলিকেও আলাদা আলাদা করে চিনতে কষ্ট হয় না।

নবীন সেনকে একদা বাঙলার বায়রণ বলা হতো এবং তার কারণ ছিলো 'পলাশির যুদ্ধের' ওপর 'Childe Harold'-এর প্রভাব। কবি ছিলেন সেকালের ইংরেজী শিক্ষিত মানুষ, ইংরেজী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ তখনকার দিনে অগৌরবের ছিলো না। তাই তাঁর খণ্ডকবিতায় বা 'পলাশির যুদ্ধে' ইংরেজী কাব্যের ছায়া বা কায়া থাকা স্বাভাবিক। এবং একথাও সত্য যে, চতুর্থ সর্গের দশম শ্লোকের—'কালি সন্ধ্যাকালে এই হতভাগাগণ' ইত্যাদির সঙ্গে 'চাইল্ড হেরোল্ডের' তৃতীয় সর্গের অষ্টবিংশ স্তবকের—'Last noon behold them full of lusty life'—ইত্যাদির মিল আছে। এইভাবে খুঁজলে স্পেন্সেরিয়ান স্তবকবন্ধই শুধু দেখা যাবে না, হয়তো আরও অনেক রকমের প্রভাবই চোখে পড়বে। তাতে শুধু এইটুকু প্রমাণ হয় যে, ইংরেজী কবিতার ভাব বা রীতি আপন কাব্যে আহরণ করবার একটা ইচ্ছা সেকালের অন্যান্য কবির মতো নবীন সেনেরও ছিলো। কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'পলাশির যুদ্ধ' ভাবে ও রসে, স্বাদে ও সৌরভে নবীন সেনের মৌলিক কাব্য।

নবীন সেনের সবচেয়ে জনপ্রিয় সৃষ্টি 'পলাশির যুদ্ধ', কিন্তু তাঁর আপন প্রিয় সৃষ্টি 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস'। সিরাজের কাহিনী দেশপ্রেমের জ্যোতিতে প্রোজ্জ্বল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী মনুষ্যত্বের

পূর্ণ মহিমায় মুখর। কবির মহৎ চিন্তায় মহিমান্বিত বলেই কাব্যত্রয়ী একদা ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত নামে খ্যাতি ও অখ্যাতি লাভ করেছিলো। মধুসূদনের আমল থেকে কৃত্রিম ক্লাসিক রচনার যে রেওয়াজ হয়, নবীন সেন কাব্যত্রয়ীর মধ্যে তারই অনুবর্তন করেছেন—এ-মতও অনুপস্থিত নয়। সুতরাং কাব্যটি বিষয় ও গঠন এই উভয় দিক থেকেই সযত্ন ও সতর্ক বিচারের অপেক্ষা রাখে।

একদা রাজগিরে মহাভারত পড়তে পড়তে নবীনচন্দ্রের মনে হলো, মহাভারত ঐতিহাসিক মহাকাব্য; সেই মহাকাব্যের আকাশের পূর্ণচন্দ্র হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। শুধু তা-ই নয়, পুরীতে বাস করার সময়ও ভাগবতের ব্রজলীলাকে তিনি দেখতে পেলেন এক নতুন আলোকে। ফলে তাঁর হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির অঙ্কুরোদ্‌গম হলো। সেই পরমপুরুষের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন মনুষ্যত্বের পূর্ণ আদর্শ। তাঁর ধ্যান ও চিন্তায় কৃষ্ণ হলেন ধর্মসংস্কারক ও ধর্মরাজ্য স্থাপয়িতা। নিষ্কাম কর্মে ও প্রেমেই তাঁর মহৎ আদর্শের রূপায়ণ। 'তাঁহার সহায় ছিল অর্জুনের শৌর্য, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মনীষা, সুভদ্রার প্রীতি এবং শৈলজার প্রেম। প্রতিপক্ষ ছিল দুর্বাসার অকারণ প্রতিহিংসা ও অভিমান এবং বাসুকির সংশয়।' স্বয়ং কৃষ্ণের মুখে শুনতে পাই—

> আমার অনন্ত বিশ্ব ধর্মের মন্দির ;
> ভিত্তি সর্বভূত-হিত ; চূড়া সুদর্শন ;
> সাধনা নিষ্কাম কর্ম ; লক্ষ্য নারায়ণ।
> এই সনাতন ধর্ম, এই মহা-নীতি,—
> ব্যাসদেব জ্ঞানবলে, পার্থ বাহুবলে,
> ভারতে, জগতে, কর সর্বত্র প্রচার,
> নারায়ণে কর্মফল করি সমর্পণ।
> বিনাশিয়া স্বার্থজ্ঞান, করিলে নিষ্কাম
> সাম্রাজ্য, সমাজ, ধর্ম, হইবে অচিরে

খণ্ড এ ভারতে 'মহাভারত' স্থাপিত,—
প্রেমময়, প্রীতিময়,—পবিত্রতাময় !

—রৈবতক।

কাব্যত্রয়ীতে যে ধর্মরাজ্য স্থাপিত হয়েছে, তার মূলে আছে আর্য-অনার্যের মিলন। নিষ্কাম প্রেমের সূত্রে এই মিলনের পর কৃষ্ণের মনস্কাম পূর্ণ—

প্রণমি সাষ্টাঙ্গে আকুল উচ্ছ্বাসে
কহে শৈল দরদর দুনয়ন—
'দেখ নরনাথ ! দেখ নারায়ণ !
আর্য অনার্যের প্রেম-সম্মিলন !
ত্রিযুগের হিংসা, কলহ, বিদ্বেষ,
তব প্রেম-স্রোতে গিয়াছে ভাসি।
দেখ ধর্মরাজ্য !—প্রেম-রাজ্য তব !
কি প্রেম !—কি শান্তি !—অমৃতরাশি !'
কহিলেন হরি প্রেমের উচ্ছ্বাসে
আকুল আনন্দে অধীর প্রাণ—
'এ যে প্রেম-রাজ্য ভদ্রা শৈলজার !
শৈল ! আজি মম পূর্ণ মনস্কাম।'

—প্রভাস।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কাব্যত্রয়ীর মূলবস্তুর মধ্যে মহত্ত্ব আছে। এখানে কবির মনন ও ধ্যান উচ্চাশ্রয়ী। মহাভারত থেকে একটা নতুন তাৎপর্য আবিষ্কারে এবং কৃষ্ণের জীবনের লীলা-বৈচিত্র্য ও জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের মধ্য দিয়ে তাকে জীবন্ত সত্য রূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসে নবীনচন্দ্রের যে মৌলিকতা তা নিঃসন্দেহে আমাদের শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। কবির এই নতুন মহাভারতের মূল আইডিয়া অনৈতিহাসিক হতে পারে, হয়তো রক্ষণশীল দৃষ্টিতে তা অসত্য রাজনীতিও হতে পারে, এমন কি তাতে সনাতন মহা-ভারতীয় ধর্মের বিকৃতিও থাকতে পারে—তবু এক বিপুলাকার

মহাকাব্যের অবিরাম চরিত্র-মিছিল ও অজস্র ঘটনার কলকোলাহল থেকে আধুনিক যুগের উপযোগী ভাবসত্য নিষ্কাশিত করা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। আর মহাভারতের নতুন ব্যাখ্যা এবং ঘটনা-সন্নিবেশ ও যুক্তিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে তাকে সগৌরবে উপস্থাপনার অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা অনুচিত; কারণ সে-অধিকার ভোগ করেছেন মিল্টন, মধুসূদন ইত্যাদি কবিরাও। নতুন যুগের আলোকে পুরনো ভাবাদর্শের পুনর্বিচারকে এবং সেই পুনর্বিচার যদি ভ্রান্তও হয়, তবু তার প্রয়াসকে কাব্যের ক্ষেত্রে অন্যভাবে যাচাই করতে হবে। দেখতে হবে, শিল্পসম্মতভাবে সেই পুনর্নবা চিন্তার সত্য-প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিনা। এবং তা নতুন যুগের নতুন চাহিদা মেটাতে পারছে কিনা। প্রথম শর্তটির কতটা কাব্যত্রয়ীতে রক্ষা করা হয়েছে, তার বিচার পরে করছি; তবে কাব্যত্রয়ীর নিহিতার্থ আজকের মানুষের পক্ষেও গ্রহণযোগ্য বলে দ্বিতীয় শর্ত পূরণে কাব্যত্রয়ীর সার্থকতা স্বীকার করে নিতে হবে।

অথচ কাব্যত্রয়ীর ভাবগত পরিকল্পনা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তি ছিলো প্রচুর। নবীনচন্দ্রের সঙ্গে পত্রালাপে তিনি বলেছিলেন, কবির মহাভারতীয় আইডিয়া ঐতিহাসিক দিক থেকে অসত্য, রাজনৈতিক দিক থেকে ভ্রান্ত; বিশেষ করে কৃষ্ণের ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের কাহিনী ও ব্রাহ্মণ-বিরোধিতা স্বকপোলকল্পিত। ধর্মসংস্কারে কৃষ্ণের ভূমিকাও স্বীকার করে নেওয়া যায় না। তবে আজকের দিনে সমস্ত বিষয়টাকে যখন তলিয়ে দেখি, তখন মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের অভিযোগ অহেতুক। তিনি কৃষ্ণচরিতে বা কোন কোন উপন্যাসে ধর্ম ও কর্মের যে সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন, যে মনুষ্যত্বের পূর্ণ আদর্শ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, তা কাব্যত্রয়ীতে নবীনচন্দ্রেরও সাধ্য ছিলো। হয়তো কিছু কিছু পার্থক্য আছে, তবু একই লক্ষ্যের অভিমুখিন। বঙ্কিম যেখানে জ্ঞানাশ্রয়ী ও যুক্তিবাদী, সেখানে, নবীন সেন ভক্তিধর্মী ও প্রেমবাদী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা

উভয়েই উনিশ শতকী সমন্বয়ের আদর্শ অঙ্গীকার করে নিয়ে ছিলেন। সুতরাং বঙ্কিমের বিরোধিতার কোন মূলগত কারণ ছিলো না।

তবে বঙ্কিমচন্দ্র আর নবীন সেনের সত্য-প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি ছিলো পৃথক। বঙ্কিম কোথায়ও কল্পনার আশ্রয় নেন নি, ঐতিহাসিক সত্যের বিরোধিতা করেন নি। তাঁর কৃতিত্ব বহুবিচিত্র এমন কি পরস্পর প্রতিকূল তথ্যগুলিকে গ্রহণ-বর্জন-নীতি অনুসরণের মধ্য দিয়ে যুক্তিসম্মতভাবে উপস্থাপনায়। তিনি সেখানে মননশীল, যুক্তি-উপাসক ও বিচারক—সমালোচনার অঙ্কুশ-তাড়নায় অযৌক্তিক তথ্যগুলিকে সরিয়ে দিয়ে কৃষ্ণের জীবনাদর্শের বুদ্ধিবৃত্ত সরলীকরণ করেছেন। অন্যদিকে নবীন সেন যুক্তির ধার ধারেন নি, জ্ঞানের আয়ুধ শানিয়ে নিয়ে তত্ত্বের পথে অগ্রসর হন নি ; ভক্তির প্রবলতায় তিনি উচ্ছ্বাসের ঢেউয়ে ভেসেছেন, প্রয়োজন মতো কল্পনার আকাশে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো উড্ডীন হয়েছেন। ফলে স্বাদ ও সৌরভে, মন ও মেজাজে বঙ্কিমের গদ্য-তত্ত্বের সঙ্গে নবীনের কাব্য-তত্ত্বের একটা পার্থক্য গেছে দাঁড়িয়ে। এই দুই রীতির পার্থক্য নবীন সেনের কলমেই পরিস্ফুট—

> জ্ঞান পদে পদে পতঙ্গের মত যেখানে যাইতে চায়,
> ভক্তি-বিহঙ্গিনী উধাও সেখানে উচ্ছ্বাসে উড়িয়া যায়।
>
> —কুরুক্ষেত্র।

আর একটি কথা। কেউ কেউ নবীনের এই তত্ত্বাদর্শের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন হিন্দু-ঐতিহ্য-বাদ। এ-ধারণা আংশিক সত্য : কারণ সেই যুগটাই ছিলো ক্লাসিক্যাল অ্যান্টিকুইটি পুনরুদ্ধারের যুগ এবং সেই ক্লাসিক্যাল অ্যান্টিকুইটি যে প্রধানতঃ হিন্দু-ঐতিহ্যের নামান্তর তা ঐতিহাসিক সত্য। তবে 'অবকাশরঞ্জিনীর' প্রথম দিকের আর্যামি ধীরে ধীরে 'পলাশির যুদ্ধ' বা কিছু কিছু খণ্ড-কবিতায় দেশপ্রেমে রূপান্তর লাভ করে এবং তারপরে দেশপ্রেমও ভারতীয় ঐতিহ্যবাদের বৃহত্তর পরিধির মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

তাই শেষ পর্যায়ে নবীনচন্দ্রের মনের গড়নে কোন হিন্দু-সঙ্কীর্ণতা ছিলো না, তার ধ্যানলোকে কৃষ্ণ (কাব্যত্রয়ী) ছিলেন, বুদ্ধ ছিলেন ('অমিতাভ') খৃষ্ট ছিলেন ('অমৃতাভ')। শুধু কি তাই? তাঁর কাব্যত্রয়ীতে কৃষ্ণের মানবতাবাদ ও হিতবাদে পাশ্চাত্ত্য মতবাদের ছায়াও আছে। এ থেকেই প্রমাণ হয়, আসলে নবীন সেনের দৃষ্টি সকল ধর্মের মূলেই যে আছে এক পরম সত্য, তারই আবিষ্কারে ছিলো নিবদ্ধ। তাই তাঁর মতবাদকে হিন্দু-ঐতিহ্য-বাদ না বলে ভারতীয় ঐতিহ্যবাদ বা সমন্বয়বাদ বলা শ্রেয়।

এতো গেলো 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসের' বিষয়-মহিমার কথা। কিন্তু তাদের কাব্যত্ব কোথায়, তার সদুত্তরের ওপরই নবীন সেনের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা নির্ভরশীল। শুধু ভাবের মাহাত্ম্যে রসের হাটে কাব্য কখনও বিকিয়ে যায় না। কৃষ্ণের লীলা ('রৈবতক'), কর্ম ('কুরুক্ষেত্র') ও বৈরাগ্যের ('প্রভাস') বহুবিস্তৃত কাহিনীকে রসসম্ভাবনাপূর্ণ নিটোল রূপ দেওয়া সহজ ছিলো না। এত বড়ো একজন বিরাট পুরুষের জীবন-বৈচিত্র্যকে নানা মত ও পথের, ব্যক্তি ও ঘটনার ভিড় থেকে উদ্ধার করে তার সুস্পষ্ট রূপরেখা নির্ধারণ করবার জন্য স্থিতিস্থাপক ও সংশ্লেষণধর্মী প্রতিভার প্রয়োজন ছিলো। বঙ্কিম একথা বুঝেছিলেন বলেই নবীনচন্দ্রকে আগে থেকে সাবধান করে দিতে দ্বিধা করেন নি। তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, কাব্যত্রয়ীর পরিকল্পনা 'exceedingly ambitious' এবং সেই উচ্চাশাজাত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তাঁর বলবার কিছু ছিলো না (কৃষ্ণচরিত সম্পর্কে মতপার্থক্য সত্ত্বেও)। তবে কাব্যটির সার্থকতা যে নবীনচন্দ্রের সংগঠন-শক্তির শেষ সীমা পর্যন্ত দাবি করে বসবে, তা তিনি জানতেন। পরিকল্পনার সঙ্গে রূপায়ণের যদি গরমিল থাকে, যদি রূপায়ণ প্রথম শ্রেণীর না হয়, তবে পাঠক গ্রহণ করবে না বলে তাঁর বিশ্বাস ছিলো। কারণ যেখানে পাঠকের ওপর ব্যাস-মহাভারতের প্রভাব রয়েছে, সেখানে নতুন মহাভারতকে অসাধ্য সাধন করতে হবে। এমনি অবস্থায় সাফল্য বা জনপ্রিয়তা

সম্পর্কে নিশ্চিত হতে তিনি নবীন সেনকে নিষেধ করেছিলেন। এসব কথা মনে রেখেই কাব্যত্রয়ীর কাব্যত্ব বিচারে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

নবীন সেনের কাব্যত্রয়ীর শিল্পগত আবেদন অন্ততঃ দু'দিক থেকে প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ যে মানবতাবাদ ও প্রেমবাদ তাঁর কাব্যচরিত্রের আলম্বন-বিভাব, তাদের মধ্যে একটা সহজ ও স্বাভাবিক রসসম্ভাবনা আছে এবং তাদের সর্বজনীন আবেদন বিনা আয়াসেই কম-বেশি পাঠকের রসবোধকে পরিতৃপ্ত করে থাকে। 'বৃত্র-সংহারের' নগেন্দ্রবালার গুরুপাক দার্শনিক তত্ত্ব স্বভাবতঃই ক্লান্তিকর ও নীরস, কাব্যের রসলোকে সেই তত্ত্বের পরিণতি নির্ভর করেছে রসমুখী কবিচিত্তের মায়াস্পর্শের ওপর। কিন্তু প্রেম ও মানবতা গুরুপাক দার্শনিক তত্ত্ব নয়, আমাদের জীবনেও তাদের উপলব্ধি ঘটে; তাই এই দুইয়ের মাধুর্য ও সৌন্দর্য স্বাভাবিক সরসতায় পাঠকের মনকে আকর্ষণ করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ শিল্পের ইতিহাসেও আছে একটা দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বের রূপই শিল্পের চেহারা চিনিয়ে দেয়। শিল্পের এই দ্বন্দ্বধর্ম সর্বজনীন ও সর্বকালীন বলেই দ্বন্দ্বের আলোকে শিল্পের সৃষ্টিলোকে সহজেই পাঠকের উত্তরণ ঘটে। কাব্যত্রয়ীতেও এই শিল্পগত দ্বন্দ্ব সহজেই চোখে পড়ে। কালিদাস রায়ের ভাষায় —'যে সকল দ্বন্দ্বের দ্বারা নবীনচন্দ্রের কাব্যের আখ্যানবস্তু পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে সে সকল দ্বন্দ্ব নবীনচন্দ্রের মনগড়া নয়—সেগুলি কেবল ভারতীয় নয়—সার্বভৌম, সর্বকালীন। আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্বই হউক, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রের দ্বন্দ্বই হউক, সামাজিক বা গার্হস্থ্য সংস্কারের সহিত জীবন-সত্য ও প্রেমের দ্বন্দ্বই হউক, ভক্তিমার্গের সহিত জ্ঞান-মার্গের দ্বন্দ্বই হউক, অহিংসাত্মক রসধর্মের সহিত হিংসাত্মক শৌর্য-ধর্মের দ্বন্দ্বই হউক, সুকুমার হৃদয়বৃত্তির সহিত রূঢ় কর্তব্যবোধের দ্বন্দ্বই হউক—সকল দ্বন্দ্বেরই সার্বজনীনতা আছে। দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের এই মানস-কুরুক্ষেত্রই নবীনচন্দ্রের কাব্যকে মহাকাব্যের পর্যায়ে

উন্নীত করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে সত্যের সহিত স্বপ্নের যে দ্বন্দ্ব কবি দেখাইয়াছেন, তাহাতে গীতিকাব্যের বিশ্বজনীন আবেদন দেশকালের সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে।' এই হচ্ছে কাব্য-ত্রয়ীর সহজ কাব্যত্বের দ্বিতীয় দিক।

কাব্যত্রয়ীর এই দ্বিবিধ কাব্যমূল্য ছাড়া আরও নানা কাব্যিক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। প্রথমতঃ, নবীনচন্দ্রের কবিস্বভাবের মূল ধাতুতে যে ভাবতান্ত্রিকতা ছিলো, এই তিনটি কাব্যের মধ্যে তার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি আছে। কবি বাইরে থেকে আবেগ বা কল্পনা আরোপ করে বর্ণনীয় বিষয়ের বিস্তার সাধন করেন নি, বর্ণনীয় ভাবের মধ্যেই যে বিস্তারপ্রবণতা বা প্রসরণশীলতা ছিলো তারই উচ্ছ্বসিত প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর কবিচিত্তের স্বরূপভূত মানবিক আবেগের দুর্দমনীয় গতিবেগ কাব্যপাঠের সময়ে সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী হয়ে ওঠে, পাঠকের রসানুভবশক্তিকে জাগ্রত ও আস্বাদন-পিপাসাকে পরিতৃপ্ত করে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক—

নির্মল আনন্দরাশি, নির্মল আনন্দহাসি,
প্রভাসের মহাসিন্ধু! আনন্দ নির্মল,—
জলরাশি ; হাসি,—লীলা তরঙ্গ চঞ্চল
অপরাহ্ন,—বসন্তের শুক্লা চতুর্দশী।
আনন্দ রবির কর, আনন্দ সুনীলাম্বর,
প্রকৃতি আনন্দময়ী ষোড়শী রূপসী।
আনন্দের সচঞ্চল লীলা রত্নাকর।
আনন্দের অচঞ্চল লীলা নীলাম্বর।
নীলিমায় নীলিমায়, মহিমায় মহিমায়,
মিশাইয়া পরস্পরে,—মহা আলিঙ্গন!
মহাদৃশ্য! অনন্তের অনন্ত মিলন!
নীলসিন্ধু, শ্বেতবেলা, বেলায় তরঙ্গ খেলা,
দিতেছে বেলায় সিন্ধু শ্বেত পুষ্পহার,

গাহিয়া আনন্দগীত চুম্বি অনিবার।
সিন্ধুবক্ষে বেলা, যেন বিষ্ণুবক্ষে বাণী,
সান্ধ্য রবিকরে হাসে বেলা সিন্ধুরাণী।

—প্রভাস।

এখানে বসন্তের শুক্লা চতুর্দশীর এক আনন্দঘন অপরাহ্ণে প্রভাসের মহাসিন্ধুর যে বর্ণনা আছে, তা চিত্রময়ী বাণী নয়। সেই শুভ মুহূর্তে কবির চিত্তে আনন্দ-ভাবের যে আস্বাদন ঘটেছে কবি তারই ধ্বনি ছড়িয়ে দিয়েছেন নির্মল জলরাশির মধ্যে, তরঙ্গের লীলা-চাঞ্চল্যের মধ্যে, শ্বেতবেলার সঙ্গে লীলাসিন্ধুর প্রণয়-কেলির মধ্যে। আনন্দের ধ্বনিতে ধ্বনিতে আকাশ, মাটি ও জল স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। অচঞ্চল নীলাম্বরে, অস্তগামী সূর্যের রক্তিমাভায় সেই আনন্দের নীরব স্পন্দন—বাইরে থেকে শান্ত মনে হলেও তাদের শিরায় শিরায় স্নায়ুতে স্নায়ুতে প্রচ্ছন্ন শিহরণ, অন্তর্লীন সাড়া। এখানে ষোড়শী প্রকৃতি তার ললিতলোভন রূপ নিয়ে নয়, তার আনন্দচঞ্চল প্রাণের বার্তা নিয়ে রসিকের কাছে ধরা দেয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নবীন সেনের ভাবতান্ত্রিক চিত্ত অতি সহজেই কাছে-দূরে, আকাশে-মাটিতে, জলে-স্থলে ছড়িয়ে পড়বার বাক্-মন্ত্র জানতো—আপন অনুভূতিকে সঞ্চারিত করতে পারতো পাঠকের মনের জগতে। তাঁর কবিস্বভাবে একটা বিস্তারপ্রবণতা ও আবেগের গতিবেগ ছিলো বলেই যেমন অন্যত্র, তেমনি এখানে পাঠকচিত্ত কবির আনন্দের দান থেকে বঞ্চিত হয় নি। এবং সেই আনন্দই বর্তমান স্থলে রসস্ফূর্তির অন্তর্নিহিত স্থায়ী ভাব।

অন্যদিকে নবীন সেনের চিত্তভাব আবেগের দুর্দমনীয় গতিবেগে পাঠকের মধ্যে যে স্পন্দন জাগায়, তা সর্বত্রই তীব্র নয়। কবির কাব্যে যে ক্রমে ভাবাবেগের বিস্তার ঘটে, তা অনেক ক্ষেত্রেই দ্রুত, সন্দেহ নেই; তবু পাঠকের চিত্তে কখনও কখনও বিভাব-অনুভাবের অভিঘাত শান্তরসের উদ্রেক করে, কারণ সেখানে ভাবের লাটাই ছাড়তে ছাড়তেও তিনি সুকৌশলে নিয়ন্ত্রণ

করেন। এমনিতর উদাহরণ বিরল হলেও কাব্যত্রয়ীতে আছে। পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে যে সব বাক্‌-বাহনে তিনি আনন্দের ধ্বনি জলে-স্থলে আকাশে-বাতাসে পরিব্যাপ্ত করেছেন তাদের গতি মন্থর নয়, পাঠকও অবিলম্বেই সেই ধ্বনির বার্তা পেয়ে যায়—তবু সমগ্রভাবে বর্ণনার শান্ত মহিমাই এতে উদ্ভাসিত।

এই জাতীয় আরেকটি উদাহরণ—

হাসিছে প্রভাস; নিশি দ্বিতীয় প্রহর
মধ্য নীলাম্বরে পূর্ণচন্দ্র বসন্তের
করি সমুজ্জ্বল উর্ধ্বে আকাশ-মণ্ডল—
চারু চন্দ্রাতপ নীল অমৃতে রঞ্জিত,
নিম্নে মহাসিন্ধু নীলামৃতে তরঙ্গিত

* * *

শৈলজা আসিয়া ধীরে প্রতিমা প্রীতির,—
প্রেমাশ্রুতে ছল ছল নেত্র ইন্দীবর;
নীলামৃতে ছল ছল, গৈরিকে আবৃত,
শান্ত সুললিত দেহ;···
আসি চন্দ্রালোকে ধীরে প্রণমিল শৈল
নারায়ণ পদাম্বুজে। অর্পিয়া চরণে
কণ্ঠস্থিত উপহার, রাখিয়া হৃদয়ে
দেব-পদ-কোকনদ, ভক্তির ত্রিদিবে,
বসিল শৈলজা, যেন সন্ধ্যা নিরমলা
বসিল সুনীল শান্ত নীলাম্বর পদে।

—প্রভাস।

এই শান্তরসাশ্রিত অনুচ্ছেদের পাশে দেখুন—

ওই আসে! ওই আসে! কি চক্র ভীষণ!
কি ঘূর্ণন! কি গর্জন অগ্নি উদ্গীরণ!
কোথা যাব! কোথা যাব! দেবতা বেদের
কোথা ইন্দ্র! কোথা রুদ্র! কোথা বরুণ!

অশ্বিনীযুগল কোথা !—অদ্ভুত ! অদ্ভুত !
অনন্ত—অনন্ত—নীলগর্ভ অনন্তের
ভ্রমিছে অনন্ত সূর্য, অনল-গোলক,
অন্তহীন, দুর্নিরীক্ষ্য ! কি চক্রে মহান্
সূর্যে সূর্যে মহাশূন্যে করিয়া বেষ্টন,
ভ্রমিতেছে নীলিমায় মহা অনন্তের,—
অশ্রান্ত, অভ্রান্ত ! কিবা অনন্ত ভ্রমণ
অন্তরীক্ষে, কি অনন্ত চক্রে সংখ্যাতীত,
কি শক্তিতে, কি নীতিতে, অচিন্ত্য কৌশলে।

—প্রভাস।

এখানে প্রথম দিকে প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র বাক্য যেন আবেগ-প্রমত্ততার বাঙ্ময় প্রকাশ, শব্দগুলিও যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের বিচ্ছুরণ। এইভাবে শব্দের অগ্নিপিণ্ডের বর্ষণ হতে হতে শেষ দিকে দীর্ঘতর বাক্যের লাভাস্রোত দেখা দিয়েছে। সমস্ত অনুচ্ছেদটির ভাবাবেগ শুধু দ্রুত গতিতেই পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয় না, সেখানে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে রসোদ্বেলতাও সৃষ্টি করে। সুতরাং প্রথম দুইটি অনুচ্ছেদের রসাস্বাদের সঙ্গে বর্তমান অনুচ্ছেদের রসাস্বাদের পার্থক্য আছে।

তবে একথা মূলতঃ স্বীকার করে নেওয়া যায় যে, বর্ণনার মহিমা শান্ত বা উদ্বেল যা-ই হোক না কেন, তাঁর বর্ণনার ভাষা ভাব-সঞ্চারণের বিশেষ উপযোগী, স্পন্দন সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। আর তাঁর শব্দ একেবারেই জড়তাগ্রস্ত নয়, আবেগের পাখায় তারা ভর করে চলে। আর শব্দ ও ভাষার চলৎশক্তি অনুযায়ী পাঠকেরও persuation ঘটে। তার চৈতন্যে সাড়া জাগে। এখানেই কাব্যত্রয়ীর অন্যতম কাব্যমূল্য।

দ্বিতীয়তঃ জটিল ও নীরস দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কবিত্বপূর্ণ প্রকাশেও নবীন সেনের কৃতিত্ব আছে। হেমচন্দ্র তত্ত্বকে কাব্যে রূপান্তর দিতে পারেন নি, কিন্তু কাব্যত্রয়ীর কবি পেরেছেন।

নিতান্ত বুদ্ধিগত বিষয়কে ব্যক্তিগত হৃদয়-রসে জারিত করতে পারলেই তা কম-বেশি কাব্যত্ব লাভ করে। তদুপরি, উপমাদি অলঙ্কার, চিত্রকল্প ইত্যাদির দ্বারা শোভনতা সম্পাদন করতে পারলে তো কথাই নেই। নবীন সেন মণ্ডনকলায় নিপুণ না হলেও দুরূহ তত্ত্বকে মস্তিষ্কের জগৎ থেকে হৃদয়ের জগতে নিয়ে এসে তার মধ্যে রসের সঞ্চার করেছেন, আপন আবেগের দ্বারা তাকে স্পন্দিত করে পাঠকের রসবোধের কাছে গ্রহণীয় করে তুলেছেন। কৃষ্ণের বৈরাগ্য-ধ্যানের ছবি দেখুন—

> পেয়েছি দর্শন কারু!—বহু অন্বেষণ পরে
> রজতের মহামূর্তি দূর সিন্ধুতীরে
> দেখিনু উপলাসনে, উপলে রাখিয়া পৃষ্ঠ,
> কি মহিমা মহাবক্ষে, সমুন্নত শিরে!
> অঙ্গ অবিচল, স্থির, নিমীলিত দুনয়ন,
> কিবা সুপ্ত সিংহ শোভা নিদ্রিত গৌরব!
> শৌর্যের ও সৌন্দর্যের মূরতি নীরব!
> ধবল গিরির শৃঙ্গে মহামেঘ-ছায়া মত
> পড়িয়াছে শোকচ্ছায়া বদনে গভীর,
> কপোলে গভীরাঙ্কিত শুষ্ক অশ্রুনীর।
> শৈল খণ্ড অন্তরালে লুকাইয়া দেখিতেছি
> এই দিবা অন্ধকারে সে রূপ মহান্,
> হইলেন নারায়ণ ধীরে অধিষ্ঠান।
> হিমাদ্রির পাদমূল বিলোড়িত ঝটিকায়,—
> সানুদেশে চিরশান্তি অবিচল স্থির;
> ভীষণ বিপ্লবে ঘোর নির্মূলিত যদুকুল;—
> যদুনাথ শান্ত, স্থির, মূরতি গম্ভীর,
> মহাশোকে নেত্রে নাহি বিন্দু অশ্রুনীর।
>
> —প্রভাস।

এখানে বৈরাগ্য-তত্ত্বের গম্ভীরতা নেই, আছে তারই সরস

রূপচিত্র। মনে হয়, কবি যেন এ-ছবির প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা, তাই বর্ণনার মধ্যে চাক্ষুষ দর্শনের বিস্ময় ও চমৎকারিত্ববোধ ফুটে উঠেছে।

সাঙ্কেতিকতা বা ব্যঞ্জনা সার্থক কাব্যের লক্ষণ। বিহারীলালের সময় থেকে বাঙলা গীতিকাব্যে এই ব্যঞ্জনাধর্ম বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে, সন্দেহ নেই। তবু নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ীতে গীতি-কাব্যসুলভ ব্যঞ্জনা বা সাঙ্কেতিকতা অনুপস্থিত নয়। উদাহরণ স্বরূপ প্রথম সর্গের ভাবী বিপদের আভাস উল্লেখযোগ্য প্রলয়ের যে অস্পষ্ট ও সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনা পুরাণে দেখা যায়, এখানে আছে তারই কবিত্বশোভন বর্ণনা। অন্যদিকে প্রকৃতি-বর্ণনায়—মানব-মনের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক স্থাপনে, প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি রূপায়ণে নবীন সেনের কৃতিত্ব স্মরণীয়, একটি ছোট্ট চিত্র তুলে ধরা যাক—

সরল তরল
তোর প্রাণ, শিশিরাক্ত কামিনী-কোমল
পড়ে ঝরে পরশনে ;

—প্রভাস।

এখানে সরল প্রাণের সঙ্গে কামিনী-কোমলের তুলনায় কবি সহৃদয় দৃষ্টির খবর পাই, কবির মমতাই এখানে মানুষের অন্তরকে প্রকৃতির অন্তরের সঙ্গে এক সূত্রে বেঁধে ফেলেছে। মানুষের মনের আলোকে প্রকৃতির নতুন দর্শনের আরেকটি ছবি—

দিবা-নিশি পশুপক্ষী, পালিত সারিকা,
ডাকিছে বিকৃত-কণ্ঠে, যেন বিভীষিকা
দেখিতেছ অনুক্ষণ ; বহে অনিবার
তপ্ত রুক্ষ বায়ু যেন করি হাহাকার।

—প্রভাস।

ভাবী বিপদ বা বিভীষিকার ভাবটি সুকৌশলে প্রকৃতির মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়ে কবি তার মধ্যে ব্যাপ্তি এনেছেন, এনেছেন গভীরতা। এতে নবীন সেনের কাব্য-কৌতুকের পরিচয় পাও

যাচ্ছে না কি? আর বাৎসল্য-রস ও ভক্তি-পরিপ্লুত হৃদয়াবেগ বর্ণনায়, প্রেমের আবেশ—তার মাদকতা ও বিদ্যুৎশক্তি প্রকাশে তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয় কাব্যত্রয়ীতে আছে। সুভদ্রা, জরৎকারু ও শৈলজা-প্রসঙ্গ তার উদাহরণ। কতকগুলি ভাবোচ্ছ্বাসময় নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণায় নবীন সেনের কৃতিত্বও স্মরণীয়। যেমন 'প্রভাসের' প্রথম সর্গের সত্যভামা ও রুক্মিণীর সঙ্গে কৃষ্ণের অচঞ্চল গাম্ভীর্যের নাটকীয়তা।

পরিশেষে কাব্যত্রয়ীর গঠন ও চরিত্রসৃষ্টিতে কতখানি কবি-কলা-কৌশলের পরিচয় আছে, তা-ই বিচার করা যাক। বঙ্কিমচন্দ্রও বোধ হয় এই দুটো দিক থেকেই 'proper execution' কামনা করেছিলেন। আখ্যায়িকার পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ বিচারের সময় স্বভাবতঃই তিনটি কাব্যের ঘটনা স্মরণ করতে হবে। 'রৈবতকে' দেখি, একটা বিরোধের আয়োজন—একদিকে কৃষ্ণবিরোধী অনার্য ও ব্রাহ্মণশক্তির নেতৃত্ব গ্রহণ করে দুর্বাসার সঙ্কল্প ঘোষণা—'যাদব কৌরবকুল হইবে বিনাশ', অন্যদিকে কৃষ্ণ-অর্জুন-ব্যাসের আলোচনা ও কৃষ্ণের অখণ্ড ধর্মরাজ্যগঠনের পরিকল্পনা—'এক ধর্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন।' এই বিরোধের বিষয় ছাড়া কাব্যটিতে আছে জরৎকারুর প্রতিহিংসা,—সুভদ্রা-অর্জুন-মিলন ও শৈলের নীরব প্রেমের পরিচয়। 'কুরুক্ষেত্রে' যুদ্ধের হেতু-নির্দেশ, ব্যাসের গীতা-রচনা, সুভদ্রা-অভিমন্যুর কৃষ্ণভক্তি ও নিষ্কাম ধর্মানুরাগ, আর্য-অনার্য অভেদতত্ত্ব ও প্রেমধর্মের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা, কৃষ্ণপ্রেমে সুভদ্রা ও শৈলের চরিতার্থতা, অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জুনের জ্ঞান-চক্ষু-উন্মীলন—'খুলিল নয়ন,—ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র বুঝিনু এখন।' অর্থাৎ অভিমন্যুর 'চিতাগ্নির দীপ্তশিখায়' মহাভারতের সংগঠন-ছবির আত্ম-প্রকাশ। 'প্রভাসে' নিষ্কাম ধর্ম-ভিত্তিক শান্তি-প্রতিষ্ঠা, কৃষ্ণলীলোৎ-সবে আর্য-অনার্যের মিলন, আত্মকলহে যাদবকুলের ধ্বংস, কৃষ্ণের লীলাসংবরণ ও শৈলের শ্রীক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পই প্রধান ঘটনা।

এই তিনটি কাব্যের পরিকল্পনা ও ঘটনা-সূত্রে তার রূপবন্ধন যে

শিথিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঘটনার ভিড়ে কাব্যত্রয়ীর সাংগঠনিক ত্রুটি দেখা দেয়নি, দেখা দিয়েছে ঘটনা ও ভাবরাশির সুচিন্তিত ও সুসংহত বিন্যাসের অভাবে। আপন লেখা সম্পর্কে কবি যদি আরেকটু নির্মম হতেন, তবে তাঁর কাব্যত্রয়ী অবান্তর-প্রসঙ্গ-বর্জিত হতে পারতো। কৃষ্ণের বাল্যস্মৃতি বা জরৎকারুর পূর্বস্মৃতির বর্ণনা না থাকলেই বা ক্ষতি ছিলো কি? শৈল-অর্জুন, জরৎকারু-কৃষ্ণ ইত্যাদির প্রেমোপাখ্যান আরও সংক্ষিপ্ত অথচ আকর্ষণীয় করা সম্ভব ছিলো নাকি? কাব্যত্রয়ীর পরিকল্পনায় এই উপকাহিনীগুলি মোটেই অবান্তর নয়, অবান্তর তাদের দীর্ঘতা ও পুনরাবৃত্তি। আসল কথা, নবীন সেনের প্রতিভা-ধর্মেই কাব্যের অঙ্গ-শৈথিল্য ও গ্রন্থি-দুর্বলতা ঘটবার মতো বীজাণু ছিলো, প্রবল গীতোচ্ছ্বাসে তাঁর কাব্যের রূপবন্ধ অটুট থাকতে পারতো না। তাই ঘটনার সঙ্গত বিন্যাসে কাহিনীর ঋজু অথচ দৃঢ়, সহজ অথচ সাবলীল বিকাশ ঘটাবার কৃতিত্ব তিনি দেখাতে পারেন নি। আখ্যায়িকা-কাব্যের পক্ষে এটা অনুপক্ষেণীয় ত্রুটি।

তবে আখ্যায়িকা-কাব্য নয়, বর্ণনাত্মক কাব্য হিসেবে দেখলে কাব্যত্রয়ীর সাংগঠনিক ত্রুটি তেমন দুঃসহ বলে মনে হয় না। তার কাব্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে যে অজস্র খণ্ডচিত্র পাই, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাব-মাহাত্ম্য ও কাব্য-সৌন্দর্যের দিক থেকে তাদের মন্দ লাগে না। আমার মনে হয়, সমগ্রভাবে কাব্যিক রূপায়ণের দিক থেকে নয়, খণ্ড-বর্ণনার চমৎকারিত্বের দিক থেকেই নবীন সেনের প্রতিভার মূল্যায়ন হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ একজন বিদগ্ধ সমালোচকের মতো আমিও মনে করি, পরিকল্পনার ত্রুটি ও গঠন-পারিপাট্যের অভাব কাব্য-বিচারের একমাত্র নিয়মক নীতি নয় এবং নাটকসুলভ ঘটনাবিন্যাস-নৈপুণ্যও আখ্যায়িকাজাতীয় কাব্যে সুলভ হতে পারে না। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, নবীন সেনের কাছে যে সঙ্গত গঠন বঙ্কিম প্রত্যাশা করেছিলেন, কাব্যত্রয়ীতে সেই প্রত্যাশিত শিল্প-সৌষ্ঠব নেই।

ঘটনাপ্রধান আখ্যায়িকা-কাব্য নয় বলে কাব্যত্রয়ীর চরিত্রগুলি বিচিত্র ঘটনার ঘাতে-প্রতিঘাতে বিকশিত হয়নি। জীবনের পথে চলতে চলতে অভিজ্ঞতার সহস্র সঞ্চয়ে মানুষের জীবন-পাত্র পূর্ণ হয়ে ওঠে, বিরোধে-বিপ্লবে প্রাণস্ফূর্তি ঘটে। এবং তখনই চরিত্রকে জীবন্ত বলে মনে হয়। উপাখ্যানের ঘটনা ও কাহিনীই মুখ্যতঃ চরিত্রসৃষ্টি করে, স্থানবিশেষে মাত্র চরিত্র কাহিনীকে প্রভাবিত করে। কিন্তু কাব্যত্রয়ীতে ঘটনাধারা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে, কার্য-কারণ-সূত্রে কাহিনীর অগ্রগমন সম্ভব করে তোলেনি : তাই ঘটনার সধারায় সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলির প্রাণপুষ্টি ঘটেনি, তাদের মধ্যে জীবন্ত মানুষের স্বরূপ ব্যক্ত হয়নি। মনে হয়, কবি আগে থেকে বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রতিমূর্তি হিসেবে কতকগুলি চরিত্রের কঙ্কাল কল্পনা করে রেখেছিলেন,--কাব্যে সেই চরিত্রগুলির মুখে কথা জুড়ে দিয়ে এবং তাদের একটা কাহিনীর ছকে ফেলে 'মানুষ' করে তোলবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কার্যতঃ তারা সেই জীবন পায়নি, যে জীবন বস্তু নয়, আত্মশক্তি দিয়ে গড়বার জিনিষ। তাই কাব্যত্রয়ীর চরিত্রগুলি আইডিয়ার প্রতিমূর্তি মাত্র, জীবন্ত মানুষ নয়। দ্বিতীয়তঃ বিশেষ বিশেষ গঠনের জন্য গাছের পাতাগুলি যেমন একরকম হয় না, তেমনি বিশেষ বিশেষ আন্তর বৈশিষ্ট্যের জন্য সংসারের মানুষ-গুলিও স্বতন্ত্র হয়। নবীন সেনের কাব্য-সংসারের মানুষগুলির মধ্যে সেই অপরিহার্য ব্যক্তিত্বমূলক স্বাতন্ত্র্য নেই, তাদের সব সময় আলাদা করে স্পষ্টভাবে চেনা যায় না। আর মুখের কথা তো অন্তরের বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র, তাই দু'একটি মুখের কথায় অনেক মানুষকে চেনা যায়। কিন্তু 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসে' মানুষগুলি বড় বেশি কথা কয়েছে, প্রায় বাক্-সর্বস্ব জীব হয়ে উঠেছে। অনেক কথার আঁচড় কেটেছে বলেই তারা যে ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, এমন নয়। বরং তাদের কথার উত্তাপে প্রাণের উত্তাপ চাপা পড়ে গেছে বলে মনে হয়। তবে 'পলাশির যুদ্ধের' চরিত্রগুলি সম্বন্ধে যে কথা বলেছি তা এখানেও স্মরণ করা যেতে পারে।

নবীনচন্দ্রের আসল সাধনা ভাবসাধনা, আইডিয়ার প্রতীক নির্মাণ; তাই তাঁর চরিত্রগুলি 'জীবন' লাভের সুযোগ পায়নি, ভাবের ছায়া-মূর্তি হয়ে উঠেছে মাত্র।

ছন্দ-অলঙ্কারে কাব্যত্রয়ীর মহিমা বিশেষভাবে আলোচনার বিষয় নয়। অমিত্রাক্ষর তাঁর ছন্দ নয়, সুতরাং সেদিক থেকে তাঁকে বিচার করবার প্রশ্ন ওঠে না। তবে যে ছন্দে, যে ভাষায়, যে জাতীয় অলঙ্করণে তিনি তাঁর কাব্যকে বিভূষিত করেছেন, তা কিছু কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও বর্ণনাত্মক কাব্যের পক্ষে ঠিক অনুপযুক্ত হয়নি।

অন্যান্য গৌণকাব্যের আলোচনা নবীন সেনের নতুন কো শক্তি উদ্ঘাটন করবে না। তাঁর গদ্যরচনা বিশেষত্ববর্জিত। কিছু খণ্ডকবিতার, 'পলাশির যুদ্ধ' ও 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র প্রভাসে' কবি হিসেবে তাঁর ঐতিহাসিক তাৎপর্য স্মরণীয়—যে তাৎপর্য অনুস্যূত হয়ে আছে উনিশ শতকী নবজাগ্রত চৈতন্যের প্রকাশোন্মুখ চিত্তের আলোর উৎকণ্ঠা আর বুদ্ধিমুক্তির আকুল পিপাসা।

৫ | বিহারীলাল

বিহারীলাল বাঙলা গীতিকবিতার ভোরের পাখি। কিন্তু এই বিজনবাসী কবির আপন মনের নিভৃত গান সকলের কানে গিয়ে পৌঁছায় নি, শুধু মুষ্টিমেয় অনুরাগীর হৃদয়ের মধ্যে অপূর্ব মূর্ছনায় বেজে উঠেছিলো। রবীন্দ্রনাথ, কিশোর কবি, তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি সেই প্রথম বাঙলা কবিতায় কবির নিজের কথা শুনলেন এবং বিহারীলালকে গুরুরূপে বরণ করে নিলেন। যেহেতু অতঃপর বাঙলা কবিতায় আত্মগত ভাবধারার একাধিপত্য দেখা দিলো এবং গীতিকবি রবীন্দ্রনাথই হলেন কবিসম্রাট, সেই হেতু গুরু বিহারীলালের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য হয়ে উঠলো। বিহারীলালকে নব্য কাব্যধারার মূল উৎস রূপে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠিত করার গৌরব রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য। আজ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলে মনে হয়, সমকালীন পাঠক ও কবিসমাজে যিনি ছিলেন অপরিচিত, তিনি আমাদের কাছে প্রাপ্যের অধিক পেয়েছেন। তিনি উপেক্ষিত নন, পরমসমাদৃত।

অথচ সমকালীন কবির কাছে বিহারীলাল ছিলেন অনুল্লেখ-যোগ্য। 'আমার জীবনে' নবীন সেনের কাছে শুনেছি—'অবকাশ-রঞ্জিনী সম্বন্ধে দুটি কথা বোধ হয় আমি বলিতে পারি। প্রথমতঃ আমি এডুকেশন গেজেটে লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়ে খণ্ড কবিতা বঙ্গভাষায় ছিল না। মধুসূদনের বীরাঙ্গনা ও ব্রজাঙ্গনায় খণ্ড কবিতা থাকিলেও তাহারা এক বিষয়ে। চতুর্দশপদী কবিতাবলী, স্মরণ হয়, আমার এডুকেশনে লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে প্রকাশিত হয়। তাহাও সমস্ত এক ছন্দে।

এ সম্বন্ধে একমাত্র পথ-প্রদর্শক প্রভাকর। তবে প্রভাকরে কাব্যাকারে প্রকাশিত হয় নাই। হেমবাবু, স্মরণ হয়, তখনও খণ্ড কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। আমি প্রভাকরের অনুকরণে শৈশব হইতে এরূপ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, অবকাশরঞ্জিনী বোধহয় বঙ্গভাষায় এরূপ ভাবের প্রথম খণ্ড কাব্য।' অনেক কথা এখানে আছে, কিন্তু বিহারীলালের কথা নেই। অথচ 'অবকাশরঞ্জিনীর' প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৮৭১ সাল আর বিহারীলালের 'বন্ধুবিয়োগ', 'প্রেম প্রবাহিণী', 'বঙ্গ-সুন্দরী' ও 'নিসর্গ-সন্দর্শন'-এর প্রকাশকাল ১৮৭০ সাল। তারও পূর্বে ১৮৬২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'সঙ্গীত-শতক'। এডুকেশনে নবীন সেন খণ্ডকবিতা লিখতে আরম্ভ করেন ১৮৬৬-৬৮ সালে, বিহারীলাল 'নিসর্গ-সন্দর্শন' রচনা করেন ১৮৬৭ সালের শেষভাগে। বয়োজ্যেষ্ঠ কবি সম্বন্ধে এই নীরবতার কারণ কি শুধুই ঈর্ষা? এবং সেই ঈর্ষা একমাত্র বিহারীলাল সম্বন্ধে?

আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিহারীলালের কাব্যসৃষ্টির যে মহিমা, নবীন সেনদের দৃষ্টিতে সে-মহিমা ছিলো না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তো স্বীকার করেছেন, বিহারীলালের শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা ছিলো অল্প। তাই সমকালীন সাক্ষ্যে বিজনবাসী কবি যদি উপেক্ষিত হয়ে থাকেন, তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথ যে বিহারীলালের কাব্যেই প্রথম কবির নিজের সুর শুনতে পেয়েছেন, তা ইতিহাসের ক্ষেত্রে পুরো সত্য নয়। বাঙলা খণ্ডকবিতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বিহারীলালের পূর্বে ও সমসাময়িক কালে অন্যান্য কবিরাও রোমান্টিক ও লিরিক প্রতিভার কিছু কিছু স্বাক্ষর রেখে গেছেন এবং তাঁদের কাব্যেও অল্পবিস্তর কবির নিজের কথা শোনা গিয়েছে। তবে বিহারীলালেই তার প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ, একথা স্বীকার করতেই হবে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের পদগীতিও এক রকমের গীতিকবিতা। তখনকার দিনে গীতি ও কবিতা পৃথক ছিলো না। যা গীতি তা-ই

কবিতা ছিলো। চর্যাপদে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ তার প্রমাণ। বৈষ্ণব পদাবলীও গান, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও রাগ-রাগিণীর নির্দেশ দেখতে পাই। মনে হয়, সংস্কৃত কাব্য নয়—লোকসঙ্গীত ও অপভ্রংশ কাব্য থেকেই এই সঙ্গীতাত্মক কবিতাদর্শ বাঙলা পদগীতিধারায় অনুসৃত। বৈষ্ণব পদাবলীর গীতাত্মকতা ষোড়শ শতকী পালাকীর্তন ও রসকীর্তনের সঙ্গীত-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ও উচ্চাঙ্গ হয়ে উনিশ শতকের নিধুবাবু পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ভারতচন্দ্রের গীতিতে, রামপ্রসাদের মাতৃগানে, শাক্তকবিদের উমাসঙ্গীতে সেই বহুকালাগত ঐতিহ্যবরণই দেখা যায়। কবিগানে সঙ্গীতমার্গ নিম্নগামী হলেও গীতি ও কবিতার বিচ্ছেদ ঘটেনি। ফলে প্রাগাধুনিক যুগের বাঙলা কবিতার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিলো গীতাত্মকতা।

কিন্তু এক দিক থেকে, আধুনিক গীতিকবিতার সঙ্গে তার পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। চর্যাপদে না হোক, বৈষ্ণব পদাবলীতে, শাক্তসঙ্গীতে, কবিগানে ও বাউলসঙ্গীতে কবিদের হৃদয়-সংবেদনা কম-বেশি ঝঙ্কৃত হয়েছে। ষোড়শ শতকের শেষ দিক থেকে সামাজিক ও ধার্মিক আদর্শের নিম্নগামিতার জন্য দেব-দেবী বা আরাধ্যের বেনামীতে অসংস্কৃত কবিদের অধঃপতিত মনোধর্ম, স্থূলরুচি ও বাসনা-কামনার প্রকাশও তাতে দেখা যায়, বিশেষভাবে রাধাকৃষ্ণগীতে। তবুও, কবিদের আন্তর উপাদান সত্ত্বেও, সেই প্রাগাধুনিক যুগের কাব্যসঙ্গীতে গোষ্ঠীসাধনার প্রভাব অবিসম্বাদিত সত্য। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবপ্রেরণা যে বৈষ্ণব সাধনার উৎসে নিহিত, একথা কে অস্বীকার করবে? বাউল সঙ্গীতে বা শাক্তগানে বাউলসাধনা বা শাক্তসাধনার অনুপ্রাণনাও বিতর্কের অতীত। সুতরাং সে-যুগের গীতিকবিতা এক এক সাধক-গোষ্ঠীর ভাবানুষঙ্গের জন্য ঠিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক গীতিকবিতায় পরিণত হতে পারে নি; এমন কি বাৎসল্য, প্রেম, ভক্তি ইত্যাদি ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিষয় হলেও ধর্মসাধনার পরিচ্ছেদ বা স্তর রূপে গৃহীত

হওয়ায় শেষ পর্যন্ত আর ব্যক্তিগত থাকেনি, গোষ্ঠীগত হয়ে পড়েছে। আর তাই সব সময় এক কবির ভাবলোকের সঙ্গে অন্য কবির ভাবলোকের সুস্পষ্ট পার্থক্য ধরা পড়ে না। কোন একটি বৈষ্ণব পদের বক্তব্য দেখে আমরা কি নিশ্চয় করে বলতে পারি, পদটি অমুক কবির রচনা, এ আর কারও হতে পারে না? সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আধুনিক বাঙলা কবিতায় গীতাত্মকতা ও আন্তর উপাদান থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি-চিহ্ন-সমুজ্জ্বল নয় বলেই তাকে আধুনিক গীতিকবিতার লক্ষণাক্রান্ত বলা যায় না।

নিধুবাবুও সঙ্গীত-রচয়িতা। তাঁর সঙ্গীতেও সুর ও কথা দুই-ই আছে। এবং সে-কারণেই পূর্বাদর্শের অনুবৃত্তি মাত্র। তাঁর গানেও পাই রাধাকৃষ্ণের কল্পলোক। তবু তাঁর গানে ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতা ও প্রেমরস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর ব্যক্তিজীবনের কোন এক শ্রীমতীর কথা। অতএব গোষ্ঠীভুক্ত ভাবসাধনার কবল থেকে গীতিগুলিকে মুক্ত করবার একটা প্রয়াস যে নিধুবাবুর রচনায় আছে, একথা স্বীকার করতেই হবে।

কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের ছোট কবিতা নানা দিক থেকেই আধুনিক-পূর্ব পদগীতি বা সঙ্গীতকথা থেকে পৃথক। তার আকার অবশ্য গীতিকবিতার উপযুক্ত (কয়েকটি দীর্ঘ কবিতা বাদ দিয়ে), যেমন পদগীতির আকারও ছিলো গীতিকবিতার পক্ষে শোভন-সঙ্গত। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের পদগীতি বা সঙ্গীতকথার সঙ্গে যে সুরের সহযোগ ছিলো, তা ঈশ্বর গুপ্তের খণ্ডকবিতায় অনুপ [illegible] সুত [illegible] বৈষ্ণব গান, শাক্ত গান, বাউল গান ইত্যাদির মতো ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা গান নয় এবং সে-কারণে জন্মগতভাবেই তাদের মধ্যে সুরের অঙ্গীকার নেই। অন্যদিকে ঈশ্বর গুপ্তের স্বচ্ছ চক্ষুষ্মানতা, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক যন্ত্রণাজাত ব্যঙ্গপ্রবণতা খাঁটি গীতিকবিতা সৃষ্টির অনুকূল ছিলো না। শুধু তাই নয়, যে জাতীয় হৃদয়রস ও অন্তরাবেগ গীতিকবিতার জন্ম দিতে পারে, গুপ্তকবি ছিলেন তা থেকে বঞ্চিত। নারীর প্রেম, মায়ের স্নেহ ইত্যাদি সুকুমার হৃদয়-

সম্পদ যিনি কখনও পান নি, তাঁর মধ্যে গীতিকবিতার উৎস না থাকাই স্বাভাবিক। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্ত খণ্ডকবিতা লিখেছেন বটে, কিন্তু তিনি ঠিক লিরিক লিখতে পারেন নি। তাঁর কবিতা হৃদ্‌পদ্মসম্ভব নয়, বস্তুতান্ত্রিক ও বুদ্ধিপ্রধান।

তবে রঙ্গলাল থেকে বাঙলা খণ্ডকবিতার অন্তর ও বাইরের পরিবর্তন আসতে থাকে। অন্যত্র বলেছি, উনিশ শতকী রেনেসাস আমাদের সামাজিক ও পরবশ সত্তাকে ভেঙেচুরে গড়তে থাকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা, আমাদের চৈতন্যে জাগাতে শুরু করে আলোর উৎকণ্ঠা, আনতে চেষ্টা করে আমাদের বুদ্ধির মুক্তি আর চিত্তের জাগরণ। যেন একটা নতুন মানুষের জন্ম দেওয়ার চেষ্টা, একটা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের আয়োজন। বিশেষ করে তখনকার ইংরেজী-শিক্ষিত মানুষের নতুন-পাওয়া ব্যক্তিতন্ত্র ও নবজাগ্রত রসপিপাসা স্মরণ রাখবার মতো। ইংরেজ কবি পোপ, গোল্ড-স্মিথ, কুপার, গ্রে ইত্যাদির খণ্ডকবিতায় যে রূপারোপ ও ভাবাদর্শ, তারই আদলে নতুন খণ্ডকবিতা সৃষ্টির প্রেরণা অনুভব করেন সেদিনের ইংরেজী-শিক্ষিত কবিরা। রঙ্গলাল থেকে তাঁদের আবির্ভাব। ওড্‌-জাতীয় কবিতা রচনাই তাঁদের লক্ষ্য—ভাব, রূপ, ধ্বনি, স্তবক ইত্যাদি সব দিক থেকেই। তবে সেই ওড্‌-জাতীয় কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তীয় প্রভাব বা দেশজ ছাপও বর্তমান ছিলো। এইভাবে একটা লরিক্যাল ও রোমান্টিক আবহাওয়া বাঙলা ছোট কবিতায় ঘনিয়ে আসতে থাকে। এমন কি প্রেম বা দেশানুরাগ-মূলক আখ্যায়িকা-কাব্যেও গীতাত্মকতা ও রোমান্টিকতার অনুপ্রবেশ দেখা যায়। রঙ্গলালের রোমান্স-কাব্যে, মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' ও 'বীরাঙ্গনায়', হেমচন্দ্রের 'বীরবাহুতে', নবীন সেনের 'পলাশির যুদ্ধ' ও 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসে' তার প্রমাণ পাই। আর কিছু খণ্ডকবিতায় রঙ্গলাল, 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'চতুর্দশপদীতে' মধুসূদন ক্রমশঃ বাঙলা লিরিকের জন্ম-সম্ভাবনাই বাড়িয়ে দিয়ে যান; অন্তরের সুরধর্মে, ব্যক্তি-অনুভবের আলোয় তাদের দিয়ে যান নতুন চারিত্র।

হেমচন্দ্রের 'প্রমদা'-কেন্দ্রিক অন্তরাবেগ, নবীনচন্দ্রের 'বিদ্যুৎ'-ঘটিত প্রথম প্রেমের উন্মাদনা খণ্ডকবিতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিভিত্তিকতা ও লিরিক-প্রবণতার মূল উপাদন ; অন্ততঃ তাঁদের কিছু কিছু কবিতা এই নিছক ব্যক্তি-হৃদয়-ভাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর কাব্যরূপেও ইংরেজী স্তবকাদর্শের অনুসরণের চিহ্ন আছে।

সুতরাং বিহারীলালেই আধুনিক লিরিকের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে না। লিরিকের কিছু কিছু রূপসাধনা ও ভাবসাধনা অনেকদিন থেকেই চলে আসছিলো। যেমন সূর্যের আলোর উত্তাপে একটু একটু করে পর্বতশীর্ষে তুষার গলতে থাকে, তেমনি উনিশ শতকের রেনেসাঁসের উত্তাপে বাঙালীর চিত্ত-জড় গলতে শুরু করে। কিন্তু প্রথমাবস্থায় যে হিমজলধারা গিরিশীর্ষ থেকে নেমে আসে তাতে যেমন অর্ধগলিত তুষারখণ্ডও পাওয়া যায়, তেমনি রেনেসাঁসী যুগের বাঙালীর বিগলিত চিত্তধারার সঙ্গে পাওয়া গেছে কিছু কিছু জড়বস্তু। ফলে, অর্থাৎ পরিপূর্ণ চিত্তস্ফূর্তিতে যে জাতীয় লিরিকের জন্ম হয়, রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেম-নবীনের পক্ষে তা রচনা করা সম্ভব হয়নি; চিত্রের জড়তা, ভাবের স্থবিরতা ও অনুভূতির অসাড়তা তখনও অল্পবিস্তর বর্তমান থাকায় তাঁদের খণ্ডকবিতা পুরোপুরি লিরিক হতে পারেনি।

অন্যদিকে বিহারীলালের কবিতায় গীতধর্মিতা, অন্তরাবেগ ও ব্যক্তি-সংবেদনার অভাব নেই। তাঁর প্রথম কাব্য-গ্রন্থের নাম 'সঙ্গীত-শতক' এবং তাতে নিধুবাবু আর দাশুরায়ের সাঙ্গীতিকতার প্রভাব আছে। ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের খণ্ড-কবিতায় যে গীতরূপের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেনি, তা-ই বিহারীলাল গ্রহণ করলেন তাঁর কাব্য-সাধনায়। বস্তুনিরপেক্ষ ভাবতন্ময়তা ও চিত্তগত আনন্দময়তাই তাঁর কাব্যসঙ্গীতের মর্মকথা। গীত ও কবিতার এই সহাবস্থান (co-existence) শুধু 'সঙ্গীত-শতকেই' নয়, 'সারদা-মঙ্গলেও' দেখা যায়। তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি, মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ ও সরস্বতীবিরহে উন্মত্ত হয়ে তিনি 'সারদা-

মঙ্গল-সঙ্গীত' রচনা করেন। প্রথম সর্গের প্রথম কবিতা থেকে চতুর্থ কবিতা পর্যন্ত বাগেশ্রী রাগিণীতে বারে বারে গাইতেও দ্বিধা করেন নি। এ-থেকেই বিহারীলালের কবিতার গীতধর্মিতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। শুধু সুরারোপেই তাঁর কবিতা গানে পরিণত হয়নি, তাঁর কবিতার সঙ্গীতানুরূপ্য ছিলো বলেই সুর তাতে সহজে পাখা মেলতে পেরেছে। দ্বিতীয়তঃ বিহারীলালের কবিতায় অন্তরাবেগ বর্ণীমূর্তি ধারণ করেনি কি? 'বন্ধুবিয়োগে' পূর্ণচন্দ্র, কৈলাস, বিজয় ও সরলাদেবীকে কেন্দ্র করে তাঁর অন্তর-বার্তা প্রতিধ্বনিত। তাতে স্মৃতি-চারণা তুচ্ছ, কবির চিত্তদাহের উত্তাপই মুখ্য। 'প্রেম-প্রবাহিণীর' অনুরাগের উচ্ছ্বাস আরও স্পন্দিত—'কিছুতেই যখন তোমারে না পেলাম। একেবারে আমি যেন কি হয়ে গেলাম॥' এই 'কি হয়ে যাওয়ার' বেদনাভর শ্রুতির মধ্যে আমরা পাই বিহারীলালের অন্তরের স্পর্শ। কিংবা স্মরণ করা যায় 'বঙ্গ-সুন্দরীর' সেই স্মরণীয় পঙ্‌ক্তিগুলি, যার মধ্যে 'হুহু করা মনের' 'কি জ্বলন্ত জ্বালাই' না প্রকাশের পথ খুঁজেছে! এই-ভাবে বিহারীলালের কবিতায় ব্যক্তি-সংবেদনা ও অন্তরাবেগ লিরিক-আবহাওয়া ঘনিয়ে এনেছে। ঈশ্বর গুপ্তের মন একেবারেই বহিরাশ্রয়ী; রঙ্গলালের দৃষ্টি বিরল মুহূর্তেই শুধু অন্তরের দিকে প্রসারিত; হেমচন্দ্রের চোখে বেশির ভাগই ধরা পড়েছে বস্তুজগৎ—কেবল কখনও কখনও সেই বহির্মুখী দৃষ্টি হয়েছে অন্তর্মুখী; নবীন সেনের মনের অভিসার কখনও বাইরের দিকে, কখনও ভেতরের দিকে—প্রায় সমান সমান; কিন্তু বিহারীলালের কবিমনের ধারে কাছে বস্তুজগৎ ছিলো না, আপন মনের নিভৃতে ভাবলোক রচনা করে তিনি তাতেই আবিষ্ট হয়ে থাকতেন। উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ তা-ই বিহারীলালের কবিতায় প্রথম শুনতে পেয়েছেন কবির নিজের কথা। আসল কথা, নিধুবাবু থেকে নবীন সেন পর্যন্ত মানুষের মনের মুক্তি ও ব্যক্তিচেতনা যেমনভাবে যতটুকু এসেছে, তার সঙ্গে মোটামুটি তাল রেখেই বাঙলা খণ্ড

কবিতা একটু একটু করে লিরিকের প্রাণস্পর্শ খুঁজেছে। কারণ *ব্যক্তিমনের মুক্তির শর্তেই লিরিকের জন্ম। অন্য দিকে* ব্যক্তি-স্বভাব-অনুযায়ী ও হৃদয়-প্রাধান্য বশতঃ বিহারীলাল প্রথম বুক ভরে মুক্তির নিশ্বাস নিতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর কবিতায় লিরিকের স্বাদ ছাড়া আর কোন স্বাদ নেই।

ঐতিহাসিক নিরিখে বিহারীলালের সৃষ্টির তাৎপর্য অনেক, কিন্তু বিশুদ্ধ কাব্যাদর্শের দিক থেকে তাঁর সৃষ্টির তাৎপর্য অনেক নয়। তাঁর কবিতায় আত্মগত ভাবধারার প্রথম পূর্ণ প্রকাশ হয়েছে, সন্দেহ নেই ; তবু সেই পূর্ণ প্রকাশ শিল্প-সুষমায় সার্থকতা লাভ করেনি। তাঁর মধ্যে ভাবতন্ময়তা যতখানি ছিলো, যতখানি কবিত্ব ছিলো, ততখানি শিল্প-নৈপুণ্য ছিলো না। তিনি মন্ময়তার কবি মাত্র, তার রূপদক্ষ শিল্পী নন। তাই ইতিহাস তাঁকে সাদরে স্বীকার করে নিলেও আর্টের ভক্ত তাঁকে নির্বিচারে ছাড়পত্র দেবে না। এই শিল্পরূপের কথা পরে আলোচনা করছি—তার আগে বুঝে নিই কবিমনটিকে, তাঁর প্রতিভার স্বরূপটিকে।

কবির অন্যতম অনুরাগী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, বিহারী-লাল সর্বদাই কবিত্বে মসগুল থাকতেন, তাঁর হাড়ে হাড়ে প্রাণে প্রাণে ছড়িয়ে ছিলো কবিত্ব। অর্থাৎ তিনি ছিলেন জাতকবি, কবিত্ব ছিলো রক্তমাংসের মতোই তাঁর সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথও গুরু-পূজায় একই মত প্রকাশ করেছেন—'তাঁহার মনের চারিদিক ঘেরিয়া কবিত্বের একটি রশ্মিমণ্ডল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত,—তাঁহার যেন কবিতাময় একটি সূক্ষ্ম শরীর ছিল—তাহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ। তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল।' এই কবিত্ব বলতে কি বোঝায়, এ-প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠতে পারে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটা সহজ ও সুন্দর সংবেদনশীলতা, শুধু জ্ঞানে নয়—হৃদয়ের অনুভূতির মধ্যে বহির্বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্যকে পাওয়াই তো কবির লক্ষ্য। সে-পাওয়ার ইতি-হাসও দ্বিবিধ—কখনও বাহির এসে ভেতরের কাছে ধরা দেয়,

কখনও বা ভেতর বাহিরের সঙ্গে নিজেকে দেয় মিলিয়ে। এই যে অন্তর-বাহিরে মেলামলির সত্য, তা-ই যখন স্রষ্টার মনের সোহাগ-স্পর্শে সাকার হয়ে ওঠে, তখনই আমরা কবিত্ব বলি। বিহারী-লালের কবিত্ববোধ সহজাত ছিলো বলেই তিনি বলতে পেরেছেন—'কেবল হৃদয়ে দেখি।' সেই 'হৃদয়ে দেখার' কবিত্ব আছে নিচের উদ্ধৃতিতে—

যে সময় কুরঙ্গিণীগণ,
সবিস্ময়ে মেলিয়ে নয়ন,
আমার সে দশা দেখে
কাছে এসে চেয়ে থেকে
অশ্রুজল করিবে মোচন—
সে সময়ে আমি উঠে গিয়ে
তাহাদের গলা জড়াইয়ে
মৃত্যুকালে মিত্র এলে
লোকে যেম্নি চক্ষু মেলে
তেমনিতর থাকিব চাহিয়ে।

—বঙ্গ-সুন্দরী।

ঝরনায় স্নানরত কবির সঙ্গে কুরঙ্গিণীদের মিতালির এই ছবিতে যে কবিত্ব আছে, তা প্রকৃতিজগতের সঙ্গে মানবমনের সম্বন্ধ স্থাপনের সত্য থেকেই উৎসারিত। কবির হৃদয়ের দেখা এখানে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় কথা, বিহারীলালের অন্তঃশীল ও আত্মনিমগ্ন কবি-স্বভাব কখনোই বহির্জগতের বস্তুতান্ত্রিকতার শাসন মানেনি। ঈশ্বর গুপ্তে যে 'বহিরাশ্রয়ী মনের নির্বিচার বস্তুনির্ভরতা দেখেছি, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, এমন কি মধুসূদনেও যতটুকু তন্ময় (objective) দৃষ্টি-ভঙ্গি পেয়েছি, বিহারীলালে তার লেশ মাত্র নেই। তিনি সব সময়েই নিজের মধ্যে নিজে ডুবে থাকতেন, ভাবানুভূতির জোয়ার-ভাঁটা থেকে আহরণ করতেন কত শত রত্নকণা। কবির এই

আত্মনিমজ্জন দশায় বাইরের ডাক এসে পৌঁছোত না এমন নয়, তবু দেখে শুনে মনে হতো তিনি যেন যোগাসনে বসেছেন। তাই এক ভক্ত-পাঠিকা প্রশ্ন তুলেছিলেন—

হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু ত্রনয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাহারে ধেয়াও?

বিহারীলালের এই ধ্যানবিরত মূর্তিই তাঁর কবিতার মধ্যে ফুটে উঠেছে। কারণ যোগীর তপস্যা আর কবির ভাবতন্ময়তার মধ্যে তিনি কোন পার্থক্য দেখতে পাননি। একাগ্র মনে কোন কিছুকে পাওয়ার সাধনাকেই তো তপস্যা বলে এবং সেদিক থেকে দেখতে গেলে কবির সাধনাও এক রকমের তপস্যা। যে শক্তি সর্বভূতে আছেন, তাঁকে একের মূর্তিতে আপন যোগসাধনার মধ্যে লাভ করার সিদ্ধি তাপসের লক্ষ্য; সেই বিশ্বাত্মাকে বিচিত্র মূর্তিতে, অবিরাম স্ফূর্তিতে উপলব্ধি করার আনন্দ কবির লক্ষ্য। একজন পান প্রেমে, আরেকজন পান যোগে। তাই বিহারীলালের কাছ থেকে ভক্ত-পাঠিকার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে—

কবিরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে।
যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে।

—সাধের আসন।

কিন্তু পার্থক্যও আছে। কবির ধ্যানজগৎ থেকে বহির্বিশ্ব নির্বাসিত নয়, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তার সঙ্গে নিত্য চলে কবির সচল মনের ক্রিয়া। কবি যে 'নেশার নয়নে' দেখেন, তা পঞ্চেন্দ্রিয়েরই অন্যতম এবং সে-নেশাও জোগায় রূপ-রস-রঙের জগৎ। অন্যদিকে ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে তাপসরা যোগসাধনা করে থাকেন এবং সেই যোগ-সাধনায় কোন এক প্রত্যয়শক্তিকে নিয়ে দুশ্চর ব্রত চলে, বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কোন প্রয়োজন থাকে না। আর কবির সঙ্গে যোগীর এই পার্থক্য আছে বলেই বিহারীলাল কাব্যে তপস্যা করেও ইন্দ্রিয়বাদী (sensuous) কবি, আপন মনের নিভৃতলোকের

অধিবাসী হয়েও বিশ্বজগৎ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। আর বিচ্ছিন্ন থাকবেনই বা কি করে? বাইরের সঙ্গে অন্তরের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেলে কবিত্বের উৎস শুকিয়ে যায় না কি?

আগে বলেছি, কবিমনের সঙ্গে বিশ্বসৃষ্টির সরস ও সরাগ যোগাযোগেই কবিত্বের উৎস নিহিত এবং সেই যোগাযোগের পদ্ধতি দু'রকমের হতে পারে। বিহারীলালের কবিতায় অন্তর এসে মিলেছে বাইরের সঙ্গে, বিশ্বজগৎ এগিয়ে এসে হৃদয়জগতের সঙ্গে কোলাকুলি করেনি। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, বিহারীলালের মূল কবিস্বভাবে ছিলো ভাবতান্ত্রিকতা এবং সামান্য আলোড়নেই সেই স্বভাবজ ভাবপ্রবণতার উৎস-মুখ খুলে যেতো। প্রায়শঃই ভাবের প্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত আবেগে ছুটে গিয়ে বস্তু-জগতে আশ্রয় খুঁজতো এবং নামমাত্র বস্তু-আশ্রয়েও ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তো। সেজন্যই তাঁর অনেক কবিতায় সামান্য বিষয়কে অবলম্বন করে অসামান্য ভাবাবেগের প্রকাশ দেখতে পাই। যেমন—

সর্বদাই হু হু করে মন
বিশ্ব যেন মরুর মতন,
চারিদিকে ঝালাপালা
উঃ! কি জ্বলন্ত জ্বালা!
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।

—বঙ্গ-সুন্দরী।

এ কবির নিজের কথা, সন্দেহ নেই; কিন্তু তার চেয়ে বেশি করে ভাবসর্বস্বতার কথা। কবির মনের মধ্যে আগে দেখা দিয়েছে আগ্নেয় জ্বালা, সেই আগ্নেয় জ্বালাই পরে খুঁজে পেয়েছে মরুর সঙ্গে আপন সাদৃশ্য। তাই উদ্ধৃতাংশে বস্তু-সমাবেশ অকিঞ্চিৎকর, কবিমনের জ্বলন্ত জ্বালাই মুখ্য। কিংবা ধরা যাক আর একটি কাব্যাংশ—

প্রাতঃকালে মাঠের উপর,
শুদ্ধ বায়ু বহে ঝর্ ঝর্,

চারিদিক্ মনোরম,
আমোদে করিব শ্রম ;
সুস্থ স্ফূর্ত হবে কলেবর।
বাজাইয়ে বাঁশের বাঁশরী,
শাদা সোজা গ্রাম্য গান ধরি,
সরল চাষার সনে,
প্রমোদ প্রফুল্ল মনে
কাটাই আনন্দে শর্বরী।

—বঙ্গ-সুন্দরী।

এখানে শিশিরস্নিগ্ধ বাতাসের আল্‌পনা আছে, বাঁশি-বাজিয়ে গ্রাম্য চাষার সহজ সুখের ছবি আছে। কিন্তু সে-সব ছবি কি পাঠকের মনে দাগ কাটে? প্রকৃতির একটা চিত্র পরিস্ফুটনেই কি কবির কথার রঙ ফুরিয়ে যায়? না, এখানে সব ছবি ছাপিয়ে উঠেছে বিহারীলালের অন্তরের ছবি, তাঁর আনন্দের ছবি। আনন্দের ছবি না বলে আনন্দের ধ্বনি বলাই ভালো। প্রথম উদ্ধৃতির তুলনায় বর্তমান উদ্ধৃতিতে বস্তু-সমাবেশ বেশি ঘটেছে এবং তারই ফলে চিত্রধর্মিতাও বেড়েছে, স্বীকার করতেই হবে,—তবু কবির অন্তরের আনন্দের ধ্বনিটুকু সহজেই ধরা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতায় ভরা বর্ষার জল-টলমল মেঘমেদুর পরিবেশের চিত্র ভেসে উঠলেও যেমন দ্বীপবাসী জীবনের নিঃসঙ্গতার বেদনা-ধ্বনিই প্রধান, তেমনি এখানে আনন্দের ধ্বনিই আমাদের রসবোধকে অধিকতর আকর্ষণ করে, প্রাতঃকালীন ছবির রঙ নয়। বিহারীলালের কবিতা পাঠ করার সময় আমাদের বিশেষভাবে এ-কথাটি মনে রাখতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিহারীলালের কাব্যে তিনি একদা প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সঙ্গ পেয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণ সত্য। কারণ যে বালক নিঃসঙ্গভাবে ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডির মধ্যে অনেক-দিন কাটিয়েছে, বহির্জগতের সঙ্গে যার পরিচয়ের পথ ছিলো

জানালার ঝিলিমিলি মাত্র, তার কাছে বিহারীলালের বন্ধন-অসহিষ্ণু স্বেচ্ছাবিহারপ্রিয় কবিমনের ভাবব্যাকুলতা ও প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে অভিসার চির-আকর্ষণীয়। কবি বালক-বয়সে বনের যে পাখিটাকে চেয়েছিলেন, বিহারীলালের কাব্যে পেয়েছিলেন তারই সন্ধান। বিশ্বের ছবির প্রতি তাঁর লোভ ছিলো বলেই প্রকৃতির সঙ্গ পেয়ে তাঁর খুশির অন্ত ছিলো না। অন্য দিকে যে অন্তর্ভাবের প্রেরণায় গুরু নিভৃত মনের গান করেছেন তা রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাত ছিলো না বলেই তিনি বলতে দ্বিধা করেন নি—'যে ভাবের উদয়ে··· অপরিচিত বিশ্বের জন্য মন কেমন করিতে থাকে বিহারীলালের ছন্দেই সেই ভাবের প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম।' আমার মনে হয়, এই 'মন কেমন করিতে থাকাটাই' বিহারীলালের ক্ষেত্রে প্রধান, প্রকৃতির দৃশ্য 'অপরূপ সৌন্দর্যে হৃদয়ে সম্ভববং চিত্রিত' হওয়াটা গৌণ। যদিও বালক রবীন্দ্রনাথের বন্ধন-পীড়িত মনের কাছে সেই চিত্র ঠিক গৌণ ছিলো না।

বিহারীলালের কাব্য পুরোপুরি হৃদয়ভিত্তিক, বুদ্ধি বা চিন্তাশ্রয়ী নয়। এবং সেদিক থেকে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্যের সঙ্গে তার পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। হেমচন্দ্রের খণ্ডকবিতা, আমরা আগেই দেখেছি, কিছু কিছু লিরিক্যাল ও রোমান্টিক উপাদান সত্ত্বেও প্রধানতঃ চিন্তাভারাক্রান্ত—সে চিন্তা দেশপ্রেমই হোক বা নীতিশিক্ষাই হোক। এবং তারই জন্য 'কবিতাবলী' সামগ্রিকভাবে গীতিকবিতা হয়ে উঠতে পারে নি। নবীন সেনের ভাবাকুলতা ও উচ্ছ্বাসপ্রবণতা সত্ত্বেও তাঁর খণ্ডকবিতাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই তত্ত্বচিন্তা বা দেশানুরাগ, নীতিশিক্ষা বা ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র পুরোপুরি হৃদয়বাদী কবি ছিলেন না, অন্ততঃ কিছুটা পরিমাণে ছিলেন বুদ্ধিধর্মী ও চিন্তাবিলাসী কবি। ফলে হেম-নবীনের কাব্যসাধনা যেখানে আমাদের ভাবনা জাগায়, চেতনায় সাড়া আনে, বুদ্ধির জড়তা ঘুচিয়ে দেয়—সেখানে বিহারীলালের কাব্যকৃতি হৃদয়-রসের উদ্দীপন

ঘটায়, অহেতুক আনন্দচর্বণার সহায়ক হয়। তাঁর কবিতার এই হৃদয়ভিত্তিকতা ও রসসর্বস্বতার জন্য তিনি গীতিকবিতার জনক এবং রবীন্দ্রনাথের গুরুরূপে স্বীকৃত। কখনও কখনও তাঁর হৃদয়-ভাব তত্ত্ব-ভাবনার আকারে অভিব্যক্ত হয়েছে, সন্দেহ নেই—যেমন 'সারদা-মঙ্গলে'—তবু সেই ভাবতত্ত্বের নাড়ীর যোগ হৃদয়ের সঙ্গেই, মস্তিষ্কের সঙ্গে নয়। উদাহরণ দেওয়া যাক—

কেমনে বা তোমা বিনে
দীর্ঘ দীর্ঘ রাত্রি দিনে,
সুদীর্ঘ জীবন-জ্বালা সব অকাতরে,
কার আর মুখ চেয়ে
অবিশ্রাম যাব বেয়ে
ভাসায়ে তনুর তরী অকূল সাগরে!

—সারদা-মঙ্গল।

কবির অন্তঃসত্তায় কাব্যলক্ষ্মী বা আনন্দলক্ষ্মীর চিরদিনের আসন পাতা। তাঁর সস্নেহ দৃষ্টিপাতেই কবির সার্থকতা, বিরহে চরম হতাশা। এই সুন্দর ভাবটিকে কবি ইচ্ছে করলে বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্বে রূপান্তরিত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। নর-নারীর বিরহ-লীলার আদলে সমস্ত ভাবটিকে উপস্থাপিত করে তিনি তার রসঘন ও চিত্তাকর্ষক রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই বলছিলাম, বিহারীলাল খাঁটি হৃদয়বাদী কবি এবং তাঁর মতো গীতিকবির পক্ষে তা হওয়াই স্বাভাবিক।

তাছাড়া বিহারীলালের কবিতা এক নূতন কল্পজগৎ ও সৌন্দর্য-লোকের সন্ধান দেয়। মোহিতলাল বলেছেন, কবির মনে সৌন্দর্যা-দর্শের একটা স্বগত উপলব্ধি ছিলো; সেই সৌন্দর্যাদর্শকেই তিনি জগতের ওপর আরোপ করে একটা সুসঙ্গত মনোজগৎ সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ জগতের যেটুকু কবির মানসিক সৌন্দর্যাদর্শের অনুগত, সেটুকু তাঁর মনোবিচরণভূমি। কবি-মানসের এই প্রবৃত্তিই আধুনিক এবং বাঙলা কাব্যে এই আধুনিক ভঙ্গি সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট

দেখা দিয়েছে বিহারীলালের কবিতায়। মোহিতলালের এ-মত নিঃসংশয়ে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। কারণ বিহারীলাল যে জগতের অধিবাসী ছিলেন, যে সৌন্দর্যের দেশে তিনি মানস-পরিক্রমা করতেন, যে প্রকৃতির দ্বারোদ্ঘাটন করে গেছেন তা সমকালীন মানুষের হাতের কাছে থাকলেও চোখের কাছে ছিলো না। আসল কথা, আপন মনের মাধুরী মিশায়ে কিংবা নিজের চোখের রূপ-রস-রঙ সঞ্চারিত করে দিয়ে তিনি যে সৌন্দর্যলোক রচনা করেছিলেন, বিধাতার দেওয়া সাদা চোখ দিয়ে বা সাধারণ মন নিয়ে তার সাক্ষাৎ পাওয়া অন্যের পক্ষে কি সম্ভব ছিলো? বালক রবীন্দ্রনাথের চোখে-মনে একটু একটু করে রঙ লাগতে শুরু করায় তিনি বিহারীলালের কবিতা-পাঠে মুগ্ধ না পারেন নি—'…এই বর্ণনা পাঠ করিয়া বহির্জগতের জন্য একটি বালক-পাঠকের মন হু হু করিয়া উঠিত। ঝরনার ধারে জলসিকরসিক্ত স্নিগ্ধশ্যামল দীর্ঘকোমল ঘন ঘাসের মধ্যে দেহ নিমগ্ন করিয়া নিস্তব্ধভাবে জলকল-ধ্বনি শুনতে পাওয়া একটি পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় বলিয়া মনে হইত; এবং যদিও জ্ঞানে জানি যে কুরঙ্গিণীগণ কবির দুঃখে অশ্রু-পাত করিতে আসে না এবং সাধ্যমতে কবির আলিঙ্গনেও ধরা দিতে চাহে না, তথাপি এই নির্ঝরপার্শ্বে ঘনশষ্পতটে মানবের বাহু-পাশবদ্ধ মুগ্ধ কুরঙ্গিণীর দৃশ্য অপরূপ সৌন্দর্যে হৃদয়ে সম্ভববৎ চিত্রিত হইয়া উঠিত।' অসম্ভবকে সম্ভববৎ করে তোলার মায়ামাধুরী বিহারীলালের সৌন্দর্যপিয়াসী কবিমনের অমূল্য সম্পদ।

শুধু তা-ই নয়, সৌন্দর্যলক্ষ্মী বা আনন্দলক্ষী বা কাব্যলক্ষ্মীর যে মূর্তি তিনি রচনা করেছেন, তাঁর জন্য যে কল্পলোক সৃজন করেছেন, তা-ও আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত। ইংরেজী রোমান্টিক কাব্যে দেখতে পাই—কোথায়ও 'Spirit of Beauty'-কে একান্ত করে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত, কোথায়ও সত্য ও সৌন্দর্য পরস্পরের নামান্তরে পরিণত, কোথায়ও বা প্রকৃতিরাণীর মধ্যে একটা সজীব প্রাণসত্তা আবিষ্কার করে মানবমনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত। অর্থাৎ

সৌন্দর্যস্বপ্নকে বিশ্বব্যাপিনীর মধ্যে রূপায়িত করা বা তাকে একটা তত্ত্ব-সত্যের মধ্যে বিধৃত করার চেষ্টা আছে। বিহারীলালও কল্প-লোকের সৌন্দর্যধ্যানেই ক্ষান্ত হননি, আপন উজ্জীবিত চেতনায় সেই সৌন্দর্যের রূপপ্রতিমাও গড়ে তুলেছেন এবং ধ্যানকে সত্যে পরিণতি দিতেও দ্বিধা করেন নি। 'সারদা-মঙ্গল' ও 'সাধের আসনে' তার প্রমাণ আছে। 'বন্ধু-বিয়োগে' তিনি যে স্মৃতির ভাণ্ডার উন্মুক্ত করেছেন, 'প্রেম-প্রবাহিণীতে' যে প্রেমের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন, তাতে ভাব আছে—আবেগ আছে, কিন্তু হৃদয়ের অনুভূত সত্যের সুস্পষ্ট দ্যোতনা নেই। প্রেমের কাব্যটিতে লক্ষ্যহীন প্রেম ('হায়রে সাধের প্রেম, কত খেলা খেল, মানুষে কোথায় তুলে কোথা নিয়ে ফেল!') শেষ পর্যন্ত এক আনন্দ-উপলব্ধিতে ('মন যেন মজিতেছে অমৃত-সাগরে, দেহ যেন উড়িতেছে সমাবেগ ভরে') পরিণত হয়েছে বটে, তবু তার অস্ফুটতা অনস্বীকার্য। 'নিসর্গ-সন্দর্শনে' প্রকৃতির গহন গভীরে প্রবেশের আবেগ আছে, বিস্ময়-বিমুগ্ধতাও আছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু কবির সৌন্দর্যস্বপ্ন সীমাহীন ব্যাপ্তি ও অতলান্ত গভীরতায় তখনও অপরিহার্য ও সুস্পষ্ট প্রত্যয়ে পরিণত হয়নি। তবে 'বঙ্গ-সুন্দরীতে' দেখতে পাই কবি বর্তমান বাস্তব থেকে বিদায় নিয়ে অভিসার করেছেন সেই কল্পলোকে, যেখানে সৌন্দর্যের অমৃতফল ফলতে শুরু করেছে। তবে কবি-মানসের এই অভিসার-যাত্রার মধ্য দিয়ে কবির সৌন্দর্য-পিপাসা মুক্তি পেয়েছে, তাঁর জাগ্রত রসবোধ একটা বিগ্রহের মধ্যে সৌন্দর্য-সম্ভোগের সুযোগ খুঁজে বেড়িয়েছে। তারপর 'সারদা-মঙ্গলে' দেখা দিয়েছেন কবির কল্পলোকবাসিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মী সারদা। বহির্বিশ্বে যে তরুণী উষা সীমন্তে শুকতারা আর সর্বাঙ্গে গোলাপ-আভা নিয়ে দেখা দেন, তিনিই কবির হৃদয়ের ভূমিতে আরাধ্যা বীণাপাণি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কবি তাঁর সাধনার ধন পেয়ে গেলেন, তাঁর আর দুঃখ নেই। এই আনন্দলক্ষ্মীই জ্যোতির্ময়ী কাব্য-সরস্বতী রূপে বাল্মীকির ললাটভাগে একদিন

জাগ্রতা হয়েছিলেন। বাল্মীকির সেই সরস্বতী বিশ্বের সাধন-সুন্দরী হয়ে ব্রহ্মার মানসে অধিষ্ঠিতা। কবির মনে তাঁর রূপোপলব্ধি সহজে ঘটেনি—হতাশা আর দ্বন্দ্বের বহুস্তর পেরিয়ে হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর প্রশান্তির মধ্যে সেই বিশ্বের মূলীভূত সৌন্দর্যের বিগ্রহিণীব সঙ্গে কবির আনন্দ-সম্মিলন হয়েছে—

এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে !
হে প্রশান্ত গিরি-ভূমি,
জীবন জুড়ালে তুমি
জীবন্ত করিয়ে মম জীবনের ধনে !
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে !

—সারদা-মঙ্গল।

সুতরাং 'সারদা-মঙ্গল' পাঠে একথাই মনে হয় যে, কবিমনের সৌন্দর্যস্বপ্ন আনন্দের মূর্তি ধরে কবির ধ্যানলোকের শাশ্বত সত্য হয়ে উঠেছে। এই আনন্দমূর্তিই যে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্ররূপিণীর অগ্রজা, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। 'সাধের আসনে'ও কবির অ্যাবস্ট্রাক্ট্ আনন্দোপলব্ধিকে একটা তত্ত্ব-সত্যের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা আছে। সৌন্দর্যময়ী বিশ্বমোহিনীকে খণ্ড বিচিত্র সৌন্দর্যের আধারে প্রত্যক্ষ করার অভিলাষ থেকেই এ-কাব্যের জন্ম ; এর প্রাণমন্ত্র—'যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।'

এতো গেলো বিহারীলালের কাব্যভাবের কথা। কিন্তু গীতি-কবির কাব্যভাবের চেয়ে কাব্যরূপ কম আকর্ষণীয় নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—'বিহারীলালের ছন্দে মিলের এবং ভাষার দৈন্য নাই। তাহা প্রবহমান নির্ঝরের মতো সহজ সঙ্গীতে অবিশ্রাম ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে। ভাষা স্থানে স্থানে সাধুতা পরিত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ অশিষ্ট এবং কর্ণপীড়ক হইয়াছে, ছন্দ অকারণে আপন বাঁধ ভাঙিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু সে কবির স্বেচ্ছাকৃত, অক্ষমতাজনিত নহে। তাঁহার রচনা পড়িতে পড়িতে কোথায়ও

একথা মনে হয় না যে, এইখানে কবিকে দায়ে পড়িয়া মিল নষ্ট বা ছন্দ ভঙ্গ করিতে হইয়াছে।' বিহারীলালের ত্রুটি এখানে যথার্থ-ভাবে নির্দেশিত। এবং ভাবানুযায়ী ভাষা, ছন্দ ও মিল সৃজনে কবির যে অনায়াস কৃতিত্বের কথা বলা হয়েছে, তা-ও সম্পূর্ণভাবে স্বীকার্য। শুধু ভাবে নয়, রূপকর্মেও বিহারীলালের পদ্য গীতি-কবিতা হয়ে উঠেছে—অন্ততঃ 'বঙ্গ-সুন্দরী', 'সারদা-মঙ্গল' ও 'সাধের আসনে', কিছুটা বা 'নিসর্গ-সন্দর্শনে'। তবে তিনি, মেনে নেওয়া উচিত, যত বড়ো কবি ছিলেন তত বড়ো শিল্পী ছিলেন না। কালিদাস রায়ের ভাষায়—'কবি হিসাবে তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন পাঠক হিসাবে তাহা পরখ করিয়া দেখেন নাই।...শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতার মূলে থাকে ভাববিহ্বলতা, গাঢ় অনুভূতি, গভীর প্রেম ও সৌন্দর্যমুগ্ধতা। এইগুলিকে বাক্যে সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ যিনি দিতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ গীতিকবি। বিহারীলাল সর্বাঙ্গসুন্দর সুপরিচ্ছন্ন রূপ দিতে পারেন নাই। তাহার কারণ তাঁহার বিহ্বলতায়, অনু-ভূতিতে ও মুগ্ধতায় শিল্পিজনোচিত সংযম-শৃঙ্খলা ছিল না।' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ-নির্দেশিত ত্রুটিগুলির জন্যই, কালিদাস রায়ের মতানু-সারে, বিহারীলালের গীতিকবিতা আঙ্গিক-সৌষ্ঠব ও কলাসৌন্দর্যে চরম সার্থকতা লাভ করতে পারে নি। অবশ্য তার জন্য রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙলা গীতিকবিতাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। তবু ইতি-হাসের খাতিরে স্বীকার করতে হবে—যে বিহারীলালের স্কুলে রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার হাতে-খড়ি হয়, যাঁর কাব্য থেকে রবীন্দ্র-নাথ শিখেছিলেন ভাষা ও ছন্দের সৌন্দর্যকে কবিতার প্রধান অঙ্গ রূপে গ্রহণ করতে, তিনি কবিচক্রবর্তী। বিহারীলাল শুধু কবি নন, তিনি কবির কবি।

বিহারীলালের কাব্যকৃতির আলোচনা শেষ করার আগে তাঁর জীবনের ইতিহাসে একটু দৃষ্টিপাত করা যাক। পিতা দীননাথ চক্রবর্তীর আদরের সন্তান রূপে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কবির জন্ম হয়। দীননাথের বৃত্তি ছিলো যাজ্যক্রিয়া, তাই আর্থিক সচ্ছলতার মধ্যে

বিহারীলালের বাল্যজীবন কেটেছে এমন কথা বলা যায় না। চার বছর বয়সে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। ফলে পিতার আদর ও স্নেহই ছিলো তাঁর জীবনারম্ভের প্রধান পাথেয়। ছেলেবেলায় বিহারী-লাল ছিলেন দুরন্ত প্রকৃতির, স্কুল কলেজের নিয়মমাফিক বাঁধাধরা শিক্ষাপদ্ধতি তাঁর মনোহরণ করতে পারেনি। তবু কিছুদিন তিনি যাতায়াত করেছেন জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউসানে, সংস্কৃত কলেজে মুগ্ধবোধের পাঠ নিয়েছেন বছর তিনেক। কেউ কেউ বলেছেন, শৈশবে নাকি তাঁর চরিত্র-স্খলন হয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তাঁকে একজন নির্মল ও নিষ্কলঙ্ক মানুষ হিসেবেই দেখা গেছে। সে যা-ই হোক, স্কুল-কলেজে আনুষ্ঠানিকভাবে তেমন পড়াশুনো না করলেও গৃহে তিনি বাঙলা ভাষা ভালোভাবেই শিখেছিলেন। আর শিখেছিলেন কিছু কিছু ইংরেজী। বায়রণের 'চাইল্ড হ্যারোল্ড', সেক্সপীয়ারের 'ওথেলো', 'ম্যাকবেথ' ও 'কিং-লিয়ার' তাঁর পড়া ছিলো। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর জ্ঞান ছিলো অপেক্ষাকৃত গভীর—রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, মুদ্রারাক্ষস, উত্তরচরিত ইত্যাদির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। এই পরিচয়ের প্রভাব তাঁর কাব্যের মধ্যেও দেখা যায়। দীর্ঘাকৃতি ও অকুতোভয় এই মানুষটির সঙ্গীতের প্রতি দুর্বলতা বাল্যাবধি। তিনি অল্প বয়স থেকে যাত্রা দেখেছেন, পাঁচালী ও কবির গান শুনেছেন। কিন্তু শুধু মাত্র শোনা নয়, তার অনুশীলন করতেও দ্বিধা করেন নি। যে গানটি আসরে শুনে এলেন, বাড়িতে এসে সেই গানটি নিজে গাইবার চেষ্টা করতেন। পদ ভুলে গেলে নিজে পদ-পূরণ করে নিতেন। এমনিভাবে অন্যের গানের পদ-পূরণ করতে করতে বিহারীলাল স্বয়ং গীত রচনায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। আবাল্যের এই সঙ্গীতানুরাগই যে তাঁর কাব্যের গীতাত্ম-কতার মূল প্রেরণা, একথা মনে রাখতে হবে।

একজন হৃদয়বান মানুষ হিসেবে বিহারীলালকে দেখা গিয়েছে। উনিশ বছর বয়সে তিনি দশ বছরের অভয়া দেবীকে বিবাহ করেন,

বছর চারেক দাম্পত্য-জীবন যাপনের পর তাকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু সে-চারটি বছর ছিলো মাধুর্যে ভরা, নব-যৌবনা পতিসোহাগিনী অভয়া কবির জীবনের অনেকখানি স্থান জুড়ে ছিলেন। তাই স্ত্রীকে হারিয়ে তিনি 'বন্ধু-বিয়োগের' সরলা-প্রসঙ্গে আপন হৃদয়-বেদনা উজাড় করে দিয়েছেন। এ হয়তো সাময়িক মর্ম-বিদারণ (কারণ পরের বছর তিনি কাদম্বরী দেবীকে বিবাহ করেন), তবু তাতে আন্তরিকতার অভাব নেই। অন্যান্য বন্ধু-স্মৃতি-চারণায়ও বিহারীলালের ব্যথাতুর চিত্তের সাক্ষাৎ পাই।

বিহারীলালের কাব্যপ্রীতি আকস্মিক নয়, আবাল্যের। নিতান্ত অপরিণত বয়স থেকে তিনি কবিতা রচনা করতে থাকেন। সাময়িক পত্রের পরিচালনায় তাঁর ভূমিকাও নগণ্য নয়। 'পূর্ণিমা' (১৮৫৯), 'সাহিত্য-সংক্রান্তি' (১৮৬৩) ও 'অবোধবন্ধু' (১৮৬৩, ১৮৬৭) পত্রিকা তাঁর সাহিত্য-জীবনের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। পূর্ণিমায় নানা গদ্য-পদ্য রচনা, সাহিত্য-সংক্রান্তিতে নভোমণ্ডল, বীর্যবতী, হিন্দুনারী ইত্যাদি কবিতা, অবোধবন্ধুতে নিসর্গ-সন্দর্শন, বঙ্গ-সুন্দরী ও সুরবালা কাব্য প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-তর্পণে অবোধবন্ধু যে অর্ঘ্য পেয়েছে, তা যথার্থই স্মরণীয়।

কবির প্রকাশিত গ্রন্থ হচ্ছে—'স্বপ্ন-দর্শন' (গদ্য। ১৮৫৮), 'সঙ্গীত-শতক' (১৮৬২), 'বঙ্গ-সুন্দরী' (১৮৭০), 'নিসর্গ-সন্দর্শন' (১৮৭০), 'বন্ধু-বিয়োগ' (১৮৭০), 'প্রেম-প্রবাহিণী' (১৮৭০), 'সারদা-মঙ্গল' (১২৮৬) ও 'সাধের আসন' (১২৯৫-১২৯৬। প্রথম সর্গ বাদে)।

৬ দীনবন্ধু ও গিরিশচন্দ্র

সরকারের কাছে দীনবন্ধু মিত্র সুবিচার পান নি, কিন্তু দেশের কাছে পেয়েছেন পরম সমাদর। ডাক বিভাগে তাঁর কর্মদক্ষতা উপযুক্ত মর্যাদা পায়নি, অথচ তার জন্য অপরিসীম শ্রম স্বীকার করেছেন তিনি, এমন কি স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়ে অকালে মৃত্যুকে পর্যন্ত ডেকে এনেছেন—এ আপশোষ বঙ্কিমের কাছে শুনেছি। কিন্তু ইতিহাস জানে, তাঁর 'নীল-দর্পণ' বাঙলাদেশে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো ; মধুসূদনকে অনুবাদে, রেভারেণ্ড লংকে শাস্তি গ্রহণে, বঙ্কিমকে বন্ধুকৃত্যে অনুপ্রাণিত করেছিলো। সুখ্যাত নটের অভিনয় তাঁকে দিয়েছিলো স্বীকৃতি, বিদ্যাসাগরের উত্তেজনা তাঁর প্রয়াসকে করেছিলো অভিনন্দিত। সিপাহী-বিদ্রোহ বাঙলা দেশের উপরের স্তরে চাঞ্চল্য আনতে পারেনি, অথচ নীল-বিদ্রোহ শিক্ষিত মানুষের মনে-মননে তুলেছিলো প্রচণ্ড আলোড়ন। সেদিনের বাঙলা বিচার করেনি 'নীল-দর্পণের' স্থায়ী মূল্য, দীনবন্ধুর হাতে মহাকালের কড়ি আছে কিনা তার হিসেব নিতে বসেনি—বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছিলো নাট্যকার দীনবন্ধু আর তাঁর নাটককে। হয়তো সমাজের প্রয়োজন ছিলো দীনবন্ধুর মতো একজনকে—হরিশ্চন্দ্রের মতো আরেকজনকে ; তবু সেই কৃতজ্ঞতা যে সময় বুঝে কৃতঘ্নতায় পরিণত হয়নি তার জন্য বাঙলা দেশকে ধন্যবাদ দিতে হয়। আসল কথা, বাঙলা দেশ ছিলো দীনবন্ধুর, দীনবন্ধু ছিলেন বাঙলা দেশের।

বাঙলা ১২৩৮ সালে নদীয়ার চৌবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধুর জন্ম। পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে (পরবর্তী নাম হেয়ার স্কুল) তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়। ১৮৫০ সাল থেকে

১৮৫৪ সালের মধ্যে হেয়ার স্কুল আর হিন্দুকলেজের প্রত্যেকটি পরীক্ষায় তিনি জুনিয়ার কিংবা সিনিয়ার বৃত্তি লাভ করেন। মাঝখানে দু'বার—চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষায় তিনি বাঙলায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে নিজের মাতৃ-ভাষা-প্রীতি ও মেধাশক্তির পরিচয় দেন। শিক্ষকতা-কর্মের পরীক্ষায়ও তাঁকে একবার সাফল্য অর্জন করতে দেখি। সুতরাং দীনবন্ধু ছাত্র হিসেবে নিঃসন্দেহে কৃতী ছিলেন।

১৮৫৫ সালে তাঁর কর্মজীবনের আরম্ভ—পাটনার পোস্ট মাষ্টার রূপে। তারপর মাত্র দেড় বৎসরের মধ্যে তাঁর পদোন্নতি হলো, ইন্‌স্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টার হয়ে তিনি গেলেন উড়িষ্যায়। উড়িষ্যা থেকে নদীয়া, নদীয়া থেকে ঢাকা। এই সময়ে নদীয়া অঞ্চলে তিনি নীলকরদের অত্যাচার স্বচক্ষে দেখেছেন, বেদনার্ত হয়েছেন। তাই কৃষ্ণনগরে থাকার সময় সরকারী কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে জনসভার আয়োজন করতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু সে-কথা যাক। কর্মজীবনে দীনবন্ধু যে শ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় দেন, একমাত্র সরকারী খেতাব তার উপযুক্ত সম্মাননা নয়। মনে রাখতে হবে, এই শ্রম ও নিষ্ঠার মূল্যেই তিনি সাহিত্যের দরবারে খ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

ছাত্রকাল থেকেই দীনবন্ধু ছিলেন সাহিত্যের ভক্ত, মাতৃভাষার অনুরাগী। হেয়ার স্কুলের বালক পড়ুয়া হিসেবেই ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং গুপ্তকবির শিষ্যত্ব করেই দীনবন্ধুর সাহিত্যিক জীবনের গোড়াপত্তন। বালক-মনের ওপর ঈশ্বর গুপ্তের এই প্রভাব স্থায়ী না হয়ে পারেনি। গুপ্তকবি-সম্পাদিত 'সংবাদ সাধুরঞ্জনেই' দীনবন্ধুর প্রথম কবিতা 'মানব-চরিত্র' প্রকাশিত হয়। গুরুর মতোই তাতে অনুপ্রাসের ঘনঘটা। অন্যদিকে গুরুর কৃপাতেই তাঁর জনপ্রিয়তা হয়েছিলো—'প্রভাকরের' যে সংখ্যায় তাঁর 'জামাই-ষষ্ঠী' কবিতা প্রকাশিত হয়, তার পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন হয়েছিলো।

দীনবন্ধুর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দশ—'নীল-দর্পণ' (১৮৬০),

'নবীন তপস্বিনী নাটক' (১৮৬৩), 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'লীলাবতী' (১৮৬৭), 'সুরধুনি কাব্য' (১ম। ১৮৭১), 'জামাই বারিক' (১৮৭২), 'দ্বাদশ কবিতা' (১৮৭২), 'কমলে কামিনী নাটক' (১৮৭৩), 'সুরধুনী' (২য়। ১৮৭৬)। একজন নিষ্ঠাবান সরকারী কর্মচারীর পক্ষে এই সংখ্যা কম নয়। তাছাড়া তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন না, একথাও মনে রাখতে হবে।

নাটকগুলির বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশের আগে দীনবন্ধু সম্পর্কে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। প্রথমতঃ তিনি হিন্দুকলেজের ছাত্র হলেও ইয়ংবেঙ্গলের কালানুক্রমিক প্রভাব থেকে দূরে ছিলেন। হিন্দুকলেজের চত্বরে তুই সভ্যতার সান্নিধ্যে যে ফেনপুঞ্জের আত্মপ্রকাশ ঘটে, দীনবন্ধু তা কখনও অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করেন নি। ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির 'ভালোটুকু' যেমন তিনি সাদরে গ্রহণ ও অনুশীলন করেন নি—যেমন করেছিলেন তাঁর বন্ধু বঙ্কিম—তেমনি তাঁর 'মন্দটুকুও' তিনি এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তবে শিক্ষিত মানুষ মাত্রেরই মধ্যে যে চক্ষুষ্মানতা ও বিবেকবুদ্ধি প্রত্যাশিত তা দীনবন্ধুর ছিলো। তাছাড়া যে সহানুভূতি তাঁর অন্তরের নিত্য সম্পদ, যার বশ্যতা তিনি করে গিয়েছেন সমগ্র সাহিত্যিক জীবনে, তা মধ্যযুগীয় নয়, তা মানবতার প্রতি গভীর বিশ্বাস থেকেই উৎসারিত এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

দ্বিতীয়তঃ সরকারী আপিসের নীল আলোয় মানুষের জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়নি ; পুঁথির জগতে তিনি জীবনকে অধ্যয়ন করেন নি ; মানুষের সুখদুঃখ, ভালোমন্দ ও ভাঙাগড়ার ব্যষ্টিগত ও সামাজিক তাৎপর্য অনুধাবনে তিনি বুদ্ধির দ্বারস্থ হন নি। জীবনের সঙ্গে তাঁর মোকাবিলা হয়েছে দেশের পথে প্রান্তরে, ভাঙা কুটিরের আনাচে কানাচে, রান্নাঘরের উনুনের পাশে, ধানের মরাইয়ের কাছে ধারে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর খোলা চোখের দৃষ্টি ও হৃদয়ের সহানুভূতিই তাঁকে চিনিয়ে দিয়েছে সহজ সরল, বক্র কুটিল, সাত

আগুনে পোড়া, শিকারী বেড়ালের মতো সুযোগ সন্ধানী, পরের দুঃখে বুক-দিয়ে-পড়া আর কেঁচোর মতো কাদা-মাটি-খাওয়া নানা জাতের মানুষকে। বঙ্কিমের ভাষায়—'ডাকঘর দেখিবার জন্য (দীনবন্ধুকে) গ্রামে গ্রামে যাইতে হইত। লোকের সঙ্গে মিশিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি আহ্লাদপূর্বক সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য-প্রদেশের ইতর-লোকের কন্যা, আদুরীর মত গ্রাম্যা বর্ষীয়সী, তোরাপের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নশীরাম ও রতার মত গ্রাম্য বালক, পক্ষান্তরে নিমচাঁদের মত সহুরে শিক্ষিত মাতাল, অটলের মত নগরবিহারী গ্রাম্য বাবু, কাঞ্চনের মত মনুষ্যশোণিতপায়িনী নগর-বাসিনী রাক্ষসী, নদেরচাঁদ হেমচাঁদের মত "উনপাঁজুরে বরাখুরে" হাপ পাড়াগেঁয়ে হাপ সহুরে বয়াটে ছেলে, ঘটিরামের মত ডেপুটী, নীলকুঠির দেওয়ান, আমীন, তাগাদ্গীর, উড়ে বেহারা, দুলে বেহারা, পেঁচোর-মা কাওরাণীর মত লোকের পর্যন্ত তিনি নাড়ী-নক্ষত্র জানিতেন; তাহারা কি করে, কি বলে, তাহা ঠিক জানিতেন;··· তাঁহার আদুরীর মত অনেক আদুরী আমি দেখিয়াছি—তাহারা ঠিক আদুরী। নদেরচাঁদ হেমচাঁদ আমি দেখিয়াছি, তাহারা ঠিক নদেরচাঁদ বা হেমচাঁদ।' দেশের জীবন সম্বন্ধে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়েই তিনি এগিয়েছিলেন নাট্যচিত্র অঙ্কনে। সেই মানুষ সম্পর্কেই তাঁর অব্যবহিত জ্ঞান ছিলো যাদের তিনি নিজের চোখে দেখেছেন, চিনেছেন, জেনেছেন।

অর্থাৎ দীনবন্ধু ছিলেন যথার্থ জীবন-শিল্পী, জীবন-রস-রসিক। তবে যে জীবনের তিনি দ্রষ্টা ও ভোক্তা, শিল্পী ও রসিক তা কোন অর্থেই কল্পনার বস্তু নয়, জীবনের নামে জীবনের অ্যাবস্ট্রাক্সান বা সাব্লিমেসান নয়। দেশের মাটি-জল-আলো-বায়ুর মধ্য থেকে রস আহরণ করে, জাতির জীবিত চেতনার অধিকার নিয়ে সেই জীবনের প্রকাশ। ভূমি থেকে তাদের উদ্ভব, ভূমিতেই তাদের অবসান—ভূমার জগৎ সেখান থেকে বহু দূরে। বৃহত্তর জাতীয় সত্তা

থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র যে ব্যক্তিসত্তা—তার যত সৌন্দর্য ও মহত্ত্বই থাক না কেন—দীনবন্ধুর কাছে তার কোন আকর্ষণ ছিলো না। উচ্চতর কল্পনা বা ভাবুকতায় জীবনের যে গভীর ও গম্ভীর, মহিমান্বিত ও ঊর্ধ্বায়িত, বিচিত্র ও সূক্ষ্ম রূপ গড়ে ওঠে, তার প্রতি এই শিল্পী ছিলেন পরাঙ্মুখ। বাঙলার মাটির জীবনই তাঁর কাছে স্ব-জীবন,—কল্পনার জীবন নয়, এমন কি নাগরিক বাঙলার জীবনও নয়। তাই নবীনমাধবের স্রষ্টা হিসেবে তিনি ব্যর্থ, তোরাপের রূপকার হিসেবে তাঁর সার্থকতার তুলনা নেই। তাঁর ক্ষেত্রমণি খাঁটি বাঙালীর মেয়ে, একটা রক্ত-মাংসে-গড়া জীবন্ত চরিত্র—কিন্তু লীলাবতী বা কামিনী কল্পলোকের অধিবাসিনী, বাঙলার সমাজের চেনা মেয়ে নয়। আসল কথা, সাধুচরণ, রাইচরণ, রেবতী, ক্ষেত্রমণি, রাইয়ত ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি ছিলো বলেই চরিত্রগুলি নিখুঁত, স্বাভাবিক ও জীবন্ত রূপ পেয়েছে—আর স্রষ্টার সামাজিক অভিজ্ঞতার অভাব এবং অন্তরের সহানুভূতির কৃপণতায় গোলোকচন্দ্র, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা ইত্যাদি অন্ততঃ কিছুটা পরিমাণে কৃত্রিম ও কষ্টকল্পিত হয়ে উঠেছে। উদাহরণ দেওয়া যাক—

'ক্ষেত্র। ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দেও, পদীপিসির সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেটয়ে দাও, আঁধার রাত, মুই একা যাতি পারবো না—(হস্ত ধরিয়া টানন) ও সাহেব তুমি মোর বাবা, হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও—তুমি মোর বাবা।

* * *

ক্ষেত্র। ও সাহেব, মুই তোমার মা, ন্যাংটো করো না, তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও—

* * *

ক্ষেত্র। মোরে অ্যাকবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বলবো না। মোর বুকি অ্যাকটা তেরোনালের খোঁচা মার্, মুই স্বগ্গে চলে

যাই—ও গুখেগোর বেটা, আঁটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ী যোড়া মরা মর্যে, মোর গায়ে যদি হাত দিবি তোর হাত মুই এঁচড়ে কেম্‌ড়ে টুক্‌রো করবো, তোর মা বুন নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে যা, দেঁড়য়ে রলি কেন, ও ভাইভাতারির ভাই, মার্ না মোর প্রাণ বার কর্যে ফ্যাল না, আর যে মুই সইতি পারি নে।'

—নীল-দর্পণ।

এই চিত্রে ক্ষেত্রমণির হৃদ্‌-স্পন্দন স্পষ্টই অনুভব করা যায় গ্রামের সরল, সজীব অথচ অশিক্ষিত মেয়েটি কখনও এমন বিড়ম্বনার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। জন্ম থেকে যে পারিবারিক আওতায় সে মানুষ সেখানে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ছিলো, বিশ্বাসের শান্তি ছিলো, আর ছিলো সহজ শ্রদ্ধা-প্রীতি-স্নেহ। বৃহত্তর পৃথিবীর জটিলতা ও কুটি-লতার কোন খবর তার জানা ছিলো না, জানার প্রয়োজন ছিলো না। সে তার ছোট পারিবারিক জীবনে ও পরিচিত সামাজিক পরিবেশে দেখেছে—পিতা সন্তানকে ভালোবাসে, সন্তান পিতাকে শ্রদ্ধা করে। মেয়েদের কাছে সন্তান হচ্ছে সাতরাজার ধন, সতীত্বের চেয়ে বড়ো ধর্ম তাদের আর নেই। এই যে ক্ষেত্রমণির মতো সাধারণ মানুষের ছোট জীবন, তাতে অভাব আছে—দুঃখ আছে, তবু সেই পোড়-খাওয়া মানুষ জীবনকে ভালোবাসে এবং জীবনের শেষ পরিণাম হিসেবে মৃত্যুকে স্বীকার করে নেয়। তারা জীবনকে যেমন চেনে, তেমনি চেনে মৃত্যুকে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এই অভিজ্ঞতার সম্বলটুকু নিয়ে ক্ষেত্রমণি যখন রোগ সাহেবের মুখো-মুখি হলো, তখন হলো তার অগ্নি-পরীক্ষা। সেই অগ্নি-পরীক্ষার ক্ষণে তার মুখে যা শুনেছি, তাতে তার প্রাণ-মন-চেহারা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অন্ধকার রাতের চোর-ডাকাতকে, ধর্মনাশকারীকে সে ভয় করে—তাই সে বলে : 'আঁধার রাত, মুই একা যাতি পারবো না।' কিন্তু নারীর শেষ সম্বলটুকু হারানোর চেয়ে তার কাছে মরণ ভালো। মৃত্যু তার অপরিচিত নয়, তাই মৃত্যুকে তার ভয় নেই—

'মোরে অ্যাক্‌বারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বলবো না।' দ্বিতীয়তঃ মৃত্যু দুর্বৃত্তের চেয়ে বেশি চেনা বলেই মৃত্যুর স্মরণ মাত্রেই ক্ষেত্রমণির মধ্যে একটা দৃপ্তভঙ্গিমা বারেকের জন্য জেগে ওঠে: অগ্নিবর্ষী তিরস্কারে তার প্রকাশ দেখতে পাই। এই যে মেয়ে, যে আঁধার রাতকে ভয় করে অথচ মৃত্যুকে ভয় করে না, তাকে দীনবন্ধু আমাদের সমাজে ঘনিষ্ঠভাবে চিনেছেন বলেই নাটকে এমন সহজ ও সুস্পষ্টরূপে দেখাতে পেরেছেন। আর জীবনের পথে চলতে চলতে মানুষের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়, সেই তো তার বিপদের দিনের আত্মরক্ষার সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র। ক্ষেত্রমণির চেনা জগতে সন্তানের সঙ্গে জনক-জননীর সম্পর্কই সবচেয়ে পূত-পবিত্র। তাই সে রোগ সাহেবকে একবার বলে—'তুমি মোর বাবা', আরেকবার বলে—'তুমি মোর ছেলে।' এখানে আত্মরক্ষার জন্য নখরপাতের চেয়েও স্বাভাবিক হয়েছে ক্ষেত্রমণির 'বাবা' বা 'ছেলে' ডাক, কারণ এই ডাকের মধ্যেই যথার্থ প্রকাশ পেয়েছে বাঙালী মেয়ের প্রাণ-মন, তার স্বভাব-ধর্ম, তার কোমলতা-দুর্বলতা। পশুশক্তির নারকীয় লীলার পটভূমিকায় নিজের জীবনের জন্য মায়া নয়, পেটের ছেলের জন্য মায়ার কারুণ্য দশন-দংশনের চেয়েও সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ক্ষেত্রমণি যে পেটের সন্তানের জন্য অনুনয়ে-আর্তনাদে আকুল, সেই পেটের সন্তানের মঙ্গলের জন্য রেবতী সাহেবের ঘরে গিয়ে দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত। কারণ সন্তানের মৃত্যুর অন্ধকারে তার নিজের দৈহিক পবিত্রতার মূল্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, শূন্যতায় ভরে গিয়েছে তার জীবন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গ্রামের মানুষের যে সাধারণ জীবনকে দীনবন্ধু জানতেন, তার গভীর তলদেশ পর্যন্ত তলিয়ে দেখেছেন, কোমলতম থেকে রূঢ়তম সত্যের পাঠ পর্যন্ত নিয়েছেন। তা না হলে ক্ষেত্রমণির সন্তানের প্রাণ ও দৈহিক পবিত্রতা রক্ষার চেষ্টা থেকে ক্ষেত্রমণির মৃত্যুতে রেবতীর সাহেবের ঘরে গিয়ে ওঠার চিন্তা পর্যন্ত বিসর্পিত জীবনের বিচিত্র সত্যকে এমন মর্মান্তিকভাবে অথচ সহানুভূতির সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত করতে পারতেন না। অথচ

কোথায়ও কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতা নেই। দীনবন্ধুর শিল্পদৃষ্টির এটাই সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য।

অন্যদিকে ভদ্রসমাজের একটি ছবি দেখা যাক—

'নবীন। কামিনীকে অলঙ্কারে বিভূষিতা করিতে পতির কত কষ্ট. বেগবতী নদীতে সন্তরণ, ভীষণ সমুদ্রে নিমজ্জন, যুদ্ধে প্রবেশ, পর্বতে আরোহণ, অরণ্যে বাস, ব্যাঘ্রের মুখে গমন,—পতি এ. ক্লেশে পত্নীকে ভূষিতা করে, আমি কি এমন মূঢ়, সেই পত্নীর ভূষ. হরণ করিব? পঙ্কজ নয়নে, অপেক্ষা কর।

* * *

সৈরি। জীবনকান্ত আমি যে কষ্টে ও নিদারুণ কথা বলিয়াছি তাহ. আমিই জানি আর সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন, ও অগ্নিবা. তার সন্দেহ কি—আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করেছে, জিহ্বা দগ্ধ করেছে, পরে ওষ্ঠ ভেদ করে্য তোমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়াছে—

* * *

নবীন। প্রণয়িনি তোমার অন্তঃকরণ অতি বিমল, তোমার ম. সরল নারী নারীকুলে দুটি নাই—আহা!…এমন ঐশ্বর্যশালী হইয় এখন আমি স্ত্রী ভাদ্রবধূর অলঙ্কার হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি. কি বিড়ম্বনা!'

এখানে মানুষ নয়, দুটি সাজানো-গোছানো পুতুলের খেলা দেখতে পাই। বক্তব্য মহৎ, ভাষা সাধু—কিন্তু কথার বুকে প্রাণের স্পন্দন নেই। বাণীর বসতি রসনায়, সন্দেহ নেই; কিন্তু তার জন্ম মানুষের অন্তরে। তাই মানুষ যখন কথা বলে তখন তার সমগ্র অন্তঃস. কথা কয়ে ওঠে, ধ্বনির দর্পণে তার প্রাণ ও ব্যক্তিত্ব ভেসে ওঠে কিন্তু নবীনমাধব ও সৈরিন্ধ্রীর কথোপকথনে অন্তরের সেই স্পন্দন কোথায়, কোথায় সেই ব্যক্তিচরিত্রের প্রতিফলন? মনে হয়, এরা যেন ঠিক জীবন্ত মানুষ নয়, সামাজিক প্রাণী নয়—রঙ্গশালার দুটি নায়ক-নায়িকা কোন শেখানো বুলি আউড়ে যাচ্ছে। তাদের

বক্তব্যে, ভাষায় ও মুখভঙ্গিতে স্বাভাবিকতা নেই, সজীবতা নেই—একটা কৃত্রিম অভিব্যক্তি মাত্র আছে। সুতরাং ভদ্রসমাজ নয়, ভদ্রেতর সমাজ সম্পর্কেই দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতা ছিলো ঘনিষ্ঠ এবং সেই অভিজ্ঞতার দিক থেকেই তাঁর সাহিত্যের সত্য-মূল্য নিরূপণ করতে হবে।

পূর্বে বলেছি, দীনবন্ধুর সহজাত সহৃদয়তা ও সহানুভূতির কথা। এই সহৃদয়তা ও সহানুভূতির রস-সিঞ্চনেই তাঁর নাটকের ভদ্রেতর চরিত্রগুলি প্রাণ পেয়েছে, জীবন্ত হয়ে উঠেছে। স্রষ্টার ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের সহানুভূতির সুন্দর সহযোগ যেখানে, সেখানে সৃষ্টির সাফল্য সুনিশ্চিত। দীনবন্ধুর নাটকে নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা শুধু স্রষ্টার অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে জন্ম লাভ করেনি, তাঁর সহানুভূতিও আদায় করে নিতে পেরেছে। কিন্তু ভদ্র চরিত্রগুলি যেমন দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সৃষ্টি নয়, তেমনি তারা লেখকের সহানুভূতি থেকেও বঞ্চিত। ফলে তাদের মধ্যে সজীব ব্যক্তিত্বের অভাব ঘটেছে—তারা চলেছে, ফিরেছে, কথা বলেছে—তবু ঠিক সপ্রাণ হয়ে ওঠেনি। ভদ্রেতর চরিত্রগুলির মুখের ভাষা যেমন তাদের অন্তরেরই প্রতিবিম্ব হয়ে দেখা দিয়েছে, তেমনি ভদ্র চরিত্রগুলির মুখের ভাষা তাদের অন্তরের ভাষা হতে পারেনি। নবীনমাধব বা বিন্দুমাধব বা সৈরিন্ধ্রী এমন ভাষায় এমন ভঙ্গিতে কথা বলেনি যাকে একান্তভাবে তাদেরই ভাষা বা ভঙ্গি বলে মনে হতে পারে। কোন রাইয়ত যখন বলে—'গোড়ার পা যান বলদে গোরুর খুর'—তখন আমরা সেই মানুষটিরই আভাস পাই, যে সমস্ত দুঃখকষ্টের মধ্যেও একটা অসংজ্ঞাত কৌতুকপ্রবণতাকে বাঁচিয়ে রেখে জীবনটাকে সহনশীল করে তুলেছে। এখানে ভাষা তার চরিত্রের দ্যোতক। কিন্তু ভদ্রসমাজের ভাষায় এই চারিত্র্য নেই।

তারও সঙ্গত কারণ ছিলো। বাঙালীর যে সনাতন জীবন-সত্য জনগণের চলমান প্রবাহে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছে—যার মধ্যে

প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, ভাবনা-চিন্তা, ভাব-অনুভূতি, এমন কি অসংজ্ঞাত কৌতুকপ্রবণতা পর্যন্ত মিলেমিশে আছে— তার গভীরে দীনবন্ধু প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। শুধু সনাতন জীবনের চিরন্তন মূল্য অনুধাবনে নয়, তার ভাষাটি পর্যন্ত আয়ত্ত করার সাধনায় তাঁর কৃতিত্ব তুলনাহীন। সেই জীবনের স্থূল ও অমার্জিত উত্তরাধিকারকেও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছিলেন বলে, উচ্চ কল্পনার ক্ষেত্রে তাকে মার্জিত ও শোভন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন নি বলে তাদের মুখের ভাষাও রূঢ়, স্থূল ও গ্রাম্য রয়ে গেছে।

যেমন জীবন, তেমনি জীবনের ভাষা একে অন্যের অনুরূপ। ক্ষে মণির শ্লীলতাহানির সেই নির্মম দৃশ্যে যে গ্রাম্য ও অমার্জিত ভা তার মুখে শুনেছি—বিশেষ করে তার সক্রোধ তিরস্কারে—তা বিচার করতে হবে এই গ্রাম্য মেয়েটির অসহায় অশিক্ষিত জীব পরিপ্রেক্ষিতে। এবং সে-বিচারে দেখা যাবে, ক্ষেত্রমণির মা মানুষের অবস্থা-বিপর্যয়কে পরিদৃশ্যমান করতে হলে যেমন তা জীবনকে, তেমনি তাদের ভাষাকে সমস্ত গ্রাম্যতা ও স্থূলতা গ্রহণ করতে হবে। যদি তা অশ্লীলতার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছ তবু উপায় নেই, কারণ তা-ই স্বভাবসঙ্গত। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর জী সম্পর্কে যেমন নিশ্চয়তাবোধ দীনবন্ধুর ছিলোনা, তেমনি তাদের ভ সম্পর্কেও কোন নির্দিষ্ট ধারণা তাঁর ছিলো না। কারণ ইং আমলে বাঙালীর জীবনের যে ভাঙাগড়া, তার ফলে পূর্বতন উ শ্রেণীর সমাজ অক্ষত থাকেনি। তদুপরি ইংরেজী শিক্ষায় শি এক নব্যসমাজও দেখা দেয়, অথচ তাদের জীবনের পরিণতির র রেখা দীনবন্ধুর আমল পর্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেন নি। ফলে উ শ্রেণী সম্পর্কে দীনবন্ধুর অনিশ্চয়তাবোধ অনুমান করা কঠিন ন অন্যদিকে '১৮৫৮ হইতে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত সাধারণ গদ্যরী নিশ্চয়তা ছিল না। গদ্যসাহিত্যের ভাষা তখনও নিজস্ব ভঙ্গ রূপ লাভ করিতে পারে নাই। একদিকে ছিল নিতান্ত অসাধু স

ভাষার জের, অন্যদিকে নিতান্ত অচল চল্‌তি ভাষার প্রচার। এই দুই বিপরীতগামী প্রবৃত্তির ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া দীনবন্ধুর আবির্ভাবের সময় বাংলা গদ্যের সমস্যা সত্যই জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।' অর্থাৎ যে জীবনের রূপের অনিশ্চয়তা, সেই জীবনের ভাষার অনিশ্চয়তা স্বাভাবিক। ফলে উচ্চশ্রেণীর মানুষের চিত্রে, তাদের ভাব ও ভাষায় দীনবন্ধুর ব্যর্থতা ছিলো অনিবার্য। তার ওপর তার ব্যক্তিগত জ্ঞান ও সহানুভূতির অভাবও ছিলো।

জীবন-শিল্পী দীনবন্ধু সকল শ্রেণীর জীবন নয়, বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষের জীবন নিয়ে সাহিত্য রচনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। সুতরাং তাঁর সাহিত্যদৃষ্টি বাঙালী চরিত্রের এক সঙ্কীর্ণ গন্তীর মধ্যেই যে বিশেষভাবে স্ফূর্তি লাভ করেছিলো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর যে লোকায়ত জীবনকে তিনি অন্তরঙ্গভাবে চিনেছিলেন, যা নিয়ে তাঁর বস্তুতান্ত্রিক কল্পনা (objective imagination) সৃষ্টিশীল হয়ে উঠেছিলো, তার প্রত্যক্ষ ও স্থূল রূপের অভ্যন্তরে হাসি-কান্নার কোন গভীর স্রোত, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কোন গূঢ় লীলা, ভাঙা-গড়ার কোন সূক্ষ্ম নিয়ম ও শক্তি-অশক্তির কোন অভাবনীয় তাৎপর্য তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি। তিনি ছিলেন জীবনের নিকট, প্রত্যক্ষ ও স্থূল অস্তিত্বেরই উপাসক, প্রাথমিক চিত্তবৃত্তির শিল্পী। তারই জন্য মানুষের চরিত্র-শক্তির প্রাচুর্য সত্ত্বেও নিয়তির রহস্য-লীলায় জীবনের যে গভীরতর নিরর্থকতা ট্র্যাজেডিতে দেখা যায়, দীনবন্ধুর নাট্যসাহিত্যে তা স্পষ্টতঃই অনুপস্থিত। উচ্চতর ভাব-কল্পনায় নর-জীবন বিচিত্র কার্য-কারণ-সূত্রে গ্রথিত হয়ে বৃহত্তর তাৎপর্য লাভ করে, তার আদি মধ্য-অন্ত-সমন্বিত সামগ্রিক অস্তিত্বের ছবি ফুটে ওঠে—কিন্তু দীনবন্ধুর সেই উচ্চতর ভাব-কল্পনা ছিলো না। তাই তাঁর 'নীল-দর্পণের' মানুষগুলির জীবনে বাইরে থেকে আঘাত এসেছে, দুঃখ এসেছে, মৃত্যুও এসেছে—কিন্তু জীবন সম্পর্কে স্রষ্টার গভীরতর ঔৎসুক্য ও উচ্চতর ভাব-কল্পনার অসদভাবের জন্যই তা নিদারুণ কারুণ্যে প্যাথেটিক হলেও দুঃখ-দ্বন্দ্বের ঘূর্ণাবর্তে ট্র্যাজিক

হয়ে উঠতে পারে নি। বোধ হয় 'সধবার একাদশীর' নিমচাঁদ তার একমাত্র ব্যতিক্রম। সে মদ খায়, ইংরেজী বুলি আওড়ায়, বার-বনিতার বাড়ি যায়—তার অসংযত জীবন ইঙ্গ-বঙ্গ-সংস্কৃতির জগা-খিঁচুড়ির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু তার এই উচ্ছৃঙ্খল বাইরের জীবনটাকেই শুধু দীনবন্ধু দেখেন নি—ভেতরে দেখেছেন একটা গভীর ও সূক্ষ্ম বেদনাবোধ। সেই বেদনাবোধের মূলে ছিল ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা, দাম্পত্য-জীবনের অসুখ। তাই স্ত্রীর উল্লেখমাত্রেই সে বলে—'Thou stickest a dagger in me' আসল কথা, স্ত্রী তার জীবনে একটা নিদারুণ পরিহাস, নির্মম তিরস্কার মাত্র। স্ত্রীকে ভুলে থাকবার জন্যই সে উচ্ছৃঙ্খলতার পঙ্কে ডুবে থাকতে চায়। তা না হলে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দের বোধ এখনও তার মধ্যে জাগ্রত। আর তাই গোকুলের স্ত্রীকে বার করে আনার প্রস্তাব তার কাছে ভদ্রলোকের অকল্পনীয় বলে মনে হয়। তবুও, নিমচাঁদের মতো বিরল উদাহরণ সত্ত্বেও, স্বীকার করতেই হবে—দীনবন্ধুর সহজ রসবুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ চক্ষুষ্মানতা বিশ্ব-জনীন ভাবলোকে জীবন-উপাদান সন্ধান করেনি, কাছের মানুষের কাছেই খুঁজে পেয়েছে দর্শনীয় জীবনের রূপ-রস-রঙ—আর তা-ও তাৎপর্যে সুগম্ভীর নয়, স্বাভাবিকতা ও সারল্যে বাস্তব-বাধ্য। একজন বিদগ্ধ সমালোচক যথার্থই বলেছেন—'প্রতিদিনের ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনাগুলির মধ্যে যে সহজ রস রহিয়াছে, যাহা এককালে মুখে হাসি ও চোখে জল লইয়া আসে, যাহা কেবল জীবনরস-রসিকেরই দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, তাহাই দীনবন্ধুর অনুভূতির সমবেদনায় নূতন করিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর ও মর্মস্পর্শী হইয়াছে।'

এখানে আর একটি কথাও পরিষ্কার হওয়া দরকার। দীনবন্ধুর যে রসবুদ্ধি 'নীল-দর্পণের' মানুষী ভাবনায় ও বাস্তব জীবনধর্মিতায় সার্থকতা খুঁজেছে তা যথেষ্টই গুরু ও গম্ভীর; অথচ সেই রসবুদ্ধি কখনও কখনও জীবনের অসঙ্গতিকে ঘিরে লঘু ও চপল হয়ে উঠেছে। আমার মনে হয়, একই জীবন-রস-রসিকতার দ্বিমুখী প্রকাশ হচ্ছে

তার নাটক ও প্রহসন। তিনি কখনও বাঙালীর বহমান জীবনের অন্তর্নিহিত কারুণ্যে কান্নাজর্জর কিংবা নিষ্ঠুর সত্য-দর্শনে ভাব-গম্ভীর, কখনও বা বিচিত্র অসামঞ্জস্য দেখে যন্ত্রণার বিপরীত প্রতি-ক্রিয়ায় পরিহাসপ্রবণ ও কৌতুকবিলাসী। অর্থাৎ তাঁর ঠোঁটের হাসি চোখের জলেরই তির্যক রূপান্তর। এবং তারই জন্য নাটক ও প্রহসন উভয়েই দীনবন্ধুর সমান স্বাধিকার ও স্বনিষ্ঠতা। বস্তুতঃ তার 'নীল-দর্পণ' বা 'নবীন-তপস্বিনী' বা 'লীলাবতী' নাটকে যে জীবনকে একদিক থেকে গভীরভাবে দেখার চেষ্টা আছে, 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' বা 'সধবার একাদশী' বা 'জামাই-বারিকে' সেই জীবনকেই আরেক দিক থেকে হাল্‌কাভাবে দেখার প্রয়াস আছে। আসল কথা, জগৎব্যাপী ব্যর্থতাকে কৌতুকের দৃষ্টিতে দেখলে 'একটা বিরাট হাস্যরসাত্মক অভিনয়ের অঙ্গরূপে উপভোগ করা' যায়। আর সে-কারণেই দীনবন্ধুর গম্ভীর ভঙ্গির অন্তরালে লুকিয়ে থাকতো একটা কৌতুকের মূর্তি, চোখের জলের পাশেই ফুটে উঠতো ঠোঁটের হাসি। তাছাড়া সাধারণ মানুষের জীবনেও তিনি দেখেছেন দুঃখ-বেদনার ফাঁকে ফাঁকে অসংজ্ঞাত কৌতুকহাস্য। আর এই কৌতুকহাস্য আছে বলেই শত লক্ষ দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও, নিরর্থকতা বা ব্যর্থতা সত্ত্বেও জীবনের বেঁচে থাকার অভীপ্সা কখনও মরে যায় না; এই কৌতুকহাস্যই অস্তিত্বের নানা যন্ত্রণার ওপর সান্ত্বনার আবরণ বিছিয়ে দেয়, সমস্ত আঘাতকে বুক পেতে সহ্য করবার শক্তি জোগায়। এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে 'নীল-দর্পণের' গোপীনাথ আর দ্বিতীয় রাইয়তকে।

'উড। চপ্‌রাও, ঈউ ব্যাসটার্ড অভ্‌ হোরস্‌ বিচ্‌। তেরা ওয়াস্তে হাম কুত্তাকাসাৎ মুলাকাৎ করেগা, শালা কাউয়ার্ড কায়েত বাচ্ছা (পদাঘাতে গোপীর ভূমিতে পতন)...

গোপী। (গাত্র ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিয়া। সাত শত শকুনি মরিয়া একটি নীলকরের দেওয়ান হয় নচেৎ অগণনীয় মোজা হজম হয় কেমন করে্য ? কি পদাঘাতই করিতেছ, বাপ ! বেটা যেন

আমার কালেজ আউট বাবুদের গৌণপরা মাগ।

(নেপথ্যে) ডেওয়ান, ডেওয়ান।

গোপী। বন্দী হাজির। এবার কার পালা—

'প্রেমসিন্ধু নীরে বহে নানা তরঙ্গ।'

এখানে গোপীনাথের রসিকতা তার আজ্ঞাবর্তিতার যন্ত্রণাকে আরও মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। নীলকরের দাসত্ব করতে গিয়ে সে খুইয়ে ফেলেছে তার ভয়, লজ্জা, বিবেক ও আত্মসম্মান; কায়েত হয়েছে 'ক্যাওট'। জীবনের বিচিত্র বজ্জাতির গ্লানি সে সহ্য করে কি ভাবে? তার কারণ, 'অগণনীয় মোজা হজম' করার পর তার আজও হাসি পায়, সাহেবের দাপটকে 'কালেজ আউট বাবুদের গৌণপরা মাগের' দাপটের সঙ্গে তুলনার রসিকতা সে সম্বরণ করতে পারে না. দাসত্বের ডাক শুনে তার মনে পড়ে প্রেম-সিন্ধুর নানা তরঙ্গের লীলা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গোপীনাথের সহনশীলতার জন্ম কৌতুক-প্রবণতার উৎসে এবং সহজাত কৌতুকপ্রবণতা তার জীবনের গ্লানিকে আচ্ছন্ন করে আছে বলেই সে আজও ফন্দি-ফিকিরে ঘুরে বেড়াবার, বজ্জাতির অলি-গলি সন্ধান করবার শক্তি খুঁজে পায়। দ্বিতীয় রাইয়ত সম্বন্ধেও একথাই বলা চলে। 'উট সাহেবের' সবুট লাথিতে যে রক্তক্ষরণ, 'গোড়ার পা-কে' 'বল্‌দে গোরুর খুরের' সঙ্গে তুলনা দেওয়ার রসিকতাতেই তার একমাত্র সান্ত্বনা।

দীনবন্ধুর প্রহসনে দেখা যায় তার বিপরীত ছবি। সেখানে পাই অধরের হাসির ভেতর চোখের জল, লঘুর মধ্যে করুণের মূর্তি। স্মরণ করুন 'সধবার একাদশীর' নিমচাঁদকে, 'বিয়ে পাগলা বুড়োর' রাজীবলোচনকে।

'অটল। তুই ওঠ, আর এক জায়গায় চল।

নিম। প্রসন্নর বাড়ী? ডেপুটি বাবু, আমি তোমার পিনাল কোড্, এতে সব ক্রাইম আছে, আমাদের হাতে ধরে লও, নইলে বাবা পড়ে মরি।'

নিমচাঁদ মদ্যপ, দুশ্চরিত্র ও উচ্ছৃঙ্খল—সে সকলের হাসির

পাত্র; কৌতুকের বস্তু। কিন্তু দীনবন্ধু তার মধ্যে শুধু হাসির উপকরণই দেখেন নি, দেখেছেন প্রচ্ছন্ন বেদনাও। তাই উপরি-উক্ত উদ্ধৃতিতে শুনতে পাই হাসির আড়ালে নিমচাঁদের আর্তনাদ। যুগের ঝড়ো হাওয়ায়, ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতায় তার চরিত্র বেসামাল, সন্দেহ নেই—তবু তার আত্মার ক্রন্দন প্রহসনটিতে থেকে থেকে বেজে উঠেছে। তার আর কিছু না থাক শিক্ষার গৌরব ছিলো, অহঙ্কার ছিলো—আর সেই গৌরব-অহঙ্কারে কেনারাম ডেপুটিকেও তুচ্ছ করতে তার দ্বিধা হয়নি। কিন্তু তার ক্ষতের স্থানে আঘাত এলো সেদিন, যেদিন ডেপুটীর প্রশ্নের উত্তরে সে অসঙ্কোচে বলতে পারেনি, শ্বশুরবাড়িই তার বাসস্থান। তার মতো একজন পুরুষের পক্ষে নিদারুণ লজ্জার কথা বলেই সে প্রচ্ছন্ন বেদনায় শুধু এইটুকু বলতে পেরেছে—'আগুন চাপা থাক্‌বের নয়। তুমি ভাই রোম, গ্রীক, ইংলাণ্ড, ইণ্ডিয়ার সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, ঐটী ছাড়ান দাও—না হয় দু নম্বর কম দিও।' বিয়ে পাগলা রাজীবলোচন কালপেড়ে ধুতি ও চুলের কলপের দৌলতে যৌবনকে ফিরে পেতে চেয়েছে—কিন্তু যৌবন একদিন চলে গেলে আর যে কখনও ফিরে আসে না, এ মর্মান্তিক উপলব্ধি তার ঘটলো নকল বাসরে। রাজীবলোচনের সেদিনের বিমূঢ়তা ও নিজের বিধবা কন্যাকে স্মরণ যেমন নিয়তির সরস পরিহাস, তেমনি জীবন-যৌবনের শোকাবহ নিরর্থকতা স্মরণ করিয়ে দেয়। এমনিভাবে বিচার করলে আমাদের চোখে ধরা পড়ে 'জামাই-বারিকের' ঘরজামাই-দের দুর্গতি, স্ত্রীর টাকা-খাওয়া হেমচাঁদের মুখে লক্ষ্মী বউয়ের প্রশংসা এবং বদ ইয়ারের নিন্দা।

স্বভাবানুকারিত্ব ও কৌতুকপ্রবণতার জন্য দীনবন্ধুর রচনায় এমন সব কথা ও চিত্র আছে যা, অনেকের মতে, সুরুচির পরিচায়ক নয়। তিনি যা দেখতেন, তাতেই তন্ময় হতেন—কল্পনার দ্বারা বাস্তবকে আদর্শায়িত করার—illusion of reality সৃষ্টির কোন চেষ্টা করতেন না। ফলে তাঁর লেখায় মানুষগুলির স্বভাবসুলভ

স্থূলতা ও নিম্নরুচির কথা বাদ যায়নি। এই তথাকথিত রুচিহীনতা বিশেষ করে দেখা যায় অশিক্ষিত জনসমাজে, ইঙ্গ-বঙ্গ শিক্ষা ও কাল্‌চারের বুলি-ওয়ালা কতকগুলি অর্ধশিক্ষিত ও উচ্ছৃঙ্খল মানুষের মুখে ও কাজে, উড্-জাতীয় দু'একজন অশিক্ষিত সাহেবের মধ্যে। এর অর্থ সুস্পষ্ট। যেখানেই শিক্ষার অভাব বা অল্পতা বা বিকৃতি সেখানেই রুচিগত অধঃপতন বা বিপর্যয়। দীনবন্ধুর চোখে-দেখা জীবন্ত আদর্শগুলির মধ্যে এমনিতর স্থূল রুচির প্রকাশ ছিলো বলেই তাঁর সৃষ্টির মধ্যেও তার অনিবার্য উপস্থিতি। তাঁর নাটক ও প্রহসনে যে সমস্ত ব্যক্তির আনাগোনা তাদের নৈতিক মান এর চেয়ে উন্নত হলে দীনবন্ধুর বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যরুচিও উন্নত হতো। মধুসূদনের প্রহসন-প্রসঙ্গেও এই অশ্লীলতা ও রুচিদোষের প্রশ্ন তুলেছি। তাতে দেখেছি যে, একমাত্র ভাই-বোনকে নিয়ে রসিকতা ছাড়া (কারণ এ-সম্পর্কটির মহিমা মোটামুটি সকল শ্রেণীর মানুষই স্বীকার করে নেয়) অন্যত্র মধুসূদনকে দোষী করার কারণ নেই; তাঁর মতো উন্নতরুচি ব্যক্তির কলমে একমাত্র বস্তুনিষ্ঠতার অনুরোধেই কিছু কিছু স্থূলতার প্রকাশ ঘটেছে। যেমন ঘটেছে মোলিয়েরের নাটকে। তেমনি দীনবন্ধু চিত্রিতব্য জীবনের খাতিরেই এবং তার অঙ্গ হিসেবেই গ্রাম্যতাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অশ্লীল বখামি ও মাতলামি নিমচাঁদের মতো লোকের স্বভাবানুগত, তাই রামগতি ন্যায়রত্নের মতো ব্যক্তিদের রুচিগত শুচিবায়ুর কথা জেনেও নাট্যকার তাদের জীবন-চিত্রে কল্পনার রঙ ছিটিয়ে সেগুলিকে মার্জিত করবার চেষ্টা করেন নি। দ্বিতীয়তঃ দীনবন্ধুর নাটকে যে শ্রেণীর মানুষের বেশি ভিড়, তাদের সমাজে নর-নারীর সম্পর্কের কথাকে পরিত্যাজ্য ও অনালোচ্য বলে মনে করা হতো না—'সেক্স' সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টি ছিলো অধিকতর সংস্কারমুক্ত ও সহজ-স্বচ্ছন্দ। ফলে তথাকথিত অশ্লীল বখামি, নর-নারীর সম্পর্ক নিয়ে রসিকতা তাদের সমগ্র চরিত্রের ভাবানুষঙ্গে অপরিহার্য সত্য, বাইরে থেকে আরোপিত অবাঞ্ছিত দোষ মাত্র নয়।

দীনবন্ধু, বঙ্কিমের ভাষায়, পবিত্রতার ভাণ করতেন না এবং নিজে পবিত্রচেতা হয়েও সহানুভূতির গুণে পাপিষ্ঠের দুঃখ পাপিষ্ঠের ন্যায় বুঝতে পারতেন। এই নিষ্ঠাপূর্ণ বাস্তব-তন্ময়তার দিক থেকেই তার নাটক-প্রহসনের মানুষগুলির রুচি ও আদর্শকে বিচার করতে হবে, বাস্তব-নিরপেক্ষ কোন বিশুদ্ধ নীতির দিক থেকে নয়। তাছাড়া, দীনবন্ধুর তথাকথিত অশ্লীলতা গম্ভীর নয়, সহাস্য; ফলে তা পাঠকের রুচিবিকার ঘটায় না। এবং সেই অশ্লীলতার জন্ম আদিরস-কল্পনায় নয়, জীবন-ভাবনায় বলেই তার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার কোন কারণ নেই। ক্ষেত্রমণির লাঞ্ছনার নিমম দৃশ্যটি যে শেষ পর্যন্ত আদিরসের শারীরিক ভাষা হয়ে ওঠেনি, তার কারণ বর্তমান ক্ষেত্রে বীভৎস রসই নাট্যকারের উদ্দিষ্ট, আদিরস নয়। তবে স্বীকার করতেই হবে, তার নাট্যচিত্রে গ্রাম্যতার প্রাধান্য আছে। এবং এই গ্রাম্যতা ও রুচিবিকার যে এক নয়, তা বলাই বাহুল্য।

দীনবন্ধুর নাটক-প্রহসনের হাস্যরস বুদ্ধির ব্যায়াম-কৌশল বা মস্তিষ্কের বপ্রক্রীড়ায় উৎসারিত হয়নি, জীবন সম্বন্ধে ক্ষমাসুন্দর সহৃদয় সহানুভূতি থেকে তার জন্ম। জীবনের অসঙ্গতির আবিষ্কারে, তার বৈষম্য, বক্রতা ও ভ্রান্তির মূল্যায়নে তিনি একটা অসাধারণ দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন, সন্দেহ নেই; কিন্তু সেই দৃষ্টিকোণ কোন অর্থেই কুটিল ও নির্মম নয়। তাতে তীক্ষ্ণ জীবন-সমালোচনা হয়েছে বটে, কিন্তু প্রাণঘাতী পর-পীড়নের ব্যবস্থা হয়নি। তার হাস্যরস হচ্ছে সেই জাতীয় যা বুদ্ধিবৃত্ত বাক্‌চাতুর্য নয়, অসঙ্গতির সংশোধন-ইচ্ছা-সঞ্জাত বিদ্রূপ নয়, নিছক রঙ্গরসমুখী তির্যক ভঙ্গিও নয়, তা মুখ্যতঃ মানবজীবনকে বোঝার একটা বিলক্ষণ অথচ সহৃদয় কৌতুকপ্রবণতা বিশেষ। 'লীলাবতী' নাটকের হেমচাঁদ নষ্টামির চূড়ান্ত দেখিয়েও যে শেষ পর্যন্ত নিন্দার পঙ্ককুণ্ডে পড়েনি, তা কারণ স্রষ্টার প্রীতি ও সহানুভূতি সে আদায় করতে পেরেছে এবং তারই জোরে এমন কি সেই স্ত্রীরও সে মন আকর্ষণ করতে

পেরেছে যার সঞ্চিত টাকা আত্মসাৎ করতে একদিন সে দ্বিধা করে নি। এই সত্ত-আলোচিত হিউমারের দিক থেকে দীনবন্ধুর প্রহসনগুলি নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়।

নাটকের শিল্পরূপ সযত্ন অনুশীলন ছাড়া কখনও সুষ্ঠু হয়ে ওঠে না। উপন্যাসের গঠন একটু ঢিলে-ঢালা হলেও ক্ষতি হয় না, কারণ তাতে শিল্পী প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করে কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র ও সংলাপের ফাঁক পুরিয়ে দিতে পারেন। তাতে সব ঘটনাই ঘটে না, কিছু বর্ণিতও হয়। কিন্তু নাটকে নাট্যকার থাকেন আড়ালে : দৃশ্যমান ঘটনা ও শ্রূয়মান উক্তির মাধ্যমেই তার কাহিনী, চরিত্র, দ্বন্দ্ব, ক্লাইম্যাক্স, উপসংহার, চমৎকারিত্ব ইত্যাদি উপস্থাপিত হয়। তাই সেখানে নাট্যকারকে প্রতি পদেই সতর্ক থাকতে হয়, কিছুমাত্র শৈথিল্য বা অসাবধানতা দেখানো চলে না। এই সব কথা মনে রেখে বিচার করলে দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণের' শিল্পরীতির প্রশংসা করা যায় না। নাটকটির দুই অসমান শক্তির মধ্যে বহির্দ্বন্দ্ব আছে, কিন্তু গভীরতর অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। বিরোধের সূত্রপাত, ক্রমবিকাশ ও উপসংহার যতটা স্পষ্ট, তার ক্লাইম্যাক্স ও গ্রন্থিমোচন ততটা স্পষ্ট কি? ক্লাইম্যাক্স হিসেবে কোন্ বিষয়টিকে গ্রহণ করা উচিত—ক্ষেত্রমণির ওপর অত্যাচারের ঘটনাকে না গোলোক বসুর কারাবরণের ঘটনাকে? সমগ্র কাহিনীর দিক থেকে অবশ্য দ্বিতীয় ঘটনাটিই ক্লাইম্যাক্সের উদাহরণ, কিন্তু পাঠকের মনকে বেশি স্তম্ভিত করে প্রথম ঘটনাটি। নায়কের নিষ্ক্রিয়তা শিল্পের দিক থেকে অসঙ্গত, তাতে গতিক্রিয়ার অভাব ঘটেছে। নাটকের অন্তিম পর্যায়ে অনেকগুলিকে মৃত্যু আমাদের অনুভূতিকে একেবারে অসাড় করে দেয়, জীবনের গভীর কারুণ্য সম্পর্কে তেমন অবহিত করে না। এ থেকেই বোঝা যায়, 'নীল-দর্পণ' সার্থক ট্র্যাজেডি নয়, উৎকৃষ্ট মেলোড্রামা মাত্র। 'নবীন-তপস্বিনীর' প্রেরণামূলে আছে সাহিত্যিক বুদ্ধি, সাময়িক আবেগ নয়। তবু তার দ্বিধা-বিভক্ত কাহিনীতে বিশেষ গঠন-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া

যায়নি। বিজয়-কামিনীর রোমান্স ও জলধর-মালতী-মল্লিকার কৌতুককর কাহিনীর মধ্যে যোগ বড়োই ক্ষীণ। দুটি অংশের তাৎপর্য আলাদা, সুর আলাদা, রস আলাদা—তাই একই নাটকের মধ্যে তাদের গ্রথিত করার যৌক্তিকতা নেই। দ্বিতীয় কাহিনীটি এতখানি জায়গা জুড়ে আছে যে, তাকে 'নাটকীয় স্বস্তি' হিসেবেও গ্রহণ করা যায় না। 'লীলাবতী', দীনবন্ধুর নিজের মতানুসারে, অনেক আয়াস ও যত্নের দ্বারা সৃষ্টি। কিন্তু সতর্ক বিচারে দেখা যায় যে, সমস্ত নাটকটি কাহিনী-সংগঠন ও ঘটনা-বিন্যাসের দিক থেকে বিচিত্র ও জটিল, দৃষ্ট চরিত্রগুলির চেয়ে অ-দৃষ্ট চরিত্রগুলির দ্বারাই নাটকের আখ্যানবস্তু বেশি নিয়ন্ত্রিত, কিছু কিছু প্রসঙ্গ ও চরিত্র মূল কাহিনীর পক্ষে অনাবশ্যক, কোথায়ও কোথায়ও নানা ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ-সূত্র সুস্পষ্ট নয়। ভাষাও কৃত্রিম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দীনবন্ধুর নাটকের শিল্পরীতি তেমন প্রশংসনীয় নয়, নিটোল ও সুষ্ঠু নাট্যরূপের সন্ধান তার রচনায় পাওয়া যায় না। তবে গঠন দেখে বোঝা যায়, তিনি নাটকগুলির শিল্পরূপ সম্বন্ধে সতর্ক না থাকলেও তাদের অভিনয়যোগ্যতা ও ব্যবহারিক সার্থকতার দিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন। নাটক তো শুধু পাঠ্য-সাহিত্য নয়, তার অভিনয়েরও একটি দিক আছে। এবং সেদিক থেকে দীনবন্ধুর নাটক ও প্রহসনের প্রশংসাই করতে হবে। তবে তাঁর প্রহসনের গঠন নাটকের গঠনের চেয়ে উন্নততর এবং মধুসূদনের প্রহসনের চেয়ে অধিকতর উৎকৃষ্ট। প্রথমতঃ তাঁর প্রহসনে উদ্দেশ্য-মূলকতা নয়, কৌতুকহাস্যই প্রধান লক্ষ্য। 'বিয়ে পাগলা বুড়োতে' রাজীবলোচনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা ও বিগতযৌবনের কারুণ্য দেখিয়েই ঘটনাধারার পরিসমাপ্তি, কোনরকমের সংশোধন-স্পৃহায় অতিরিক্ত কোন চিত্র যোজনা করা হয়নি। 'সধবার একাদশীতেও' মূল ঘটনাবস্তুর অতিরিক্ত কোন কথা প্রহসনকার বলেন নি—নিমচাঁদের চরিত্রের নাটকীয় গুণের প্রতিই তাঁর লোভ ছিলো, তার চরিত্র সংশোধনের মহৎ উদ্দেশ্য তাঁর ছিলো না। এ থেকেই

বোঝা যায়, কোথায় থামতে হবে এ-সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলেই তাঁর প্রহসনের গঠনে শৈথিল্য নেই, অবান্তর প্রসঙ্গও নেই। শুধু তাই নয়, অনাবশ্যক চরিত্রের ভিড়ে তার প্রহসনের কাহিনী জটিল ও আচ্ছন্ন হয়ে যায়নি ; এমন কি 'সধবার একাদশীর' কেনারাম ডেপুটী, রামমাণিক্য ও ভোলা পর্যন্ত অনাবশ্যক নয়, কারণ মাতলামি ও উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্রে তাদের স্ব স্ব ভূমিকা উপেক্ষা করা যায় না। তাছাড়া তাঁর প্রহসনগুলি মধুসূদনের প্রহসনগুলির মতো অতিরিক্ত মাত্রায় সংক্ষিপ্ত নয়, আখ্যানবস্তুর পক্ষে তার উপযুক্ত পরিসর পেয়েছে। কাহিনীর মধ্যে গতি আছে এবং সেই গতি পাঠক বা দর্শককে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। 'জামাই-বারিক' তার অন্যতম প্রমাণ।

এই পরিমিত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে দীনবন্ধুর স্থান বিশিষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ। পরিচিত জীবনকে দর্শনীয় করে তোলবার প্রতিভা তাঁর ছিলো। যে সহমর্মিতায় জীবনের ভাবনা রসসিক্ত ও প্রাণপূর্ণ হয়ে ওঠে, দীনবন্ধুর মধ্যে তাঁর কোন অভাব ছিলো না। পাপীর সান্নিধ্যে পাপী, দুঃখীর ভাবানুষঙ্গে দুঃখী, মাতালের কল্পনায় মাতাল হওয়ার জন্য যে মানস-স্বাস্থ্য ও নমনীয় সৃষ্টিশক্তির প্রয়োজন, এই নাট্যকারের মধ্যে তা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিলো। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, নাট্যকারসুলভ অপক্ষপাত মনোভাব থেকে একটা সংযম-ধর্মও তিনি পেয়েছিলেন। তা যদি না হতো তবে ক্ষেত্রমণির লাঞ্ছনার দৃশ্যটি ক্রোধ ও আবেগের তাড়নায় আরও বীভৎস ও রোমহর্ষক হয়ে উঠতে পারতো। একই শিল্পী-মনে কি করে অপরিমিত সহানুভূতি ও অত্যাবশ্যক সংযম-সংহতিবোধ মিলেমিশে থাকতে পারে তা ভাবতেও অবাক লাগে। সামাজিক অভিজ্ঞতার ওপর তাঁর নাট্যসাহিত্যের প্রতিষ্ঠা, অথচ সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই অভিজ্ঞতার রসগত মূল্যকেই একমাত্র সত্য করে তোলা তখনকার দিনের কোন শিল্পীর পক্ষেই সহজ ছিলো না ; কারণ সামাজিক

কর্তব্য থেকে শিল্প-সাধনার পার্থক্য তখন সবেমাত্র স্বীকৃতি লাভ করতে শুরু করেছে। দীনবন্ধু তাঁর সামাজিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নাটক প্রহসন লিখতে গিয়ে সমাজের মঙ্গল অমঙ্গলের প্রশ্নটাকেই বড়ো করে দেখেন নি, সামাজিক 'বেসের' ওপর সাহিত্যের 'সুপারস্ট্রাক্‌চার' নির্মাণের দিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন। তাঁর সাহিত্য রচনার পেছনে সামাজিক গরজ যতটা ছিলো, সাহিত্যিক গরজ তার চেয়ে খুব কম ছিলো না। 'সধবার একাদশীর' নিমচাঁদ যখন অটলের কাজে অনুতপ্ত, তখন নাট্যকারের কল্যাণী ইচ্ছার জয়জয়-কার : কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে ব্রাণ্ডী পান করিয়ে বাগানে পাঠিয়ে দিয়ে নাট্যকার প্রমাণ করলেন যে, নিমচাঁদ সম্পর্কে তাঁর সামাজিক কৌতূহলের চেয়ে সাহিত্যিক কৌতূহলটা বড়ো। শুধু তাই নয়, রামবাবুর মারের সময় তার মুখে যে কথাগুলি শুনেছি, তাতে দর্শকের হাসি শুকিয়ে যায় না, বরং আরও প্রবল হয়ে ওঠে। অর্থাৎ নাট্যকারের কাছে লোকশিক্ষার চেয়ে প্রহসনের ধর্ম বড়ো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যেখানে সামাজিক ও সাহিত্যিক কর্তব্য প্রায় অবিচ্ছিন্ন ছিলো, সেখানে দীনবন্ধুর হাতে নাট্যসাধনা শিল্পের সম্মান পেতে শুরু করেছে। শুধু তা-ই নয়, যে মনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সামাজিক 'তথ্য' সাহিত্যের 'সত্যে' পরিণত হয়, দীনবন্ধুর রচনায় আমরা সেই মনের সাক্ষাৎ পাই। 'নীল-দর্পণের' তোরাপ নিতান্ত একটা সাময়িক বিবাদের স্থূল ক্ষেত্র থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের সেই সর্বজনীন লোকে, যেখানে পশুত্বের হাতে মনুষ্যত্বের অপমান ও মিথ্যার কাছে সত্যের পরাজয়ের বেদনার মধ্যেও কোথায়ও যেন আশা ও ভরসার ভাব আছে। নাট্যকারের মানস-সাহচর্য ছাড়া সাময়িকতার বন্ধন থেকে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের সর্বজনীন লোকে মুক্তি পাওয়া তোরাপের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। আর সে-কারণেই 'নীল দর্পণ' নাটক হিসেবে এখনও বেঁচে আছে।

দীনবন্ধুর পূর্বে সামাজিক সমস্যা নিয়ে নাটক রচিত হয়েছে—

নাট্যকারদের সমাজ-সচেতনতার নানা প্রমাণ আমরা পেয়েছি কিন্তু দীনবন্ধুর নাটকেই প্রথম সামাজিক চেতনার সঙ্গে এসে মিলেছে রাজনৈতিক চেতনা। রেনেসাঁসের আশীর্বাদে বাঙালীর সামাজিক চেতনা নানা সংস্কারমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছে বহুদিন আগেই, কিন্তু সেই নবজাগ্রত চৈতন্যে যতক্ষণ না এসে যুক্ত হয়েছে রাষ্ট্রীয় চেতনা—পরশাসনের বেদনা, ততক্ষণ 'নতুন মানুষের' জন্ম সম্ভব ছিলো না। 'নীল-দর্পণের' নবীনমাধবের মধ্যে দেখা গেছে সেই নতুন মানুষের প্রথম আভাস। বাঙালীর যে জীবন-রস-রসিকতা লোকসাহিত্যের অধঃপথে নিম্নগামী হয়ে আসছিলো, দীনবন্ধুর সৃষ্টিতে তা-ই গভীরতর রূপ লাভ করে। তা না হলে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য রুচির পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ না হয়েও, নাটকের কলাকৌশলের বিশেষ কিছু উন্নতি না ঘটিয়েও (তাঁর প্রহসনের গঠন নিন্দনীয় নয়) এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারতেন না। স্মরণ রাখতে হবে, দীনবন্ধুর নাটকের অভিনয় দিয়েই বাঙলা দেশের ন্যাশানল থিয়েটারের উদ্বোধন হয়, তাঁর নাটক নিয়ে সাধারণ নাট্যশালা জমে উঠেছিলো বলেই গিরিশচন্দ্রের চোখে দীনবন্ধু ছিলেন 'রঙ্গালয়স্রষ্টা'।

হেরাসিম লেবেডেফের বিলিতি ধরণের নাট্যাভিনয় থেকে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা (১৮৭২) পর্যন্ত বাঙলা দেশে অভিনয়-কলার যে মৃদুমন্দ ধারা, নটশ্রেষ্ঠ গিরিশচন্দ্র ঘোষে তারই কালানুক্রমিক পরিণতি। বহু শতাব্দী থেকে বাঙলা দেশে যাত্রা ও নাটগীতের মতো যে লোকনাট্যপ্রবাহ চলে আসছে, সঙ্গীত-নির্ভর গীতাভিনয় বা নূতন যাত্রার মধ্য দিয়ে তারই ঐতিহ্য গিরিশচন্দ্রের নাট্যসাহিত্যে এসে পৌঁচেছে। নবাগত ইংরেজী নাটকের স্বরূপ-লক্ষণও তাঁর নাট্যপ্রয়াসে কিছু ছায়া ফেলেছে। এর অর্থ হচ্ছে, নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র কোন আকস্মিক স্বয়ম্ভু প্রতিভা নন, তিনি উনিশ শতকের প্রথমার্ধের নাগরিক বাঙালীর প্রতিনিধি—তাদের নাট্য-সংস্কৃতির ভাষ্যকার। রেনেসাঁসের আশীর্বাদে শিক্ষিত বাঙালীর যে নূতন জীবনায়ন, তাদের মুক্ত-মনের যে সমৃদ্ধি, কাব্যের ক্ষেত্রে তারই প্রকাশ আমরা দেখেছি। শিক্ষিত মানুষের আদর্শ ও স্বপ্নের জীবন, তাদের উচ্চ ভাবুকতা ও গভীর রস-কল্পনার ছবি দেখা যায় বঙ্কিমের উপন্যাসে। কিন্তু তখনকার বাঙালীর শুধু চিত্তোৎকর্ষ নয়, তাদের বাস্তব জীবন —যে জীবনে প্রগতিশীলতার পাশেই ছিলো সংস্কারপ্রিয়তা, মুক্তবুদ্ধির সঙ্গেই ছিলো ধর্মানুরাগ, সূক্ষ্ম অনুভূতির রাজ্যেই ছিলো স্থূল রুচি—সেই জীবনের পরিচয় বিশেষভাবে গিরিশচন্দ্রের নাটকে ছড়িয়ে আছে। তার কারণ বাস্তব জীবনের সঙ্গে নাটকের সম্বন্ধ যতটা ঘনিষ্ঠ, কাব্য বা রোমান্স-উপন্যাসের সঙ্গে ততটা নয়। দ্বিতীয়তঃ দীনবন্ধুর মতো নাট্যকারেরা মোটামুটি একদিক দিয়েই বাঙালীর জীবনকে দেখবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাকে দেখবার চেষ্টা করেছেন নানা দিক দিয়ে। আর তাই তাঁর নাটক তখনকার বাঙালীর জীবনের একটা বড়ো দর্পণ।

গিরিশচন্দ্রের মনোবিকাশের ধারা আর নাটকের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে কথাটা পরিষ্কার হবে। কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে তাঁর জন্ম হয়—১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে। তাঁর পিতার নাম নীল-কমল ঘোষ। তখন পর্যন্ত বাগবাজার পুরো সহর নয়, আধা সহর আধা গ্রাম। সুতরাং তাঁর বাল্যকাল কেটেছে 'ভাগীরথী-তীরবর্তী ঘন বনচ্ছায়াচ্ছন্ন শ্যামল তৃণ-গুল্মাচ্ছাদিত শ্বাপদ-সমাকীর্ণ-বনানী বেষ্টিত সহর-পল্লীর' মধ্যে। তাঁর ঘুম ভেঙেছে হিন্দু পল্লীর কাঁসর-ঘণ্টা-শঙ্খ-ধ্বনিতে। বালক জেগে দেখেছে 'দলে দলে নরনারী ভক্তিরসাপ্লুত কণ্ঠে স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে, গীত গাহিতে গাহিতে গঙ্গাস্নানে চলিয়াছে। পর্বাহে পর্বাহে কত উৎসব, কত আনন্দ, কত সঙ্কীর্তন। বাড়ীতে তাঁহার মাতা শ্রীধরের সেবার আয়োজনে ব্যস্ত। খুল্ল-পিতামহী সন্ধ্যাকালে বালক গিরিশ-চন্দ্রকে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ হইতে কত গল্প শুনাইতেন—গিরিশ একাগ্র মনে উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিতেন।...সেই পুরাণপ্রসঙ্গ গিরিশের মনে কত কল্পনার উচ্ছ্বাস, কত বিষাদ-উল্লাস, কত মহনীয় মূর্তি, কত বরেণ্য বিগ্রহের ছবি অঙ্কিত করিয়া দিত।' এ বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়, কি মানসিক আবহাওয়ায় তিনি মানুষ হয়েছেন, তাঁর মনের গড়নে এসে যুক্ত হয়েছে কোন্ কোন্ উপাদান।

গিরিশচন্দ্রের বাল্যকালে কলকাতা তথা বাঙলা দেশে যাত্রা, পাঁচালী, কবিগান, হাফ্ আখড়াই ইত্যাদির বেশ প্রচলন ও সমাদর ছিলো। প্রাত্যহিক জীবনের টানাপোড়েনের মধ্যে এই সব লোকশিল্পই ছিলো আনন্দের উৎস—রসের আকর। প্রথম জীবনে গিরিশচন্দ্র আপন রসের পিপাসা নিয়ে যাত্রা দেখেছেন, কথকতা, পাঁচালী ও হাফ্ আখড়াই শুনেছেন, কবির লড়াইয়ের আমোদ উপভোগ করেছেন। নারায়ণ দাসের যাত্রায় প্রহ্লাদের মুখে কৃষ্ণের নামগান শুনে দর্শকদের স্তম্ভিত ও ভক্তি-করুণায় আপ্লুত হতে দেখেছেন; দেখেছেন লোকা ধোবার কণ্ঠের চণ্ডীগানে

বিগলিত শ্রোতৃ-সমাজের অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত। গিরিশচন্দ্রের শিল্পী-সত্তায় এই সব লোকশিল্পের প্রভাব ছিলো লক্ষণীয়। এমন কি কথকতাও তাঁর মনে রেখাপাত করেছিলো। এই কথকতার শিল্প-নৈপুণ্য দেখাতে গিয়েই তিনি একদিন বন্ধুগৃহে ধ্রুবচরিত্র নিয়ে কথকতা করতে দ্বিধা করেন নি। তারই ফলে জন্ম নেয় তাঁর 'ধ্রুবচরিত্র নাটক'।

মায়ের অষ্টম গর্ভের সন্তান গিরিশচন্দ্র বিধাতার অযাচিত দান মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। দেহের সূতিকা-রোগ ও অষ্টম গর্ভের সন্তান সম্বন্ধে মনের আশঙ্কার জন্যই তাঁর মা বাহ্যতঃ ছেলে সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু এক কঠিন অসুখের দিনে গিরিশ-চন্দ্র জানতে পারলেন তাঁর মায়ের প্রচ্ছন্ন অথচ অগাধ স্নেহের কথা। মাতৃচরিত্র সম্পর্কে তিনি লাভ করলেন এক নূতন দৃষ্টি। কিন্তু গিরিশের বালক-হৃদয়ের নবজাগ্রত আকাঙ্ক্ষাকে অতৃপ্ত রেখে তাঁর মা অকালে পরলোক গমন করেন। কিন্তু যতদিন জীবিত ছিলেন অন্তরের স্নেহকে প্রচ্ছন্ন রেখে পুত্রকে কঠোর শাসন করতে দ্বিধা করতেন না। ফলে অল্প বয়স থেকেই গিরিশচন্দ্রের মনে সত্যনিষ্ঠা জন্মাতে দেখি।

গিরিশচন্দ্রের প্রথম জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটেনি। কৈশোরের অন্তে তিনি পিতাকে হারান, তারপর হারান ভাই ও বোনকে। তার এই অভিভাবকহীন জীবনে দুঃখ ও দারিদ্র্যের অভাব ছিলো না। ক্রমে তিনি 'বয়াটে আখ্যা লাভ করেন, তাঁর নৈতিক চরিত্রেরও স্খলন ঘটে। বিশ বছর বয়সের পর সওদাগরী আপিসের হিসাবরক্ষকের কাজ নিয়ে গিরিশচন্দ্রের কর্মজীবন শুরু হয়। সেখানে কর্তব্য-নিষ্ঠা দেখিয়ে পদোন্নতি লাভ তাঁর মনঃশক্তির পরিচায়ক।

ভালো ছাত্র হিসেবে গিরিশচন্দ্রের কোন সুনাম ছিলো না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। সুতরাং তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন

না। এবং সেদিক থেকে তাঁকে প্যারীচাঁদ, ভূদেব, মধুসূদন, বঙ্কিম, দীনবন্ধু ইত্যাদির সমগোত্রীয় বলা যায় না। তবে লোক-চরিত্র অধ্যয়নের আকাঙ্ক্ষা ও সুযোগের অভাব তাঁর ছিলো না। 'ইহাতে মান অপমান, যশ অপযশ, নিন্দা প্রশংসা এমন কি চরিত্রের নৈতিক অধঃপতনেও তিনি দৃক্‌পাত করিতেন না। নৈতিক অধঃপতনের স্তরবিভাগে মানুষের মানসিক অবস্থার বিপর্যয়, মনোবেগ এবং ভাষা ও দৃষ্টি কিরূপ হয় তাহাও তন্ন তন্ন করিয়া জানিবার জন্য গিরিশের প্রবল পিপাসা ছিল।...এমন কি সেই অবস্থায় কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মনের ও শরীরের সঙ্গে চিন্তা ও কার্যের ধারা কি ভাবে প্রবাহিত হয় তাহার অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করিয়াছিলেন।' অন্যদিকে স্কুল-কলেজের আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় বিফল হলেও তিনি একাগ্রমনে নানা গ্রন্থপাঠে নিরত ছিলেন। এর প্রেরণামূলে ছিলো মাতুল নবীনকৃষ্ণের তর্কালোচনা ও সঙ্গী ব্রজবিহারী সোমের পরামর্শ। 'ইংরেজী সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস এমন কি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাবিজ্ঞানে পর্যন্ত তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। আবার আমাদের দেশীয় কাব্য, পুরাণ ও সাহিত্য প্রভৃতিতে তাঁহার অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইত।...কাশীরাম, কৃত্তিবাস এবং সেক্সপীয়র, মিলটন ও বায়রণ তাঁহার কণ্ঠাগ্রে ছিল। তাঁহার এরূপ তীব্র জ্ঞানপিপাসা ছিল যে তিনি প্রৌঢ় বয়সে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-সভায় বিজ্ঞান-শিক্ষা ও আলোচনার জন্য যাইতেন।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রেনেসাঁসী শিক্ষার আলোক না পেলেও গিরিশচন্দ্র নিজের চেষ্টায় কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন।

লোকসাহিত্য, বিশেষ করে যাত্রা বা গীতাভিনয়ের প্রতি যে অনুরাগ গিরিশচন্দ্রের ছিলো, তা-ই সওদাগরী আপিসের চার দেয়ালের মধ্যে তাঁকে আবদ্ধ থাকতে দেয়নি। বিশ বছর বয়স পেরিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, দেশে বিশেষ নাট্য-আন্দোলন চলেছে, কলকাতা সহরেই গড়ে উঠেছে চারটি নাট্যশালা। সখের

যাত্রার তো অভাবই ছিলো না। গিরিশচন্দ্র প্রথম পাড়ার সখের যাত্রার সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'শর্মিষ্ঠার' জন্য গান লেখেন, তারপর বাগবাজার রঙ্গালয়ে যোগদান করে 'সধবার একাদশীতে' নিমচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করেন। শুধু তা-ই নয়, প্রহসনটির জন্য তিনি প্রস্তাবনা-সঙ্গীতও রচনা করেছিলেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে গানের বাঁধনদার, যাত্রার পালা-রচয়িতা ও অভিনেতা হিসেবে তাঁর নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাটকগুলি অভিনয় করার পর বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিকে নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করতে শুরু করেন, এমন কি কালক্রমে নবীন সেনের 'পলাশির যুদ্ধও' বাদ পড়েনি। এরই মধ্যে তিনি পুরোন চাকুরী ছেড়ে দিয়ে নতুন চাকুরী নিলেন, কিন্তু তাতেও এক বছরের বেশি টিঁকে থাকেন নি। তিনি ন্যাশানল থিয়েটারে যোগদান করেন এবং অভিনয়ই তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। তারপর অভিনয়যোগ্য নাটকের অভাবে তিনি নাটক রচনা করতে আরম্ভ করেন—অভিনেতা ও গানের বাঁধনদার হন নাট্যকার। তখন তাঁর বয়স তেত্রিশ।

'আগমনীতে' গিরিশচন্দ্রের নাট্যকার জীবনের সূত্রপাত। তারপর তিনি অজস্র নাটক, প্রহসন, নক্সা, গীতিনাট্য ইত্যাদি রচনা করেন। বৈচিত্র্য ও সংখ্যায় তাঁর রচনা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিন্তু নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের আগে নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মতমত একটু বুঝে নেওয়া দরকার।

পূর্বে বলেছি, লোকসাহিত্যের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের যোগাযোগের কথা। যাত্রা বা গীতাভিনয়ের মধ্যে আর কিছু না থাক সঙ্গীতরস ছিলো এবং সেই সঙ্গীতরসের জন্যই লোকনাটকের প্রতি তাঁর আজীবন অনুরাগ ছিলো। পাশ্চাত্ত্য ধরণের থিয়েটারের মধ্যে এই সঙ্গীতরসের অভাব দেখে তিনি বেদনা অনুভব না করে পারেন নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—হৃদয়বান, আবেগপ্রবণ ও উচ্ছ্বাস-ধর্মী বাঙালীর রসচিত্তে গীতবহুল যাত্রা বা গীতাভিনয়ের প্রভাব অসামান্য। তাই তিনি মন্তব্য করেছেন—'এই শ্রেণীর সমালোচক

(অর্থাৎ যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য ভাবের বাহ্য দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার কৃত্রিম অনুকরণে মুগ্ধ) প্রথমে যাত্রার প্রতি ঘৃণা উদ্রেক করেন, ইহাতে ক্ষতিলাভ উভয়ই হইল। যাত্রায় কতকগুলা অশ্লীল ভাঁড়ামি ছিল তাহা গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বদন অধিকারী গোবিন্দ অধিকারীর মধুর রসের সঙ্গীতস্রোতও লোপ পাইল।' গিরিশচন্দ্রের নাটকের সঙ্গীত-প্রাচুর্য ও সঙ্গীত-রচনায় প্রাচীন কবিদের আদর্শানুসরণের কারণ এখানে সুস্পষ্ট।

অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্য নাটক সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র যে ধারণা পোষণ করতেন তা-ও এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি সেক্সপীয়ারের নাটক ভালোভাবেই পড়েছিলেন; ম্যাকবেথের অনুবাদ তার প্রমাণ পাশ্চাত্ত্য দেশের নাটকাভিনয়ের নানা ইতিহাসও তাঁর জানা ছিলো। শুধু তা-ই নয়, বিলিতি থিয়েটার-পার্টি যখন কলকাতায় এসে অভিনয় করতো, তখন তা ভালো করে দেখে নিতে তিনি কখনও ভুলতেন না। বিখ্যাত মার্কিন অভিনেত্রী মিসেস লুইসের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথাও এখানে স্মরণ করতে হবে। কিন্তু তৎ-সত্ত্বেও পাশ্চাত্ত্য নাটক সম্বন্ধে তাঁর জানাশুনো ঠিক মতো হয় নি বলেই মনে হয়। কারণ তিনি বলেছেন—'যাঁহারা এই যাত্রাকে থিয়েটারের সহিত প্রভেদ করেন, তাঁহাদের বোধ হয় অজানিত যে সেক্সপীয়র বেন জনসন্ প্রভৃতি মহাকবির নাটক সকল প্রথমে যাত্রার ন্যায়ই অভিনীত হইত। কবির বর্ণনায় রম্য উপবন, সাগর, বিশাল প্রান্তর, নিবিড় কানন দর্শককে বুঝিতে হইত যেমন আমাদের দেশে যাত্রার দর্শককে বুঝিতে হইয়াছিল।' গিরিশচন্দ্রের প্রধান ত্রুটি তিনি নাট্যকলা ও অভিনয়কলাকে অভিন্ন মনে করেছেন। মনে রাখতে হবে, নাট্যকল্পনা ও নাট্যরীতি এই উভয় দিক থেকে যাত্রা ও সেক্সপীয়ারের নাটকের মধ্যে বিশেষ কোন মিল নেই। তৎসত্ত্বেও গিরিশচন্দ্রের উক্তি ('মহাকবি সেক্স-পীয়রই আমার আদর্শ। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলেছি।') সেক্সপীয়ারের নাটক সম্বন্ধে ভুল ধারণারই ফল। বিদূষক চরিত্রে

লঘু ও হাস্যরসাত্মক দৃশ্যে এবং প্রেতাত্মার কল্পনায় যেটুকু অনুসরণ দেখা যায়, তা সেক্সপীয়ারের প্রভাব নিরূপণের পক্ষে নিতান্তই স্বল্প তথ্য মাত্র। আর বহিরঙ্গের দিক থেকে কিছু কিছু মিল থাকা সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্র ভিন্ন পথের অভিযাত্রী।

বাঙলা নাটকের মর্ম সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের বক্তব্য ছিলো খুব স্পষ্ট। তিনি বলেছেন—'হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম, মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।' অর্থাৎ জাতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ধর্মই বাঙলা নাটকের মর্ম হওয়া উচিত। অথচ নানা প্রবৃত্তির সংঘর্ষই সেক্সপীয়ারের নাটকের মূলকথা। এবং সে-কারণেই গিরিশচন্দ্রের নাট্যদৃষ্টির সঙ্গে সেক্সপীয়ারের নাট্যদৃষ্টির পার্থক্য অনুমেয়। জাতীয় জীবনের ভাবধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নাটক রচনার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তাঁর নিশ্চয়তা-বোধই হচ্ছে তাঁর নাট্যকল্পনার মূল প্রেরণা। নাটকের ক্ষেত্রে এই ঐতিহ্য-চিন্তা তিনি পেয়েছেন লোকসাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে, ঈশ্বর গুপ্তের ভাব-শিষ্যত্ব থেকে, 'সংবাদ-প্রভাকরে' প্রকাশিত কবিজীবনীসংগ্রহ থেকে, মনোমোহন বসুর গীতাভিনয় থেকে, বঙ্কিম-নবীনের সংগঠনাত্মক জাতীয় আদর্শ থেকে, সর্বোপরি ব্যক্তিগত জীবনে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আশীর্বাদ থেকে। তাঁর সমকালীন বাঙলায় হিন্দু তথা জাতীয় চিন্তার পুনরুজ্জীবনের কথাও এ-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে।

গিরিশচন্দ্রের পূর্বে নাটকাভিনয় ও নাট্যচর্চা বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলো সীমাবদ্ধ। বাঙলা দেশের নাট্যান্দোলন তখন পর্যন্ত দেশের বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়নি। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে যে সমস্ত অভিনয় হতো, তাতে সকলের প্রবেশাধিকার ছিলো না। কিন্তু ১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে বাঙলা নাটক ও অভিনয়-প্রচেষ্টার যোগাযোগ ঘটতে থাকে। নাটকাভিনয়ে জনরুচির দায় রক্ষার ভার এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জনবল্লভতা ও

সর্বজনবোধ্যতার দিকে ঝুঁকে পড়া বাঙলা নাটকের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। সেক্সপীয়ার বা মোলিয়েরের স্থায় গিরিশচন্দ্রও বিশেষ দর্শকগোষ্ঠীর জন্য নয়, সকল শ্রেণীর দর্শকের জন্যই নাটক লেখার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি—'আমি শুধু পণ্ডিত ও শিক্ষিতদের জন্য নাটক লিখি না—লিখি সকলের জন্য পণ্ডিত, মূর্খ, স্ত্রী, পুরুষ সকলকেই আনন্দ দান নাটকের উদ্দেশ্য। সুতরাং পণ্ডিতের স্থায় মূর্খেরও নাটকখানি কেমন লাগিল তাহা জানা দরকার।' নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের এই জনমুখী দৃষ্টির কথা তাঁর নাটক বিচারের সময় স্মরণীয়।

নাট্যকার যেখানে স্বয়ং নাটকাভিনয়ের অধ্যক্ষ ও শিক্ষাদাতা এবং নটশ্রেষ্ঠ, সেখানে নাট্যসৃষ্টিতে রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের জ্ঞান যে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হবে, তাতে সন্দেহ কি? দৃশ্য-সংযোজন, পরিবেশ-সৃষ্টি, ঘটনা-সংস্থান, সংলাপ-রচনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অভিনয়-সৌকর্যের কথাই যদি গিরিশচন্দ্র বিশেষভাবে চিন্তা করে থাকেন, তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বস্তুতঃ নাট্যশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য নিয়ে নয়, রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিনয়-শিক্ষা নিয়ে নাটক রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন বলে তাঁর সিদ্ধি ঘটেছিলো আশাতীত।

গিরিশচন্দ্র বাঙলা নাটক রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন নিতান্তই দায়ে পড়ে। মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাটকাবলীর অভিনয় হওয়ার পর বঙ্কিমের উপন্যাসের নাট্যরূপের অভিনয় হলো। তারপর নতুন নাটকের চাহিদা মেটাতে গিয়েই গিরিশচন্দ্র হন নাট্যকার। জীবনের তৃতীয় দশকের মধ্যভাগে লিখতে আরম্ভ করলেও তাঁর রচিত নাটকের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। তাঁর মৌলিক নাটকাবলীকে প্রধানতঃ চারভাগে ভাগ করা যায়—গীতিনাট্য, পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাট্য, সামাজিক নাট্য ও ঐতিহাসিক নাট্য। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে 'আগমনী' গীতিনাট্য নিয়ে নাট্যকার হিসেবে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে ও ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ছয়খানি

গীতিনাট্য রচিত হয়। সঙ্গীতরসের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত অনুরাগ ও জাতীয় রুচি এবং সমকালীন রঙ্গমঞ্চে গীতাভিনয়ের জনপ্রিয়তাই তাঁর গীতিনাট্য রচনার মূল প্রেরণা। এগুলির ভাববস্তু হচ্ছে প্রেম। স্পষ্টই বোঝা যায়, মনোমোহন বসুর গীতাভিনয়ের সংস্কার গিরিশচন্দ্রের মধ্যে প্রবল ছিলো। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, মনোমোহনের মতো তিনিও মনে করতেন—'চরিত্রগত স্বভাবের সমর্থনপূর্বক বাঙ্গালা নাটকে সৎসঙ্গীতের বাহুল্য যতই থাকিবে, ততই লোকের প্রীতির কারণ হইবে, সন্দেহ নাই। নাটকের অন্যান্য অঙ্গে কল্পনা ও বিচারশক্তি যেমন আবশ্যক, গীতি অংশেও তদপেক্ষা ন্যূন হওয়া উচিত নহে।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গীতি-নাট্যে গিরিশচন্দ্র সমকালীন জনরুচির অনুবর্তন করেছেন এবং সেই সমকালীন রুচি যতখানি লোকসঙ্গীতের ঐতিহ্যের ধারক, ততখানি গিরিশচন্দ্র জাতীয় রুচিরই সাধক।

তারপর পৌরাণিক নাটকেও দেখা যায়, তিনি মনোমোহন বসু ও রাজকৃষ্ণ রায়ের উত্তরসাধক। পৌরাণিক বিষয়ে সঙ্গীত-বহুল গীতাভিনয় রচনায় তাঁরা যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, পৌরাণিক নাটক রচনায় তা-ই ছিলো গিরিশচন্দ্রের অনুরাগের অন্যতম কারণ। তাছাড়া যে যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা, কবিগান, হাফ আখড়াই ইত্যাদির সঙ্গে ছিলো তাঁর আবাল্যের পরিচয়, তা-ও ছিলো ধর্মবিষয়ক ও ভক্তিরসাশ্রিত। ফলে তাঁর পৌরাণিক নাটক নূতন যাত্রা বা গীতাভিনয়ের উন্নততর সংস্করণ মাত্র। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এখানেই যে, যাত্রায় যেখানে রঙ্গমঞ্চের ব্যবহার ছিলো না, সেখানে পৌরাণিক নাটকে রঙ্গমঞ্চের ব্যবহার দেখা গেলো। এবং সঙ্গীতের সংখ্যাও যাত্রার চেয়ে কম হলো। এর অভিনয়পদ্ধতি অবশ্য যাত্রার মতো উচ্ছ্বাস ও আবেগপ্রধান রয়ে গেলো। ভক্তি-প্রাবল্যেরও অন্ত রইলো না। 'রাবণবধের' (১৮৮১) মূর্চ্ছিত রাবণের মুখে যে স্তব এবং রামের যে প্রতিক্রিয়ার কথা শুনেছি, তাতে ধর্মমাহাত্ম্য থাকতে পারে, কিন্তু নাটকীয় চমৎকারিত্ব

নেই। যুদ্ধবিমুখ রামচন্দ্রকে দেখে রাবণের স্বগতোক্তি একই ধরণের :

শুনিয়া মিনতি রঘুপতি করেছেন দয়া ;
এ রাক্ষস-দেহ-ভার কতদিন ব'ব আর,
করি কটুবাক্যে উত্তেজিত রোষ।

গিরিশচন্দ্রের জনপ্রিয় নাটক 'জনায়' এই ভক্তিরসের ত্রিবেণী-সঙ্গম—হরিভক্তি, গঙ্গাভক্তি ও মাতৃভক্তি। এই ভক্তির প্রকোপ থেকে জনা, বিদূষক, নীলধ্বজ ইত্যাদি কেউ দূরে সরে থাকতে পারেনি। এইভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের প্রধান সুর ভক্তি। দ্বিতীয়তঃ ভক্তি-প্রাবল্যের সূত্রে নানা অপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ হওয়ায় এই জাতীয় কোন কোন নাটকের ভাবধারা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমারেখা ঘুচিয়ে দেয়, সম্ভব-অসম্ভবের সমস্ত জ্ঞান বিপর্যস্ত করে ফেলে। 'জনার' মহাদেবকে কেন্দ্র করে অলৌকিক ঘটনার বয়ন তার একটি উদাহরণ। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, পৌরাণিক কাহিনীর অলৌকিক ঘটনা বা চরিত্রের রূপায়ণে যাত্রার মতোই বিশ্বাসযোগ্যতার কোন দায় গিরিশচন্দ্র স্বীকার করেন নি এবং ভক্তিমান মানুষের আদর্শে নিঃসন্ধিগ্ধ চিত্তে অলৌকিক উপকরণ সমাবেশ করেছেন। এ-প্রসঙ্গে সেক্সপীয়ারের নাটকের কথা উল্লেখ করে লাভ নেই, কারণ সেক্সপীয়ার তাঁর নাটকে যে কলাকৌশলে অপ্রাকৃত উপাদান ব্যবহার করেছেন এবং সমগ্র কাহিনীর মধ্যে তাদের তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছেন, গিরিশচন্দ্র কখনও সেই জাতীয় কলাকৌশল ও তাৎপর্য সৃষ্টি করতে পারেন নি। সকলের চেয়ে বড়ো কথা, গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে বস্তু-সমাবেশ নির্দ্বন্দ্ব ও সরল—দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে কাহিনী ও চরিত্র বিকাশের কোন চেষ্টা নেই। প্রচলিত বা পরিচিত উপাখ্যানকে পরিবর্তিত করে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত করার ইচ্ছা বা প্রয়াস না থাকায় তাঁর পৌরাণিক নাটকের মধ্যে মৌলিকতা নেই বলে মনে হয়। এবং সেদিক থেকেও তা যাত্রার অনুরূপ।

তাই একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন - 'গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকসমূহ আলোচনা করিলেই মনে হইবে যে সেইগুলি অনেকাংশে যাত্রালক্ষণাক্রান্ত। যাত্রার ন্যায় তাঁহার নাটকেও ভক্তিরসের প্রাবল্য, এবং অলৌকিক, অপ্রাকৃত ব্যাপারের অবাধ সমাবেশ রহিয়াছে। নাটকের চরিত্রগুলিরও কোনো স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা ফুটিয়া উঠে নাই, তাহাদের ক্রিয়াকর্ম নিবস্তুর কোন ধর্মভাব অথবা দেবমাহাত্ম্য প্রকাশ করিবার জন্যই বিশেষভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।'

অন্যদিকে তাঁর ভক্তিমূলক নাটকের বৈশিষ্ট্য পৌরাণিক নাটকের মতোই। পৌরাণিক নাটকেব ভাববৃত্ত ও গঠনপদ্ধতিই এদের মধ্যে অনুসৃত। 'চৈতন্যলীলা' (১৮৮৬), 'বুদ্ধদেব-চরিত' (১৮৮৭), 'রূপ-সনাতন' (১৮৮৮), 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর (১৮৮৮) 'পূর্ণচন্দ্র', (১৮৮৮), 'করমেতিবাই' (১৮৯৫), 'নসীরাম' (১৮৯৬ , 'কালা-পাহাড়' (১৮৯৬); 'শঙ্করাচার্য' (১৯১০) ইত্যাদি নাটকে ঐতিহাসিক সূত্র কোথায়ও স্পষ্ট, কোথায়ও বা ক্ষীণ , কিন্তু সবত্রই ভক্তিবাদ ও মহাপুরুষতত্ত্ব প্রধান। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরিত্রের অবতারত্ব বা মহাপুরুষত্ব ধরে নেওয়ায় দর্শকের নাট্য-কৌতূহল বজায় থাকে না। অর্থাৎ তাঁর পৌরাণিক নাটকের ঘটনা-বিন্যাস যেমন নিরঙ্কুশভাবেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যেব অভিমুখে এগিয়ে গেছে তেমনিভাবেই এগিয়ে গেছে তাঁর ভক্তিমূলক নাটকের ঘটনাধারা। তাছাড়া একটা অলৌকিক ভাবমণ্ডলের মধ্য দিয়ে এই জাতীয় নাটকেরর প্রধান চরিত্রটি রূপায়িত হওয়ায় তাঁর সমগ্র জীবনের ক্রমবিকাশের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। চরিত্রমিছিলেও দুটো শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়—হয় অবতার, নয় ভক্ত; কোথায়ও কোথায়ও ভক্ত ও ভগবান একাকার হয়ে যাওয়ায় গৌড়ীয় ভক্তি-বাদের চরম প্রকাশ ঘটেছে।

গিরিশচন্দ্রের ভক্তিমূলক নাটক পৌরাণিক নাটকের মতোই জনপ্রিয় হয়েছিলো। তার কারণ স্পষ্ট। পৌরাণিক নাটকে যেমন

তিনি বাঙলার নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতির ওপর নির্ভর করেছিলেন এবং সেই নির্ভরতা বশতঃ যে সমস্ত পৌরাণিক কাহিনী পারিপার্শ্বিক জলবায়ুর মতোই বাঙলা দেশের নিজস্ব সম্পদে পরিণত একমাত্র তাদেরই দ্বারস্থ হয়েছেন, তেমনি ভক্তিমূলক নাটকেও তিনি ধর্মসাধকদের ইতিহাসসম্মত ব্যক্তিত্ব নয়, বাঙলা দেশের জনশ্রুতির অনুগামী ও সহৃদয় ধর্মবিশ্বাসের অনুকূল ব্যক্তিত্বেরই ছবি এঁকেছেন। কৃষ্ণের জন্য বিল্বমঙ্গলের আকৃতির মধ্যে শুনতে পাওয়া যায় চৈতন্যের কণ্ঠস্বর, নসীরামের মুখে ধ্বনিত হয়েছে পরমহংসদেবের ভগবদ্বাক্য। বাঙালীর হৃদয়ের সঙ্গে এমনিতর যোগ রয়েছে বলেই গিরিশচন্দ্রের ভক্তিমূলক নাটকের অসামান্য জনপ্রিয়তা দেখা গেছে।

গিরিশচন্দ্রের সমগ্র নাট্যসাধনার মূলে ছিলো এক সামাজিক শক্তি। এবং সে-শক্তি হচ্ছে বাঙালীর সহজ ধর্মবিশ্বাস ও অধ্যাত্ম-বোধ। লোকসাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ, মনোমোহন বসুর গীতাভিনয়ের আদর্শ ও নিজের জীবনে পরমহংসদেবের প্রভাব থেকেই তিনি নাট্যসাধনার এই বিশেষ পথটি বেছে নিয়েছিলেন, একথা পূর্বে বলেছি। অথচ মনোমোহন বসু ছাড়া তাঁর অন্যান্য পূর্বসূরীর নাটকাবলীতে সামাজিক অন্যায় ও কু-প্রথাই প্রধান উপজীব্য বিষয়। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে—রামনারায়ণ, উমেশচন্দ্র (মিত্র), মধুসূদন, দীনবন্ধু ইত্যাদির আদর্শ গিরিশচন্দ্রের লক্ষ্য ছিলো না। তার কারণ, তিনি কোন বাস্তব দর্শন বা সামাজিক ন্যায়বোধের অধিকারী ছিলেন না। বস্তুনির্ভর দৃষ্টি, সামাজিক কৌতূহল ও প্রত্যক্ষ জীবন সম্পর্কে কোন মমত্ববোধ না থাকায় তিনি সমকালীন মানুষের বহমান ধারা সম্পর্কে কোন ব্যাপক ও গভীর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন নি বা সুবিচার করতে সমর্থ হন নি। যে সমস্ত অর্থ নৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক কারণে মানুষের জীবন ভাঙে গড়ে, অন্তঃসত্তার গভীরে যে জাতীয় আলোক-পাতে জীবন-ভোগের সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত হয়—এক কথায় যাকে

বাস্তব জীবন-রস-রসিকতা বলে—গিরিশচন্দ্রের ধ্যানে, মননে ও শিল্পে তার কোন গুরুত্ব ছিলো না। দীনবন্ধুর সর্বব্যাপিনী সহানুভূতিও গিরিশচন্দ্রের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। সামাজিক নাটক ও প্রহসনে তাঁর মন ঘুরে বেড়িয়েছে একটা নিতান্তই সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে—উত্তর কলকাতার ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং বস্তিবাসী নিম্ন শ্রেণীর মানুষের ছোট্ট বৃত্তের ভেতরে। ধর্মবিশ্বাস তো সাংসারিক মানুষের একটা ভগ্নাংশ মাত্র এবং সে-কারণেই গিরিশচন্দ্রের নাট্যসাধনায় বাস্তব মানুষের ব্যাপক জীবন-জিজ্ঞাসার বিশেষ কোন ছবি নেই। তাঁর সামাজিক নাটক ও প্রহসন তাই বিষয়ের দিক থেকে প্রশংসার দাবি করতে পারে না।

তাঁর মতে, ধর্মই বাঙলা নাটকের যথার্থ বিষয় এবং পারিপার্শ্বিক সমাজ নিয়ে নাটক লেখা নর্দমা ঘাঁটারই নামান্তর। এমনিতর নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে কি কখনও সার্থক নাটক লেখা যায়? তাই অসামান্য জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯) ভালো নাটক হয়নি। 'হারানিধি' (১৮৯০), 'মায়াবসান' (১৮৯৮), 'বলিদান' (১৯০৫), 'শাস্তি কি শান্তি' (১৯০৮) ও 'গৃহলক্ষ্মী' (১৯১১) নাটকের সাফল্যও স্বীকার করে নেওয়া যায় না। সমকালীন বাঙলা দেশের কতকগুলি সমস্যা—বিধবাবিবাহ, পণপ্রথা, মদ্যপান, জাল-জুয়াচুরি, প্রতারণা, হত্যা ইত্যাদি তাঁর নাটকে স্থান পেয়েছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু নাট্যকারের কোথায় সেই গভীর অন্তর্দৃষ্টি যার দ্বারা সমাজ-সত্তার সঙ্গে আত্মবোধের সংঘর্ষের রূপরেখা চেনা যায়? জীবনের বহির্ভাগের কতকগুলি ঘটনার একত্র সমাবেশ করতে পারলেই কিংবা কিছু কিছু বিক্ষোভ, ব্যভিচার, বিকৃতি ও দ্বন্দ্বের নির্দেশ দিতে পারলেই কি সুগভীর জীবন-সমস্যার প্রকটন হয়? গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক পড়লে মনে হয়, তিনি যেন অন্তর-প্রেরণা ও সহানুভূতির বশে নয়, অন্যের তাড়নায় জীবনের বহিরঙ্গে উপস্থিত হয়ে তাড়াতাড়ি দেখে নিয়েছেন কতকগুলি ফুটো-ফাটল, খোঁচ-খাচ, অসঙ্গতি-অন্যায়, আবর্তন-আলোড়ন এবং তারই আদলে

জোড়াতালি দিয়ে জীবনের একটা খসড়া দাঁড় করিয়েছেন। অর্থাৎ পাপ বা বিকৃতির প্রাচুর্যই যেন জীবন। সেক্সপীয়ারের নাটকেও পাপের নানা চেহারা ফুটেছে, নানা দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ অপঘাত-মৃত্যু দেখা দিয়েছে—কিন্তু মানুষের নীতিবোধের সঙ্গে দুর্দম প্রবৃত্তির নিরন্তর সংঘর্ষ সত্ত্বেও জীবন সম্পর্কে একটা গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও রসনিবিড় উপলব্ধির প্রকাশ সেখানে দেখা যায়। সেক্সপীয়ার মূলতঃ জীবন-সৌন্দর্যেরই উপাসক। গিরিশচন্দ্রের কল্পনা ও মননে কোথায় সেই মহৎ জীবন-প্রতীতি? নানা ত্রুটি সত্ত্বেও 'নীল-দর্পণে' জীবনের যে সত্য অভিব্যক্ত, প্রচণ্ড আঘাতের মুখে দাঁড়িয়েও তোরাপের নিজের মধ্য থেকেই শক্তি সংগ্রহের যে বন্য পৌরুষ দেখা যায়—গিরিশচন্দ্রের নাটকে তা থাকলেও খুশির কারণ ছিলো। নিমচাঁদের প্রচ্ছন্ন আত্মধিক্কার কিংবা স্ত্রী-ঠকানো হেমচাঁদের স্ত্রীর প্রতি দুর্বলতায় যে জীবন-প্রতীতি নিহিত, গিরিশচন্দ্রের লেখনীকে তা উদ্বুদ্ধ করেনি।

কয়েকটি গীতিনাট্য ও অনেকগুলি পৌরাণিক নাটক লেখার পর গিরিশচন্দ্র তাঁর সর্বাধিক পরিচিত সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল' রচনা করেন। নাট্যকার জীবনের মধ্যভাগে সামাজিক নাটকের দিকে এই দৃষ্টিপাত প্রমাণ করে যে, এই জাতীয় নাটক রচনায় তাঁর বিশেষ কোন উৎসাহ বা আগ্রহ ছিলো না। দ্বিতীয়তঃ নাটকটির কাহিনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ট্র্যাজেডির স্বরূপ-লক্ষণ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র অবহিত ছিলেন না কিংবা অবহিত থাকলেও বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করার চেষ্টা করেন নি। যোগেশের সুখের দিনের কোন চিত্র নাটকে নেই, তাই ব্যাঙ্ক ফেলের মধ্য দিয়ে সর্বনাশের আবির্ভাব ও পরিমাণ পাঠককে তেমন বিচলিত করে না। জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির পটভূমিকায় দুঃখের ছবি আঁকলে তা আরও ট্র্যাজিক ও হৃদয়গ্রাহী হতো, সন্দেহ নেই। তৃতীয়তঃ মহান ও বলিষ্ঠ চরিত্রের পতনই যথার্থ ট্র্যাজেডির আস্বাদ দেয়, দুর্বল চরিত্রের পতন শুধু প্যাথেটিক বলে মনে হয়। যোগেশের সকল গুণই শোনা কথা:

তার ব্যবসায়ে সততা, পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও উৎসাহের কাহিনী তার নিজের দীর্ঘ বক্তৃতায় শুনেছি। কিন্তু তার কোন বিশ্বাসযোগ্য চিত্র নাট্যকারের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। শুধু প্রথম দৃশ্যে মাতার সঙ্গে সশ্রদ্ধ ব্যবহার, মাতৃভক্তি বশতঃ তার সকল প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া এবং স্বোপার্জিত সম্পত্তি মা ও ভাইদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার প্রস্তাবে তার আভাস আছে। কিন্তু এ দৃশ্যে মদের প্রতি তার আসক্তিও দেখেছি। তারপর সমগ্র নাট্যকাহিনীতে আমরা দেখেছি সেই যোগেশকে, যে মদ খেয়ে মাতলামি করে বেড়ায়, ভিক্ষে করে পয়সা সংগ্রহ করে, উপবাসী ছেলের হাত থেকে পয়সা কেড়ে নিয়ে মদ কেনে, স্ত্রীকে প্রহার করতে দ্বিধা করে না ইত্যাদি ইত্যাদি। এর ফাঁকে ফাঁকে সৎ জীবনের স্মৃতি-রোমন্থন নিতান্তই তুচ্ছ। সুতরাং যোগেশ ট্র্যাজেডির উপযুক্ত নায়ক নয়, তার সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়ার পেছনে কিছুটা রয়েছে তার অতিরিক্ত মদ্যাসক্তি ও সংগ্রাম-শক্তির অভাব। যে নাটকের নায়ক দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে বারেকের জন্যও উঠে দাঁড়ায় নি, কোন শুভ মুহূর্তেও নিজের মধ্যে লড়াইয়ের শক্তি অনুভব করেনি সে ট্র্যাজেডির নায়ক হতে পারে না। চতুর্থতঃ রমেশ ভিলেন হলেও মানুষ নয় কি? সে কি পশু যে, তার মধ্যে মানুষের কোন লক্ষণই পাওয়া যাবে না? অথচ নাটকে তাকে দেখে তা-ই মনে হয়। ঠাণ্ডা মাথায় স্বার্থের নেশায় সে ষড়যন্ত্র ও সর্বনাশের জাল বুনে চলেছে: কোথায়ও কিছুমাত্র চাঞ্চল্য নেই, দুর্বলতা নেই। এই স্বার্থান্ধ হৃদয়হীন অমানুষটির ক্রিয়াকলাপে পারিবারিক সর্বনাশ ত্বরান্বিত হয়েছে, দুঃখের কালিমা কয়েকদিনের মধ্যেই গাঢ়তর হয়েছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু মানুষের চরিত্রের মঙ্গল-সৌন্দর্য না হোক স্বভাব-সৌন্দর্যও কিছুমাত্র প্রতিভাত হয়নি। মনে রাখতে হবে, সেক্সপীয়ারের নাটকের ভিলেনরা নানা অপকর্ম সত্ত্বেও জীবনের বিকৃত দিকটাকে চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা দেয় না, গভীর জীবন-বিশ্বাস ও স্বভাব-সৌন্দর্যের দিকেই দর্শকের দৃষ্টিকে শেষ

পর্যন্ত ফিরিয়ে আনে। পঞ্চমতঃ 'প্রফুল্ল' নাটকের প্রধান পুরুষ-চরিত্রগুলির কেউ সুস্থ নয়—শুধু মেয়েদের মধ্যেই বেঁচে আছে যা কিছু আদর্শনিষ্ঠা, সদ্বিবেচনা ও ত্যাগধর্ম। এ এক আশ্চর্য অবস্থা! জগমণি যতটা নারী, তার চেয়ে অনেক বেশি পুরুষ এবং এ-রকমের একটি ধূর্ত, দুষ্টবুদ্ধি-সম্পন্ন ও বিকারগ্রস্ত নারী-চরিত্র নাট্যকারের উদ্ভট মনোবৃত্তি থেকেই জন্ম নিয়েছে, বাস্তব সমাজে তার অস্তিত্ব অকল্পনীয়। মনে হয়, জগমণির অসঙ্গত পুরুষালি দর্শকের স্থূল রুচিকে আকর্ষণ ও বিকৃত প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলার একটা উপায় মাত্র। এক কথায়, 'প্রফুল্ল' নাটকের গার্হস্থ্য-চিত্র, বিশেষতঃ পুরুষের সমাজ-চিত্র যে সঙ্গত ও স্বাভাবিক নয়, নারী জগমণির অতিরঞ্জিত পুরুষালি সে-কথা আরও বেশি করে স্মরণ করিয়ে দেয়।

মন্মথমোহন বসু বলেছেন, গিরিশ-যুগে বাঙালীর গার্হস্থ্য-জীবনের মধ্যে রোমান্টিক নাটকের উপযুক্ত উপাদানের অভাব ছিলো এবং পণপ্রথা, ভ্রাতৃবিরোধ, গ্রাম্য দলাদলি, জ্ঞাতিশত্রুতা, মদ ও বেশ্যাসক্তির প্রতিক্রিয়াজনিত ভাঙন, জমিদারের অত্যাচার ইত্যাদি মাত্র বাঙালীর নিস্তরঙ্গ গার্হস্থ্য-জীবনে কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি করতো। তার ফলে উচ্চশ্রেণীর ও গম্ভীর প্রকৃতির সামাজিক নাটক লেখা সহজ ছিলো না। মন্মথমোহনের এ কথা যদি সত্য হয়, তবে গিরিশচন্দ্রের সিরিয়াস্ নাটক লেখা উচিত হয়নি, সামাজিক বা পারিবারিক জীবনের কু-রীতিগুলিকে অবলম্বন করে প্রহসন বা নক্সা লেখাই উচিত ছিলো। তাছাড়া গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের ব্যর্থতার কারণ তার বিষয়বস্তু নয় (ভ্রাতৃবিরোধ বা মদ-খাওয়া নিয়েও ভালো নাটক লেখা যেতে পারে), যথার্থ ট্র্যাজেডিসুলভ নাটকীয় সংগঠন-শক্তি ও গভীর জীবন-দৃষ্টির অভাব। অন্যদিকে পারিবারিক ক্ষেত্রে যোগেশের মদ্যাসক্তি ও রমেশের স্বার্থপরতা যেটুকু আলোড়ন তুলেছে, তাকে গিরিশচন্দ্র ঠিক মতো কাজে লাগাতে পারেন নি বলেই সিদ্ধি তাঁর ঘটেনি। সবচেয়ে

বড়ো কথা, উনিশ শতকের নতুন পরিস্থিতি ও নবজাগরণ সাধারণ বাঙালীর পারিবারিক জীবনেও যে একটু আধটু 'আধুনিক আবহাওয়ার' সৃষ্টি করেছিলো 'নীল-দর্পণ' থেকে তা প্রমাণ করা যায়। আগ্রহী দৃষ্টি নিয়ে খুঁজলে গিরিশচন্দ্র নিশ্চয়ই নতুন জীবন-সমস্যা বা জীবন-জিজ্ঞাসার দেখা পেতেন। সুতরাং স্বয়ং নাট্যকারের অভিনয়-ক্ষমতায় সুখ্যাত হলেও, পারিবারিক ভাঙনের মর্মান্তিক চিত্র দেখে পরিবারপ্রেমিক বাঙালী দর্শক খুশি হলেও, কিছু কিছু 'সিচুয়েসান' (যেমন যাদবের হাত থেকে যোগেশের পয়সা কেড়ে নেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি) দর্শকের আবেগপ্রবণ চিত্তকে উদ্বেলিত করতে পারলেও শিল্পকর্ম হিসেবে 'প্রফুল্ল' নাটক সার্থক নয়। তেমনি প্রশংসা করা যায় না 'হারানিধি', 'মায়াবসান', 'বলিদান', 'শাস্তি কি শান্তি' ও 'গৃহলক্ষ্মীর'; কারণ গিরিশচন্দ্রের সব সামাজিক নাটকেরই এক প্যাটার্ণ। এক জন সমালোচক যথার্থই বলেছেন —'তাঁহার সব (সামাজিক) নাটকে একই রকম ঘটনা এবং একই ধরণের চরিত্রের পুনরাবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকখানি নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হইতেছেন পরিবারের কর্তা, বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার আঘাতে তিনি বিকৃত মস্তিষ্ক ও অসংলগ্নপ্রলাপী হইয়া উঠিয়াছেন। যোগেশ, হরিশ, করুণাময়, প্রসন্নকুমার, কালীকিঙ্কর এবং উপেন্দ্রনাথ ইহারা মূলতঃ একই চরিত্র। এই ধরণের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র খুব মনোহর অভিনয় করিতেন, সম্ভবতঃ তিনি নিজের অভিনয়োপযোগী ভূমিকার কথা চিন্তা করিয়াই প্রত্যেক নাটকে একই রকম চরিত্র বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।' অন্তর্দ্বন্দ্বের অভাব, সত্যিকারের ট্র্যাজিক কল্পনার অনুপস্থিতি, পাইকারি মৃত্যুর ঘটনা, থানা-পুলিশ আইন-আদালত বিষ-খুন ইত্যাদির বাহুল্য দেখে মনে হয়, গিরিশচন্দ্র 'নীল-দর্পণের' ত্রুটিগুলি অনুসরণ করেছেন, কিন্তু গুণগুলি ধরতে পারেন নি। 'হারানিধির' ভিলেন মোহিনীর কন্যা হেমাঙ্গিনীর প্রতি স্নেহ একটু সুস্থ মনোভাবের পরিচায়ক, তবে 'মায়াবসানের' প্রবীণ

কালীকিঙ্করের প্রতি পতিতালয় থেকে উদ্ধারপ্রাপ্তা বৈষ্ণবীকন্যা রঙ্গিণীর নিষ্কামপ্রেম অস্বাভাবিক চিন্তার ফল।

ঐতিহাসিক নাটকে গিরিশচন্দ্রের আদর্শ ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজনৈতিক চেতনার ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করেছি এবং সেই ইতিহাসে হিন্দুমেলার (১৮৬৭) গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছি। ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পরেই (১৮৭২। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ!') জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে নাট্যকার জীবনের উদ্বোধন হয়, তাতে দেশানুরাগের প্রাধান্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আঠারো বছর বয়সে হিন্দুমেলার প্রভাবেই তিনি রচনা করেছিলেন সেই সুখ্যাত 'উদ্বোধন' কবিতা—'জাগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান! মাকে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান?' তাঁর এই নবজাগ্রত দেশানুরাগ 'পুরুবিক্রম নাটক' (১৮৭৪), 'সরোজিনী নাটক' (১৮৭৫) ও 'অশ্রুমতী নাটকে' (১৮৭৯) কম-বেশি অভিব্যক্ত। নাট্যক্ষেত্রে পূর্বসূরীর এই ইতিহাস-প্রীতি ও দেশানুরাগের আদর্শই গিরিশচন্দ্রের সম্মুখে ছিলো। তবে অন্তরের দিক থেকে রাজনৈতিক দেশানুরাগের চেয়ে ধর্মীয় দেশানুরাগের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিলো বেশি। আর সে-জন্যই বোধ হয়, তাঁর প্রথম দিকের ইতিহাসাশ্রিত নাটকগুলিতে —'আনন্দ রহো' (১৮৮১), 'চণ্ড' (১৮৯০) ইত্যাদিতে দেশাত্মবোধের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেনি—তাতে ইতিহাসের অস্পষ্ট সূত্রে নাট্যকারের নানা নৈতিক আদর্শেরই উদ্‌ঘোষণ হয়েছে। কিন্তু বঙ্গ-বিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিশ শতকের গোড়ার দিকে যে দেশাত্মবোধের প্রবল জাগরণ ঘটে, বৃদ্ধ গিরিশচন্দ্রের অন্তরেও তা আলোড়ন না এনে পারেনি। এই সময়ে তাঁর দেশাত্মবোধের পরিচয় নবীন সেনের সঙ্গে পত্রালাপেও অভিব্যক্ত। ইতোমধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্যে' দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটকের নতুন যুগ শুরু হয়ে যায়। 'প্রতাপাদিত্যের' মঞ্চসাফল্যের

জন্য রঙ্গালয়-কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে গিরিশচন্দ্র দেশপ্রেমের আদর্শ নিয়ে তিনটি ঐতিহাসিক নাটক লেখেন—'সিরাজদৌল্লা' (১৯০৬), 'মীরকাসিম' (১৯০৬) ও 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৭)। এর মধ্যে প্রথম নাটকখানি নাট্য-প্রচেষ্টা হিসেবে প্রশংসনীয়। প্রথমতঃ সমকালীন রাজনৈতিক ভাবাবেগের পক্ষে তৃপ্তিকর দেশপ্রেমমূলক সংলাপ এতে সংযোজিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার দিক থেকে নাটকটির সার্থকতা অনস্বীকার্য। তৃতীয়তঃ দেশপ্রেমের নাটকীয় ভাষ্য হলেও 'সিরাজদৌল্লায়' সংযমের পরিচয় আছে। চতুর্থতঃ সিরাজের চরিত্রকে ট্র্যাজেডির উপযুক্ত রূপ দিতে গিয়ে তার প্রাক্-নবাব জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা বাদ দিয়ে নবাবী পর্বের প্রজাবৎসল, পত্নীপ্রেমিক ও স্নেহপ্রবণ দিকটির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। পঞ্চমতঃ আদর্শ নবাব সিরাজের একটি চারিত্রিক দুর্বলতার রন্ধ্রপথে পতনের সূত্র নির্দেশ করে নাট্যকার ট্র্যাজিক রস ঘনীভূত করার চেষ্টা করেছেন। ষষ্ঠতঃ প্রেমচাচার চরিত্র ছাড়া অন্যান্য চরিত্রের নাট্যোপযোগিতা ও সার্থকতা মোটামুটি স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে,—ঐতিহাসিকতা, দেশানুরাগ, চরিত্র-চিত্রণ, গঠন-প্রণালী ইত্যাদির দিক থেকে 'সিরাজদৌল্লা' গিরিশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। অবশ্য তাঁর 'মীরকাসিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজী' 'সিরাজদৌল্লার' তুলনায় নিকৃষ্টতর নাটক।

প্রহসনের যে নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহ্য গিরিশচন্দ্রের সম্মুখে ছিলো। এর এই বিশেষ ক্ষেত্রে পূর্বসূরী মধুসূদন ও দীনবন্ধু যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, গিরিশচন্দ্রের হাতে তার উন্নতি দূরে থাক অবনতি ঘটেছে। আসল কথা, পূর্ববর্তীদের সকৌতুক জীবন-দৃষ্টি, সরস কৌতুকবোধ ও সদিচ্ছা-প্রণোদিত ব্যঙ্গপ্রবণতা তাঁর ছিলো না। তাছাড়া বাস্তবজীবন সম্পর্কে যে অন্তর্দৃষ্টি ও সহানুভূতি থেকে অনেক সময় সংজ্ঞাত ও অসংজ্ঞাত কৌতুকহাস্য জন্ম নেয়, গিরিশচন্দ্র ছিলেন তা থেকে বঞ্চিত। ফলে 'সপ্তমীতে বিসর্জন' 'ভোট-মঙ্গল', 'বেল্লিক-

বাজার', 'বড়দিনের বকশিশ', 'পাঁচ কনে', 'সভ্যতার পাণ্ডা' ইত্যাদি পঞ্চরং বা প্রহসনগুলির সামাজিক তাৎপর্য কিছু নেই, শুধুই আমোদের উপকরণ মাত্র। যেখানে ব্যঙ্গ আছে, সেখানেও অব্যর্থলক্ষ্য নয়। উত্তর কলকাতার নিচু স্তরের জীবনের ইতরতা ও কদর্যতার আবহাওয়া তাদের উন্নত রসসৃষ্টিতে পরিণত হতে দেয়নি। ভাব ও ভাষা উভয় দিক থেকেই রচনাগুলি গিরিশচন্দ্রের সম্মানের অনুকূল নয়।

এবার রেনেসাঁসী সাহিত্যের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের স্থান নির্দেশ করা প্রয়োজন। উনিশ শতকের নবজাগরণ বাঙালীর সামনে নতুন জীবনের দ্বারোদ্ঘাটনে যে চিত্তমুক্তির সুযোগ এনে দিয়েছিলো, গিরিশচন্দ্রের নাট্যসাধনায় তার কি ছবি ভেসে উঠেছে, তা একবার বুঝে নেওয়া উচিত। তাঁর বিপুল নাট্যপ্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর বলা যায়, তাঁর পৌরাণিক নাটকের সংখ্যা ও জনপ্রিয়তা বৃহত্তর জাতীয় জীবনে রেনেসাঁসের প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের সন্দিহান করে তুলে। কারণ বাস্তব জীবনের অগ্রগতির একটা বড়ো মাপকাঠি হচ্ছে নাটক, এ-কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। অন্য দিকে গিরিশচন্দ্রের গুরুতর অপরাধ, মধুসূদন ও বঙ্কিমের মতো নবযুগের সন্তান হিসেবে জাতীয় সংস্কৃতির কোন নতুন ব্যাখ্যা না দিয়ে তিনি গতানুগতিক ও সংরক্ষণশীল জনরুচির দাসত্ব করে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতো আমিও মনে করি, যুক্তি ও বিচারের ওপর ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত না করার ফলে তিনি উনিশ শতকের বাঙালীর মানস-জগৎকে এগিয়ে দেওয়া দূরে থাকুক তাকে যেন দুই-তিন শতাব্দী পেছিয়ে দিয়েছেন। সাহিত্যিকের কর্তব্য শুধু জাতির মর্মস্থান আবিষ্কারে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, ভবিষ্যতের দিকে সমাজ ও মানুষকে এগিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। তবে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের কৃতিত্বও আছে। ঈশ্বর গুপ্তের পর থেকে লোকায়ত ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার যে দায় শিক্ষিত

সম্প্রদায় অস্বীকার করে আসছিলেন, তারই গুরুত্ব গিরিশচন্দ্র নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পৌরাণিক নাটকে। রেনেসাঁসের মধ্য দিয়ে যে নতুন মানসিক ঋদ্ধি আমাদের ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় লাভ করেছেন, তার সঙ্গে লোকসংস্কৃতির সাযুজ্য না রাখার বিপদ সম্পর্কে আমরা যেন তার আগে ঠিক সচেতন ছিলাম না। গিরিশ-চন্দ্রের সামাজিক নাটক ও প্রহসন দেখে মনে হয়, দীনবন্ধুর পর বাঙলা নাট্যসাহিত্যের কোন উন্নতি ঘটেনি। গভীর জীবন-জিজ্ঞাসা ও বাস্তব-চেতনা না থাকায় তাঁর সামাজিক নাটক ও প্রহসনগুলিতে বাঙালীর কোন নতুন চৈতন্য বা প্রগতিশীল মানসিকতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তবে যুগের রীতি অনুযায়ী বহুকালাগত কু-প্রথাগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি সদিচ্ছার পরিচয় দিতে দ্বিধা করেন নি। ঐতিহাসিক নাটকে প্রথম দিকে নৈতিক আদর্শকে, শেষ দিকে দেশাত্মবোধকে রূপায়িত করে গিরিশচন্দ্র জাতীয় কর্তব্য সম্পন্ন করে গেছেন, সন্দেহ নেই।

সত্যের খাতিরে স্বীকার করতেই হবে, গিরিশচন্দ্রের হাতে বাঙলা নাট্যশিল্পের সমৃদ্ধি বা নাট্যরুচির উন্নতি ঘটেনি। বাঙলা নাটকের প্রারম্ভে ইংরেজী নাটকের যে শুভসূচক প্রভাব দেখা যায়, তা থেকে তাঁর দূরে সরে থাকা* বা গীতাভিনয়ের শিল্পাদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়ার ('জনা' প্রভৃতিতে সেক্সপীয়ারের প্রভাব এমন কিছু লক্ষণীয় নয়) ফলেই নাট্যশিল্প উন্নত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ সাহিত্যিক প্রেরণা নয়, রঙ্গালয়ের তাগিদে নাটক রচনা করায় তাঁর নাটক হয়ে পড়েছে শিল্পসৌষ্ঠববঞ্চিত ও গভীরচিন্তাবর্জিত। অন্যদিকে ব্যক্তিগত জীবনে আনুষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষার অভাব, রঙ্গালয়ের আবহাওয়া ও উত্তর কলকাতার বিশেষ পরিবেশের জন্য রুচির পরীক্ষায় গিরিশচন্দ্রের সর্বাঙ্গীণ সিদ্ধি আসে নি। তবে স্বীকার

* 'ভিন্ন দেশে ভিন্নমস্তিষ্কপ্রসূত নাটক ভিন্নভাবাপন্ন হইয়া থাকে ,...সকল বস্তুই দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী। সেই হেতু ভিন্ন দেশস্থ বা ভিন্ন সময়ের নাটক সুপাঠ্য হইলেও তাহার অনুকৃত রচনা আদরণীয় হয় না'—গিরিশচন্দ্র।

করতেই হবে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো সংস্কৃত নাটকের উদ্দেশ্যহীন অনুবাদে আত্মনিয়োগ না করা এবং অবাস্তব আদর্শের চেয়ে বাস্তব জীবন ও জনসংস্কৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করা তাঁর পক্ষে প্রশংসার কথা। দ্বিতীয়তঃ রঙ্গমঞ্চের দিকে দৃষ্টি রেখে নাট্যশিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করে বা নাট্যশিল্প ও রঙ্গমঞ্চের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে তিনি রসজ্ঞানেরই পরিচয় দিয়েছেন। কারণ নাটক তো শুধু সাহিত্য নয়, তা অভিনয়-শিল্পও বটে। তৃতীয়তঃ বাঙলা নাটক ও নাটকের অভিনয়ের ধারাকে ব্যক্তিগত রঙ্গালয়ের মুষ্টিমেয় শ্রোতার সম্মুখ থেকে সাধারণ রঙ্গালয়ের মারফৎ বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কৃতিত্ব গিরিশচন্দ্রকে দিতে হবে। শতাব্দীর রেনেসাঁসের প্রভাব আলোচনায় বাঙলা নাটকের এই পরিধি-বিস্তার বিশেষ স্মরণীয়। চতুর্থতঃ তাঁর অভিনয়-প্রতিভায় বাঙলা নাট্যশিল্প দীর্ঘস্থায়ী মর্যাদা পেয়েছে, নতুন একটা শিল্পক্ষেত্রে বাঙালীর অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়েছে। পঞ্চমতঃ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী 'গৈরিশ ছন্দের' সৃষ্টি তাঁর প্রতিভার গৌরব।

এক কথায়, বহুবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্র জাতীয় নাট্যকার।

অস্তিত্বের সমগ্রতাকে নতুন করে বোঝা ও ধরাই ছিলো উনিশ শতকের বাঙালীর সমস্ত জীবন-সাধনা ও মনন-সাধনার লক্ষ্য। কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌঁছোবার জন্য প্রয়োজন ছিলো বুদ্ধি ও চিত্তের মুক্তি, চৈতন্যের জড়তা ও অনুভূতির অসাড়তার অবসান, নতুন অভাববোধ ও পিপাসার জাগরণ। কোন রকমে পুরোন অস্তিত্বের বন্ধন ছেদন করতে পারলেই নূতনের উপলব্ধি ঘটে না, তার জন্য চাই ভাবে, কর্মে ও চিন্তায় জাতির জীবনী-শক্তির উদ্বোধন। রামমোহন থেকে সেই দুরূহ সাধনার শুধু সূত্রপাত নয়, সুস্পষ্ট ক্রমবিকাশ। কিন্তু প্রথম দিকে নবযুগের নতুন উৎকণ্ঠা খণ্ড খণ্ড ভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে—কোথায়ও যুক্তিতর্কমূলক ধর্মচিন্তায়, কোথায়ও মানবিকতাধর্মী সমাজ-সংস্কার-স্পৃহায়, কোথায়ও প্রত্যয়-সিদ্ধ ঈশ্বরপ্রেমে, কোথায়ও বিজ্ঞানমুখী যুক্তিবাদে, কোথায়ও বা ব্যবহারিক বুদ্ধি ও ঐহিকতাবোধে। তবে এই সব খণ্ড খণ্ড চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে কম-বেশি ব্যক্তির মুক্তি ঘটছিলো ও নূতন জীবনের চেহারা ক্রমে ক্রমে দেখা দিচ্ছিল। এইভাবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালীর খণ্ডিত জীবনায়নের মধ্যে যে পরিমাণ আত্মস্ফূর্তির প্রেরণা, মধুসূদন ছিলেন তারই মূর্ত প্রতীক। অন্য-দিকে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শিক্ষিত বাঙালীর যেটুকু অপূর্ণতা তিনি ছিলেন তারই সম্পূরক। অর্থাৎ মধুসূদনের মতো বঙ্কিম ব্যক্তি-চিত্তের মুক্তির উল্লাসে সৃষ্টির আসর বসান নি, এরই মধ্যে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সামঞ্জস্যের প্রশ্নে যে জীবন-জিজ্ঞাসার উদ্ভব—আপন চিন্তা ও সৃষ্টিতে তিনি তারই সমাধান খুঁজেছেন। নতুন জীবন তাঁকে যা দিয়েছে তা তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু অস্তিত্বের

পূর্ণতা ও সমগ্রতার খাতিরে সেই নতুন পাওয়া ধনকে রক্তগত সংস্কার ও বস্তুগত ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। এই সমন্বয় ও সংগঠনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায়, উনিশ শতকের বাঙালীর পূর্ণ রূপের সাধনা করবার উদ্দেশ্যে বঙ্কিমের আবির্ভাব। এবং সেখানেই রেনেসাঁসের দিক থেকে তাঁর সার্থকতা।

প্রাক্-বঙ্কিম যুগের দেশকালের রূপ-রেখা ও মানুষের জীবনের চেহারা আমরা প্রথম পর্বে দেখেছি, তার পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। আঠারো শ আটত্রিশে জন্ম নিয়ে আটান্নতে কর্মজীবন শুরু করা পর্যন্ত বিশ বছর ধরে সেই দেশকাল ও জীবনাদর্শের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বঙ্কিম দেহমনে বড়ো হয়ে উঠেছেন। এখন আমাদের বিচার করে দেখতে হবে, কোন্ কোন উৎস থেকে কি কি শক্তির ক্রিয়া তাঁর মানস-সংগঠনে সহায়তা করেছে, কেমন করে উন্মেষিত হয়েছে তাঁর বিরল মনীষা। ফার্সী ও ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী যাদবচন্দ্রের পুত্র হওয়ায় দেশজ সনাতন শিক্ষালাভের কোন সুযোগ বঙ্কিমচন্দ্রের হয়নি। কুলপুরোহিতের কাছে হাতে-খড়ি হয়েছিলো বটে, কিন্তু পাঠশালায় পড়ার কোন প্রমাণ নেই। তাঁর সত্যিকারের শিক্ষারম্ভ মেদিনীপুরের ইংরেজী স্কুলে—একজন ইংরেজ হেডমাষ্টারের উৎসাহে। বছর চারেক সেখানে পড়ে সাড়ে এগার বছর বয়সে তিনি হুগলী কলেজে প্রবেশ করেন। মাঝখানে কাঁটালপাড়ায় শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের কাছে কিছুদিন সংস্কৃত ও বাঙলার পাঠ নিয়েছেন। হুগলী কলেজের ছাত্ররূপে বঙ্কিম অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। জুনিয়ার ও সিনিয়ার স্কলারসিপ্ পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ তাঁর মেধাশক্তির প্রমাণ। জুনিয়ার পরীক্ষায় অনুবাদ ছাড়া সকল বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করাও কৃতিত্বের বিষয়। তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সাতান্ন সালে তিনি প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স ও আটান্ন সালে দ্বিতীয় বিভাগে শীর্ষস্থান অধিকার করে বি.এ. পাশ

করেন। পরে চাকুরীজীবনে বি.এল. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন (১৮৬৯)। এ থেকে বোঝা যায়, বঙ্কিমের মেধাশক্তি ও বিদ্যানুরাগ ছিলো ঈর্ষার যোগ্য। লেখাপড়া ছাড়া অন্য কিছু সম্বন্ধে—এমন কি খেলাধুলোর ব্যাপারেও—তাঁর কোন আগ্রহ ছিলো বলে মনে হয় না। ছাত্রাবস্থায় তাঁর পাঠ্যতালিকা ছিলো—ইংরেজী সাহিত্য ও ব্যাকরণ, ইতিহাস, গণিত, জ্ঞানার্ণব, ভূগোল, বীজগণিত, জ্যামিতি, বাঙলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ, নীতিশাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, সংস্কৃত তাঁর পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলো না এবং ইতিহাস (এবং ইংরেজী ও বাঙলা সাহিত্য) তাঁকে সকল স্তরেই পাঠ করতে হয়েছিলো। তবে তিনি বলে গেছেন, ছেলাবেলা থেকে কোন শিক্ষকের কাছে কিছু শেখেন নি—যা কিছু শিখেছেন নিজের চেষ্টায়।

হুগলী কলেজে প্রবেশের আগে ন্যায়বাগীশের কাছে বাঙলার পাঠ নেওয়ার সময়ে বঙ্কিম ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা আবৃত্তি করতেন। 'সংবাদ-প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জনের' অনেক কবিতা তিনি এই সময়ে কণ্ঠস্থ করেছিলেন। তাঁর আবৃত্তির ক্ষমতা দেখে হলধর তর্কচূড়ামণি তাঁকে 'অন্নদামঙ্গল' ও 'গীতগোবিন্দ' আবৃত্তি করে শোনাতেন। এই তর্কচূড়ামণির কাছেই বঙ্কিম প্রথম জানতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ চরিত্র। হুগলী কলেজে পড়বার সময় 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে—পাঠ্য বিষয় হিসেবে। অন্যদিকে এই কলেজে থাকা-কালীন 'সংবাদ-প্রভাকরে' সম্ভবতঃ তাঁর প্রথম কবিতা ও গদ্যরচনা প্রকাশিত হয় (১৮৫২)। ১৮৫৩ সালে বার হয় 'ললিতা ও মানস'। বর্তমান বৎসরেই 'প্রভাকরের' কবিতা-প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে তিনি রমণীমোহন রায় ও কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর কাছ থেকে আর্থিক পুরস্কার লাভ করেন। শুধু তাই নয়, দু' বছর পরে 'প্রভাকরে' তাঁর অনেক গদ্য পদ্য রচনা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রশস্তি সমেত প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা বিশেষ স্বীকৃতি পায়।

কর্মজীবনের পূর্বেকার এই তথ্যপঞ্জী থেকে বোঝা যায়, প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশের আগে আধুনিক শিক্ষা ও চিন্তার পীঠস্থান কলকাতার সঙ্গে বঙ্কিমের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিলো না, শুধু কিছুটা মানসিক যোগাযোগ ছিলো 'প্রভাকর' ও 'সাধু রঞ্জনের' মারফৎ। তবে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বার সময়ে বাঙলা দেশের নব্যসম্প্রদায়ের চিন্তাধারার সঙ্গে তিনি নিশ্চিত পরিচিত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন, সাঁওতাল-বিদ্রোহ, নীল-বিদ্রোহ, সিপাহী-বিদ্রোহ, ডালহৌসীর শিক্ষা-পরিকল্পনা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ঘটনার সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য তাঁর শিক্ষিত মনের ওপর কিছু না কিছু রেখাপাত করেনি কি? তারপর কর্মজীবনে সামান্য কিছুকাল কলকাতা, আলিপুর ও হাওড়ায় কাটানো ছাড়া তেত্রিশ বছরের বাকি সময় তিনি কাটিয়েছেন মফঃস্বল বাঙলায়। এই দীর্ঘ কালের ইতিহাস থেকে তিনটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য—প্রথমতঃ ১৮৬১-৬২ সালে তিনি খুলনায় নীলকরদের হাঙ্গামা সংক্রান্ত এক তদন্তের ভার পান এবং সে-সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পান; দ্বিতীয়তঃ ১৮৬৩ সালে খুলনায় থাকার সময়ে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য হন; তৃতীয়তঃ বহরমপুরে (১৮৭৩-৭৪) কর্ণেল ডাফিনের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে তিনি মর্যাদা রক্ষার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হন। এ তিনটি ঘটনা থেকে বঙ্কিমের মনের গতি-প্রকৃতির একটু আভাস পাওয়া যায়।

তবে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। বঙ্কিম কর্মী পুরুষ ছিলেন না; রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশব সেন ইত্যাদির মতো জাতীয় জীবনের বিচিত্র কর্তব্যে তিনি কখনও অংশ গ্রহণ করেন নি। তার প্রধান কারণ, তিনি ছিলেন রাজকর্মচারী। তাছাড়া সমকালীন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর সাময়িক চিত্তবিক্ষোভ বা মানসিক উত্তেজনার কোন প্রমাণ নেই। সমগ্র সাহিত্যিক জীবনে তিনি কখনও সাময়িকতার দাসত্ব করেন নি, 'বঙ্গদর্শনের' প্রবন্ধে

বা সম্পাদকীয় মন্তব্যে তাঁর সাংবাদিক মানসের স্বাক্ষর নেই—যদিও গুরু ঈশ্বর গুপ্তের 'নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা নিয়ে' লেখা রসময়ী রচনার প্রশংসা করতে তিনি ভোলেন নি। আসল কথা, সাময়িক বিষয়কেও তিনি তলিয়ে দেখবার পক্ষপাতী ছিলেন, জাতির নিত্যকার অভিপ্রায়ের দিক থেকেই বর্তমান সমস্যাকে বিচার করতে তিনি ভালোবাসতেন। সুতরাং বিশেষ বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মন ও মননের খবর নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে তাঁর মতো শিক্ষিত মানুষ নিশ্চয়ই যুগধর্মের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তা নিয়ে অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করতেন। তার প্রমাণ আছে সহপাঠী কেশবচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধায়, ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগে, ব্রাহ্ম সমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে সপ্রশংস উল্লেখে ('আদি ব্রাহ্ম সমাজকে আমি বিশেষ ভক্তি করি। আদি ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা এদেশের ধর্মসম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি সিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে জানি।···বিশেষ আমার বিশ্বাস, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের অতিশয় উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে'), শশধর বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ঔদাসীন্যে। লক্ষণীয় এই যে, তাঁর চিন্তার গতিও ছিলো প্রগতিশীলতারই দিকে।

এবার প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশের পর থেকে বঙ্কিমের পুঁথিগত মনের খবর নেওয়া যাক। তাঁর বি. এ. ক্লাশের পাঠ্য-তালিকায় একদিকে ইংরেজীর সঙ্গে ছিলো গ্রীক ও ল্যাটিন, অন্যদিকে বাঙলার সঙ্গে ছিলো হিন্দী ও ওড়িয়া। আর ছিলো সংস্কৃত, যা তিনি হুগলী কলেজে কখনও পড়েন নি। তবে পাঠ্য-তালিকার বাইরে তখন ইংরেজী ছাড়া আর কোন সাহিত্যই তিনি পড়তেন বলে মনে হয় না। কারণ হুগলী কলেজ ছেড়ে আসার পর 'দুর্গেশনন্দিনী' লেখার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর বাঙলা চর্চা বা পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বোধ হয়, প্রেসিডেন্সী কলেজের আবহাওয়ায় তিনি ইংরেজীর দিকেই বিশেষ করে ঝুঁকেছিলেন। ১৮৬৫ সালে

'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ইংরেজী উপন্যাস 'Rajmohan's Wife' তাঁর সেই ইংরেজী-চর্চারই পরিণতি। পরবর্তী কালে লিখিত প্রবন্ধেও তিনি এই সময়কার ইংরেজীপন্থী লেখকদের অনুকূলেই মত প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমের ইংরেজী-অনুরাগ প্রবল ছিলো বলেই তিনি 'সহজ ইংরেজী শিক্ষা' রচনা করতে দ্বিধা করেন নি। সাহিত্য ছাড়া তিনি বেশি করে পড়েছেন ইতিহাস ও দর্শন। ইতিহাসের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বের কাহিনী থেকে শুরু করে য়ুরোপের রেনেসাঁসের ইতিবৃত্ত পর্যন্ত তাঁর পড়া ছিলো। পাশ্চাত্ত্য-দর্শন পাঠের উপযোগিতা সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহ, কারণ তার মধ্যে নতুন চিন্তার পরিচয় আছে। ভারতীয় সমাজ-বিবর্তনের যতটুকু উপাদান ছড়িয়ে আছে ভারতীয় দর্শনের মধ্যে তিনি তার ততটুকু মূল্য মাত্র স্বীকার করতেন। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের বিভিন্ন রচনা থেকে বোঝা যায়, নিজের বক্তব্যের অনুকূল বা প্রতিকূল য়ুরোপীয় চিন্তাই তাঁকে প্রধানতঃ আকৃষ্ট করতো। তাঁর পাশ্চাত্ত্য-বিদ্যাই তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছিলো, কোন্ কোন্ বিষয়ে ভাবতে হবে, ভাবতে হবে কি কি রীতিতে। তিনি মন দিয়ে পড়েছিলেন—বেকন, বাক্‌ল, বার্কার, সীলি, লেকি, রুশো, বেন্থাম, ষ্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেন্‌সার, কোঁত, ডারুইন ইত্যাদি কতো মনীষীর বিচিত্রবিষয়ক সিদ্ধান্তগ্রন্থ।* তাঁর মন আকৃষ্ট হয়েছে র‍্যাশনালিজম্, এম্পিরিসিজম্, ন্যাশানেলিজম্, ইউটিলি-টারিয়ানিজম্, পজিটিভিজম্, অ্যাগনষ্টিসিজম্ ইত্যাদি কতো 'ইজমের'

* বঙ্কিমের ছাত্রোত্তর যুগে নিম্নলিখিত বইগুলি প্রকাশিত হয়—মিলের 'On Liberty' (১৮৫৯); ডারুইনের 'Origin of Species' (১৮৫৯); স্পেন্‌সারের 'Education Intellectual, Moral, Physical' (১৮৬১) ও 'First Principles' (১৮৬২), মিলের 'Utilitarianism' (১৮৬৩) 'Comte and Positivism' (১৮৬৫) ও 'Subjection of Women' (১৮৬৯); ডারুইনের 'Descent of Man' (১৮৭১), স্পেন্‌সারের 'Principles of Psychology' (১৮৭২), 'Principles of Sociology' (Vol. I. ১৮৭৬), 'Principles of Sociology' (Vol. II, ১৮৭৯), 'Data of Ethics' (১৮৭৯) ও '**Man versus the State**' (১৮৮৪)।

প্রতি। ভারতীয় দর্শন ও শাস্ত্র সম্বন্ধেও তিনি ভালোই জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তবু পাশ্চাত্ত্য চিন্তাবস্তু ও চিন্তাপ্রণালীই তাঁর কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় ছিলো। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বঙ্কিম সমগ্র জীবন ধরে ভাব, জ্ঞান ও চিন্তার দিক দিয়ে নিজেকে আধুনিক ও মনীষা-সমৃদ্ধ করে তুলতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি। তাঁর মনন-সাধনায় কোন জ্ঞাত ফাঁকি ছিলো না। অস্তিত্বের সমগ্রতা যাঁর চিন্তার লক্ষ্য, এইভাবে আত্মপ্রস্তুতি তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।

পুঁথির জগতে জীবনকে নিয়ে যে অধ্যয়ন, বিভিন্ন তত্ত্বের আলোতে জীবনের স্বরূপ আবিষ্কারের যে চেষ্টা তার ফলে কতকগুলি জিজ্ঞাসা অনিবার্যভাবেই বঙ্কিমের মনে দেখা দিয়েছিলো। অন্যদিকে বাইরের দেশকালের মধ্যে নানা ভাব ও কর্মের দ্বন্দ্ব, চিত্তমুক্তি ও প্রাণশক্তির আত্মপ্রসারের বিপুল প্রয়াস সত্ত্বেও, জীবনের মধ্যে যে সঙ্কট ঘনিয়ে আনছিলো, বঙ্কিমের খোলা চোখে তা ধরা না পড়ে পারে নি। সে-জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছিলো জীবনের পূর্ণ রূপ নিয়ে, সে সঙ্কটের মূলে ছিলো ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব। পূর্বে আমরা দেখেছি, উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রধান ভাব-সূত্র ছিলো মানবতাবাদ বা মানব-মহত্ত্বে শ্রদ্ধেয়তা। 'জীবনকেই যতদূর সম্ভব শ্রী ও শক্তিমান করিবার প্রয়োজন—স্বীকার করাই এই নবধর্মের মূলমন্ত্র।' কিন্তু এই নবধর্মের মধ্যেই লুকিয়েছিলো ব্যক্তির মুক্তির বীজ বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রেরণা। রামমোহন থেকে মধুসূদন পর্যন্ত মনীষীদের জীবন-চর্যা ও মনন-চর্চা সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সম্ভাবনাকেই ফুটিয়ে তোলে, সমাজের অচলায়তন বিদীর্ণ করে নতুন ব্যক্তিমানুষের জন্মকেই অনিবার্য করে ফেলে। এইভাবে সমাজ ও ব্যক্তি যখন মুখোমুখি দাঁড়ালো, শুরু হলো উভয়ের সংঘর্ষ—তখনই দেখা দিলো নবাগত মানবতাধর্মের কঠিন পরীক্ষা। মোহিতলালের ভাষায়—'দেশের ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় ঘোরতর সংশয়বাদী হইয়া উঠিলেন, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অর্ধপথেই দ্বিধাগ্রস্ত হইল। মনুষ্য-জীবনের অর্থ কি? মানুষের জ্ঞানে সত্যের ধারণা সম্ভব কিনা? লোকহিতের আদর্শ কি? ধর্ম কাহাকে বলে? সমাজের মুখাপেক্ষিতা ব্যক্তির পক্ষে কতদূর আবশ্যক? ব্যক্তির যে স্বাধীনতা—মানুষের যাহা অপেক্ষা অধিক গৌরব নাই, তাহার সহিত শেষ

পর্যন্ত সামাজিক জীবনের আপোষ আদৌ সম্ভব কি না? নূতন মানব-ধর্মের যে উদার ভাবাবেগ, মানুষের হৃদয়-মনের শক্তি সম্বন্ধে যে অপরিমিত আশ্বাস—তাহার প্রেরণা ও উল্লাস এমনই নানা চিন্তায় সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া উঠিল: ব্যক্তি-ধর্ম ও সমাজ-ধর্মের মধ্যে যে সঙ্গতির প্রয়োজন, তাহার উপায় সম্বন্ধে সেকালের ভাবুক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। এই সমস্যাই প্রধান সমস্যা হইয়া উঠিবার কারণ—ব্যক্তির স্বাধিকার-বোধের উগ্রতা; এবং ইহারও কারণ বিদেশী শিক্ষার প্রভাবে স্বদেশীয় সমাজের সেই অবনত অবস্থার প্রতি অশ্রদ্ধা ও অসহিষ্ণুতার উদ্রেক। ব্যক্তির মত জাতিও স্বকর্মফলভুক্—সমাজের পাপও ব্যক্তির পাপ, সে পাপকে অস্বীকার করিয়া নিজ স্বতন্ত্র মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা মিথ্যা বলিয়াই নিষ্ফল হইতে বাধ্য।' অর্থাৎ 'যাহা প্রথমে প্রাণমনের প্রবল আকুতিরূপেই একটা বিদ্রোহের সূচনা করিয়াছিল—তাহাই শেষে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য-স্পৃহাকে প্রবল করিয়া, ভাবচিন্তার ক্ষেত্রে, এবং জীবনেও, নানা বিপর্যয় উপস্থিত করিয়াছিল, এবং ধর্মজিজ্ঞাসাকে যেমন উন্মুখ করিয়াছিল, তেমনই মনুষ্যত্বের উদার আদর্শকেও ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল।' বঙ্কিমের চক্ষুষ্মানতা ধরতে পেরেছিলো সমকালীন জীবনের এই সঙ্কটের ছবি। তিনি শুধু বাস্তবে অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করেই যে সঙ্কটের সন্ধান পেয়েছিলেন তা নয়, আমার মনে হয়, ভারতীয় জীবনে বিচিত্র 'আইডিয়ার' প্রভাব ও দ্বন্দ্বসম্পর্কে বুদ্ধিগত বিচার ও তত্ত্বগত চিন্তায়ও তিনি সঙ্কটের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সিদ্ধান্ত মিলে গিয়েছিলো বলেই তার মনে অতঃপর প্রশ্ন জাগলো: সমাধানের পথ কোথায়? এই জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান ও গঠনেই চিন্তানায়ক বঙ্কিমের জীবন নিয়োজিত হয়। তিনি নিজেই বলেছেন—'অতি তরুণ অবস্থা হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত—"এ জীবন লইয়া কি করিব?" সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে

খুঁজিতে প্রায় জীবন কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি; তাহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কর্মক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি।'

নতুন জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর এবং যুগগত সঙ্কটের সমাধান খুঁজতে গিয়ে বঙ্কিম বুঝতে পেরেছিলেন, য়ুরোপাগত মানবতাবাদকে দেশের ধারাবাহিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হবে বুদ্ধির নবাবিষ্কারের সঙ্গে রক্তগত সংস্কারের মিলন ঘটাতে হবে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যের সংস্পর্শে ক্রমে ক্রমে আমরা যে নতুন জীবনতত্ত্ব লাভ করেছি, সমাজের সঙ্গে তার সত্য-সম্পর্ক স্থাপন ছাড়া গত্যন্তর নেই। দ্বিতীয়তঃ রামমোহন থেকে যে বুদ্ধিবাদ ন্যায় ও যুক্তির নামে ধীরে ধীরে জীবনকে সঙ্কুচিত করে দিচ্ছিল, ত' জীবনের একটা প্রধান বৃত্তি মাত্র এবং সেই কারণেই অন্যান্য সমস্ত বৃত্তির সঙ্গে তার সমন্বয় সাধন করার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, বিশুদ্ধ প্রকৃতিবাদ ও মন-নিয়ন্ত্রিত চরিত্রধর্মের সামঞ্জস্য এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও লোক-সংশ্রব-তত্ত্বের বিরোধের অবসানও কাম্য বলে তাঁর ধারণা না হয়ে পারে নি তৃতীয়তঃ নবজাগরণের বিচিত্র ভাবপ্লাবনের ফলে ও সত্তার মুক্তির নামে আমাদের মধ্যে যে য়ুরোপীয় নীতিজ্ঞান ও স্পর্শকাতর বিবেকবুদ্ধি দেখা দেয়, তার আতিশয্যে উদার মানবতাধর্মের ক্ষুণ্ণতা তাঁর চোখে পড়েছিলো। তিনি বুঝেছিলেন, এই অতি-শুচিতার সঙ্কীর্ণতাকে রোধ করতে হবে। চতুর্থতঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে যে স্বার্থবুদ্ধির পূজো শুরু হয়েছে তাকে সর্ব-মানব-হিতবাদে রূপান্তরিত না করলে চলবে না। এই সব খণ্ড খণ্ড সিদ্ধান্তের সমাবেশে তাঁর মূল বক্তব্য দাঁড়ালো—এক, বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের অনুশীলন; দুই, মনুষ্যত্বের পূর্ণ রূপের সন্ধান; তিন, সর্বভূতহিতবাদের

আদর্শ গ্রহণ। তাঁর অনুশীলন প্রবৃত্তিমার্গ—সন্ন্যাসের নিবৃত্তিমার্গ নয়। তাঁর স্বরূপ হচ্ছে—

'১। মানুষের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।'

অন্যদিকে বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্যের অভাবেই জীবনের যা কিছু অপূর্ণতা ও দুঃখ। বঙ্কিম নিজেই স্বীকার করেছেন, 'সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলন, প্রস্ফুরণ, চরিতার্থতা ও সামঞ্জস্য একেবারে দুর্লভ।' সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে, এরূপ আদর্শ কোথায় পাওয়া যাবে? তার উত্তর আছে 'ধর্মতত্ত্বে', প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা আছে 'কৃষ্ণচরিত্রে'। 'ধর্মতত্ত্বে' শুনতে পাই 'অনন্ত প্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারে না, ইহা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্য যীশুখৃষ্ট খ্রীষ্টীয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ। কিন্তু এরূপ ধর্মপরিবর্দ্ধক আদর্শ যেরূপ হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্মপুস্তকে নাই—কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই।...ইহারা সর্বগুণবিশিষ্ট—ইহাদিগেতেই সর্ববৃত্তি সর্বাঙ্গসম্পন্ন স্ফূর্তি পাইয়াছে। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়—যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ যাঁহার অংশ মাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখন মনুষ্যভাষায় কীর্তিত হয় নাই।' অন্যদিকে 'কৃষ্ণচরিত্রের' উপসংহার উল্লেখযোগ্য—

'কৃষ্ণ সর্বত্র সর্বসময়ে সর্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্মে অপরাঙ্মুখ—ধর্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শাস্তা, নির্মম, নিরহঙ্কার, যোগযুক্ত, তপস্বী। তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্ম নির্বাহ করেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র অমানুষ।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমের চোখে কৃষ্ণ ছিলেন মনুষ্যত্বের পূর্ণ রূপের প্রতীক। 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮), 'কৃষ্ণচরিত্র' (সম্পূর্ণ গ্রন্থ। ১৮৯২), 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' (১৯০২ মৃত্যুর পর প্রকাশিত) ইত্যাদিতে এই জীবন-জিজ্ঞাসা ও ধর্ম-দর্শন যেমন প্রবন্ধাকারে ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত হয়, তেমনি তা মানুষের গল্পে রূপায়িত হয় 'আনন্দমঠ' (১৮৮৪), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪), 'সীতারাম' (১৮৮৭) ও 'রাজসিংহ' (১৮৮৩ সালে পুনঃপ্রণীত চতুর্থ সংস্করণ) উপন্যাসে।

সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের আদর্শ বঙ্কিমের ক্রমাভিব্যক্ত জীবন জিজ্ঞাসারই ফল। পূর্বে বলেছি—পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, চিন্তা ও দর্শনের প্রভাব নিয়েই সেই জীবন-জিজ্ঞাসার আরম্ভ, তাঁর বিচারপদ্ধতি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলো য়ুরোপীয় ধরণের। 'সাম্য' (১৮৭৯) প্রবন্ধে রুশোর মতবাদ সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ধর্মাবতারদের প্রতি শ্রদ্ধারই নামান্তর (গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে বঙ্গদর্শনে বিভিন্ন সময়ে প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হয়। পরে অবশ্য তাঁর অভিমত অনেকাংশে বর্জিত হয় এবং নিজের ভুল তিনি বুঝতে পারেন) এতে মিলেরও প্রভাব আছে। বেন্থামের হিতবাদ—greatest good of the greatest number-এর তত্ত্ব—তাঁর মনোহরণ করেছিলো, এমন কি পরে ধারণার কিছু কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও হিতবাদ তাঁর কাছে কোন দিনই হেসে উড়িয়ে দেওয়ার বস্তু হয়ে ওঠে নি ('ধর্মতত্ত্ব' দ্রষ্টব্য)। তবে কোঁতের প্রত্যক্ষতাবাদ (positivism) তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর থেকে তিনি কোঁতের প্রচারিত 'মানবদেবীর পূজার' আদর্শের মধ্যেই দেখতে পান বেন্থাম

তত্ত্বের পরিণততর রূপ। কারণ কোঁত-দর্শনের মূল কথা ছিলো শুধু বেশি সংখ্যক লোকের বেশি পরিমাণ কল্যাণ নয়, সমগ্র মানব-সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত নিজের প্রবন্ধে, 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের 'motto'-তে, 'বিবিধ প্রবন্ধে', এমন কি 'ধর্মতত্ত্বে' কোঁত-দর্শনের প্রতি যে অনুরাগ সুস্পষ্ট, তা-ই শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় হিন্দু-ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে অসামান্য শ্রদ্ধায়। তখন দেখা যায়, তিনি যেন 'ধমক দিয়েই' (মোহিতলালের ভাষা) কোঁতের দর্শনের চেয়ে হিন্দু-দর্শনের প্রাচীনতা ও ব্যাপকতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। ঐ 'ধর্মতত্ত্বেই' তিনি গুরুর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—'হিন্দুধর্মের কোন অংশের সঙ্গে যদি কোমৎ মতের কোন সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তবে যবন স্পর্শ-দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া সেটুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি?' এরই জের টানা হয়েছে গ্রন্থটির গুরু-শিষ্য-সংবাদের আরেক অংশে—

'গুরু। ভূতকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোম্‌তের প্রথম চারি—Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়ন। এই জ্ঞানের দ্বারা আজিকার দিনে পাশ্চাত্ত্যদিগকে গুরু করিবে। তার পর আপনাকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে। এবং অন্তর্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ কোম্‌তের শেষ দুই—Biology, Sociology, এ জ্ঞানও পাশ্চাত্ত্যের নিকট যাচ্ঞা করিবে।

শিষ্য। তার পর ঈশ্বর জানিবে কিসে?

গুরু। হিন্দুশাস্ত্রে, উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়।'

অর্থাৎ বঙ্কিমের দৃষ্টিতে হিন্দু-ধর্ম-দর্শনের মধ্যেই পরম পুরুষার্থের কথা নিহিত। এ-সিদ্ধান্ত যেমন তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী চিন্তা ও

অভিজ্ঞতার ফল, তেমনি যুগ-সাধনার অনুকূলতা-সম্ভূত। পূর্বে নানা প্রসঙ্গে বলেছি, উনিশ শতকের শেষ বছর তিরিশেক হিন্দু জাতীয়তাবাদ বা সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের যুগ। ভূদেব-শশধর-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-দয়ানন্দ-কৃষ্ণানন্দ-বিজয়কৃষ্ণ ইত্যাদির প্রভাবে তখনকার দিনের শিক্ষিত মানুষেরও ঝোঁকটা পড়েছিলো হিন্দুত্বের দিকে। এই অনুকূল আবহাওয়ার কথা মনে রেখেই 'কৃষ্ণচরিত্রের' উপক্রমণিকায় বঙ্কিম বলেছেন—'এখন হিন্দুধর্মের আলোচনা কিছু প্রবলতা লাভ করিয়াছে। ধর্মান্দোলনের প্রবলতার এই সময়ে কৃষ্ণচরিত্রের সবিস্তারে সমালোচনা প্রয়োজনীয়। যদি পুরাতন বজায় রাখিতে হয়, তবে এখানে বজায় রাখিবার কি আছে না আছে, তাহা দেখিয়া লইতে হয়। আর যদি পুরাতন উঠাইতে হয়, তাহা হইলেও কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা চাই; কেননা কৃষ্ণকে না উঠাইয়া দিলে পুরাতন উঠান যাইবে না।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই হিন্দুত্বের দিকে সরে যাওয়ার জন্য বঙ্কিমের প্রগতি-বিরোধী মুসলমান-বিদ্বেষী সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির নিন্দা করতে অনেকে দ্বিধা করেন নি। তবে তাঁর হিন্দু-প্রেম তথ্য হিসেবে স্বীকার করে নিলেও আরও কিছু বলার থেকে যায়। আবদুল ওদুদের ভাষায় সেই বক্তব্য হচ্ছে—'একাল আমাদের জন্য ব্যাপকভাবে মোহ-নাশের কাল, প্রচারক বঙ্কিমের বিতর্কিত মাহাত্ম্যের বিঘোষণার চাইতে তাই আমাদের জন্য বেশী প্রয়োজনীয় স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের অপরিসীম মর্যাদার উপলব্ধি। এইভাবে দেখলে তাঁর মনীষা ও ভাবালুতা, প্রেম ও অপ্রেম, জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা সমস্তই পরম অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে তাঁর যুগের পটভূমিতে বিন্যস্ত হ'য়ে, বোঝা যাবে, তাঁর যুগের তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি, এদেশের বহু দুঃখে-দুঃখী হিন্দুসমাজে তাঁর জন্ম, সে জন্যে সেই সমাজের বেদনা তিনি ভুলতে পারেন নি কোন দিন, কিন্তু শুধু হিন্দুর সন্তান তিনি নন, বৃহত্তর দেশের ও কালেরও তিনি সন্তান, তাই এসবের প্রত্যেকের প্রতি গভীর প্রেমের পরিচয় তাঁর সাধনায় রয়েছে।' আর সেখানেই বঙ্কিমের ঐতিহাসিক মূল্য নিহিত

॥ ৩ ॥

বঙ্কিমের জীবন-জিজ্ঞাসা ও মতামতের ক্রম-বিবর্তন থেকে বোঝা যায়, তাঁর মনীষায় স্থৈর্যের কোন স্থান ছিলো না। তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি, মতপরিবর্তন হচ্ছে বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার ও ভাবনার ফল ('কৃষ্ণচরিত্রের' দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য)। মনীষায় এই চলিষ্ণুতার ধর্মকে যিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তিনি সৃষ্টির আসরে জীবন্ত মানুষের সন্ধান না করে পারেন না। সত্যিই ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের জীবনের প্রতি ছিলো অফুরন্ত আকর্ষণ ও মমতা, তাঁর রসোপলব্ধিতে ছিলো জীবনের স্বাদ, তাঁর কামনা ছিলো জীবনের সুন্দর ও সার্থক প্রতিষ্ঠা। তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি জীবন সম্পর্কে উজ্জীবিত চেতনায় প্রাণবন্ত। তাদের সমস্যা আছে, বেদনা আছে, এমন কি বিদ্রোহও আছে—কিন্তু পচনশীল সমাজের দায়ভার নেই, মনের অবসন্নতাজনিত ব্যাধি নেই, অস্তিত্বের অবলুপ্তির ভয় নেই, শরীর-প্রাণের নিস্তেজতা নেই। তাদের পৌরুষ শুধু দেহে নয়, অন্তরেও ; তাই আত্মাবমাননায় তারা ভেঙে পড়ে না, জীবনের চতুর্দিকের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তারা আত্মস্ফূর্তির প্রয়াসে অস্থির ও উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। এই অদম্য জীবন-পিপাসা উপন্যাসের চরিত্রগুলি পেয়েছে উনিশ শতকী রেনেসাঁসের মুক্ত চৈতন্য থেকে, সমকালীন মানুষের সঞ্জীবন-মন্ত্র থেকে, স্রষ্টার জীবন সম্পর্কে বলিষ্ঠ বিশ্বাস থেকে।

অন্যদিকে বঙ্কিমের গড়া মানুষগুলির মধ্যে নিঃসঙ্গতার বেদনা, স্বাতন্ত্র্য-স্পর্ধার নিষ্ফলতাবোধ ও পারিপার্শ্বিক সমাজের সমবেদনাহীন অস্তিত্বের বিরুদ্ধে আক্রোশের ক্ষোভ সুস্পষ্ট। আসল কথা, উনিশ শতক যে স্বাতন্ত্র্য-গর্বিত সমাজ-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমানুষের জন্ম দিয়েছিলো, তাদের অনিবার্য একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা বঙ্কিমের ব্যক্তিগত জীবনে যেমন দেখা গেছে, তেমনি তাঁর উপন্যাসের চরিত্র-

মিছিলেও স্থান পেয়েছে। বর্তমান-প্রসঙ্গের ভূমিকায় বলেছি, বঙ্কিম-যুগে ব্যক্তিজীবনের সঙ্কটের কথা এবং এ-ও বলেছি, সে সঙ্কটের মূলে ছিলো ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সামঞ্জস্যের প্রশ্ন। এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। মানুষের মধ্যে অদম্য প্রাণশক্তি রয়েছে, অথচ সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসত্তায় নিঃসঙ্গতার বেদনাও আছে। বঙ্কিমের উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করার সময় একথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে।

ব্যক্তির আত্মস্ফূর্তির তাগিদ ও সমাজের নিঃস্পৃহ প্রবহমানতার চিত্র বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনীর' (১৮৬৫) মধ্যেই আছে। আপাতঃদৃষ্টিতে জগৎসিংহের প্রতি আয়েষার ভালোবাসা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিন্তু গভীরতর দৃষ্টিতে পাঠানদের অন্দর-মহলের অবরোধ-প্রথাকে অস্বীকার করে মুসলমানীর এই চিত্ত-উদ্ঘাটন একদিকে তার নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃসহ বেদনা, অন্যদিকে অপরিমিত জীবন-পিপাসা ও প্রাণশক্তির পরিচায়ক। আয়েষা বহু মানুষের ভিড়ের মধ্যেও ছিলো একটি নির্জন ও নিঃসঙ্গ আত্মা। অন্দর-মহলের গড্ডলিকা-প্রবাহে সে নিজেকে মেশাতে পারেনি। এই অন্তরে-বাইরে একাকিনী আয়েষার ভালোবাসার স্বাভাবিক অধিকার কতলুখাঁর প্রাসাদের কাম-কেলি-কুতূহলের মধ্যে স্বীকৃতি পায়নি বলেই শেষ পর্যন্ত তার হৃদয়ের বিস্ময়কর আত্ম-বিঘোষণ: 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'। ওসমানের ব্যক্তিসত্তারও সে একই আর্তনাদ: তার আশা-লতায় ফুল ফুটলো কই? বিমলা অভিরাম স্বামীর কানীন কন্যা—অতুলনীয় তার প্রতিভা—তবু বীরেন্দ্রসিংহের সঙ্গে তার বৈধ বিবাহের কথা স্বামীর জীবৎকাল পর্যন্ত গোপন রইলো। সমাজের মুখ রক্ষার জন্য বিমলার নারীত্বের এই অবমাননা সমকালীন জীবন-জটিলতারই উদাহরণ। অন্যদিকে দেখতে পাই দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমার সঙ্গে পিতার শত্রু-পুত্র জগৎসিংহের প্রণয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে—বিশেষ করে নারী-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমাজসত্তার সংঘর্ষ ও সামঞ্জস্যের নবজাগ্রত সমস্যা নিয়ে বঙ্কিম

এখানে ইতিহাসের অতলে ডুব দিয়েছেন—অভিসার করেছেন রোমান্সের রাজ্যে। 'কপালকুণ্ডলায়' (১৮৬৬) কবি-কল্পনার সৌন্দর্য যুগ-চেতনার তাৎপর্যের চেয়ে বেশি প্রকট, সন্দেহ নেই : তবু মোগল-হারেম-বিলাসিনী মতিবিবির অদৃষ্টের সঙ্গে জন্ম-যোগিনী কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টকে এক সূত্রে গ্রথিত করার মধ্যে সমকালীন জীবন-জটিলতার অভিক্ষেপ থাকাই স্বাভাবিক। হারেম-বিলাসিনীর মুক্তির বদলে বন্ধনের আকাঙ্ক্ষা ও বননিবাসিনীর বন্ধনের বদলে মুক্তির পিপাসা—এ দুই-ই ব্যর্থ হয়ে গেলো নবকুমারের নিষ্ক্রিয় পৌরুষের জন্য। কে জানে, ভোগ আর বৈরাগ্যের এই ব্যর্থতা-চিত্র হয়তো উনিশ শতকের ক্ষুব্ধ ব্যক্তিসত্তার অনিশ্চিত রূপেরই ছায়ামাত্র! 'মৃণালিনীর' (১৮৬৯) হেমচন্দ্র তাঁর মৃণালিনীকে হারিয়ে উন্মত্ত ও অপ্রকৃতিস্থ—যে ঐতিহাসিক গুরু দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত, সে তার প্রতি সুবিচারে অক্ষম। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, কণ্টকপূর্ণ মৃণাল যেখানে, সেখানে জীবন-পদ্মে শ্রী নেই, শক্তি নেই—আর সে ক্ষেত্রে মৃণালিনীর প্রেমাভিসার বৈষ্ণবীয় পরিহাস মাত্র। আর পশুপতি ও মনোরমার মিলনে—শিব ও শক্তির মিলনে—বড়ো প্রতিবন্ধক হচ্ছে অদৃষ্টের লিখন, সামাজিক সংস্কার। তাই পশুপতি দুর্বল, আত্মভ্রষ্ট। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমের উপন্যাসের নারী-পুরুষ যেন নিঃসঙ্গ, একা ; সামাজিক পটভূমিকায় নারী-পুরুষের মিলন-সম্ভূত সার্থক শক্তির স্ফুরণ এখনও অপেক্ষিত।

তারপর বঙ্কিমের দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলিতে দৃষ্টিপাত করলেও একই ছবি চোখে পড়ে। 'বিষবৃক্ষের' (১৮৭৩) সমস্যা কুন্দনন্দিনীর ভালোবাসার অধিকার নিয়ে। কুন্দ রূপসী, পূর্ণ-যৌবনা। মন্দ অর্থে রিপুর তাড়না আর ভালো অর্থে প্রেমের পিপাসা তার মধ্যে এখনও প্রবল। কিন্তু বিধবা বলেই স্বভাবজ প্রেমকে চরিতার্থ করার সামাজিক অধিকার থেকে সে বঞ্চিতা। সুতরাং তার কল্পনা-মূলেই আছে একটা নৈঃসঙ্গ্যের ভাব, বৈধব্য-

দশার একাকিত্বের মধ্যে তার নারী-সত্তার বিড়ম্বনার আইডিয়া। নগেন্দ্রনাথের ভালোবাসা জাগিয়ে তুলেছে সেই আত্মবিলুপ্ত নারীকে—যে ভালোবাসার মধ্যে বাঁচতে চেয়েছে, বাঁচতে চেয়েছে বিবাহ-সংস্কারের সামাজিক স্বীকৃতির মধ্যে। কিন্তু সমাজ তাকে ক্ষমা করেনি, আর তারই পরিণতিতে তার আত্মহত্যা। সুতরাং এখানেও দেখি নারী-ব্যক্তিত্বের আত্মস্ফূর্তির দাবি এবং সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের আদর্শের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব। 'চন্দ্রশেখরের' (১৮৭৫) শৈবলিনীর সঙ্কট আরও জটিল—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্বামী চন্দ্রশেখর তার দেহমনের পিপাসা মেটাতে পারেনি। তাই কুলবধূ হলেও সে অন্তরের দিক থেকে একা। বাইরের পৃথিবী থেকে প্রতাপের বাল্যপ্রেম এখনও প্রবলতর রূপে তাকে আকর্ষণ করে, কিন্তু সমাজের রক্তচক্ষুর শাসনে সেই ভালোবাসা নির্জন কান্নায় শুধুই গুমরে মরে। তারপর আপন স্পর্ধিত স্বাতন্ত্র্যে শৈবলিনী গৃহত্যাগ করে—প্রতাপকে পেতে চায়। কিন্তু সমাজের চোখে এ তো অগাধ জলে সাঁতার মাত্র! মৃত্যুর পথ খোলা ছিলো, কিন্তু নিজের জীবন-যৌবনকে অতৃপ্ত রেখে সে মরণে আত্মবিলুপ্তি চায়নি। অন্যদিকে প্রতাপের কাছ থেকে শপথ গ্রহণের আহ্বান আসলে সমাজের নৈতিক চেতনারই প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস। তাই নিজের হাতে সমাজের কাছে দাবি আদায় করতে গিয়ে হার হলো শৈবলিনীর—আবার তাকে ফিরে যেতে হলো প্রেম ও মানবিক সম্পর্কের রস-স্পর্শহীন দাম্পত্য জীবনের মধ্যে, যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নিষ্ফলতার কান্না নিভৃতে নির্জনে চিরদিন গুমরে মরবে। প্রতাপেরও সেই একই দশা। তার অচরিতার্থ ভালোবাসা কর্মময় জীবনের কোলাহলের মধ্যেও জাগিয়ে তোলে ব্যক্তিহৃদয়ের পরাভব-চেতনা, যা নিষ্ফল আত্মাহুতির চিতাগ্নিশিখার মধ্যেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। এই চিত্ত-সঙ্কটের আইডিয়া 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' (১৮৭৮) রোহিণী-গোবিন্দলালের মধ্যেও সুপ্রকট। রোহিণীর একটি উক্তিতে আছে তারই চরম পরিচয়—'রাত্রিদিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে

—সম্মুখে শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।' এমন কি সেই 'সীতারামেও', যেখানে বঙ্কিম কোমর বেঁধে আদর্শ প্রচারে নেমেছেন সেখানেও একই চিত্র। রূপে গুণে বুদ্ধিতে কর্মশক্তিতে অতুলনীয়া শ্রী ভাগ্যদোষে বিয়ের পর থেকে স্বামী-সহবাসে বঞ্চিতা। সে স্বামীর সর্বস্বের অধিকারিণী, তবু তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যেন প্রথম দিকে স্পর্ধিত মর্যাদাই সন্ধান করেছে—'আমি শুধু তোমার দয়া লইব কেন?...এতকাল তোমা বিনা যদি আমার কাটিয়াছে, তবে আজও কাটিবে।' এখানে মনে হয়—সমাজ, সংসার ও স্বামী তাকে বঞ্চনা করলেও সে নিজেরই গড়া একটা মর্যাদা-স্বর্গে ব্যক্তিহৃদয়ের সুখ খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু অদৃষ্টলিপি জানার পর সেই কল্পিত স্বর্গ থেকে তার পতন হয়েছে, নিজের মধ্যে সে গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে। জয়ন্তীর শিষ্যা হয়ে সে হয়তো খুঁজে পেয়েছে একটা দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব, তবু কোথায় তার সেই পূর্বেকার কর্মকুশলতা ও আত্মনির্ভরতা? আসল কথা, সমগ্র জীবন ধরে যে আকুতি তাকে দগ্ধ করেছে, সাময়িক কর্মৈষণা বা নিষ্কাম কর্মের শিক্ষা তাকে প্রশমিত করতে পারেনি। তাই তার ব্যক্তিহৃদয়ের চরম কান্না শুনতে পেয়েছি শেষ পরিচ্ছেদে—'সন্ন্যাসিনীই হউক, যেই হউক, মানুষ মানুষই চিরকাল থাকিবে।'

সুতরাং বঙ্কিমের উপন্যাস যুগগত চিত্ত-সঙ্কটের কাহিনী, সন্দেহ নেই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সমাজ-প্রাধান্যের দ্বন্দ্বেই সেই সঙ্কটের বীজ নিহিত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বঙ্কিম কিভাবে এই দ্বন্দ্বের নিরসন করতে চেয়েছেন? ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সামঞ্জস্য মানবিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন কি? যে সংগঠকের ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ, তা কতটুকু সার্থকতা লাভ করেছে? এর উত্তরে বলা যায়, বঙ্কিম ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও সমাজের কল্যাণ—এই দুয়ের মধ্যে একটা ভারসাম্য, একটা সামঞ্জস্য আনতে চেয়েছেন। ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাসনা-কামনা, সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ ইত্যাদি তিনি দেখেছেন ও স্বীকার করে নিয়েছেন—তা না হলে আয়েষা,

কুন্দ, রোহিণী, শৈবলিনী, গোবিন্দলাল, প্রতাপ ইত্যাদির জন্ম হতো না। শুধু তা-ই নয়, জীবনের প্রতি অপরিসীম মমতায় তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যেন অধিকতর স্পর্ধিত ও দুরন্ত। তা ছাড়া একথা বঙ্কিম কোথায়ও বলতে পারেন নি যে, ব্যক্তিসত্তা মূল্যহীন ও উপেক্ষণীয়। বরং তাঁর উপন্যাসে যেন সীতারামদের কণ্ঠস্বরই থেকে থেকে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—'তোমার আমার কি শ্রী মিলিবে না?' তাছাড়া ব্যক্তিমানুষ তাঁর হাতে কোথায়ও পঙ্গু হয়ে জন্ম নেয়নি—কেউ ব্যাধিগ্রস্ত নয়, হেমচন্দ্র-পশুপতি-প্রতাপ ইত্যাদির জীবন না-পাওয়ার বেদনায় ও পরাভব-চেতনায় ম্লান হয়েছে, কিন্তু আত্মমর্যাদা হারিয়ে ক্ষুণ্ণ হয়নি। সুতরাং এ-পর্যন্ত বঙ্কিম ব্যক্তি-মানুষের প্রতি সুবিচারই করেছেন। কিন্তু যেখানে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষ বেধেছে, সেখানে তিনি ব্যক্তিকে ছেড়ে সমাজকেই আঁকড়ে ধরেছেন। তাঁর দার্শনিক বিশ্বাস ও রক্তগত সংস্কার তাঁকে এই শিক্ষাই দিয়েছিলো যে, ব্যষ্টি অপেক্ষা সমষ্টির গৌরব উচ্চতর সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই কুন্দনন্দিনীকে বিষ খেতে হয়, রোহিণীকে পিস্তলের মুখে বুক পেতে দিতে হয়, শৈবলিনীকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, প্রতাপকে নিষ্ফল যুদ্ধে আত্মাহুতি দিতে হয়, প্রথম বয়সের একটু অপরাধের জন্য অমরনাথকে ('রজনী'। ১৮৭৭) সমগ্র জীবন ধরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, এমন কি চোখে জল নিয়ে শ্রীকে জয়ন্তীর নিষ্কাম ধর্মের শূন্যতায় মিলিয়ে যেতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ সামাজিক কল্যাণের কাছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সর্বত্রই পরাভব। বঙ্কিম আপন চিন্তা ও সংস্কার অনুযায়ী যে আদর্শবাদের জয়ঘোষণা করতে চেয়েছেন, তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হতে কিছুই বাকী রইলো না। কিন্তু ভাববার কথা এই যে, বঙ্কিমের এই আদর্শ-প্রতিষ্ঠায় যতখানি জোর-জবরদস্তি আছে ততখানি মানবিক সম্পর্কের স্বাভাবিকতা নেই। শৈবলিনীর আত্মশুদ্ধি নিছক তত্ত্বের দিক দিয়ে হয়তো মন্দ নয়, কিন্তু তার যে অন্তর প্রতাপকে ভালোবেসেছিলো, যৌগিক প্রক্রিয়ায় তার মূলোৎপাটন

করতে যাওয়া বঙ্কিমের বুদ্ধি-সঙ্কটের চরম উদাহরণ। মানবিক সম্পর্কের রসাকর্ষণে শৈবলিনীর মন যদি চন্দ্রশেখরের দিকে ফিরে যেতো তবে তার রূপান্তর হতো বাস্তবসঙ্গত ও শিল্পসুন্দর। যে ভাবে রোহিণীর মূর্তি স্রষ্টার দাক্ষিণ্যে গড়ে উঠেছে, তাতে এমনভাবে মরা তার বিধিলিপি নয়—ভ্রমরের খাতিরে বা সমাজের খাতিরেও নয়। তাই শরৎচন্দ্র আপত্তি তুলেছিলেন, বলেছিলেন : এ অন্যায়, এ অবিচার। কুন্দকে বিষ খাওয়াবার জন্য বঙ্কিম আয়োজনের ত্রুটি রাখেন নি—অথচ সে মরতে চায়নি, বাঁচতেই চেয়েছিলো। এইভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বঙ্কিম বাইরে থেকে চাপ দিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সমাজসত্তার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করেছেন, অস্বাভাবিক উপায়ে সমাজ-কল্যাণর আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এবং সমাজের সত্যকে ব্যক্তির সত্যের ওপরে স্থান দিয়ে তখনকার দিনের মানুষের চিত্ত-সঙ্কট নিরসন করতে চেয়েছেন। এর মধ্যে স্রষ্টার সামাজিক প্রত্যয়ই বড়ো হয়ে উঠেছে, মানবিক বিচারবুদ্ধি নয়। ফলে তত্ত্বের দিক থেকে তাঁর সংগঠন-চিন্তা প্রশংসনীয় হলেও তিনি রক্তমাংসের জীবনের মধ্যে সেই তত্ত্বচিন্তাকে স্বাভাবিকভাবে রূপায়িত করতে পারেন নি। সুতরাং প্রচারক-সংগঠক হিসেবে তাঁর যতখানি সার্থকতা, শিল্পী-সংগঠক হিসেবে তাঁর সার্থকতা ততখানি নয়।

বঙ্কিমের সৃষ্টিশক্তি সঙ্কট-দীর্ণ মানুষের খণ্ডবিচ্ছিন্ন সত্তাকে একটা সমগ্র ও অখণ্ড রূপের মধ্যে ধরতে চেয়েছিলো, শিল্পের দিক থেকে খানিকটা ব্যর্থতা সত্ত্বেও তা তাঁর বড়োত্বের পরিচায়ক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মনুষ্যত্বের পূর্ণ স্বরূপের সাধনা সমকালের প্রয়োজন মিটিয়েছে বটে, যুগগত সঙ্কল্পনাকে মানুষের কাহিনীতে রূপ দিয়েছে সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য কোন যুগাতিক্রমী জীবন-দর্শনের ইঙ্গিত দিয়ে যেতে পেরেছে কি ? তিনি যে ভাবে সমাজের কাছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বিকিয়ে দিয়ে সমন্বয় করতে চেয়েছেন, তাতে, অন্ততঃ আজকের

দিনে আমরা বলতে পারি, কোন প্রগতিশীল চিন্তার ছাপ ছিলো না। ভাবী কালের চোখে তাঁর সমস্যা-সমাধান পজিটিভ্ নয়, নেগেটিভ্, কারণ তিনি এই বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে পাঠককে তেমন এগিয়ে দিতে পারেন নি। বড়ো লেখকের লক্ষণ এই যে, তাঁরা শুধু যুগের সমস্যাকেই পরিচ্ছন্নভাবে ফুটিয়ে তোলেন না, অপ্রস্তুত পাঠক তথা সমাজকে সমাধানের নতুন পথ দেখিয়ে যান, যা পরে তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। বঙ্কিমের রচনায় যে পথের নির্দেশ আছে তা পশ্চাদ্গামী পথ, অগ্রগামী নয়—তাই বিশ শতকে বঙ্কিমের সাধনা নিয়ে বহু বিরুদ্ধ ধারণার সৃষ্টি হতে দেখেছি। অবশ্য তাঁর সপক্ষে এইটুকু বলার আছে যে, আমাদের সমাজের শ্লথ গতি-প্রকৃতির জন্য সমস্যার সমাধান সহজ নয়—রবীন্দ্রনাথ পারেন নি, পারলে বিহারীকে উচ্চপ্রেমের ব্যাখ্যান শুনিয়ে বিনোদিনীকে আত্মবঞ্চনা করতে হতো না; শরৎচন্দ্রও পারেন নি—যদি পারতেন, তবে চোখে জল নিয়ে রমাকে কাশী যেতে হতো না।

উপন্যাসে বঙ্কিমের দৃষ্টি অতীতমুখী—তা না হয়ে উপায় ছিলো না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বিশেষ করে সাহিত্যিক জীবনের যুদ্ধপর্বে ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর সমন্বয় ধর্ম ও পূর্ণ মনুষ্যত্বের তত্ত্ব দেশের ভাবী সমাজ গ্রহণ করবে কিনা সন্দেহ। তাই উপন্যাসে তিনি বর্তমানের সমস্যা নিয়ে ডুব দিয়েছেন অতীতের অতলে এবং সেই দূরের কাহিনীর আড়ালে দাঁড়িয়ে যুগগত সমস্যার সংগঠনমূলক সমাধানের আভাস দিয়েছেন। শুধু রোমান্সগুলির কল্পনাঘন পরিবেশকেই তিনি তাঁর আইডিয়ার অবাধ মুক্তির ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করেন নি, সামাজিক উপন্যাস-গুলির রসরহস্যমধুর কাহিনী—যেখানে উঁচুস্তরের কথাবার্তা, বিষপান, পলায়ন, জলনিমজ্জন, পিস্তল ব্যবহার ইত্যাদির সমাবেশে রোমান্সের ব্যঞ্জনা আছে—তারও দ্বারস্থ হয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, বঙ্কিম শতাব্দীর শেষভাগের বাঙলা দেশের মুখের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ

রেখেছিলেন—কালের দূরাভিসারী যাত্রা বা মানুষের বিশ্বপ্রসারী মূর্তিকে বুঝবার চেষ্টা করেন নি। তাই অতীত তাঁর চোখে বর্তমানেরই ভূমিকা এবং সেই সূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তৃতীয়তঃ সমকালীন বাঙলা দেশের যে নবজাগ্রত স্বদেশচেতনা তার মনকে নাড়া দিয়েছিলো, ঐতিহ্যপ্রেমিক বঙ্কিমের কাছে অতীতের ইতিহাসের ক্ষেত্রই হচ্ছে সেই স্বদেশচেতনা প্রকাশের উপযুক্ত স্থল। তাছাড়া তাঁর মতো সরকারী কর্মচারীর পক্ষে এই ইতিহাসের আড়ালটুকুর সুযোগ নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। সুতরাং বঙ্কিমের ইতিহাস-চারণার সঙ্গত কারণ আছে।

এই পর্যন্ত গেলো বঙ্কিমের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে তার উপন্যাসের বিশ্লেষণ। এতে আমরা খুশি হই বা না হই, তাঁর উপন্যাসে যে পরিমাণ কবিদৃষ্টি ও রসপ্রাণতার স্বাক্ষর আছে, তাতে বেশ খুশি না হয়ে পারিনে। বস্তুতঃ 'দেবী চৌধুরাণী', 'আনন্দমঠ' ও 'সীতারামের' প্রচারধর্মিতা আমাদের বিচারবোধকে এতটা আচ্ছন্ন করে রাখে যে, জীবন-রস-রসিক বঙ্কিম প্রায় আমাদের চোখে পড়েন না। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত, কুন্দনন্দিনীর আত্মহত্যা, রোহিনীর নিধন ইত্যাদি উপেক্ষা করে উপন্যাসগুলির প্রথমাংশে দৃষ্টিপাত করলে বঙ্কিমের সরস মানবিকতা, স্বভাব-সৌন্দর্যমুখী দৃষ্টি, প্রেম-রূপ-যৌবন সম্পর্কে সহৃদয় মনোভাব ও মানবমনের বাসনা-কামনার প্রতি সহজ সহানুভূতির প্রকাশ দেখতে পাই। আয়েষা ও জগৎসিংহ প্রসঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের কথা বড়ো নয়, বড়ো সেই নর-নারী-ধর্ম—যে ধর্ম জাতি, সমাজ ও পরিবার-বন্ধনকে উপেক্ষা করে বিপন্ন পুরুষ জগৎসিংহকে ভালোবাসতে যুবতী আয়েষাকে প্রেরণা দিয়েছে। রসের দিক থেকে এই ভালোবাসার সত্য বহু মূল্যবান এবং সে-কারণেই বঙ্কিমের রসদৃষ্টির প্রশংসা করতে হয়। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নয় কি তার ভালোবাসার সেই অদৃশ্য অস্তিত্ব ও বেদনাভর চাপা নিঃশ্বাস যা নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর পুনর্মিলনের মধ্যেও চিরকাল সূক্ষ্ম ব্যবধান রচনা

করবে? লোকচক্ষুর অন্তরালে শৈবলিনীর মানসবেদীতে প্রতাপের যে চিতাগ্নি অনির্বাণ জ্বলতে থাকবে, তার কাছে তুচ্ছ নয় কি অন্তরের সায়হীন প্রায়শ্চিত্ত? গোবিন্দলাল শেষ পর্যন্ত ফিরে গেছে ভ্রমরের কাছে, কিন্তু রোহিণীর স্মৃতি-জর্জর চিত্ত পুনর্মিলনের মধ্যে ফিরে পেয়েছে কি নির্মল সন্তোষ? কিংবা ধরা যাক 'রাজসিংহের' জেব-উন্নিসাকে। মোগল-হারেমের কাম-কেলি আর বিলাসিতার স্রোতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে সে একদিন প্রেমিক মোবারকের বিয়ের প্রস্তাবকে পরিহাস করতে দ্বিধা করেনি, কিন্তু দরিয়ার সঙ্গে মোবারকের বিয়ের কথা শুনে তার মধ্যে জেগে উঠেছিলো চিরন্তনী নারী। তাই ঈর্ষাকাতর জেব-উন্নিসা সর্পাঘাতে মোবারকের মৃত্যু ঘটিয়ে একটু সান্ত্বনা পেতে চেয়েছিলো। কিন্তু মৃত্যুর সংবাদ তার মনে আনন্দ আনে নি, নিদারুণ আঘাত হেনেছে —সেই আঘাতের বেদনায় সে নিজেকেই প্রশ্ন করেছে—'আমি তাকে এত ভালবাসিতাম, তা সে কথা এতদিন জানিতে পারি নাই কেন?' এই যে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার ভেতর প্রেমের চকিত চমক— তার জন্য বঙ্কিমকে ধন্যবাদ। সুতরাং তাঁর নায়ক-নায়িকারা যে না-পাওয়ার বেদনায় অন্তরে অন্তরে কেঁদেছে, সেই জীবন-মন্থন-করা বেদনামৃতের মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই স্রষ্টার শাশ্বত মানবিকতার স্বাদ, তাঁর রসিকচিত্তের সুরভি। বঙ্কিমের জীবন-সমস্যার সমাধান তর্কের অতীত নয়—কিন্তু তাঁর লেখায় কামনা-বাসনায় বিজড়িত মানুষের কথা, তাদের অতৃপ্ত যৌবন ও অনাঘ্রাত প্রেমের কথা এবং ভাগ্যের শত লাঞ্ছনার মধ্যেও তাদের বেঁচে থাকার পিপাসার কথা যেটুকু রস ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে তা তর্কাতীত।

এই মানব-মনের আলেখ্য ছাড়া বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির আরেকটি সম্পদ হচ্ছে স্বদেশপ্রেমের চিত্র। সমকালীন রাজ-নৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণের সুযোগ তাঁর ছিলো না—অথচ দেশকে তিনি ভালোবেসেছিলেন, ভালোবেসেছিলেন তার

ঐতিহ্যকে—তার চিন্ময় ও মৃন্ময় সত্তাকে। তাঁর চোখে ভারতবর্ষ ছিলো হিন্দুর দেশ, হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি বহু মানুষ সমন্বিত একটি মিশ্রিত জাতির দেশ নয়—একথা অবশ্য কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেছেন। সত্য বটে, হিন্দু-মুসলমানের সংগ্রামের কাহিনীতে তিনি হিন্দুর পক্ষ নিয়েছিলেন, তাঁর চিন্তা ও ধ্যানের ঝোঁকটা ছিলো হিন্দু-সংস্কৃতির দিকেই। তবু তাঁর মানবতাবোধ মুসলমানদের জাতি হিসেবে কখনও ছোটো করে দেখেনি। তাঁর নিজের মুখেই শুনতে পাই—'যখন সর্বত্র সমান জ্ঞান, সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই বৈষ্ণব-ধর্ম, তখন এ হিন্দু ও মুসলমান, এ ছোট জাতি ও বড় জাতি এই রূপ ভেদ জ্ঞান করিতে নাই।' অর্থাৎ 'মনুষ্যে মনুষ্যে সমান।' কিন্তু, তিনি আরও বলেছেন, একথার অর্থ এই নয় যে, 'সকল অবস্থার সকল মনুষ্যই সকল অবস্থায় সকল মনুষ্যের সঙ্গে সমান।' আমার মনে হয়, এই শেষ পঙক্তিটি বঙ্কিমের স্বদেশ-ধর্মের আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের যে যে অধ্যায় অবলম্বনে তিনি রোমান্স ও উপন্যাস রচনা করেছেন, সেই সেই অধ্যায়ে ব্যক্তিগত হিন্দুর আচরণ ব্যক্তিগত মুসলমানের আচরণের চেয়ে উৎকৃষ্টতর বলে তাঁর কাছে মনে হয়েছিলো (তবে ইতিহাসের সেই অধ্যায়গুলি নির্বাচনে তাঁর হিন্দু-গৌরব-ভূয়িষ্ঠ মনের পরিচয় থাকতে পারে)। তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ 'রাজসিংহ'। উপন্যাসটির উপসংহারে বঙ্কিম সবিনয়ে জানিয়েছেন—'কেহ যেন মনে না করেন হিন্দু মুসলমানের কোনও প্রকার তারতম্য নির্দেশ করা এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না। অথবা মুসলমান হইলেই ভাল হয় না, হিন্দু হইলেই খারাপ হয় না। উভয়ের মধ্যেই ভাল মন্দ আছে।...অন্যান্য গুণের সহিত যাঁহার ধর্ম আছে তিনিই শ্রেষ্ঠ। ঔরংজেব ধর্মশূন্য, সেই জন্য তিনি এত বড় মোগল সাম্রাজ্যকে নিজের হাতে ধ্বংস করিয়া গেলেন—আর রাজসিংহ ধার্মিক সেইজন্য তিনি ক্ষুদ্র অঞ্চলের রাজা হইয়াও মোগল সম্রাটকে পরাজিত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন।'

সে যা-ই হোক, বঙ্কিমের স্বদেশচেতনা হিন্দুঘেঁষা হোক বা না হোক, সমগ্র বাঙালীর স্বাধীনতার সাধনায় তাঁর প্রভাব অসামান্য। স্বদেশী যুগ থেকে অধুনা-কাল পর্যন্ত সমস্ত আন্দোলনের মূলে প্রেরণা জুগিয়েছে 'আনন্দমঠ' আর 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত। তবে তাঁর উপন্যাসের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের দুর্বল চিত্রও আছে—'মৃণালিনীতে' স্বদেশভাবনার প্রথম সূচনা হলেও নায়ক হেমচন্দ্র মহৎ দায়িত্বভার বহনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

বঙ্কিমের উপন্যাসের আরেকটি লক্ষণীয় দিক হচ্ছে প্রেমের প্রাধান্য। বস্তুতঃ নারী ও প্রেম রেনেসাঁসের মানুষের বড়ো আবিষ্কার। যে নারী রেনেসাঁসের আগে সহজ সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলো, সেই নারীর মুক্তিই শুধু রেনেসাঁসের ভেতর দিয়ে ঘটেনি, তার সর্বোত্তম চিত্তসম্পদ হিসেবে প্রেমের স্ফূর্তিও ঘটেছে, একথা বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বলেছি। উনিশ শতকে বাঙলা তথা ভারতবর্ষে নারীর মুক্তির ইতিহাস সত্যিই চমকপ্রদ, কারণ নারীকে সীতা আর সাবিত্রী নাম দিয়ে এদেশে দীর্ঘকাল অর্গলবদ্ধ করে রাখা হয়েছিলো। 'ব্রজাঙ্গনার' আলোচনায় বলেছি, রাধা হচ্ছেন আমাদের চিরকালের হেলেন; অন্ততঃ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত তা নিঃসন্দেহে সত্য। তবে বঙ্কিমের উপন্যাস পড়ে মনে হয়, আমাদের সাহিত্যে ধীরে ধীরে আরও অনেক হেলেন গড়ে উঠছে। সমাজে নারীর মুক্তি ঘটছিলো বলেই সাহিত্যেও নারী-ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। 'দুর্গেশনন্দিনীর' তিলোত্তমা অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ হলেও আয়েষা রীতিমতো মহীয়সী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না—ওসমানের সামনে জগৎসিংহকে প্রাণেশ্বর বলতে যেমন তার দ্বিধা নেই, তেমনি বিবাহের বধূ তিলোত্তমাকে অলঙ্কারে সাজিয়ে দিতেও তার আপত্তি নেই। আর বিমলা? বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, চাতুর্যে ও হৃদয়বত্তায় তার জুড়ি মেলা ভার—বিলাস-বিভ্রমে সে মোহিত করে অনেককেই, তবু অন্তরে সে স্বামীগতপ্রাণা নারী। এই ধরণের চরিত্র বাঙলা সাহিত্যে বিরল। 'মৃণালিনীর' মনোরমা এক দিক থেকে যেমন চমকপ্রদ, তেমনি

আরেক দিক থেকে চমকপ্রদ 'সীতারামের' শ্রী। বঙ্কিমের কল্পনায় যেমন বিশিষ্টা হয়ে উঠেছে গৃহত্যাগিনী শৈবলিনী, তেমনি সাধ্বী স্ত্রী লবঙ্গলতা। নগেন্দ্রনাথকে ভালোবাসার পর কুন্দচরিত্র সঙ্কুচিত ও ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লেও রোহিণী আগাগোড়াই উজ্জ্বল। আর 'দেবী চৌধুরাণীর' প্রফুল্ল অনন্যা, অদৃষ্টপূর্বা। অন্যদিকে প্রেমেরই বা কত বিচিত্র রূপ! শৈবলিনী ও দলনীর প্রেম এক নয়; রোহিণীর প্রেম যতটা মুখর, কুন্দর প্রেম ততটা মুখর নয়; মতিবিবির ('কপালকুণ্ডলা') প্রেমের গতি যেমনি বিচিত্র ও সর্পিল, তেমনি বিচিত্র ও সর্পিল হীরার প্রেম ('বিষবৃক্ষ'); তিলোত্তমার ভীতি-বিহ্বল যুবতী-প্রেম যেমন দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় রমার ('সীতারাম') শঙ্কাজর্জরিত বিবাহিত-প্রেম। নায়িকারা কেউ মুগ্ধা, কেউ মধ্যা, কেউ প্রগল্‌ভা। এই সব বিচিত্র নারী-চরিত্র ও প্রেম-ভাবনা সাহিত্যের রসলোকে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আর উপন্যাসের গঠন-কৌশলের দিক থেকেও শিল্পী বঙ্কিম সপ্রশংস উল্লেখ দাবি করতে পারেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' কাঁচা হাতের লেখা; কাহিনী-সংগঠন, চরিত্রসৃষ্টি, ইতিহাসের জগতের সঙ্গে মানব-সংসারের সম্পর্ক স্থাপন, এমন কি পরিচ্ছেদের নামকরণেও নানা ত্রুটি ও অসঙ্গতি দেখা যায়। কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা' বঙ্কিমের শিল্পজ্ঞান ও কবিকল্পনার অপূর্ব সৃষ্টি—মোগল-হারেমের মতিবিবির অদৃষ্টকে যেমন কৌশলে বননিবাসিনী কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত করেছেন, তা পরিণত কলাবুদ্ধির পরিচায়ক। কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি, কাপালিক, নবকুমার ইত্যাদি চরিত্রমিছিলও উজ্জ্বল ও স্বাতন্ত্র্য-বিশিষ্ট। পরিচ্ছেদের নামকরণেও সুচিন্তিত পরিকল্পনার চিহ্ন আছে। 'চন্দ্রশেখরের' গঠন-কৌশল ত্রুটিপূর্ণ হলেও 'রাজসিংহ' ত্রুটিহীন। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, সমস্ত কাহিনীর মধ্যে অগ্রসর-গতি সঞ্চার করার জন্য বঙ্কিম তাঁর প্রত্যেক পরিচ্ছেদ থেকে সমস্ত অনাবশ্যক ভার দূরে ফেলে দিয়েছেন, সেই দ্রুততার হাত থেকে এমন কি স্ত্রীচরিত্রগুলিও বাদ পড়েনি। শুধু তাই নয়, তিনি ইতিহাস

ও মানব উভয়কে একত্র করে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে উভয়কেই এক রাশের দ্বারা বেঁধে সংযত করে নিয়েছেন। অন্য দিকে তাঁর দুটি সামাজিক উপন্যাস—'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' রূপবন্ধ কাহিনী ও চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে মোটামুটি সার্থক। এইভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বঙ্কিমের হাতে উপন্যাস-শিল্প শুধু জন্মে নেয়নি, তা বিকশিতও হয়েছে। জন্মদশা থেকে যৌবনদশা পর্যন্ত তার অঙ্গ-পরিচর্যার ভার বঙ্কিম বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে বহন করে গেছেন। ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ের' প্রথম প্রচেষ্টা বঙ্কিমের প্রতিভার স্পর্শে বহুবিচিত্র সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। যদিও মাঝে মাঝে স্বয়ং আসরে নেমে তিনি যে সব মন্তব্য করেছেন, যে ভাবে কাহিনীর গতি পর্যন্ত ফিরিয়ে দিয়েছেন তা আজকের দিনে আমাদের কাছে একটু অস্বাভাবিক ঠেকে। আর ভাষার দিক থেকেও বঙ্কিম-সাহিত্যের ক্রম-পরিণতি বিস্ময়কর। 'সংবাদ-প্রভাকরের' পৃষ্ঠায় যে যমক-অনুপ্রাস-কণ্টকিত অবোধ্য গদ্যভাষার প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন, তা থেকে 'দুর্গেশনন্দিনীর' ভাষা অনেক উন্নত ও সুবোধ্য। অন্য দিকে মোহিতলাল বিশুদ্ধ মানদণ্ডে বিচার করে বলেছেন, 'ভাষা হিসাবে দুর্গেশনন্দিনীর মত অপকীর্তি আর নাই।' কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর সযত্ন সাধনায় এই কুখ্যাত ভাষাই 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'বিষবৃক্ষের' সহজ, সরস, জীবন্ত ও শ্রীসম্পন্ন ভাষায় পরিণত। তাই ঐতিহাসিক নিরিখে সমগ্রভাবে বিচার করলে মনে হয়, বঙ্কিমের প্রতিভা একদিকে বিদ্যাসাগরের সাধু ভাষাকে, অন্যদিকে 'আলাল' ও 'হুতোমের' মৌখিক ভাষাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিয়েছে। এই উভয় জাতীয় ভাষা রয়েছে তাঁর নতুন ভাষারীতির রাসায়নিক সংশ্লেষের অলক্ষ্য উপাদান রূপে। বঙ্কিম বিদ্যাসাগরী সাধুভাষার বহিঃসৌষ্ঠব গ্রহণ করেছেন, গ্রহণ করেছেন 'আলালী' ও 'হুতোমী' ভাষার অন্তঃস্পন্দন। একের রূপ ও অন্যের প্রাণ মিলে বঙ্কিমের ভাষা-স্রোতস্বিনী পূর্ণাঙ্গিণী হয়ে উঠেছে। দার্শনিক পরিভাষা ব্যবহার

ভাবে বলা যায়—বিদ্যাসাগরের ভাষা যদি হয় 'thesis', তাহলে 'আলাল' ও 'হুতোমের' ভাষা 'antithesis' এবং বঙ্কিমের ভাষা 'synthesis'। বস্তুতঃ বঙ্কিমের সাহিত্যে সাধুভাষা সংপৃক্তির সম্পৃক্তাঙ্কে (point of saturation) এসে পৌঁচেছে; তার জড়তা চলে গেছে, গতিবেগ এসেছে; সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ-শক্তিকে যথাসাধ্য শোষণ করে ভাষা হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক। শুধু তাই নয়, ভাষার মণ্ডনকলাও তখন একটা প্রশংসনীয় স্তরে এসে পৌঁচেছে। বঙ্কিমের পূর্বে বাঙলা গদ্য-ভাষায় এই সব ব্যাপার ঘটলো না কেন—এ প্রশ্ন উঠতে পারে। মনে রাখতে হবে, মানুষের জীবন ও মনের সঙ্গে তাল রেখেই ভাষার বিবর্তন হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ রাজত্বের সংস্পর্শে এসে বাঙালীর ব্যবহারিক জীবনে ও চিন্তার জগতে যে ভাঙাগড়া শুরু হয়েছিলো—তা বঙ্কিমের সময়ে একটা নির্দিষ্ট পরিণতি লাভ করে: পূববাহিনী ও পশ্চিম-বাহিনী সমস্ত চিন্তা ও কর্মের ধারা সমন্বায়িত আদর্শের সাগর-সঙ্গমে মিলিত হয়। সুতরাং বঙ্কিমের হাতে বাঙলা সাধুভাষার পরিণতি আসতে দেখে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

বঙ্কিমের সাহিত্যালোচনায় 'বঙ্গদর্শনের' (১৮৭২) কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তিনি চিন্তানায়ক, জ্ঞানস্থবির, যুক্তিবাদী, ধর্মপ্রবক্তা, সাহিত্যরথী—এ সবই সত্যি। কিন্তু তাঁর মনীষার সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তির মূলে আছে 'বঙ্গদর্শনের' দাক্ষিণ্য। এই পত্রটি যেমন বাঙলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে বিশিষ্টতম, তেমনি বঙ্কিম-প্রতিভার ক্রম-বিকাশের সহায়ক হিসেবে উজ্জ্বলতম। তাঁর সব্যসাচী রূপ 'বঙ্গদর্শনের' ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পত্রটি 'যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো সমাগতো রাজ-বদুন্নতধ্বনিঃ।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের রেনেসাঁসের অন্যতম প্রধান সন্তান হচ্ছেন বঙ্কিমচন্দ্র। শুধু সন্তান নন, তিনি তার প্রবক্তা ও সংগঠকও বটে। চিন্তায় তিনি আনলেন সমন্বয়ের তত্ত্ব—পথের

নির্দেশ দিলেন; সাহিত্যে তিনি বিকশিত করলেন 'প্রভাতের সূর্যোদয়'—উপন্যাসে তিনি মানুষের অ-পূর্ব কাহিনী রচনা করে গেলেন; স্বদেশপ্রেমের চেতনায় তিনি উদ্বুদ্ধ হলেন—তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেলো স্বদেশকর্মীদের গীতা 'আনন্দমঠ'; গদ্য-ভাষায় তিনি যুগান্তর আনলেন—সৃষ্টি হলো একদিকে 'কপালকুণ্ডলা' অন্যদিকে 'বিষবৃক্ষ'। 'গোলেবকাওলির' দেশে তিনি রেখে গেলেন 'রোহিণী-কুন্দনন্দিনীর' কাহিনী—অনেক ব্যবধান! শিল্পীপুরুষ বঙ্কিম যথার্থই মধুসূদনের উপযুক্ত উত্তরসাধক, রবীন্দ্রনাথের সম্মানিত পূর্বসূরী।

৮ রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ এক পরম বিস্ময় কিংবা এক আশ্চর্য প্রাকৃতিক ঘটনা। তৃণলতাগুল্মের সমাজে তিনি বলিষ্ঠ বনস্পতি—এমনি তাঁর ব্যক্তিত্ব; সমতলের চোখে তিনি অনন্য নগাধিরাজ—এ তাঁর বিচিত্র বিপুল মনীষার রূপক। তাঁর দৃষ্টি দূরাভিসারী—সীমার বন্ধন তাঁকে দেশকালের গণ্ডির মধ্যে ধরে রাখতে পারে নি; তাঁর বোধ অতলান্ত—মানব-মনের গহন গভীরে তাঁর অনুপ্রবেশ ঘটেছে সহজাত স্বচ্ছন্দতায়; তাঁর বুদ্ধি আলোকস্নাত—কোন সংস্কারের রঙ তাতে লাগে নি। রবীন্দ্রনাথের মোহমুক্ত মন অনেক কিছুকেই দেখেছে, জেনেছে, অনুভব করেছে—তাদের মধ্য থেকে আহরণ করেছে রূপ-রস-রঙ, অথচ সেই মাধুকরীতে কোথায়ও কোন আসক্তির শেকড় ছড়িয়ে নেই। হৃদয়ের অসংখ্য পত্রপুট জগৎ ও জীবনের মধ্য থেকে যা কিছু জ্যোতিঃকণা সংগ্রহ করতে পেরেছে তাতেই তিনি ভেতরের দিক থেকে বড়ো হয়ে উঠেছেন, তাঁর প্রাণাগ্নি উদ্দীপ্ত হয়েছে। অশীতিবৎসরব্যাপী সৃষ্টির প্রাচুর্যে প্রমাণ হয়েছে সেই ক্লান্তিহীন প্রাণময়তার। এ থেকে বলতে ইচ্ছে হয়, রবীন্দ্রনাথ যেন যুগ-মানুষের সন্তান নন, বাঙলা দেশের তিল তিল তপস্যার ধন নন—তিনি যেন বিধাতার অযাচিত আশীর্বাদ, এক স্বয়ম্ভু নক্ষত্রবিহারী আলোকপিণ্ড। অথচ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, উনিশ শতকী রেনেসাঁসের প্রেরণার সঙ্গে রবীন্দ্র-প্রতিভাকে মেলানো যায় এবং তাঁর কীর্তি ও আদর্শ শতাব্দী-ব্যাপী যুগান্তরণ-প্রায়াসেরই চূড়ান্ত পরিণাম। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যেমন যুগ-সম্ভব, তেমনি যুগাতিক্রমী। রামমোহন থেকে যে নবজন্মের সাধনার ধারা চলে আসছিলো, সেই চলমান প্রবাহ

থেকেই বেরিয়ে এসেছেন তিনি—অথচ সেখানেই থেমে যান নি, সেই প্রবাহকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন—প্রায় অকল্পনীয় দূরত্বে ও বিস্তারে। যুগকে একান্তভাবে স্বীকার করে নিয়ে তার অতিক্রমণের অক্লান্ত ও অনিবার প্রচেষ্টাই কবির দীর্ঘ জীবনের বহুমুখী সৃষ্টিময়তার নিহিতার্থ। এক কথায়, রবীন্দ্রনাথ যেমন রেনেসাঁসের সৃষ্টি, তেমনি রেনেসাঁসের সুদূরপ্রসারী পরিণতি রবীন্দ্রনাথের সাধনকীর্তি।

রামমোহন থেকে যাত্রা শুরু করে রবীন্দ্রনাথে এসে যখন পৌঁছোই, তখন গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগরে পৌঁছোনোর বিস্ময়ই শুধু অনুভব করিনে, অনুভব করি এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। অনেক শতাব্দীর ব্যবহারিক ও মানসিক নিষ্ক্রিয়তার জড়ভার ভেদ করে ব্যক্তিমানুষ তথা জাতির আত্মপ্রকাশের অমিত প্রয়াস সহজ সাফল্য লাভ করে নি—নানা পথ ও মতের দ্বন্দ্ব, অগ্রসারী ও পশ্চাদমুখী আদর্শের টানাপোড়েন, দেশজ ও য়ুরোপীয় চিন্তা ও কর্মের বিকর্ষণ-আকর্ষণের বিচিত্র-জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ ও মানুষের মন এগিয়েছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধার্মিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত পরিস্থিতি অনিবার্য দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মুক্তিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। শতাব্দীর প্রথমার্ধ বিশেষ করে ভাঙনের কাল—সংস্কারের জাঙাল ভেঙেছে, মনের জড় ভেঙেছে আর ভেঙেছে বুদ্ধির জট। এই নেতিবাচক ভাঙন-ক্রিয়ার ভেতরে ভেতরে অবশ্য গড়ে উঠেছে ব্যক্তিমানুষের স্বরূপ। তাই দ্বিতীয়ার্ধে সময় এলো গড়নের—নতুন ব্যক্তির সঙ্গে পুরোন সমাজের, য়ুরোপীয় আদর্শের সঙ্গে দেশজ আদর্শের সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিলো। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব শতাব্দীর এই দ্বিতীয়ার্ধে হয়েছিলো বলেই তখনকার সমাজের তাগিদ ও ব্যক্তির ঝোঁকটা ছিলো যে গড়ন ও স্বাবলম্বনের দিকে তিনি তারই সম্মুখীন হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের চিন্তা ও বিশ্বাস অনুযায়ী জাতির বৃহৎ সত্তা ও মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রকে গড়ে তোলবার পথ-নির্দেশ দিয়ে

গিয়েছিলেন। তাঁর সমগ্র সাধনার মূল লক্ষ্য ছিলো বাঙলা দেশ ও কিছুটা ভারতবর্ষ, তাঁর বিশ্বাসের মূল ছিলো দেশের মাটির মধ্যেই প্রোথিত—ফলে ঋষিকল্প সদিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি একটা উগ্র জাতি-অভিমান ও মানবপ্রেমের ঔদার্য-বিরোধী হিংসাত্মকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। ইতিহাসের অধ্যবসায়ী পাঠক হওয়া সত্ত্বেও তিনি যেন একটা ভ্রান্ত স্বপ্নকেই ধরে ছিলেন—ব্যক্তি ও সমাজের সামঞ্জস্য স্থাপন ও মনুষ্যত্বের পূর্ণ আদর্শ তুলে ধরতে পারলেই বর্তমান ও অনাগত যুগের সব সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হয়ে যাবে। তিনি বুঝেও বুঝেন নি—মানুষের ইতিহাসের শেষ নেই, একটা আদর্শের বন্ধন খাড়া করতে পারলেই মানুষের যাত্রা লক্ষ্যে গিয়ে পৌছোবে না, বন্ধন ও মুক্তির পর্যায়ক্রমেই মহাকালের ইতিহাস রচিত হয়ে চলেছে। তা ছাড়া জীবনের বৃত্ত যে ভেঙে ভেঙে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর বৃত্ত রচনা করে চলেছে, মানুষের দৃষ্টি যে ধীরে ধীরে বিশ্বমুখিন হতে শুরু করেছে—ইতিহাসের এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিতটুকু তিনি ধরতে চান নি বা ধরতে পারেন নি। তাই হিন্দুত্বের প্রতি ঝোঁকটা তিনি রোধ করতে চান নি, সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাকে জাগিয়ে তুলতে দ্বিধা করেন নি, জাতীয়তার নামে হিংস্রবৃত্তির অনুশীলনকে আপত্তি-কর মনে করতে পারেন নি। আসল কথা, শতাব্দীর শেষ দিকে নবজাগ্রত জাতির অর্জিত নতুন সমৃদ্ধি ও প্রত্যয়, চেতনা ও জিজ্ঞাসা, আবিষ্কার ও সমীক্ষা যে নির্দিষ্ট পরিণামের দিকে চলছিলো —ধর্ম, অর্থ, রাষ্ট্র, সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যাদি সব দিক থেকেই—বঙ্কিমের মনীষা তাকেই একটা বাস্তব ও মানসিক ভূগোলের সীমার মধ্যে সুস্পষ্ট রূপ দেয়। ফলে বঙ্কিমের সাধনায় দেখতে পাই ইতিহাসের একটা বিরাট অধ্যায়ের পরিণতি। আর সে-কারণেই নতুন অধ্যায় রচনার দায়িত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। আশ্চর্যের কথা, তিনি শুধু একটা বিশেষ অধ্যায় রচনা করে ইতি-হাসকে পথ ছেড়ে দিলেন না, ইতিহাসের ভাবী লক্ষ্য নির্দেশ করে দিয়ে ইতিহাসকেই অনুযাত্রী করে গেলেন। সমকাল যতটুকু

তাঁর কাছে চেয়েছিলো, তিনি দিয়ে গেলেন তার চেয়ে অনেক বেশি।

কিন্তু এতো গেল তাঁর কবি-মনীষার সামর্থ্য ও সাধনার কথা। সেই সামর্থ্য ও সাধনার বিস্তৃত আলোচনার আগে ঠাকুর পরিবারের ক্ষণজন্মা সন্তানের জীবনটাকে একটু যাচিয়ে দেখা দরকার যশোহর-খুলনার পিরালী ব্রাহ্মণ বংশের দ্বারকানাথ ঠাকুর পঞ্চাশ বছরের জীবনে শুধু ধনী নন, মানী ও গুণী লোক হয়ে উঠেছিলেন তিনি ছিলেন রামমোহনের কালের লোক এবং তাঁর বন্ধু। তিনি ব্রাহ্ম হন নি, কিন্তু নতুন দিনের সুধা পান করেছিলেন। এই বিদ্বান ও বুদ্ধিমান 'প্রিন্সের' জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা দেয় চিত্ত-সঙ্কট (প্রথম পর্বে 'দেবেন্দ্রনাথ'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)—তিনি ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হন, সংস্কারের নানা নাগপাশ থেকে পরিবারকে মুক্ত করেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলতে দ্বিধা করেন নি—'আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা-ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল।' আচার-অনুষ্ঠান বিরল, হিন্দুঘরের পাল-পার্বণ বন্ধ। অবশ্য উপনয়ন ছিলো, গায়ত্রী মন্ত্র ছিলো, ছিলো আরও কিছু দিশি রীতিনীতি। অন্যদিকে ঘর-সাজানোর ছবি, পাথরের মূর্তি, আসবাবপত্র, বাদ্যযন্ত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদে বিলিতি ছোঁয়া ছিলো ভালো রকমের। অর্থাৎ পুরোন কালের বদলে 'নতুন কাল সব এসে নামল' যখন, তখন দেবেন্দ্রনাথের চতুর্দশ সন্তান রবীন্দ্রনাথের জন্ম (২৫শে বৈশাখ, ১৮৬১)। কবির জন্মের পরও নতুন কালের সাধনা চলতে থাকে ঠাকুর পরিবারে। আই সি এস. সত্যেন্দ্রনাথ ও প্রতিভাবান পুরুষ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রী-স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, গণেন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলার' আয়োজনে উদ্যোগী হন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেশমন্ত্রদীক্ষিত 'সঞ্জীবনীসভা' প্রতিষ্ঠা করেন, ঠাকুর বাড়িতে নাটকের অভিনয় ও 'বিদ্দজনসমাগমের' ব্যবস্থা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একটা প্রায়-সংস্কার-মুক্ত পরিবেশে ও মানসিক খোলা হাওয়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব।

দেশাচারের পিরালী অভিশাপ থেকে ঠাকুর পরিবারের মুক্তি—চলনে-বলনে, পোষাকে-পরিচ্ছদে, ধর্ম-দর্শনে, সাহিত্য-সঙ্গীতে, দেশের প্রতি প্রেমে ও বিদেশের প্রতি আকর্ষণে ঠাকুর পরিবারের সর্বময় স্বাতন্ত্র্য যেন তখনকার শিক্ষিত বাঙলার প্রতীকতা নিয়েই কবির দৃষ্টির সম্মুখে সমুদ্ভাসিত ছিলো।

কবির জীবন-কাহিনীর প্রথম পাতাতেই চোখে পড়ে একটি কুনো ও নিঃসঙ্গ ছেলের সঙ্গে। বিরাট পরিবারের বহু ভাইবোনের মধ্যে মানুষ হওয়ার ফলে বাবা-মাকে একান্ত করে পাওয়া রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে ঘটেনি। তাঁর বাল্যকাল কেটেছে ঝি-চাকরদের মহলে। নিজেদের কর্তব্যকে সহজ করে নিতে গিয়ে তারা কড়া শাসনের ব্যবস্থা করেছিলো, এমন কি শ্যাম নামধেয় চাকর ছোট্ট মানুষটির চারদিকে খড়ি দিয়ে গণ্ডি কেটে তার নড়াচড়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলো। কিন্তু বাইরের এই বন্ধনের অন্তরালে ছিলো যে অযত্ন ও অনাদর তারই সূত্রে মনের দিক থেকে একটা স্বাধীনতাও ছিলো। ঘরে আটকা থাকেন, বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ কম—তাই নিজের মনের সঙ্গে কবির খেলা চলে, দেখা দেয় কল্পনাপ্রবণতা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রাচুর্য। কখনও জানালার ঝিলিমিলির ফাঁক দিয়ে তার চোখে পড়ে নীচের পুকুর, তার পূর্বধারের পাঁচিলের গায়ে একটা চীনাবট, দক্ষিণ পারে নারকেল গাছের সারি। আরও একটু বড়ো হয়ে ছাদ থেকে কবি দেখেছেন পল্লীর একটা পুকুর, দূরে দূরে বাড়ির মিছিল, নিজেদের এলাকায় একখণ্ড পতিত জমি। তখন রবীন্দ্রনাথের যেন ডাক-ঘরের অমলের মতো বন্দীদশা—বহির্বিশ্বের রূপ-শব্দ-গন্ধ 'দ্বার-জানলার নানা ফাঁক-ফুকুর দিয়ে' নানা ইশারায় কবির মনকে ছুঁয়ে যায়। বটগাছের তলাকার অন্ধকার জায়গা দেখে মনে হয়, যেন স্বপ্নযুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব। নিজেদের বাড়ির জানা-অজানা কুঠরীর গোলকধাঁধায় যেন নানা রহস্যের ঠিকানা। সুতরাং নিজের বাস্তব জীবনের গণ্ডি-বন্ধন থেকে কবি অনুভব করেছেন

মুক্তি-পিপাসা—এমন কি পিতার কলঘরে ঝাঁঝরি খুলে দিয়ে স্নান করার সময়েও তাঁর মনে পড়তো একদিকে মুক্তি, আর এক-দিকে বন্ধনের কথা। বাল্য বয়সেই অনুভূত এই বন্ধন-মুক্তির চেতনাই ক্রমে কবির সমগ্র জীবনের অন্তরতম সত্য হয়ে দাঁড়ায়।

রবীন্দ্রনাথ ইস্কুল-পালানো ছেলে। ইস্কুলে যাওয়ার জন্য কান্না নিয়ে তাঁর শিক্ষার্থী জীবনের শুরু, ইস্কুলে না যাওয়ার ইচ্ছা দিয়ে তার পরিসমাপ্তি। ওরিএণ্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমী ও সেণ্ট জেভিয়ার্‌স্ স্কুলে তিনি ঘুরে ঘুরে পড়লেন, কিন্তু কোথায়ও মন বসলো না। সবই যেন কয়েদখানা। ঘরে পড়লেন মাধব পণ্ডিত, জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য, নীলকমল ঘোষাল, সীতানাথ দত্ত (ঘোষ ?), হেরম্ব তত্ত্বরত্ন, অঘোরবাবু ইত্যাদি কত জনের কাছে—কিন্তু বাঁধাধরা শিক্ষা তাঁর মনোহরণ করতে পারলো না, নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকার চেয়ে অনির্দিষ্ট অ-পাঠ্য বইয়ের দিকেই তার আকর্ষণ দাঁড়ালো বেশি। এমন কি সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের অত্যুৎসাহও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করতে পারে নি মায়ের মৃত্যুর পর স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে এলো আরও ঢিলেমি, ক্লাশে প্রমোশান না পাওয়ায় তাঁকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হলো। বছর সতেরো বয়সে তাঁকে ব্যারিস্টার করে আনার ইচ্ছায় বিলেত পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ে কিছুদিন ইংরেজীয়ানায় অভ্যস্ত হয়ে তিনি বিলেত যাত্রা করলেন। কিছুদিন ব্রাইটনের পাবলিক স্কুলে ও লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজে তিনি পড়লেন, ইংরেজীর পাঠ নিলেন হেন্‌রী মর্লির ক্লাশে—কিন্তু তাতে লেখাপড়া শিখলেন যতটা, তার চেয়ে বেশি আয়ত্ত করলেন নতুন মতামত। অবশেষে অবিভাবকদের অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি দেশে ফিরে এলেন—'কোনো বিদ্যা আয়ত্ত না করে, কোনো ডিগ্রী না নিয়ে, ব্যারিস্টারি পড়া শেষ না করে'।

বাঁধাধরা শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের হয়নি, কিন্তু সাহিত্য-শিক্ষা হয়েছিলো। তা-ও নিজের মনের স্বাভাবিক অনুরাগে। 'কর, খল'

ইত্যাদি শব্দের তুফান কাটিয়ে তিনি যখন প্রথম পড়লেন—'জল পড়ে পাতা নড়ে'—তখন আদিকবির প্রথম কবিতার মতোই চরণটির ছন্দ তাঁর মনকে দোলা দিয়েছিলো। তাঁর নিজের ভাষায় —'এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।' শুধু তা-ই নয়, কবির শিশুকালের সাহিত্যরসসম্ভোগের ইতিহাসে আরেকটা চরণ—'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এলো বান'—অক্ষয় হয়ে আছে। 'এটা যে শৈশবের মেঘদূত।' হেমেন্দ্রনাথের শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যম ছিলো বাঙলা, তাই বাঙলা ভাষা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন বেশ অল্প বয়সেই। স্কুলের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় তাঁর দৃষ্টি পড়লো দ্বিজেন্দ্রনাথের আলমারির ওপর—যাতে ছিলো 'অবোধবন্ধু' ও 'বিবিধার্থসংগ্রহ', 'বৈষ্ণব পদাবলী' ইত্যাদি। সাময়িক পত্র দুটির মধ্যে কবি পেয়েছিলেন তাঁর রসপিয়াসী ও কৌতূহলপ্রবণ চিত্তের নানা খোরাক। তারপর ধীরে ধীরে কবির মন খুঁজতে লাগলো নিজের সঙ্গে বিশ্বের মিলনের নানা পথ। উপনয়নের গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে তিনি শুনতে পেলেন বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর তাঁর নিজের অস্তিত্বের একাত্মকতার বাণী। এমন দিনে তিনি পিতার সঙ্গী হয়ে হিমালয়ে যাওয়ার পথে শান্তিনিকেতনে থেকে গেলেন কয়েকদিন। এর আগে পেনেটিতে গঙ্গার তীরে প্রকৃতিরাণীর সঙ্গে একবার শুভদৃষ্টি-বিনিময় ঘটে, তিনি সেই সময় প্রথম পান অজানা জগতের নতুন চিঠি। এবারে ধু ধু মাঠে খোয়াইয়ের ঢেউয়ে ঢেউয়ে, ভুবনডাঙার তালের সারিতে মুক্তমনের যে লীলাভিসার তারই কবিত্ববোধে পত্তন হলো একখানা নাট্যকাব্যের। ডালহৌসির শৈলশিখরেও রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন বিশ্বসৃষ্টির অমৃতস্বাদ—ব্রাহ্ম মুহূর্তে ঊর্ধ্বমুখে সূর্যের জ্যোতিঃকণা পান করে কিংবা উপত্যকা অধিত্যকার চৈতালি ফসলে স্তরে স্তরে ছড়িয়ে-যাওয়া সৌন্দর্যের আগুন দেখে তাঁর রসচিত্ত উদ্বেলিত না হয়ে পারেনি। পিতার কাছে সংস্কৃত, ইংরেজী ও জ্যোতিষের পাঠ নিতে

গিয়ে তিনি তৈরি করে ফেললেন একটা প্রবন্ধ—যা বোধহয় তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা। হিমালয় থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ মূল থেকে পড়লেন 'কুমারসম্ভব' ও 'ম্যাকবেথ', লিখলেন 'বন-ফুল' কাব্য। তেরো বছর আট মাস বয়সে লেখা 'হিন্দুমেলার উপহার' (প্রথম মুদ্রিত কবিতা) নামক কবিতা ও বেনামীতে লেখা 'জ্বল্ জ্বল চিতা দ্বিগুণ দিগুণ' গান এখানে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাইরের জগৎ থেকেই শুধু তিনি কবিত্বের প্রেরণা পাননি, তা পেয়েছেন বাড়ির আবহাওয়া থেকেও। তাঁর জীবনীকারের ভাষায়—'সাহিত্য ও কলা-সৃষ্টির নৈপুণ্য বা সমঝদারি, এ যেন ঠাকুর বাড়ির লোকদের জন্মার্জিত ক্ষমতা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে একটা সাহিত্যচক্র গড়ে ওঠে; সেটা সংবিধানসম্মত সভা নয়—সেটা মজলিশ, আড্ডা। আড্ডায় যেমন আসেন অক্ষয় চৌধুরী, বিহারী লাল চক্রবর্তী সেকালের খ্যাতনামারা তেমনি অখ্যাত সমঝদার ও চাটুকারেরা—আসর জমান তারা। অক্ষয়চন্দ্রের কাছ থেকে সকলে শোনেন ইংরেজি সাহিত্যের 'আধুনিক' কবিদের কথা।...তিনি রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে পাশ্চাত্য কাব্যবিচারের একটা উচ্চ মান তুলে ধরে কত কথাই বোঝাতেন।...ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠদের মধ্যে কথা হল বাড়ি থেকে একটা মাসিক পত্র বের করলে হয়।...অবশেষে 'ভারতী' নাম দিয়ে ১২৮৪ শ্রাবণ মাসে (১৮৭৭) পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বের হল ; দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদক হলেন।...নতুন পত্রিকার আবির্ভাবে বালকের লেখনী হতে অজস্র রচনা বের হতে থাকল।' এইভাবে কবির 'হৃদয়ের দখলের সীমানা' বেড়ে চলে বাড়ির অনুকূল আবহাওয়ায় আর বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগে। বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লেখেন, তখন কাব্যরসের যে ভোজ চলেছিলো বাড়িতে কবি তা থেকে বঞ্চিত হন নি। তাঁর নিজের মুখেই শুনতে পাই—'এত ছড়াছড়ি যাইত যে, আমাদের মতো প্রসাদ আমরাও পাইতাম।...সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কিনা জানিনা, পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না, কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া

ঢেউ খাইতাম; তাহারই আনন্দ-আঘাতে শিরা-উপশিরায় জীবন স্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত।'

ডালহৌসিতে রবীন্দ্রনাথ পিতাকে পেয়েছিলেন একান্ত আপন করে। শুধু তাই নয়, সেই সময় পিতার কাছ থেকেই তাঁর উপনিষদের দীক্ষা হয়। এই দীক্ষা কবির জীবনে কোন দিনই ব্যর্থ হয়নি। বিলেত থেকে ফিরে কবি আরেকজনকে অন্তরঙ্গরূপে পেয়েছিলেন—তিনি বৌ-ঠাকুরাণী কাদম্বরী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী। এই নারী রবীন্দ্রনাথের জীবনে ছিলেন অনেকখানি---তাকে তিনি ভুলতে পারেন নি কোনদিন। তবু কবির সেই সময়কার মনের অবস্থা—'নিজের মনের বিজন স্বপ্ন,···চারি দিক থেকে প্রসারিত সহস্র বন্ধন, কর্মহীন কল্পনা, আপন মনে সৌন্দর্যের মরীচিকা রচনা, নিষ্ফল দুরাশা, অন্তরের নিগূঢ় বেদনা, আত্মপীড়ক অলস কবিত্ব।' 'এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাব্যধারা অকস্মাৎ এক নূতন পথে উৎসারিত হল। এতদিন যে অভ্যাসে, স্বভাবে বেষ্টিত ছিলেন, হঠাৎ সেটা খসে পড়তেই কাব্য যেন মুক্তগতি নূতন ছন্দে নূতন রূপ নিয়ে দেখা দিল; সেই কাব্যগুচ্ছ 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'। এর আগে তাঁর লেখা 'কবি-কাহিনী' (১৮৭৮), 'বন-ফুল' (১৮৮০), 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১), 'ভগ্নহৃদয়' (১৮৮১), 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১), ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (লিখিত ১২৮৮। মুদ্রিত ১২৯১) ইত্যাদিতে পূর্বসূরীদের প্রভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' (১৮৮২) কবির নিজস্ব ভাব ও ভাষাভঙ্গি আত্মপ্রকাশ করে। কাব্যের ক্ষেত্রে এই স্বাবলম্বন অর্জন পর্যন্তই কবির মানস-সংগঠনের কাল এবং এই কালটুকুর পর্যালোচনায় তাঁর যে পরিচয় ধরা পড়ে তাই হচ্ছে সত্য পরিচয়। আরেকটি কথা। সঙ্গীতে কবির অনুরাগ বাল্যাবধি এবং তাঁদের বাড়ির আবহাওয়াও ছিলো সঙ্গীতচর্চার অনুকূল। তবে তাঁর বিদ্যা-শিক্ষার মতো সঙ্গীত-শিক্ষাও আনুষ্ঠানিক-ভাবে সম্পন্ন হয়নি—রীতিমতো চর্চা তিনি কখনও করেন নি। তবে তাঁর গানের গলা ও কান ছিলো। এবং সেই সম্বল নিয়েই তিনি

হয়েছিলেন গানের রাজা।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-সম্পর্কিত এই আলোচনা থেকে আমাদের কয়েকটা সিদ্ধান্তে পৌছোতে হয়। প্রথমতঃ আধুনিক শিক্ষার মারফৎ য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তি-দর্শন ও সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর পুঁথিগত কোন পরিচয় হয়নি—এদিক থেকে তিনি ছিলেন সেকালের সাহিত্য ও সংস্কৃতির নায়কদের থেকে আলাদা। তবে ঠাকুরবাড়ির মধ্যে সেই নবযুগের প্রবৃত্তির সুষ্ঠুতম প্রকাশ ঘটায় তিনি আপন নিঃশ্বাস ও রক্তে উনিশ শতকের প্রাণধর্মকে পেয়েছিলেন, সন্দেহ নেই। তবে আপন স্বভাবের জোরেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বাইরে থেকে পাওয়া কোন জিনিষই জীবনের সত্য হয়ে ওঠে না—তাই বেন্থাম, মিল ও কোঁতের চিন্তা থেকে তিনি যতটা পেয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক চিন্তা ও ঈশ্বরাভিমুখী চারিত্র্য থেকে। তাই তৎকাল সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—'তখন বেন্থাম, মিল ও কোঁতের আধিপত্য। তাহাদেরই যুক্তি লইয়া আমাদের যুবকরা তখন তর্ক করিতেছিলেন। য়ুরোপে এই মিল্-এর যুগ ইতিহাসের একটি স্বাভাবিক পর্যায়। মানুষের চিত্তের আবর্জনা দূর করিবার জন্য স্বভাবের চেষ্টা রূপেই এই ভাবিবার ও সরাইবার প্রলয়শক্তি কিছুদিনের জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমাদের দেশে ইহা আমাদের পড়িয়া-পাওয়া জিনিস। ইহাকে আমরা সত্যরূপে খাটাইবার জন্য ব্যবহার করি নাই। ইহাকে আমরা শুদ্ধ মাত্র একটা মানসিক বিদ্রোহের উত্তেজনা রূপেই ব্যবহার করিয়াছি।' তাই যা য়ুরোপ থেকে এসে 'হৃদয়াবেগের চুলাতে হাপর করিয়া মস্ত একটা আগুন' জ্বালায়, রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্মে ছিলো তারই বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ। অথচ য়ুরোপের চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে যতটুকু পরিমাণে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দিয়েছে, ততটুকু পরিমাণে তা আমাদের পক্ষে সত্য এবং য়ুরোপের পক্ষে সততা ('কালান্তর'

দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয়তঃ পুঁথির জগতে তাঁর বিশ্ব-পরিচয় ঘটেনি, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কোন গভীর দৃষ্টি তিনি লাভ করেন নি—এমন কি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন যুক্তিসাপেক্ষ জ্ঞানের দাবি বাড়লো তখনও নয়। তাঁর বিশ্ববীক্ষার মূলে আছে ইন্দ্রিয়ানুভূতির আবাল্য অভ্যাস, প্রকৃতির ক্ষেত্রে বিশ্ববিধানের নিরন্তর উপলব্ধি, আপন স্বভাবের তাগিদে সৃষ্টির মূলীভূত ঐক্য-অভিজ্ঞা। তাই তাঁর মুখে শুনতে পাই—'সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহচাঞ্চল্যকে সুবৃহৎ ভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহাসৌন্দর্যনৃত্যের আভাস পাইতাম। বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা লালন করিতেছে, একটা গোরু আর একটা গোরুর পাশে দাড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে, ইহাদের মধ্যে যে অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিস্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল।' তিনি আরও বলেছেন—'রামমোহন রায়ের মতো অত বড়ো একজন প্রখরবুদ্ধিমান লোকও বৈদান্তিক ছিলেন, ডয়সেন সাহেবও আগাগোড়া বেদান্তের খুব প্রশংসা করে গেছেন, কিন্তু আমার মনের কোনো সংশয় দূর হয়নি।...এই জল স্থল আকাশ, এই নদীকল্লোল, ডাঙার উপর দিয়ে কদাচিৎ এক-আধখানা জেলে ডিঙির গতায়াত, জ্যোৎস্নালোকে অপরিস্ফুট মাঠের প্রান্ত এবং দূরে অন্ধকার মিশ্রিত বনশ্রেণী বেষ্টিত সুপ্তপ্রায় গ্রাম, সমস্তই ছায়ার মতো মায়ারই মতো বোধ হয়, অথচ সে মায়া সত্যের চেয়ে বেশী সত্য হয়ে জীবন মনকে জড়িয়ে ধরে- এবং এই মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই যে মানবাত্মার মুক্তি একথা কিছুতে মনে হয় না।' রবীন্দ্রনাথের এই যে সত্যবোধ তার চরম পরিণতি হচ্ছে সেই ঔপনিষদিক বিশ্বানুভূতির অন্তহীন অপরিমেয়তা ও ইন্দ্রিবেদ্য প্রকৃতিপ্রেমের চরাচরব্যাপী উপলব্ধি, যার আলোতে তিনি দেখতে পেয়েছেন—'একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্র-জীবনের মূল কথা বন্ধন-

মুক্তির সত্য, সীমা-অসীমের লীলা এবং তারই মধ্য দিয়ে জীবনের অনন্ত বিস্তার। ইতিহাসের পাঠ এবং ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্র ইত্যাদিতে বিভক্ত জগতের জটিল ও বিচিত্র রূপ সম্বন্ধে বহুস্তর অভিজ্ঞতাও রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দিয়েছিলো সেই ঐক্যবিধায়ক মহাজীবনবোধে ও বিশ্বাত্মবাদে, যার নির্ধারণেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন মানুষের সমস্ত সঙ্কট থেকে মুক্তির পথ। অতএব ইন্দ্রিয়বেদ্য অনুভূতি, ইতিহাসের চেতনা এবং ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (বার বার পৃথিবীর বহুস্থল পরিভ্রমণ করে মানুষের জগৎ সম্পর্কে যে জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন, তা এখানে মনে রাখতে হবে) ইত্যাদি যেদিক থেকেই বিচার করিনে কেন, রবীন্দ্র-জীবনের মর্মবাণী হচ্ছে সকল প্রকার বন্ধন-খণ্ডতা থেকে মুক্তি-অখণ্ডতায় উত্তরণ। এর উনিশ শতকী রেনেসাঁসের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে এই মর্মবাণীর কোন অমিল নেই, এটাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

॥ ২ ॥

এবার ধর্মবোধ, রাজনৈতিক চেতনা, অর্থনৈতিক চিন্তা, সামাজিক ভাবনা ইত্যাদির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের মানস-জগতের একটু পরিচয় নেওয়া যাক। বঙ্কিম সমাজ ও ব্যক্তিসত্তার সংঘর্ষজনিত যে ধর্মসঙ্কট তার নিরসন করতে গিয়ে বলিষ্ঠ কর্মবাদ ও শক্তিমন্ত্রের ওপর পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ ও বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্যের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এবং সেই আদর্শ ও তত্ত্ব অনুশীলনের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র যে সমাজ, একথা বলতেও দ্বিধা করেন নি। আর বঙ্কিমের এই ধর্মবোধ ছিলো তারও পূর্ববর্তী যুগের (যে যুগের আরম্ভ রামমোহন থেকে) বিচারবুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং ব্যক্তিগত আদর্শ ও বিশ্বাসের অনুবর্তী ধর্মবোধের বিরোধী। তিনি ধর্মকে ব্যক্তির ক্ষেত্র থেকে টেনে এনে সমাজের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ বিধর্মের সহিত স্বধর্মের দ্বন্দ্বে চেনাপক্ষ

নিয়েছিলেন বলে তাঁর ধর্মচেতনা হিন্দুত্বের দিকেই ঝুঁকে পড়েছিলো। এক কথায় বলা যায়, বাঙলা দেশের বিশেষ ভূখণ্ডের মধ্যে, হিন্দুর ধর্মসংস্কারের আওতার ভেতরে থেকে, সামাজিক মানুষের শক্তিব্রত ও কর্মৈষণার মাধ্যমে পূর্ণ মনুষ্যত্ব ও বৃত্তি-সমন্বয়ের অনুশীলনই হচ্ছে বঙ্কিমের ধর্ম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শক্তি ও কর্মের নিরিখে বিচার করে মানুষে মানুষে ভেদ নির্ণয় করার তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না, ক্ষুদ্র ও মহতের মাত্রাভেদের বদলে সকল মানুষকেই সুখ-দুঃখ-চেতনার মূর্তি রূপে দেখেছেন। ফলে তাঁর মানব-দর্শন কর্মের ওপরে নয়, প্রেমের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। তাই তিনি বলেছেন—'আমার মনে হয়, যাহাদের মহিমা নাই, যাহারা একটা অস্বচ্ছ আবরণের মধ্যে বদ্ধ হইয়া আপনাকে ভালরূপ ব্যক্ত করিতে পারে না, এমন কি নিজকেও ভালরূপে চেনে না, মূকমুগ্ধভাবে সুখদুঃখ বেদনা সহ্য করে তাহাদিগকে মানবরূপে প্রকাশ করা, তাহাদিগকে আমাদের আত্মীয়রূপে পরিচিত করাইয়া দেওয়া, তাহাদের উপব কাব্যের আলো নিক্ষেপ করা, আমাদের আত্মীয়রূপে পরিচিত করাইয়া দেওয়া, তাহাদের উপর কাব্যের আলো নিক্ষেপ করা আমাদের এখনকার কর্তব্য ('পঞ্চভূত')।' রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের তাৎপর্য নিহিত আছে মানুষ সম্পর্কে এই প্রেমের দৃষ্টিতে। শুধু মানুষ কেন, সমস্ত পৃথিবীকেই তিনি দেখেছেন ভালোবাসার মায়াঞ্জন চোখে নিয়ে—তাই তিনি ধূলির তিলক পরে গৌরববোধ করেছেন, ধূলির মধ্যে সত্যের যে আনন্দরূপ তাকে প্রণতি জানিয়ে কৃতার্থ হয়েছেন। কিন্তু কবি এই ভালোবাসার বিশ্ব এবং সেই বিশ্বব্যাপী অদ্বয় সত্য বিশ্বেশ্বরকে কখনও আলাদা আলাদা করে দেখেন নি। (দ্রষ্টব্য 'আত্মপরিচয়')। তাঁর বিশ্ববোধই তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে বিশ্বেশ্বরবোধে। অন্য ভাবে বলা যায়, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে বসে আছেন যে অনাদি অনন্ত বিশ্বেশ্বর, তাঁর আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধির যে স্বপ্ন, বিশ্ব হচ্ছে তারই অভিব্যক্তি। আবার বিশ্বেশ্বরের আত্মপ্রকাশের আইডিয়া থেকে যে

বিশ্বের উদ্ভব, তারই খণ্ড প্রকাশ ব্যক্তিমানুষের মধ্যে। অন্য দিকে ব্যক্তিমানুষও লক্ষ লক্ষ যুগ ধরে প্রতিটি ক্ষণের সত্যকণার অদ্বয়-যোগে আপনাতে আপনি পূর্ণ হয়ে ওঠে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের অখণ্ডতাবাদের তিনটি স্তর আছে—প্রথমতঃ প্রতি-ক্ষণের খণ্ড জীবনের অদ্বয়বোধের মধ্য দিয়ে দেখা দেয় অখণ্ড ব্যক্তি-জীবন। দ্বিতীয়তঃ এই ব্যক্তিজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্তা আবার 'জন্ম-মরণ, উত্থান-পতন, কর্ম-মনন, প্রেম-প্রীতি' ইত্যাদি নিয়ে অবিচ্ছিন্ন ইতিহাসের ভেতর দিয়ে মহাজীবন বা বিশ্বজীবনের অখণ্ডধারাকে সৃষ্টি করে। তৃতীয়তঃ এই বিশ্বজীবন আবার সেই অনন্ত মহাকাশের সেই লক্ষ লক্ষ সাবিত্রীমণ্ডলের সঙ্গে, সেই অসীম সৃষ্টির যজ্ঞের সঙ্গেই অদ্বয়যোগে সত্য, যার মূলে আছেন এক আদিত্যবর্ণ পরম পুরুষ—বিশ্বেশ্বর (Supreme Person)। অতএব, রবীন্দ্রনাথের মতে, ব্যক্তিজীবনের চরম লক্ষ্য শুধু নিজের ভেতরেই নয়, বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের ভেতরে অখণ্ড হয়ে ওঠা। এই 'হয়ে ওঠা' বা অখণ্ডত্ব-লাভই রবীন্দ্রনাথের ধর্ম। তিনি নিজেই বলেছেন—'আমার রচনার ভেতরে যদি কোনো ধর্মতত্ত্ব থাকে তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ—যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত আর একদিকে অদ্বৈত, একদিকে বিচ্ছেদ আর একদিকে মিলন, একদিকে বন্ধন আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি ও সৌন্দর্য, রূপ ও রস, সীমা ও অসীম এক হয়ে গেছে; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে।' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধর্ম হচ্ছে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার অখণ্ড হয়ে ওঠা। এবং অন্যত্রও বলেছেন—'...in reality he is the infinite ideal of Man towards whom men move in their collective growth, with whom they seek union of love as individuals...' এখন কথা হচ্ছে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সম্বন্ধটি কি ধরণের? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সে সম্বন্ধ

প্রেমের সম্বন্ধ', 'union of love'। তবে ধর্মসাধনার এই প্রেম-সম্বন্ধই যে শ্রেষ্ঠ, এ-সম্পর্কেও তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন—'ধর্মশাস্ত্রে তো দেখা যায়, মুক্তি ও বন্ধনে এমন বিরুদ্ধ সম্বন্ধ যে কেউ কাউকে রেয়াত করে না। বন্ধনকে নিঃশেষে নিকাশ করে দিয়ে মুক্তিলাভ করতে হবে, এই আমাদের প্রতি উপদেশ। তাই মনে হয় স্বাধীনতা জিনিসটা যেন একটি চূড়ান্ত জিনিস। পাশ্চাত্য শাস্ত্রেও এই সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল করে দিয়েছে। কিন্তু একটি ক্ষেত্র আছে যেখানে অধীনতা এবং স্বাধীনতা ঠিক সমান গৌরব ভোগ করে, একথা আমাদের ভুললে চলবে না। সে হচ্ছে প্রেমে।... প্রেম যেমন স্বাধীন এমন স্বাধীন আর দ্বিতীয় কেউ নেই, আবার প্রেমের যে অধীনতা, এত বড়ো অধীনতা বা জগতে কোথায় আছে?' অর্থাৎ বন্ধন ও মুক্তিতে, সান্ত ও অনন্তে, জীবাত্মা ও পরমাত্মায় সমান গৌরব ভোগ করে যে প্রেম, তা-ই উভয়ের মিলনের প্রকৃষ্ট সূত্র। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ধর্মসাধনার এই প্রেমের পথ সহজ নয়—দুরূহ, ক্ষুরধারনিশিত। কারণ অনেক পথ পেরিয়ে এই প্রেমের পথ মেলে—'ধর্মবোধের প্রথম অবস্থায় শান্তম্, মানুষ তখন আপন প্রকৃতির অধীন—তখন সে সুখকেই চায়, সম্পদকেই চায়, তখন শিশুর মতো কেবল তার রসভোগের তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেম। তার পরে মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে; তখন সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ, এই দুই বিরোধের সমাধান সে খোঁজে—তখন দুঃখকে সে এড়ায় না। মৃত্যুকে সে ডরায় না। সেই অবস্থায় শিবম্, তখন তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়—শেষ হচ্ছে প্রেম, আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও মৃত্যুর গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম। সেখানে অদ্বৈতম্।'

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে কয়েকটা সিদ্ধান্ত করতে হয়। প্রথমতঃ তাঁর দৃষ্টিতে পরমাত্মা যেমন সত্য, তেমনি সত্য খণ্ডজীবন। এবং সেদিক থেকে তিনি দ্বৈতবাদী।

দ্বিতীয়তঃ দ্বৈত ও অদ্বৈত, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনে তিনি প্রেমের পথ স্বীকার করে নিয়েছেন বলে তাঁর ধর্ম শুষ্ক তত্ত্ব মাত্র নয়, তা জীবনের হৃদয়বোধের মধ্যে উপলব্ধ একটা সজীব সত্তা। তৃতীয়তঃ জীবাত্মার ক্রমাগত পরমাত্মার দিকে অখণ্ড হয়ে ওঠার ধর্মবোধ যে দেশ-কাল-জাতির অতীত একটা সার্বভৌম অদ্বৈতচেতনা, তাতে সন্দেহ নেই। চতুর্থতঃ তাঁর ধর্মবোধ শুধু একটা কল্পিত আইডিয়া মাত্র নয় (মোহিতলাল বলেছেন: রবীন্দ্রনাথের ধর্ম জীবনের বাস্তব সাধনা নয়, ভাবসাধনা মাত্র), তা সাধনযোগ্য ধ্রুবসত্য—'If we really believe this, then we must uphold an ideal of life in which everything else—the display of individual power, the might of nations—must be counted as subordinate and the soul of man must triumph and liberate itself from the bond of personality which keeps it in an ever-revolving circle of limitation.' রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন-সাধনা তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথের পুত্ররূপে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর অনুগামী হিসেবে, বঙ্কিম-শশধরের ধর্মমতের বিরোধী রূপে যে ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথকে একদিন দেখা গেছে, তিনিই ক্রমে জোড়াসাঁকোর ব্রাহ্ম আবহাওয়া থেকে দূরে সরে গিয়ে, শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক পরিবেশে, সাংসারিক জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্‌কে নিজের জীবনে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। পঞ্চমতঃ রামমোহনে যে যুক্তিপ্রবণ ধর্মজিজ্ঞাসার আরম্ভ, রবীন্দ্রনাথ নিজের ধর্ম-নিরীক্ষায় তারই সত্য ও পূর্ণ পরিণতি দিয়ে গেছেন; ভারতের ধর্মের পথকে মিলিয়ে দিয়ে গেছেন বিশ্বমানুষের ধর্মের পথের সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনা কোন বিশিষ্ট মতবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। তিনি পেশাদার রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না—দল গড়ার

কথা কখনও ভাবেন নি, জনগণের নেতৃত্ব করবার কোন অভিলাষ তার মধ্যে দেখতে পাইনে। তবু যুগধর্মের প্রভাব তাঁর মনের উপর কাজ করতো বলেই তাঁরও সাময়িক চিত্তবিক্ষোভ ঘটেছে—পরাধীন দেশের একজন মানুষ বলেই দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি একেবারে অচেতন থাকতে পারেন নি। এনড্রুজ সাহেবকে একটি চিঠিতে তিনি একথাটিই বুঝিয়ে লিখেছিলেন—'Political controversies occasionally overtake me like a sudden fit of ague, without giving sufficient notice; and then they leave suddenly, leaving behind a feeling of malaise. Politics are so wholly against my nature; and yet, belonging to an unfortunate country, born to an abnormal situation, we find it so difficult to avoid their outbursts.' দ্বিতীয়তঃ সাময়িক বিষয়কেও তিনি সব সময় সাময়িকভাবে দেখতেন না, তাকে দূরে সরিয়ে একটু তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করতেন, পৃথিবীর মানুষের ইতিহাসের গভীর নিরীক্ষা নিয়ে বিচার করতে ভালোবাসতেন। তৃতীয়তঃ 'রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি—জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই সমস্ত পরিবর্তন পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহ একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ গৌণ, কোন্টা তৎসাময়িক, কোন্টা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই। বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।'

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মনটিকে যখন সমগ্রভাবে অনুভব করি, তখন মনে হয়, তাঁর স্বদেশ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন একটা

ভূখণ্ড নয়—তাঁর স্বজনরা বিশ্বজন থেকে আলাদা একটা মানবগোষ্ঠী নয়। তাই বিশেষ কোন স্বার্থ ও রক্তগত সংস্কারের দিক থেকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা তিনি কখনও করেন নি। তাঁর চোখে দেশের রাজনৈতিক মুক্তি ছিলো বিশেষ একটা শাসনব্যবস্থা থেকে বিশেষ একদল লোকের মুক্তি নয়—নিপীড়নাত্মক বন্ধন থেকে মনুষ্যত্বের মুক্তি। দেহের কোন একটা অঙ্গ অসুস্থ থাকলে যেমন সমস্ত দেহটাই অসুস্থ হয়ে পড়ে, তেমনি বৃহৎ মানবসমাজের কোন একটা অঙ্গ যখন বন্ধন-পীড়িত হয়—তখন সমগ্র সমাজেই তার অসুস্থ প্রতিক্রিয়া হয়। তাই স্বদেশের মুক্তি তাঁর চোখে মানুষের মুক্তিরই নামান্তর ছিলো। অন্য দিকে পরাধীন ভারতবর্ষ শুধু ভারতবাসীকে নয়, ইংরেজদেরও ছোট করে রেখেছে —খর্ব করে দিয়েছে তাদের মনুষ্যত্ব, ন্যায়পরায়ণতা, চরিত্রশক্তি ইত্যাদি। সুতরাং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মুক্তি ইংরেজদের দিক থেকেও কাম্য—তাতে শাসক, শোষক ও পীড়ক হওয়ার গ্লানি থেকে তাদের মুক্তি ঘটবে।

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতার অর্থ শুধু স্বরাজ বোঝেন নি, তিনি তার মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন মনুষ্যত্ব ও আত্মশক্তি উদ্বোধনের সুযোগ, তাই তাঁর চোখে স্বাধীনতার সাধনা দেশব্যাপী নিত্যকর্মের ভেতর দিয়ে সত্য, ন্যায় ও লোকশ্রেয়ের জন্য ব্যষ্টি ও সমষ্টির আত্মোৎসর্গের সাধনা। দেশের সম্বন্ধে দেশের লোকের চেষ্টাকে জাগিয়ে তুলে, দেশের সেবা ও তার দায়িত্ব গ্রহণ করে যদি আমরা রাষ্ট্রসাধনায় অগ্রসর হই, তবে সমগ্র দেশে একটি অপ্রতিরোধ্য শক্তির স্ফুরণ ঘটবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দর্শনে শুধু ইংরেজ-বিতাড়নের নেতিবাচক আদর্শই নয়, আত্মনির্ভরশীল স্বদেশী সমাজ গড়বার ইতিবাচক আদর্শও অনুস্যূত হয়ে আছে। আর সেই স্বদেশী সমাজ গড়বার সাধনা স্বরাজের আগেই আরম্ভ করা কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন—কারণ তাতে যে আত্মশক্তি ও আত্মমর্যাদার উদ্বোধন

ঘটবে, তা যেমন স্বরাজকে ত্বরান্বিত করবে তেমনি স্বরাজের পরবর্তী কালের দেশব্যাপী শূন্যতার সম্ভবপরতাকে রোধ করবে। তাই তিনি বলেছেন—'স্বরাজ আগে আসবে, স্বদেশের সাধনা তার পরে, এমন কথাও…সত্যহীন, এবং ভিত্তিহীন এমন স্বরাজ।' এই আত্মশক্তির চেতনা প্রথম প্রকাশ পায় 'সাধনার' প্রবন্ধগুলিতে, পরে নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনের' পৃষ্ঠায়। এর পেছনে আছে দেশের প্রজাসাধারণ সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—এ হচ্ছে জমিদারি দেখাশুনোর প্রধান লভ্যাংশ। তখনকার দিনে 'চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করা ও গলা মোটা করে গভর্ণমেণ্টকে জুজুর ভয় দেখানোর' যে রাজনৈতিক লক্ষ্য কংগ্রেসের ছিলো, তাকে রবীন্দ্রনাথ 'পোলিটিক্যাল অধ্যবসায়ের অবাস্তব ভূমিকা' ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারেন নি। 'মন্ত্রী-অভিষেক' প্রবন্ধে তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদে ভারতীয়দের সংখ্যাবৃদ্ধি করে অধিকতর দায়িত্ব অর্পণের যুক্তি দিলেও পরে তিনি নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, সে ছিল দাঁড়ের কাকাতুয়ার পাখা ঝাপ্‌টানোর মধ্য দিয়ে পায়ের শেকল একটু লম্বা করে দেওয়ার জন্য চিৎকার মাত্র। কিন্তু ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে লেখা 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্যে একটা নূতন রাজনৈতিক দর্শনের প্রস্তাব ছিলো—'ইংরেজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকট কর্তব্য সকল পালনে একান্তমনে নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়া কখনোই আমাদের মনের যথার্থই সন্তোষ হইবে না।' তিনি আরও বলেছেন- 'সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না, সম্মান আকর্ষণ করিব, নিজের মধ্যে সম্মান অনুভব করিব।' জাতির জীবনের সমস্ত ভালোকে অন্যের হাত থেকে গ্রহণ করার মধ্যে সম্মান নেই, 'দেশকে সেবার দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে' তুলতে হয়। সকলের চেয়ে বড়ো কথা, প্রীতির সাধনায় হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবিধানের সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যের ওপর তিনি বার বার জোর দিয়েছেন। 'হিন্দুমেলার উপহার'

(১৮৭৫) থেকে 'সভ্যতার সংকট' (১৩৪৮) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মানসের নানা পর্যায়ের ভেতর দিয়ে এই মানবমুক্তি ও আত্মশক্তির তত্ত্বই সত্য হয়ে উঠেছে, বঙ্কিমী হিন্দু-জাতীয়তাবাদ কিংবা স্বদেশীযুগের সঙ্কীর্ণ দেশপ্রেমের একটু আধটু ছোঁয়া সত্ত্বেও। তার জন্য কখনও রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে তিনি দূরে সরে এসেছেন, মহাত্মার সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়েছেন, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও 'না গ্রহণ না বর্জন' নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, নেতিবাচক অসহযোগের বিরোধিতা করেছেন, চরকা-তত্ত্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য স্বীকার করে নেন নি—তবু নিজের সত্য থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হন নি। দেশে কোন কোন ব্যাপারে অগ্রসর হতে গিয়ে বিড়ম্বিতও হয়েছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তাঁর রাজনৈতিক চেতনায় স্বাদেশিকতা ও বিশ্বমানবিকতার মধ্যে বিরোধ নেই, তাঁর জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতারই দেশভিত্তিক রূপ মাত্র। তাই জাতীয় অহংজ্ঞান থেকে মুক্তি পেয়েই গোরা ভালোবাসতে পেরেছে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে, সুচরিতাকে।

কবির অর্থনৈতিক চিন্তাও এখানে একটু উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। পরাধীন ভারতবর্ষের দুর্গতির মূলে রয়েছে বণিক ইংরেজের আর্থিক ক্রিয়াকর্ম, একথা বুঝতে তাঁর কষ্ট হয়নি। তিনি এও বুঝতে পেরেছিলেন যে, ধনতন্ত্রই তার শোষণের বাজার অব্যাহত রাখতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দেয়—'ভারতবর্ষের ধনমহিমা ছিল। কিন্তু সেটা কোন্ বাহনযোগে দ্বীপান্তরিত হয়েছে সেকথা যদি ভুলি তবে পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসের একটি তত্ত্ব আমাদের এড়িয়ে যাবে।' অন্যদিকে তিনি জানতেন, স্বল্প মূলধন নিয়ে পুরনো রীতিতে উৎপাদন চালিয়ে গেলে বর্তমান আর্থিক দুর্গতির অবসান ঘটবে না, তার জন্য চাই যন্ত্রশিল্পের প্রসার। আসল কথা, কৃষিগত অর্থনীতির বদলে শিল্পগত অর্থনীতি প্রবর্তনের কথা বলে রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রগতিশীল অর্থনৈতিক চিন্তারই স্বাক্ষর

রেখে গেছেন। এবং সেদিক থেকে মহাত্মার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিলো সুস্পষ্ট। হস্তচালিত কুটিরশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি, চরকাতত্ত্ব ইত্যাদির মধ্যে তিনি দেখেছিলেন সম্মুখে চলবার নয়, পেছনে হটবার পথ। যে পরিকল্পনায় 'চাষীর উদ্যমকে ষোল আনা খাটাবার চেষ্টা না করে, তাকে চরকা ঘোরাতে বলা' হয়, তা কখনই দ্রুত উৎপাদন-বৃদ্ধি ও উন্নততর উৎপাদন-পদ্ধতির সহায়ক হয় না, এই জাতীয় কথাও আমরা তাঁর মুখে শুনতে পেয়েছি। যন্ত্রপুরীর অভিশপ্ত দিকের ছবি আছে 'রক্তকরবীতে'—কিন্তু সেখানে বিচার হয়েছে মনুষ্যত্বের দিক থেকে; কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে তিনি যন্ত্রশিল্পের সমর্থক ছিলেন—তার প্রমাণ আছে 'কালান্তর', 'রাশিয়ার চিঠি' ইত্যাদি গ্রন্থে। শুধু তাই নয়, সমবায়-মূলক কৃষিব্যবস্থার মধ্যেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ধনোৎপাদনের পথ—শুধু মাত্র জমিদার-উচ্ছেদে নয়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তার দৌড় সীমাবদ্ধ হলেও তা যে প্রগতিমুখীই ছিলো, তা স্বীকার করতে হবে। দুনিয়ার অর্থনীতির ইতিহাস কোন্ দিকে চলেছে তা তিনি জান্তেন এবং আরও জান্তেন, ভারতের অর্থনীতি তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে টিঁকে থাকতে পারবে না। সবচেয়ে বড়ো কথা, তিনি কখনও কোন বিশেষ রকমের অর্থ-নৈতিক বিলিব্যবস্থা ও উৎপাদন-পদ্ধতিকেই চূড়ান্ত বলে মনে করেন নি এবং সে-কারণেই তাঁর অর্থনৈতিক চেতনা ছিলো ঐতিহাসিক চেতনারই অনুগামী। কিন্তু কোন অবস্থাতেই ভোলেন নি সেই সর্বাশ্রয়ী মানুষদেবতার কথা, যাঁর আজীবন উপাসক ছিলেন তিনি। তাই সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া তাঁর মনোহরণ করেছিলো। সেখানকার 'ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্বের' গুরুতর গলদের কথা জেনেও তিনি অধ্যাপক পেট্রভকে জানাতে দ্বিধা করেন নি—'your success is due to turning the tide of wealth from the individual to collective humanity.'

সমাজচেতনায় রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য প্রগতিশীলতার কথা

বিস্তৃতভাবে আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবে নারী-প্রগতি সম্পর্কে তাঁর মতামতের মধ্যে সেই প্রগতিশীল চিন্তার একটা প্রস্থচ্ছেদ (cross-section) পাওয়া যাবে। নারীমুক্তি আধুনিক মানুষের একটা বড়ো আবিষ্কার, একথা মনে রেখেই অবশ্য কথাটা বলা হলো। রবীন্দ্রনাথের চোখে অন্দরের নারী চিরকালই বন্দিনী ছিলো না—একদিন 'মানবসংসারকে গড়ে তোলবার, বেঁধে রাখবার আদিম বাঁধুনি' জোগাবার ভার পড়েছিলো নারীর ওপর। সংসারের এই গোড়াকার বাঁধন সৃষ্টির দিনে নারী হলো গৃহিণী ও জননী, তার স্থান ছিলো অন্দর মহলে—কারণ স্থির-প্রতিষ্ঠিত না হলে হৃদয়-মাধুর্য ও সেবা-নৈপুণ্য দিয়ে কোন সংহত মিলনকেন্দ্র সে রচনা করতে পারতো না। কিন্তু কালক্রমে নারীর এই ঐতিহাসিক ভূমিকার অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগ ঘটতে থাকে, জীব-পালিকার স্বভাবগত বাঁধনমুখিতার সুযোগে তাকে পুরুষ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অধিকারের মধ্যে বন্দিনী করে ফেলে। ফলে মেয়েরা ছোট হয়ে যায়—যেমন অন্দর মহলে তেমনি বাইরের জগতে। রবীন্দ্রনাথ এইভাবে ঐতিহাসিক নিরিখে নারীসমাজকে বিচার করে অতঃপর বলেছেন—'এদিকে প্রায় পৃথিবীর সকল দেশেই মেয়েরা আপন ব্যক্তিগত সংসারের গণ্ডি পেরিয়ে আসছে। আধুনিক এসিয়াতেও তার লক্ষণ দেখতে পাই। তার প্রধান কারণ সর্বত্রই সীমানা ভাঙার যুগ এসে পড়েছে।...স্বতই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে, দৃষ্টিসীমা চিরাভ্যস্ত দিগন্ত পেরিয়ে এসেছে। বাহিরের সঙ্গে সংঘাতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে, নূতন নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে আচারবিচারের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়েছে।...এই-যে বাহিরের দিকে ব্যবহারের পরিবর্তন এতো বাইরেই থেকে যায় না। অন্তরপ্রকৃতির মধ্যেও এর কাজ চলতে থাকে। মেয়েদের যে মনোভাব বদ্ধ সংসারের উপযোগী, মুক্ত সংসারে সে তো অচল হয়ে থাকতে পারে না।.. কালের প্রভাবে মেয়েদের জীবনের ক্ষেত্র এই যে স্বতই প্রসারিত হয়ে চলেছে...এতে ক'রে আত্মরক্ষা এবং আত্ম-

সম্মানের জন্য তাদের বিশেষ ক'রে বুদ্ধির চর্চা, বিদ্যার চর্চা একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠল।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিদ্যা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে নারী-প্রগতিকে রবীন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা জানাতে দ্বিধা করেন নি এবং এই প্রাগ্রসরতার ভেতর দিয়েই ভারতের নারীসমাজ বিশ্বের নারী-সমাজের মতোই সর্বতোভাবে যোগ্যতালাভ করতে পারবে বলে তিনি স্বপ্নও দেখতেন—'সভ্যতাসৃষ্টির নূতন কল্প আশা করা যাক। এ আশা যদি রূপ ধারণ করে তবে এবারকার এই সৃষ্টিতে মেয়েদের কাজ পূর্ণ পরিমাণে নিযুক্ত হবে সন্দেহ নেই। নবযুগের এই আহ্বান আমাদের মেয়েদের মনে যদি পৌঁছে থাকে তবে তাঁদের রক্ষণশীল মন যেন বহু যুগের অস্বাস্থ্যকর আবর্জনাকে একান্ত আসক্তির সঙ্গে বুকে চেপে না ধরে। তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়।'

সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম—ধর্মবোধ, রাজনৈতিক চিন্তা, অর্থনৈতিক চেতনা, সামাজিক বোধ ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত একটা মুক্তিতত্ত্বে গিয়ে পৌঁচেছেন, সীমা থেকে অসীমের দিকে যাত্রা করেছেন, দেশজ মানসকে পরিণতি দিয়েছেন বিশ্বমুখিন মানসে। সঙ্কোচন-প্রয়াসী প্রাদেশিকতা, সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা, ধন-বৈষম্যের অমানুষিকতা, ধর্মের অন্ধবিশ্বাস, গ্রামভারী মূর্খতা, যুক্তিহীন আচারপ্রবণতা, জীবনের কূপমণ্ডূকতা ইত্যাদির অভিশাপ থেকে মানুষের মন ও বুদ্ধির মুক্তি ছিলো তাঁর কাম্য। ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি ও পরিবর্তনের রূপরেখা তাঁর চোখে ধরা পড়েছিলো, তাই তিনি বর্তমানের সঙ্গে যোগ খুঁজেছেন শাশ্বত অতীত ও সৃজনশীল ভবিষ্যতের। এবং সেই ইতিহাসবোধের মধ্যেও ভাস্বর ছিলো তাঁর মানবতাবোধ। রামমোহনের সাধনা ছিলো স্বদেশবাসীর মুক্তি—তাদের মন, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের মুক্তি; এক শতাব্দী ধরে নানা মত ও পথ, কর্ম ও চিন্তার ভেতর দিয়ে সেই স্বাদেশিক মুক্তি-সাধনাই রবীন্দ্রনাথে এসে রূপ নিয়েছে মানবমুক্তির

সাধনায়। তাঁর সাহিত্য পড়লে মনে হয়, তিনি মানুষের জীবনকে নানা দিক দিয়ে, নানা বর্ণ ও রূপের আলোতে, নানা রসের আশ্রয়ে উপলব্ধি করবার সাধনায় ছিলেন ব্যাপৃত—হৃদয়ের শিকড় চালিয়ে তিনি মানবরস আহরণ করেছেন আজীবন। শুধু তাই নয়, অধ্যাপক লেজ্নির ভাষায়—'from a conviction of the nobility of man's mission in the world he derives a wise philosophy, which culminates in his unhesitatingly positive attitude towords life and in his later conception of the divine nature of mankind'. অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের অমৃতসন্ধানী মানবতা অধ্যাত্ম-বিবেক থেকে উৎসারিত। তাছাড়া তাঁর মুক্তির সাধনা—মানবতার মুক্তি, মনের মুক্তি ইত্যাদি যেদিক থেকেই ধরিনে কেন—নৈরাজ্য-সাধনা নয়, বন্ধনকে স্বীকার করে নিয়েই বন্ধন-অতিক্রমের সাধনা। তিনি জানতেন, মুক্তির পূর্ণ স্বাদের জন্যই সীমার বন্ধন সত্য, যেমন সত্য ছন্দের ক্ষেত্রে যতিপাত।

৩

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের দিকে তাকালে তার পরিমাণ ও বৈচিত্র্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। বাঙলা সাহিত্যের এমন শাখা নেই, যেখানে তাঁর প্রতিভা সোনার ফসল ফলায়নি। উনিশ শতকী রেনেসাঁসের ক্রমবিকাশে বাঙালীর জীবন ও চিত্তের যে স্ফূর্তি, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তার সগৌরব ও অনুপম প্রতিষ্ঠা। শুধু তাই নয়, বাঙালীর জীবনে ও মানসে যা নেই, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে তারও বাক্-প্রতিমা দেখিতে পাই। এবং সে-কারণেই তিনি কেবল স্বাদেশিক ও যুগন্ধর নন, তিনি বিশ্বমানবিক ও যুগাতিগ। বড়ো প্রতিভার লক্ষণ এই যে, তার মধ্যে জটিল, বিচিত্র ও আপাত-বিরুদ্ধ ভাব ও অনুভূতির সমাবেশ ঘটে, সৃষ্টি-প্রাচুর্যের বহুমুখিনতার জন্য

কোন ছকে ফেলে তাঁকে বিচার করা যায় না। একেই মানবমনের রহস্য অনেক, তার ব্যক্ত রূপ ও অব্যক্ত ব্যঞ্জনা নিয়ে বিচারবুদ্ধির নিত্য বিভ্রান্তি—রবীন্দ্রনাথের মতো কবিপুরুষের ক্ষেত্রে সেই বিচার-বিভ্রান্তি আরও বেশি করে দেখা দেয়, নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে গেলেই অতি সরলীকরণের দোষ ঘটে যায়। তবু সব কিছু মিলিয়ে দেখলে তাঁর রচনায় যে মূল কথাটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তা বলে নিতে চাই, এবং তা থেকেই রবীন্দ্রনাথকে চেনা যাবে বলে আমার বিশ্বাস। বলা বাহুল্য, সেই মূল কথাটা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একমাত্র কথা নয়, যদিও রবীন্দ্র-বিচিত্রার মর্মমূল হিসেবে তাকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

কবির জীবনে ও চিন্তায়, আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি, একটা মুক্তিতত্ত্ব আছে। সেই মুক্তিতত্ত্ব তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে চলেছে জীবনের নানা বন্ধনের চক্র থেকে—স্বদেশ থেকে বিশ্বের দিকে, আপনজন থেকে সর্বজনের দিকে, স্বার্থ থেকে পরমার্থের দিকে, ক্ষুদ্র থেকে বৃহতের দিকে, প্রেয় থেকে শ্রেয়ের দিকে। এই 'ছোট আমি' থেকে 'বড়ো আমির' দিকে মুক্তিযাত্রাই—শুধু দার্শনিক অর্থে নয়, বাস্তব অর্থেও—রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল কথা। শ্যামের দেওয়া খড়ির গণ্ডি থেকে তিনি গিয়ে পৌঁচেছেন বিরাট মানবসংসারের অঙ্গনে, বিশ্বপ্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে। তাঁর কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গান ইত্যাদি থেকে তা প্রমাণ করা যায়।

প্রথমতঃ ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের কথা। 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে' (১৮৮৩) দুটি চরিত্র প্রধান—বসন্ত রায় ও প্রতাপাদিত্য। প্রতাপাদিত্য একটি বিশেষ চিত্তবৃত্তির প্রতীক—সে চিত্তবৃত্তি সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমের মধ্যেই উজ্জীবিত, তার বাইরে তার কোন প্রসার নেই, অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই। এই স্বাদেশিক চিত্তবৃত্তির কাছে স্ত্রী, পুত্র, স্নেহ, প্রেম ইত্যাদি মূল্যহীন এবং তার চরিতার্থতার জন্য পাপকর্মও অগ্রাহ্য নয়। অন্য দিকে বসন্ত রায় 'একটি সংসার-নির্লিপ্ত উদার প্রকৃতির ভাবুক ব্যক্তি। তিনি বিশেষ

কোন জাতি বা সমাজের মানুষ নন। তিনি মানুষমাত্রকেই আত্মীয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহার নিকট শত্রু মিত্র নাই, আপন পর নাই।' ফলে তুজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য। পরিণামে বসন্ত রায়ের পরাজয় ঘটেছে বটে, তবু স্রষ্টার সহানুভূতি তাঁকে কেন্দ্র করেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের চোখে সঙ্কীর্ণ দেশপ্রেমের প্রতীক প্রতাপাদিত্য নন, উদারপ্রাণ মুক্তপুরুষ বসন্ত রায়ই বড়ো মানুষ। এই কাহিনীতে প্রতাপাদিত্য যেন বঙ্কিমের প্রতিনিধি—তাঁর ভাবাদর্শের জগৎ থেকেই যেন চরিত্রটিকে গ্রহণ করা হয়েছে : কারণ রাজসিংহ, হেমচন্দ্র, সীতারাম ইত্যাদির সঙ্গে তার আত্মিক সম্বন্ধ দূরের নয়। অন্য দিকে বসন্ত রায় রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিনিধি—তাঁর নবজাগ্রত মানবচেতনার সৃষ্টি, তাঁর দেশ-কাল-জাতি নিরপেক্ষ সর্বজনীন-সার্বভৌম সত্যবোধের বার্তাবহ দূত। সুতরাং প্রথম উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে বৃহত্তর জগতে প্রবেশ করেছেন, বাঙলার মাটি থেকে এগিয়ে চলেছেন বিশ্বের দিকে। দ্বিতীয় উপন্যাস 'রাজর্ষিতে' (১৮৮৭) এই উদার বিশ্বমুখী দৃষ্টিরই স্ফুরণ দেখতে পাই। প্রচলিত ধর্ম-সংস্কারের বিরুদ্ধে এক সর্বাশ্রয়ী প্রেমধর্মের দীক্ষায় গোবিন্দমাণিক্য বসন্ত রায়েরই সার্থক অনুজ। 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে' বসন্ত রায়ের পরাজয় ও মানবধর্মের ব্যর্থ পরিণাম ঘটেছিলো, কিন্তু 'রাজর্ষিতে' রঘুপতির মধ্যে উদার চেতনার অভ্যুদয়ে আছে স্রষ্টার ভাবাদর্শের প্রতিষ্ঠা। 'চোখের বালি' (১৯০৩) ও 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) ঘরোয়া উপন্যাস। তাদের সমস্যা প্রবৃত্তিকেন্দ্রিক ও প্রেমমূলক, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মুক্ত চৈতন্যের দিক থেকে তাৎপর্যার্থক নয়। বিনোদনীর সঙ্গে বিহারীর প্রেমকে বিবাহে পরিণতি দেওয়া হয়নি এবং সে-ক্ষেত্রে হয়তো সংস্কারের প্রশ্রয় আছে—কিন্তু ভালোবাসার সূক্ষ্ম বিস্তৃত ক্রমিক স্তর বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ একটা সর্বজনীন স্বভাব-সৌন্দর্যই ফুটিয়ে তুলেছেন। তাছাড়া মহেন্দ্রের প্রতি ভোগলোলুপ ভালোবাসা যখন রূপান্তরিত হলো বিহারীর

প্রতি অনাবিল ভালোবাসায়, তখন বিনোদনীর যে মহিমময়ী রূপ দেখেছি তা জীবনধর্মিতার দিক থেকে আকস্মিক ও অবাস্তব বলে মনে হলেও নিছক ভাবকল্পনার দিক থেকে মহৎ ও উদার, সন্দেহ নেই। এর পরে 'গোরায়' (১৯১০) আবার প্রত্যক্ষ ভাবেই কবি ফিরে গেলেন সর্বজনীন মানবধর্মের পথে। প্রত্যপাদিত্যের ছোটত্ব গোরা চরিত্রে নেই এবং ব্যক্তিগতভাবে সে নিষ্পাপ, তবু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তাঁর স্বাদেশিকতা ও হিন্দুয়ানী সঙ্কীর্ণ ও উপন্যাসের শেষে এই ছোট মনের বন্ধন থেকে গোরার মুক্তি ঘটেছে —হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত মানব-মন্দিরের দ্বার তার সামনে খুলে গেছে। মানুষকে জাতি, ধর্ম, দেশ ইত্যাদির খণ্ডত্বের মধ্যে দেখতে যাওয়া যে ভুল, এই উপলব্ধি তাকে পৌঁছে দিয়েছে সেই উদার অনাবিল সত্য-তীর্থে, যা মহামানবমিলন ক্ষেত্রেরই নামান্তর মাত্র। 'চতুরঙ্গে' (১৯১৬) শচীশের মধ্যে যে আইডিয়ার পরীক্ষা-নিরীক্ষা তা দামিনীর ভাষায়—'তোমরা দিনরাত রস রস করিতেছ, ও ছাড়া আর কথা নাই। রস যে কী সে তো আজ দেখিলে? তার না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান; তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, শরম নাই।' তার আগে জ্যাঠামশায়ের প্রভাবে পড়ে সে বুদ্ধির ওপর নির্ভর করেছিলো, আশ্রয় করেছিলো অতিকর্মকে। কিন্তু একদিন অতিরস অতিকর্ম সবই তার কাছে ব্যর্থ বলে মনে হলো—কোথায়ও জীবনের ভার দুর্বহ, কোথায়ও পায়ের তলায় মাটির অভাব! তাই শেষ পর্যন্ত সে ফিরলো পূর্বের সেই কাজের জগতে, অথচ আগের মতো ঝগড়াবিবাদের ঝাঁজ আর নেই—আছে ধৈর্য ও শান্তি। অর্থাৎ কর্মকে এড়িয়ে নয়, কর্মের ভেতর দিয়েই মুক্তপুরুষের সাধনার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আছে 'চতুরঙ্গে'। 'ঘরে বাইরের' (১৯১৬) নিখিলেশ মন, মনন ও চরিত্রে বিশ্বমানবিক, তার মতে—'আজ আমাদের খাওয়া-পরা চলাফেরা ভাবনাচিন্তা সমস্তই সমস্ত পৃথিবীর যোগে।' এই দৃষ্টি নিয়ে যখন সে দেখেছে দেশকে, তখন তার মনে না হয়ে

পারেনি—'দেশকে আমি সেবা করতে রাজি আছি, কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে।' অর্থাৎ জাতীয়তাও তার কাছে একটা সঙ্কীর্ণ সংস্কার, তাই তার লক্ষ্য সেই ওপরে আছেন যিনি তাঁর দিকে—অর্থাৎ বিশ্বমানবের দিকে। এই বৃহত্তর ও মহত্তর দৃষ্টির আদর্শ পারিবারিক জীবনেও সে অনুসরণ করতে দ্বিধা করেনি—তাই সে বিমলাকে বলে—'একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও।' এমন কি বিমলার ভালোবাসাও তার চোখে একটা সংস্কার—তাই স্ত্রীকে সে মুক্তি দিয়েছে। আর সন্দীপকে দিয়েছে তার নিজের জমিদারিতে স্বাধীন কর্মপন্থা অনুসরণের সুযোগ। এ মুক্তিতত্ত্বে শুধু তার বুদ্ধি বা হৃদয়ের যোগ ছিলো না, ছিলো সমস্ত জীবনের যোগ। তার জন্য মৃত্যুও শিরোধার্য ছিলো। এই বিশেষ ভাবকল্পনার দিক থেকে 'যোগাযোগের' (১৯২৯) প্রত্যক্ষ মূল্য হয়তো নেই, তবু সন্তানসম্ভবা কুমুদিনীর স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তনের ঘটনায় বোঝা যায় যে, নূতন মানবজন্মের সত্য বিপ্রদাসের সংযত আভিজাত্য বা মধুসূদনের উদ্ধত ধন-গর্বের চেয়ে বড়ো সত্য। 'শেষের কবিতায়' (১৯২৯) অমিত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বন্ধনহীনতাকে শেষ পর্যন্ত ঘরমুখো করেছে—'কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলবো, প্রতিদিন ব্যবহার করবো।' অর্থাৎ মুক্তির সঙ্গে বন্ধনের যোগ হলো। অন্য দিকে রইলো লাবণ্য—মুক্তির সীমাহীন আকাশ—'আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালবাসা সে রইলো দীঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে!' এর পরে উল্লেখ করতে হয় 'চার অধ্যায়ের' (১৯৩৪) কথা। ইন্দ্রনাথের গুপ্তসমিতি দেশাত্মবোধে দীক্ষিত—কিন্তু সেই দেশাত্মবোধে উদারতা নেই, মনুষ্যত্বের পূজো নেই, অহিংসার স্থান নেই—আছে শুধু একটা তীব্র তপ্ত নির্দিষ্ট সাহসিকতা। এই সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতার চাপে পড়ে এলার ব্যক্তিসত্তা পীড়িত ও ব্যর্থ, অতীনের স্বভাব নিহত ('স্বভাবকেই হত্যা করেছি, সব হত্যার চেয়ে পাপ')। তাই

তারা উভয়েই বুঝেছে, এই জাতীয়তার পণগ্রহণ অধার্মিক—এ পণকে রক্ষা করাও প্রতিদিন স্বধর্ম-বিদ্রোহ। তাই গুপ্তসমিতির ডামাডোলের মধ্যে থেকেও তারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এককত্বের অধিকারী—দেশ ও সমাজের আদর্শ ও সংস্কার তাদের জীবনকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন এই যে, পারিপার্শ্বিকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিসত্তার সঙ্কোচন ও এককত্বের অবসান ঘটে একমাত্র সেই সমাজ, জাতি ও দেশ নিরপেক্ষ বিশ্বমানবিক ক্ষেত্রে, যেখানে নির্দিষ্ট সংস্কারের এমন কি সঙ্কীর্ণ দেশপ্রেমেরও বন্ধন নেই।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ জীবনের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন উন্মুক্তির দিকে। তা করতে গিয়ে মানবজীবনের কত সূক্ষ্ম অনুভূতি, কত অন্তর্দ্বন্দ্ব, কত সংগ্রাম, কত বৈচিত্র্য ও জটিলতার চিত্রই না তাঁকে আঁকতে হয়েছে। কালের যাত্রায় জীবনের অন্তহীন বিকাশ ঘটে চলেছে, মানুষ নিত্য নতুন ভাবে রচনা করে চলেছে আপনাকে। অফুরন্ত সৌন্দর্য, মাধুর্য, সূক্ষ্মতা ও জটিলতা নিয়ে এই যে সৃজনশীল জীবন তার সমস্ত সম্ভাবনার মধ্যে ক্রিয়া করেছে উনিশ শতকী রেনেসাঁসের চেতনা-প্রবাহ। আর ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির ইঙ্গিতে এবং নিজের বিশ্বমুখী চৈতন্যের উৎকণ্ঠায় তিনি সেই জীবন-বিচিত্রার রূপকার হয়েই রইলেন না, হলেন বিশ্বমানবিক জীবনের উপাসক, মুক্তিমন্ত্রের উদ্গাতা।

নাট্যবৃত্তে কবির ভাবচিন্তার স্বরূপও স্মরণীয়। যে সাধারণ লক্ষণাক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ নাটক দুটি তিনি রচনা করেছেন—যেমন 'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯) ও 'বিসর্জন' (১৮৯০) তাতে ঘটনা-সন্নিবেশ আছে, গতিক্রিয়াও (action) আছে। তবু নাটকাশ্রিত চরিত্রগুলির জীবনধর্মিতার চেয়ে তাদের ভাবাদর্শই আমাদের বেশি করে চোখে পড়ে। 'বিসর্জনে' দুই বিরোধী শক্তির মধ্যে সংগ্রাম দেখতে পাই—একদিকে প্রেম ও স্বাধীন ধর্মজ্ঞানের প্রতিভূ

গোবিন্দমাণিক্য, অন্যদিকে প্রচলিত ধর্মসংস্কারের প্রতিনিধি রঘুপতি। এই দুই বিপরীত ভাবদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত জয়সিংহের আত্মহত্যা রঘুপতির সংস্কার-দর্পকে বিচলিত করে। তাঁর মধ্যে উদয় হয় উদার প্রেম-চৈতন্যের। কবির নিজের ভাষায়—'এই নাটকে বরাবর এই দুটি ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে,—প্রেম আর প্রতাপ। রঘুপতির প্রভুত্বের ইচ্ছার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের শক্তির দ্বন্দ্ব বেধেছিল। রাজা প্রেমকে জয়ী করতে চান, রাজপুরোহিত নিজের প্রভুত্বকে। নাটকের শেষে রঘুপতিকে হার মানতে হয়েছিল। তার চৈতন্য হল, বোঝবার বাধা দূর হল, প্রেম হল জয়যুক্ত।' তার আগে 'রাজও রাণীতে' দ্বন্দ্ব প্রেমের দুই রূপের মধ্যে—বাসনাপ্রমত্ত সঙ্কীর্ণ অন্ধপ্রেমের সঙ্গে কল্যাণধর্মী সর্বব্যাপী মুক্তপ্রেমের দ্বন্দ্ব নাটকটিতে মুখর। রাজা বিক্রমদেব চান রাণীকে একান্তে নিজের মতো করে—রাজ্যের বৃহৎ কর্মক্ষেত্র থেকে তাকে সরিয়ে এনে, প্রজাদের মঙ্গলামঙ্গলকে উপেক্ষা করে। কিন্তু রাণী সুমিত্রা তার পতিপ্রেমকে ব্যক্তিগত ভোগের সীমায় বাঁধতে চাননি—রাজ্যের কল্যাণসাধনার ভেতর দিয়ে নিজের প্রেমকে করতে চেয়েছেন বৃহৎ ও মহৎ। 'সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শক্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হলো।'

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪) নামক নাট্যকাব্যে বন্ধন-মুক্তির লীলাই রূপায়িত। এক সন্ন্যাসী হচ্ছেন কাহিনীর নায়ক—তিনি সংসার ও প্রকৃতির মায়াবন্ধন ছিন্ন করে মগ্ন হয়েছিলেন অনন্তের সাধনায়। কিন্তু একটি বালিকা তাঁকে স্নেহপাশে আবদ্ধ করলো, ফিরিয়ে আনলো সংসারে। সন্ন্যাসী বালিকার হৃদয়ে খুঁজে পেলেন অনন্তকে। তাঁর মনো হলো—'ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই

পাই, তখনই যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই।' 'মালিনীতে' (১৯১২) যে-ভাব রূপ পেয়েছে তা হচ্ছে—যথার্থ ধর্ম মানবসংসার হতে উর্ধ্বস্থিত একটা নির্বিকল্প আইডিয়া মাত্র নয়, অচল সত্য মাত্র নয়; তা মানুষের জীবনে কল্যাণের ধারা রূপে নিত্য প্রবাহিত। তাই তার কাছে ব্রাহ্মণ্য-নেতৃত্ব ভ্রান্ত, সংস্কার ও আচার মিথ্যা। 'সত্য যার স্বভাব, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানবদেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক, সকল পৌরাণিক ধর্ম-জটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে।...এই ভাবের উপরে মালিনী স্বতই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এরই যা দুঃখ, এরই যা মহিমা সেইটেতেই এর কাব্যরস।'

'মায়ার খেলা' (১৮৮৮) গীতিনাট্যে দেহভিত্তিক প্রেমলিপ্সা ও প্রেমের মুক্তি-কামনার দ্বন্দ্বজনিত বেদনা আছে—এখানে দুঃখের আলোতেই প্রেমের স্বরূপ চিনবার চেষ্টা আছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, প্রেমই যে জীবনের প্রধান সম্পদ ও প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়ই যে জীবন, এই ভাবটি গীতিনাট্যটির মধ্যে ব্যঞ্জিত। 'গান্ধারীর আবেদন' কাব্যনাট্যেও সংঘর্ষ বেধেছে দুই বিরোধী শক্তির মধ্যে। দুর্যোধন ক্ষাত্রশক্তির প্রতিমূর্তি, তার জীবনদর্শনের মূল কথা—

জয়! জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ।
ক্ষুদ্র সুখে ভরে নাকো ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা
কুরুপতি! দীপ্তজ্বালা অগ্নিঢালা সুধা
জয়রস, ঈর্ষাসিন্ধু মন্থনসঞ্জাত,
সদ্য করিয়াছি পান—সুখী নহি তাত,
অদ্য আমি জয়ী।

* * *

ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষা সুমহতী।

ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম।

*　　*　　*

রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম নাই,
শুধু জয়ধর্ম আছে ; মহারাজ, তাই
আজি আমি চরিতার্থ,…

অন্য দিকে গান্ধারী শাশ্বত লোকধর্মের পূজারিণী। সেই নিত্যধর্মের জন্য তিনি পুত্রের নির্বাসন কামনা করেছেন, বরণ করে নিতে চেয়েছেন 'দুঃখ নবনব'। তাঁর মতে—

ধর্ম নহে সম্পদের হেতু,
মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু ;
ধর্মেই ধর্মের শেষ।

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গান্ধারীর আবেদন ব্যর্থ হয়ে গেলো। তিনি তাই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য প্রতীক্ষা করে রইলেন সেই দিনের—

যে দিন সুদীর্ঘ রাত্রি-পরে
সদ্য জেগে উঠে কাল সংশোধন করে
আপনারে, সেদিন দারুণ দুঃখ দিন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কাব্যনাট্যটির মূল কথা হচ্ছে সত্যধর্মের প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যগুলিতে নটরাজ ও বুদ্ধদেবের লীলা কবি-কল্পনাকে আকৃষ্ট করতে দেখি। এঁরা কবির ভাবাদর্শের প্রতীক। 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালায়' বলা হয়েছে—নটরাজ মুক্তপুরুষ. তাঁর বিশ্বনৃত্যের সঙ্গে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস-উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। 'শ্যামা' (১৯৩৯) নৃত্যনাট্যে উত্তীয় পূর্ণপ্রেমের ধারক। 'পরিশোধ' কাব্যের প্রেমে-উন্মত্ত অধীর বালক এখানে শ্যামার করুণার পাত্র হয়ে নয়, শ্যামাকে করুণা করবার জন্যই প্রেমের মহৎ গৌরব নিয়ে আবির্ভূত। তার আত্মদান বালকের মূঢ়তা থেকে নয়, প্রেমের গভীরতম উপলব্ধি থেকে।

প্রিয় যে তোমার, বাঁচাবে যারে,
নেবে মোর প্রাণ ঋণ

তাহারি সঙ্গে তোমারি বক্ষে
বাঁধা রব চিরদিন
মরণডোরে।

এবং

আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া
মাধুরী করেছ দান—
তুমি জান নাই তুমি জান নাই
তার মূল্যের পরিমাণ।

অর্থাৎ উত্তীয় পেয়েছে তার অন্তরের পূর্ণতা, তার হৃদয়ে জেগেছে অসামান্য প্রেমের সৌরভ। এই ধ্যান-গভীর ও অনুভূতি-নিবিড় পূর্ণ-প্রেমের তুলনায় শ্যামার প্রেম অপূর্ণ, স্থূল ও ভোগলিপ্সু।

এবার ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকগুলির কথা। 'রাজা' (১৯১০) নাটকের মূল বক্তব্য হচ্ছে, অরূপকে বাহ্য রূপ ও সৌন্দর্যের মধ্যে কখনও পাওয়া যায় না (সুদর্শনার এখানেই ভ্রান্তি), তাঁকে—যিনি 'কোনো বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে নাই'—পাওয়া যায় আপন অন্তরের উপলব্ধির মধ্যে, আনন্দ-রসের নিবিড়তার ভেতরে (সুরঙ্গমার এখানেই চরিতার্থতা)। রূপের সীমায় অরূপকে খুঁজতে যাওয়ায় বিড়ম্বনা আছে, অগ্নিদাহ সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। তাই সুদর্শনা অনেক মোহ-ভ্রান্তির স্তর পেরিয়ে, দুর্যোগের দিনের দুঃখতাপের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়ে অন্ধকার ঘরের রাজার সন্ধান পেয়েছে। 'ডাকঘরে' (১৯১২) রবীন্দ্রনাথের সুদূরের পিপাসা অভিব্যক্ত। অমল রুদ্ধগৃহের বন্দী—এই বন্ধনের অভিশাপ তাকে আর্ত ও বেদনামুখর করে তোলে। অথচ দেহ-খাঁচার ভেতর থেকে মুক্তির একটা আকাঙ্ক্ষা, আপন চিত্তের সুদূরবিলাসের কামনা তার মধ্যে প্রবল। বাইরের জগতের অনন্ত রহস্য তাকে নিত্য হাতছানি দিয়ে ডাকে—রাজার চিঠি এসে তার কাছে পৌঁছোয়। তার স্বপ্ন সে হবে ডাকহরকরা—অচেনা অজানা দেশে সে ঘুরে বেড়াবে। অবশেষে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বন্দী অমল

ছাড়া পেলো—অনন্ত রহস্যের রাজ্যে, অখণ্ড সৌন্দর্যের দেশে, চির মুক্তির ক্ষেত্রে! 'অচলায়তনে' (১৯১২) মহাপঞ্চকের দল এক প্রাণহীন আচার অনুষ্ঠান এবং অন্ধ ও বিকৃত সংস্কারের দ্বারা বৃহৎ জগৎ বা পরম সত্য বা ভগবানকে আড়াল করে রেখেছে। তাই পঞ্চকের মনে অচলায়তন থেকে মুক্তির কামনা, বিদ্রোহের প্রেরণা; দাদাঠাকুর একদিন সত্যের বাণী বহন করে এবং অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য মানুষের দল নিয়ে প্রাচীর ভেঙে দিলেন, উন্মুক্ত আকাশতলে মুক্তি ও মিলন ঘটলো সকলের—তাদের সাক্ষাৎ ঘটলো বিশ্বের সজীব সত্যের সঙ্গে, প্রাণের সংস্পর্শে প্রাণ জাগলো। এখানে তিনটি জিনিষ লক্ষণীয়—এক, মুক্তির লীলা; দুই, অনার্য অন্ত্যজ জাতির নেতৃত্ব ও প্রীতি শুধু ঐশী লীলার একটা দিক নয়—তা নবযুগের মানবচেতনারও একটা বিশিষ্ট মহিমার দিক; তিন, দাদাঠাকুরের নতুন জগতে মহাপঞ্চক (বন্ধন) ও পঞ্চক (মুক্তি) উভয়েরই স্বীকৃতি। এই কয়েকটি নাটক সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলেছেন—'বিজ্ঞান আমাদের সনাতন মন্দিরগুলি বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে ও পুরাতন বিগ্রহগুলি চূর্ণ করিয়াছে সত্য; কিন্তু আমাদের ধর্মবিশ্বাস ইহাদের সহিত সহমরণে যায় নাই। ভগবান তাঁহার পুরাতন আশ্রয়চ্যুত হইয়া পৃথিবীর সর্বত্র আপনাকে ছড়াইয়া দিয়াছেন এবং নূতন উপায়ে ভক্ত-হৃদয়ের সহিত সম্পর্ক-স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই নূতন পূজার উপাসক ও এই নূতন মন্ত্রকে বাণী দিয়াছেন—ভগবানের সহিত মানবমনের এই অবিনশ্বর আকাঙ্ক্ষাকে, আনন্দ-উপলব্ধি ও ব্যাকুল প্রতীক্ষার মধ্য দিয়া নাটকীয় রূপদান করিয়াছেন।' 'মুক্তধারায়' (১৯২৩) নামেই প্রকাশ, মুক্তির মন্ত্রোচ্চারণ শোনা যায়। সে-মুক্তি ঘটেছে যন্ত্রের বন্ধন থেকে। যান্ত্রিকতা মাত্রই মন্দ নয়, একথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন,—কিন্তু যে যান্ত্রিকতা মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে, মানুষের পারস্পরিক আত্মিক বন্ধনকে ছিন্ন করে—তা দানবতার নামান্তর। তাছাড়া সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী রাজনীতিও নাটকটিতে নিন্দিত

অম্বার মাতৃহৃদয়ের আর্তির মধ্যে শুনতে পাওয়া যায় সঙ্কীর্ণ রাজনীতি ও অন্ধ যান্ত্রিকতার হৃদয়হীন লীলার ধ্বনি। 'রক্তকরবী' (১৯২৬) যন্ত্রপুরীর রাজার উদ্ধারের কাহিনী—তার উদ্ধার ঘটেছে যন্ত্রদানবের কবাল গ্রাস থেকে, জড়দেবতার অচল ভার থেকে, লোভনীয় ধনৈশ্বর্যের বিড়ম্বনা থেকে। তার এই মুক্তির প্রত্যক্ষ কারণ নন্দিনী, পরোক্ষ প্রেরণা রঞ্জন। কবি নিজেই প্রাণময়ী নন্দিনীর হাতে পাষাণপ্রাণ রাজার মুক্তির কথা ব্যাখ্যা করে বলেছেন—'রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি। মাটি খুঁড়ে যে পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয়, নন্দিনী সেখানকার নয়, মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের, যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।' লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, নাটক দুটিতে আধুনিক যুগের জীবন-জিজ্ঞাসারই ছবি আছে।

॥ ৪ ॥

রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়, তিনি কবি—'বিশ্বরচনার অমৃতস্বাদের যাচনদার।' তাঁর 'বাহিরের প্রকাশের অন্তরালে যে একটি গভীরতর অন্তরের প্রকাশ আছে', তা মুখ্যতঃ কবিচিত্তের প্রকাশ। তিনি নিজেই বলেছেন—

> যে আমি স্বপন-মূরতি গোপনচারী,
> যে আমি আমারে বুঝিতে বোঝাতে নারি,
> আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
> সেই আমি কবি।

এই কবির বিচিত্র পরিচয় ছড়িয়ে আছে 'কবি-কাহিনী' (১৮৭৮) থেকে 'শেষ লেখা' (১৯৪১) পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের মধ্যে। তাঁর বহুধা মানস-ধারা, ভাবের অজস্র সমারোহ ও অনুভূতির বর্ণবৈচিত্র্য সত্যিই বিস্ময়কর। তবু যখন অন্তরঙ্গভাবে তাঁর কাব্যধারাকে

অনুধাবন করার চেষ্টা করি, তখন মনে হয়, তাঁর কবিস্বভাব শুধু বৈচিত্র্যমুখিন নয়, গতিশীলও বটে। তাঁর কাব্যসৃষ্টিপ্রবাহে একটা নিয়ত-পরিবর্তনের অভীপ্সা বড়োই স্পষ্ট—এক ভাবের পর্যায় থেকে অন্য ভাবের পর্যায়ে, এক অনুভূতির স্তর থেকে অন্য অনুভূতির স্তরে উত্তরণের রোমান্টিক কামনায় তিনি সর্বদা মুখর। এই পরিবর্তন-কামনা কবির অফুরন্ত প্রাণময়তার সাক্ষ্য। অবশ্য স্বীকার করতে হবে, রবীন্দ্রনাথের অস্থির প্রাণাগ্নি সৃষ্টিশীল প্রবর্তনায় শুধুই বহুপ্রসবিনী হয়ে ওঠেনি, কবিস্বভাবে অনুস্যূত পরিবর্তনধর্ম ও গতিশীলতাকেও প্রমূর্ত করে তুলেছে।

উদাহরণ দেওয়া যাক। রসিক পাঠকমাত্রই জানেন, 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে' (১৮৮২) কবি হৃদয়-অরণ্যে বন্দী। একটা বিষাদ, অতৃপ্তি ও নৈরাশ্যের ভাব কাব্যগ্রন্থটির মধ্যে 'জলের মতো ঘুরে ঘুরে কথা কয়েছে।' রবীন্দ্রনাথ বাইরের সংসারের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চেয়েছেন, কিন্তু আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পাননি। এই যে অবরুদ্ধ জীবনের বিষাদ-চেতনা তার ব্যঞ্জনা আছে কবিতাগুলির ছন্দের মধ্যেও। চরণগুলির বুকে কান পাতলে একটা বেদনাভর সূক্ষ্ম শ্রুতি শোনা যায়, ভাষা ও ছন্দের চলন ভারগ্রস্ত চিত্তের মতোই দ্বিধাবিজড়িত। আসল কথা, 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' কবির অন্তর্ভাব যেমন বহির্জগতে প্রকাশের পথ খুঁজে পায়নি, তেমনি কবির অন্তরের সুরও কথার মধ্যে চরণ খুঁজে পায়নি।

আয় দুঃখ, আয় তুই,
তোর তরে পেতেছি আসন,
হৃদয়ের প্রতি শিরা টানি টানি উপাড়িয়া
বিচ্ছিন্ন শিরার মুখে তৃষিত অধর দিয়া
বিন্দু বিন্দু রক্ত তুই করিস শোষণ ;
জননীর স্নেহে তোরে করিব পোষণ।

—দুঃখ-আবাহন।

এখানে শুধু রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের শিরা থেকে রক্ত ঝরে পড়েনি,

চরণগুলি চলতে গিয়ে রক্তাক্ত হয়েছে, ক্লান্ত পথিকের মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে। অন্যদিকে 'প্রভাতসঙ্গীতে' (১৮৮৩) দেখতে পাই হৃদয়-অরণ্য থেকে কবির নিষ্ক্রমণ ঘটেছে অপরূপ বিশ্বসংসারের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—'চাহিয়া থাকিতে থাকিতে (ফ্রি-স্কুলের বাগানের গাছের দিকে) হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে ও সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই দিনই "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।' হৃদয়-অরণ্যের পাষাণ-প্রাচীর বিদীর্ণ করে কবির ভাবের যে দুর্বার প্রকাশ, তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই কবিতাটির মধ্যে।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত-পাখির গান।

* * *

কেনরে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারিদিকে তার বাঁধন কেন ?
ভাঙ্‌রে হৃদয় ভাঙ্‌রে বাঁধন,
সাধ্‌রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পর লহরী তুলিয়া
আঘাতের পর আঘাত কর্‌!

* * *

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,

আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা ;

—নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' কবিতাটিতে যেখানে বেদনা-মন্থর হৃদয়বোধের সঙ্গে তাল রেখে দীর্ঘপর্বসমন্বিত অক্ষরবৃত্ত চরণ রচিত হয়েছিলো, সেখানে 'প্রভাতসঙ্গীতের' কবিতাটিতে কবির আনন্দ-চেতনার সঙ্গে মিল রেখে হ্রস্বপর্বযুক্ত মাত্রাবৃত্ত চরণ রচিত। ফলে একটা গতি ও দ্রুতি স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়, যা 'দুঃখ-আবাহনে' পাওয়া যায় নি। এইভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, 'প্রভাতসঙ্গীতের' পর থেকে কবিমনের যে মুক্তি ঘটেছে, বিশ্বভুবনের গতি-সত্যের সংস্পর্শে কবির অন্তঃসত্তায় যে চলৎ-শক্তি এসেছে, তার ধ্বনিরূপ হিসেবেই দেখা দিয়েছে তাঁর কবিতার ছন্দ। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে যেমন, তেমনি তাঁর ছন্দকে কখনও খুঁড়িয়ে চলতে হয়নি।

হৃদয়-অরণ্য থেকে প্রকৃতি ও মানবজীবনের মধ্যে সদ্য-মুক্তির আনন্দাতিশয্যে 'প্রভাতসঙ্গীতের' ভাব ও ভাষায়, এমন কি ছন্দে যে আবেগ ও উচ্ছ্বাস, গতি ও দ্রুতি দেখা দিয়েছিলো, 'ছবি ও গানে' (১৮৮৪) তা কতকটা শান্ত ও ধীর হয়ে এসেছে। কারণ এখন শুধু প্রাণ ভরে নিবিড়তর ভাবে বিশ্বের সৌন্দর্য উপভোগের পালা—তাই একটা উদ্বেগহীনতা ও সহজ আনন্দ কবিতাগুলির মধ্যে অভিব্যক্ত। সৃষ্টির প্রত্যেকটি বস্তুকে কবি আলাদা করে দেখছেন, 'নিতান্ত সামান্য জিনিসকেও বিশেষ করিয়া দেখিবার' একটা প্রবণতা তাঁকে পেয়ে বসেছে। তাঁর নিজের ভাষায়—'নানা জিনিসকে দেখিবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি একটি যেন স্বতন্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম। এক-একটি বিশেষ দৃশ্য এক-একটি বিশেষ রসে রঙে নির্দিষ্ট হইয়া আমার চোখে পড়িত। এমনি করিয়া নিজের মনের কল্পনাবেষ্টিত ছবিগুলি

গড়িয়া তুলিতে ভারি ভালো লাগিত।' সব কিছুকে কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়ে দেখার জন্য তাঁর কাছে পরিদৃশ্যমান জগৎ যেন স্বপ্নঘন আকাশ হয়ে উঠেছে—আর তাই তাঁর চোখে ছোট গ্রামখানি 'মায়াদেবীর মায়া রাজধানী' ('গ্রামে'), মধ্যাহ্নের পৃথিবী 'স্বর্ণময় মায়ায় মগন' ('মধ্যাহ্নে')। কবির এই মায়ার জগৎ, যা স্বপ্নাবেশময় আকাশেরই নামান্তর, তাতে বিচরণের কাহিনী আছে 'জাগ্রত স্বপ্ন' নামক কবিতাটিতে—

আজ একেলা বসিয়া, আকাশে চহিয়া,
কী সাধ যেতেছে, মন !
বেলা চলে যায়—আছিস কোথায় ?
কোন্ স্বপনেতে নিমগন্ ?
* * চ
যেন সুদূর নন্দনকাননবাসিনী
সুখঘুমঘোরে মধুর হাসিনী
অজানা প্রিয়ার ললিত পরশ
ভেসে ভেসে বহে যায়,
অতি মৃদু মৃদু লাগে গায়।
* * *
ভ্রমি আমি যেন সুদূর কাননে
সুদূর আকাশতলে,
আনমনে যেন গাহিয়া বেড়াই
সরযূর কলকলে।

—জাগ্রত স্বপ্ন।

রবীন্দ্রনাথের এই আকাশবিহারী মনের স্বপ্ন-বিচরণ-পালা হচ্ছে 'ছবি ও গান।' 'প্রভাতসঙ্গীতের' উচ্ছ্বাসের ঢঙ এতে নেই। তিনি নিজেই বলেছেন—'সহজ হবার একটা চেষ্টা (এতে) দেখা যায়। সেই জন্যে চলতি ভাষা আপন এলোমেলো পদক্ষেপে এর যেখানে সেখানে প্রবেশ করেছে। আমার ভাষায় ও ছন্দে এই একটা

মেলামেশা আরম্ভ হল। .ছবি ও গান কড়ি ও কোমলের ভূমিকা করে দিলে।'

'কড়ি ও কোমলে' (১৮৮৬) কবির কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়ে বিশ্বকে দেখার নেশা আর নেই, তাঁর মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টির অবসান ঘটেছে। তিনি এখন স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক চোখ নিয়ে জগৎ ও জীবনকে নিরীক্ষণ করতে চান। শুধু তা-ই নয়, তাঁর আকাশবিহারী মন নেমে এসেছে সেই বাস্তব প্রকৃতি ও জীবন-নিকেতনের সম্মুখে, সেই স্থূল মাটির জগতের মধ্যে—এতকাল যা তাঁর হাতের কাছে থাকলেও দৃষ্টির কাছে ছিলো না। তিনি বলেছেন—'জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে-সমস্ত ভালোমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো করিয়া হালকা করিয়া দেখা আর চলে না।' মানুষের জীবনের রহস্যসভার ভেতরে আসন পাওয়ার অভিলাষও—বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্রজীবনের আত্মনিবেদনও—কাব্যটির মধ্যে অভিব্যক্ত। এর পরবর্তী কাব্য 'মানসী' (১৮৯০) রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রথম সার্থক ফসল। কারণ 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত তিনি প্রকৃতি ও মানবজীবনের মধ্যে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজেছেন, তাদের সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছেন—কখনও আকাশে কল্পনার দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন, কখনও বা স্বাভাবিকভাবে দেখার চেষ্টা করেছেন ডাঙার পথে জীবনের যাত্রা—কিন্তু কবির নিজের ভাব-জগৎ তখনও গড়ে ওঠেনি। 'মানসীতেই' তিনি বাস্তব ও কল্পনার সাহায্যে রচিত ভাব-লোকে প্রথম উত্তীর্ণ হলেন। কবির সেই ভাবলোকে অন্তরে বাহিরে ব্যাকুলিত মিলন দেখা গেলো—বিশ্ব এসে ধরা দিলো সীমার মধ্যে, খণ্ড ব্যাপ্ত হলো অখণ্ডের মধ্যে। সীমার মধ্যে অসীম বিশ্বের যে বাণীরূপ, তা-ই আত্মপ্রকাশ করলো রবীন্দ্রনাথের মানসী প্রতিমায়—

নিভৃত এ চিত্তমাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।

*　　　*　　　*

এ চির-জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে, তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।
বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে,
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।
সেই মোহমন্ত্র গানে কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা,
ছাড়ি অন্তঃপুরবাসে সলজ্জ চরণে আসে
মূর্তিমতী মর্মের কামনা।

—উপহার।

হৃদয়-অরণ্য থেকে কবি যে বহির্বিশ্বে এসে পৌঁচেছেন এবং সীমা-অসীম ও বাস্তব-কল্পনার মিলনে নিজের ভাবলোক রচনা করতে পেরেছেন, সেটাই এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আর ছন্দের দিক থেকেও 'মানসীর' বিশেষ গুরুত্ব আছে। প্রথম দিকের কাব্য-গ্রন্থগুলিতে কবি অর্জন করতে পারেন নি তাঁর নিজের ভাষা ও ছন্দ। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' তিনি নিজের পথের সন্ধান পেলেও ভাব ও ভাষার মতো ছন্দও 'মূর্তি ধরিয়া পরিস্ফুট হইতে পারে নাই'। এই অপরিস্ফুট ছন্দকে তিনি ক্রমশঃ পরিস্ফুট করলেন, চরণের পঙ্গুত্ব ঘুচিয়ে তাতে আনলেন স্বচ্ছন্দগতি, মুক্তচাল। তার জন্য কত আয়োজনই না তাঁকে করতে হলো! প্রাচীন বাঙলা কাব্যের

অক্ষরবৃত্তে 'অক্ষরের মাপ সমান রেখে ধ্বনির মাপে ইতর বিশেষ করার' চেষ্টার ফলে যে ত্রুটি দেখা দিতো তা তিনি দূর করে দিলেন, প্রতিষ্ঠা করলেন দৃষ্টিগ্রাহ্য অক্ষর নয়—শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনির সম্মান। দীর্ঘ অক্ষর কোথায় কয় মাত্রা হবে, তা কবির রচনাতেই প্রথম সুস্পষ্ট হলো। শুধু কি তাই? মাত্রাবৃত্তে যুক্তব্যঞ্জনের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ করে মাত্রাবৃদ্ধির তত্ত্ব আসলে কবির ছন্দোগত মুক্তির তত্ত্ব, কারণ ধ্বনির মাপের শেষ সীমা পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি বস্তুতঃ ধ্বনির প্রসরণ-শক্তি বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন। যেমন—

আমি ভাঙ্গিব করুণাধারা
আমি ভাঙ্গিব পাষাণকারা

—নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, প্রভাতসঙ্গীত।

এখানে 'ভাঙ্গিব-'তে তিন মাত্রা হিসেব করা হয়েছে। যুক্তব্যঞ্জন' "ঙ্গ'-এর বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ করে ধ্বনির পরিমাণ ও মাত্রার সংখ্যা বৃদ্ধি করার কৌশল এখনও কবির অনায়ত্ত। অথচ 'মানসীতে' দেখুন—

নীলাম্বরে অঙ্গ ঘিরে
নেমেছে সেই নিভৃত নীরে,

—অপেক্ষা।

যুক্তব্যঞ্জন 'ম্ব' ও 'ঙ্গ'-এর বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ করে ধ্বনির পরিমাণ ও মাত্রার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। এই কবিতাতেই 'মৌন এক মিলনরাশি' যখন কবি লিখেছেন তখন 'মৌন'-এর 'মৌ'-কে দুই মাত্রা হিসেব করা হয়েছে। অথচ এই ধরণের যৌগিক অক্ষর পূর্বের কাব্যগুলিতে একমাত্রাসূচক। 'যৌবনমুকুল প্রাণে বিকশিত'—নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের এই চরণটিতে 'যৌ' একমাত্রিক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 'মানসীতে' কবিমনের মুক্তিযাত্রা ভাবের দিক থেকে যেমন নিজস্ব ভাবলোকে এসে পৌঁচেছে, তেমনি ছন্দের দিক থেকেও ধ্বনির মাপের শেষ সীমা পর্যন্ত এসে পৌঁচেছে।

কিন্তু একই ভাবের পর্যায়ে আটকে থাকা তাঁর কবিস্বভাব

নয়। তাই 'মানসীর' ভাবলোক থেকে তাঁকে বিদায় নিয়ে যেতে দেখি 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬) ও 'চৈতালি' (১৮৯৬)-র তপোলোকে। এই তপোলোক লোকাতীত জগতেরই নামান্তর মাত্র। ছবি ও গানের 'রাহুর প্রেম' কবিতায় যে 'অনন্ত এ ক্ষুধা অনন্ত এ তৃষ্ণা করিতেছে হাহাকার', 'কড়ি ও কোমলে' যে ইন্দ্রিয়জ প্রেম ও রূপমোহের নাগপাশ, তার মধ্যে ভোগ ও উপভোগের বার্তা আছে, সন্দেহ নেই—তবু তার স্থূলতা সম্বন্ধে একটা অতৃপ্তি ও ক্ষোভ স্পষ্ট। 'কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরান' ('কড়ি ও কোমল') বলে তিনি মাঝে মাঝে আর্তনাদও করে উঠেছেন। 'মানসীতে' সেই অতৃপ্তির সুর আরও প্রবল—তার মধ্যে কল্পনা থাকলেও তা বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়েই অভিব্যক্ত। আর সেই বাস্তব ও ইন্দ্রিয়ভোগের জগৎ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তাঁর অন্তরের ক্রন্দন শুনতে পাই—

খুঁজিতেছি, কোথা তুমি,
কোথা তুমি
যে অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়।

-- নিষ্ফল কামনা।

এরি মাঝে ক্লান্তি কেন আসে,
উঠিবারে করি প্রাণপণ!
হাসিতে আসে না হাসি, বাজাতে বাজে না বাঁশি,
শরমে তুলিতে নারি নয়নে নয়ন।

*　　*　　*

এই দিবা এই নিশা　　এই ক্ষুধা এই তৃষা,
প্রাণপাখি কাঁদে এই বাসনার টানে।

—পুরুষের উক্তি।

ফলে একটা ইন্দ্রিয়াতীত ও লোকাতীত তপোলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার

চেষ্টা দেখা যায় পরবর্তী কাব্যগুলিতে। তিনি তাঁর মনঃশক্তি ও সৃষ্টিশক্তিকে যুক্ত করলেন সেই আত্মার সঙ্গে—'যা আপনাতে আপনি সীমাবদ্ধ নয়, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।' আত্মাকে আশ্রয় করার ফলে যে তপোলোক গড়ে উঠলো তা বিধাতার দান নয়—কবির নিজের তপস্যারই সৃষ্টি। কবি দেহ-সায়রের তীর থেকে তপস্যার্জিত তপোলোকে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি নিয়ে যাত্রা করলেন, পেছনে পড়ে রইলো—তাঁর মর্ত্যকায়া। অস্পষ্টভাবে দেখা দিলেন সেই নতুন জগতের নিয়ামক এক মহৎ সত্তা—তাঁর ইঙ্গিতে চললো কবির নিরুদ্দেশ যাত্রা। 'চিত্রায়' দেখি রবীন্দ্রনাথের পথযাত্রা শেষ হয়েছে—তিনি এখন তপোলোকের অধিবাসী। শুধু তা-ই নয়, পথের দিশারী মহৎ সত্তাকে তিনি জীবনদেবতা রূপে বরণ করে নিয়েছেন—কখনও তিনি অন্তর্যামী, কখনও বা কৌতুকময়ী। এই জীবন-দেবতার লীলাবিলাস ছাড়াও 'সোনার তরী', 'চিত্রা' ও 'চৈতালিতে' দেহাতীত প্রেম ও বিশ্বসৌন্দর্যবোধের কথা আছে। 'বস্তুতঃ রূপৈশ্বর্যে, আনন্দোল্লাসে, আবেগময় বর্ণনায়, ভাবরহস্যে, মননশক্তিতে, ধ্বনির গভীরতায়, ছন্দগরিমায়, কল্পনার সবলতায়, প্রতিভার দীপ্তিতে, এমন কি সংযমহীন বর্ণনার আতিশয্যে' এটাই হচ্ছে রবীন্দ্র-কবি-জীবনের ঐশ্বর্যের কাল। কিন্তু এই ঐশ্বর্যময় কাব্যলোক থেকেও কবি বিদায় নিতে চেয়েছেন 'কল্পনায়' (১৯০০)। সেখানেও জীবন-দেবতা আছেন—কবির অন্তরের সঙ্গে এই ভাব-প্রত্যয়ের নিত্য-যোগ আছে বলে তাঁর সমগ্র জীবন-সাধনাতেই জীবন-দেবতার উপস্থিতি অনিবার্য। তবু প্রেম ও প্রকৃতি, সৌন্দর্য ও মাধুর্য রবীন্দ্রনাথের জীবনের দ্রাক্ষাকুঞ্জে যে গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ধরিয়েছে ('চৈতালি'), তা 'কল্পনায়' কবিকে যেন আর আকর্ষণ করছে না; তাঁর মনে হয়েছে এই ভাব-পর্যায় থেকে বিদায় নিতে হবে। আসল কথা, যখনই কোন বিশেষ স্তরে তিনি অন্তরের দিক থেকে পূর্ণ হয়েছেন, তখনই তা থেকে মুক্তির ইচ্ছা তাঁকে পেয়ে বসেছে। তাই তিনি লিখলেন—

বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,

এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

—অসময়।

কবির নতুন জীবন 'নহে মুখর বনমর্মরগুঞ্জিত, এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে।' এই দুঃসময়ে 'মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে, দিক-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা'। তবু কবি সেই অস্পষ্টতার মধ্যে দেখতে পেয়েছেন এক নূতন মহাজীবনের ইঙ্গিত—

তোমার ইঙ্গিত যেন ঘনগূঢ় ভ্রূকুটির তলে

বিদ্যুতে প্রকাশে—

তোমার সংগীত যেন গগনের শত ছিদ্র মুখে

বায়ুগর্জে আসে,—

*　　　　*　　　　*

যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে

সে পথপ্রান্তের

এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ

যুগযুগান্তের।

—বর্ষশেষ।

অর্থাৎ 'কল্পনায়' রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নভঙ্গ এবং মহত্তর ও বৃহত্তর জীবন-সত্যে উত্তরণ ঘটেছে।

'চৈতালির' চতুর্দশপদীগুলির মধ্যে যেমন প্রাচীন ভারত তেমনি বর্তমান দেশকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ মানব-মহিমার গভীরে আত্মনিমজ্জন কামনা করেছেন। 'নৈবেদ্যের' (১৯০১) কতকগুলি কবিতায় সেই ভাবেরই অনুবৃত্তি আছে। কিন্তু কাব্যটির স্বদেশ-ভাবনাও একটা অধ্যাত্মবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, একথা মনে রাখতে হবে। অন্য দিকে 'নৈবেদ্যে' এমন কতকগুলি কবিতা আছে, যাতে কবির ঔপনিষদিক ধর্মবোধ ও অধ্যাত্ম-আকৃতি সুস্পষ্ট। সেই আধ্যাত্মিকতা মানুষ ও মানুষের সংসারকে অস্বীকার করে নয়, তাদের অঙ্গীকার ও অতিক্রম করেই সার্থক।

একদিকে—

> বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়
> অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ।

(৩০ নং)

অন্যদিকে-

> তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
> মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।

(৬০ নং)

এইভাবে ইন্দ্রিয়ের পথ খোলা রেখে নিজের জীবনের মধ্যে দেবতার উপলব্ধি নিয়ে, অন্তহীন প্রাণ ও জ্যোতির্ময় আত্মার স্বরূপ চিনতে চিনতে কবি পৌঁছোলেন অধ্যাত্মলোকে—'খেয়া' (১৯০৬ 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০। ১৩১৩-১৭), 'গীতিমাল্য' (১৯১৪) ও 'গীতালিতে (১৯১৪)। এই কাব্যগ্রন্থগুলিতে যে 'সকল রসের রসতম ভগবৎ প্রেমের গান' আছে, তা কবির ব্যক্তিহৃদয়ে উপলব্ধ অধ্যাত্ম চৈতন্যের বাণী, সন্দেহ নেই ; তবু ভারতীয় অধ্যাত্ম-মানসের সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত চৈতন্যের কোন গরমিল নেই। তাঁর ভগবান যিনি তিনি নানক-কবীর-চণ্ডীদাস-মীরাবাঈয়েরও ভগবান।

কিন্তু এই অধ্যাত্মলোকে কবির ঊর্ধ্বপ্রয়াণও স্থায়ী হয়নি—আবার তিনি বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে ফিরে এলেন 'বলাকা' (১৯১৬ কাব্যে। কিন্তু 'প্রভাতসঙ্গীত' থেকে 'নৈবেদ্যের' পূর্ব পর্যন্ত যে বিশ্ব তাঁর মন জুড়ে ছিলো, সেই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-বর্ণ-ভরা বিশ্বে তাঁর পুনরাবির্ভাব ঘটলো না। তাঁর 'বলাকার' জগৎ কবি-দার্শনিকের জগৎ। তিনি এখানে সৃষ্টির অন্তর্নিহিত স্বরূপ-সন্ধানী জগৎ ও জীবনসম্পর্কে রসানুভূতি ও আসঙ্গবোধ নয়, একটা চিন্তা নিয়েই তাঁর কবি-মানসের আত্মপ্রকাশ। সেই চিন্তার মূল কথাটি হচ্ছে—গতি-সত্য। তিনি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে লক্ষ্য করলেন একটি নিরন্তর গতির প্রবাহ—জীবনে সেই গতির দ্যোতনা দেখলেন

যৌবনের প্রাণশক্তির মধ্যে। বিশ্বের অন্তর্লোকে এই গতির উপলব্ধি থেকে জন্ম নিলো তাঁর নতুন কাব্য। অন্য দিকে বিশ্ব-ভুবনের গতি-সত্যের সংস্পর্শে কবির অন্তঃসত্তায় যে চলৎ-শক্তি এসেছে, তার ধ্বনিরূপ হিসেবেই তাঁর কবিতায় দেখা দিয়েছে নতুন ছন্দ। পরিবর্তনবাদী ও গতিশীল চিত্তধর্মের আনন্দময় অভিব্যক্তি হিসেবে নিম্নের চরণগুলি অতুলনীয়—

তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক্ তীরে—
তাকাস নে ফিরে।
সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।
—চঞ্চলা।

'বলাকাতে' যে নানা দৈর্ঘ্যের চরণ রচিত হয়েছে, চরণের ভেতরে ছেদের অবস্থান-ক্ষেত্রে যে অভিনব অন্ত্যানুপ্রাস দেখানো হয়েছে, যে ছোটো-বড়ো পর্বের বহুবিচিত্র সংস্থান ঘটেছে, তাতে প্রচলিত ছন্দ-রূপের অনেক বিপর্যয় ঘটেছে ও মুক্তির লক্ষণ অনেক দিক দিয়ে ফুটে উঠেছে, সন্দেহ নেই। এখানে ছন্দ-ধ্বনিতে সন্ধ্যাসঙ্গীতের 'এক-ই গান, এক-ই গান, এক-ই গানের' সুর নেই, আছে 'অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলার' সুর। এতেই প্রমাণিত হয় কবির ছন্দোময় চলমানতার কথা।

'বলাকায়' রবীন্দ্রনাথের চিন্তার মৌলিকতার সঙ্গে তাল রেখে যে ছন্দ-স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ, তারই আরও অগ্রগতি দেখা যায় গদ্যকাব্য-গুলির মধ্যে। 'পুনশ্চ' (১৯৩১), 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫) ও 'শ্যামলী' (১৯৩৬) সঙ্গীতের সুর ও আবেশ থেকে মুক্ত, 'অসঙ্কুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়ার' চেষ্টা এদের মধ্যে আছে, কবির বুদ্ধি ও মনে এসেছে ঋতু-পরিবর্তন, নতুন দিনের নতুন

চেতনা ও বৃহত্তর জনগণের জীবনবোধ তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছে। তাই তিনি ঐশ্বর্যশালিনী কাব্যলক্ষ্মীকে বিদায় দিয়ে বরণ করে নিয়েছেন ধূলি-ধূসর-বেশিনী পথিকবধূকে। তাই তাঁর সঙ্কল্প—'যাব দুর্গমে, কঠোর নির্মমে, নিয়ে আসবো কঠিনচিত্ত উদাসীনের গান।' সাধারণ মানুষের জীবনের দিকে লক্ষ্য রেখে কবি আরও বললেন—

আমার বাণীকে দিলেম সাজিয়ে পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলঙ্কারে ;
তাকে রেখে দিয়ে গেলেম পথের ধারে পান্থশালায়,
পথিক বন্ধু, তোমারি কথা স্মরণ করে !
যেন সময় হলে একদিন বলতে পারো
মিটলো তোমাদেরও প্রয়োজন,
লাগলো তোমাদেরও মনে।

—নূতন কাল, পুনশ্চ

কোপাইয়ের মতো এই কাব্যগুলির 'ভাষা গৃহস্থ পাড়ার ভাষা,—তাকে সাধু ভাষা বলে না।' এখানে পূর্বরীতি-অনুযায়ী মণ্ডনকলার সযত্ন সাধনা নেই—কবিতাগুলি অলঙ্কারবর্জিত, নিরাভরণ, অসজ্জিত ও আটপৌরে। নূতন কালের মেজাজ ও রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে কবির এই যে গৃহস্থ পাড়ার ভাষায় ছন্দের সুস্পষ্ট ঝঙ্কার না রেখে জন-মানসের কথা শোনাবার প্রায়াস, তা তাঁর মুক্ত ও প্রগতিশীল চৈতন্যেরই পরিচায়ক। এরও আগে 'পলাতকায়' (১৯১৮) ধূলির ধরণীর কথা—সাধারণ মানব-চিত্তের তুচ্ছ সুখ-দুঃখ, ভালো মন্দ, স্নেহ-ভালোবাসা, লাঞ্ছনা-বেদনা ইত্যাদির কথা আমরা শুনেছি—তুচ্ছ ছড়ার ছন্দে, একথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

এইভাবে নানা পরিবর্তনের স্রোত বেয়ে কবির উত্তরণ হলো শেষ পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থগুলিতে—'প্রান্তিক' (পৌষ ১৯৩৮), 'সেঁজুতি' (ভাদ্র ১৯৩৮), 'আকাশ-প্রদীপ' (বৈশাখ ১৯৩৯), 'নবজাতক' (বৈশাখ ১৯৪০), 'সানাই' (আষাঢ় ১৯৪০), 'রোগশয্যায়' (পৌষ

১৯৪০), 'আরোগ্য' (ফাল্গুন ১৯৪১), 'জন্মদিনে' (বৈশাখ ১৯৪১) ও 'শেষ লেখায়' (ভাদ্র ১৯৪১)। এই সময়ের কবিতাগুলির মধ্যে কবির সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতাপ্রসূত স্বচ্ছদৃষ্টি, ঋষিসুলভ দিব্য-দর্শন, অর্থগভীর প্রজ্ঞা ও অম্লান সত্যানুভূতি অভিব্যক্ত। মৃত্যুমুখী রবীন্দ্রনাথের বোধ ও বুদ্ধির এই মুক্তি-ভাস্বরতা আমাদের বিস্মিত না করে পারে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যেমন কাব্যের ভাবের ক্ষেত্রে, তেমনি তার ছন্দের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মুক্তিমন্ত্রের সাধক। এক বন্ধন থেকে মুক্তি নিয়ে কবি আরেক বন্ধনের মধ্যে গিয়ে পড়েছেন এবং এইভাবে অধিকতর মুক্তির আশায় বন্ধন থেকে বন্ধনান্তরের ভেতর দিয়ে চলেছে কবির মানস-যাত্রা। একথা যেমন ভাবের দিক থেকে সত্য, তেমনি সত্য ছন্দের দিক থেকে। তবে মুক্তি তিনি চেয়েছেন বটে, কিন্তু মুক্তির নামে কোন নৈরাজ্যে গিয়ে পৌঁছোনো তাঁর কাম্য ছিলো না। তাই তাঁর 'শেষ লেখায়ও' দেখতে পাই প্রজ্ঞার নতুন সীমান্ত আর ছন্দের গভীর ধ্বনি—

রূপ নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ ;
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়···ইত্যাদি

বিশ্বাত্মবাদী কবি পদ্মোপমা সৃষ্টির মধ্যে দেখেছিলেন একটা সুষম ছন্দ, তাই তাঁর কাব্যে ছন্দ আমরণ সুন্দর ও বৃহতের পদধ্বনি।

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের কথা একটু উল্লেখ করতে চাই।—এক শ আঠারোটি ছোটগল্পে, যা সাহিত্যিক সৃষ্টি হিসেবে

তাঁর কাব্য ও সঙ্গীতের পরেই স্থান পেতে পারে, তাতেও রবীন্দ্র-চিত্তের বিশিষ্ট ধর্মগুলি স্বপ্রকাশ। 'দালিয়া' গল্পে সমস্ত রাজকীয় আয়োজন ভেদ করে যে সর্বজনীন মানবতার বিচ্ছুরণ, 'কঙ্কালে' ভৌতিক রহস্যের অন্তরাল থেকে যে অদম্য জীবন-পিপাসার অভি-ব্যক্তি, 'কাবুলিওয়ালায়' শিক্ষিত নাগরিক বাঙালীর পিতৃহৃদয়ের সঙ্গে অশিক্ষিত খুনে কাবুলিওয়ালার পিতৃহৃদয়ের এক হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে যে বিশ্ব-আর্তির প্রকাশ, 'স্ত্রীর পত্রে' পারিবারিক শাসন ও সামাজিক সংস্কারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বধূ মৃণাল যে মুক্তি নিয়েছে নারীত্বের পূর্ণতার মধ্যে—তা মানবপ্রেমিক ও মুক্তি-বাদী রবীন্দ্রনাথের কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

আইডিয়ার দিক থেকে রবীন্দ্র-মানস ও সাহিত্যের এই ব্যাখ্যা মূলতঃ সত্য হলেও সমগ্রভাবে এত সরল নয়। কারণ কবির মন বিচিত্র ও জটিল, নানা দিক থেকেই তার বিশ্লেষণ সম্ভব। তাই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোন বক্তব্যই শেষ কথা নয়। তবু রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে মূল আইডিয়ার কথা বলেছি, তা নিয়ে মতভেদ হবে না বলেই বিশ্বাস করি। অন্য দিকে সাহিত্য হিসেবে দেখলেও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি বিস্ময়কর। হয়তো তাঁর বাগ্‌বিস্তার, অলঙ্কার-প্রিয়তা, উচ্ছল মানস-বিচরণ-ধর্ম, যুক্তিক্রমের অভাব ও ভাবানুক্রমের প্রাধান্য, এমন কি ভাবজীবনের চরম মুহূর্ত ও সঙ্কটগুলিকে (crises) পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা বিবেকবান ও বিচারপ্রবণ সকল পাঠককে সব ক্ষেত্রে খুশি করে না, তবু তাঁর লেখায় বিচিত্র ও সুন্দর ভাষা ও ছন্দ রচনার প্রয়াস, অজস্র অফুরন্ত অনুভূতির খেলা, ভাব ও ধ্যানতন্ময়তা, প্রকৃতি, জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে অন্তহীন কৌতূহল, উজ্জ্বল সৌন্দর্যমুখিতা, নিগূঢ় প্রজ্ঞা ও অন্তর্দর্শন, পূর্ণতা লাভের আধ্যাত্মিক আকূতি ইত্যাদি রসিক ও বিদগ্ধ জনের কাছে পরম সমাদৃত, সন্দেহ নেই। আর তাতেই বোঝা যায়, রামমোহনের যুগের সাহিত্যের কতখানি সমৃদ্ধি ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে। এবং সেই মূল্যায়নের মধ্যেই

পাওয়া যায় বাঙলা সাহিত্যের মর্মমূলে রেনেসাঁসী আশীর্বাদের পরিমাপ।

এই তো গেলো রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে রেনেসাঁসের প্রভাবের কথা। পূর্বেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ যেমন রেনেসাঁসের সৃষ্টি তেমনি রবীন্দ্রনাথও রেনেসাঁসের সুদূরপ্রসারী পরিণতির নিয়ামক। শুধু তা-ই নয়, তিনি নিজের চোখেই দেখে গেছেন বিশ শতকের জীবনের মোড় ফেরার প্রয়াস, নতুন চিন্তা ও জিজ্ঞাসার রূপ, পরিবর্তিত যুগচেতনার স্বাক্ষর। তাঁর শেষ পর্যায়ের রচনায় তার আভাস আছে। তবু তিনি যে মূলচেতনা নিয়ে বিশ্বের জীবন-নিকেতনে ও নিসর্গ-জগতে প্রবেশ করেছিলেন তা উনিশ শতকী রেনেসাঁসেরই আন্তরধর্ম। বিশ শতকের মূল প্রেরণা আস্তিক্যহীন বুদ্ধিবাদ। সে আরেক ইতিহাস।

পরিশিষ্ট—১

কালানুক্রমিক লেখক-সূচী

মধুসূদন দত্ত	১৮২৪—১৮৭৩
দীনবন্ধু মিত্র	১৮৩০—১৮৭৩
বিহারীলাল চক্রবর্তী	১৮৩৫—১৮৯৪
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৩৮—১৯০৩
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৩৮—১৮৯৪
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৮৪৪—১৯.১
নবীনচন্দ্র সেন	১৮৪৬—.৯০৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৬১—১৯৪১